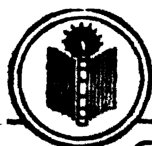
রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠ

[প্রথম খণ্ড]

হরিপ্রসাদ মিত্র



ডি.এম.লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট · কলিকাতা - ৬

মুদ্রাকর :
শ্রীসুকুমার চৌধুরী
বাণী-শ্রী প্রেস
৮৩ বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন, ১৩৭০
মূল্য : নয় টাকা
প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

ডি. এম. লাইব্রেরী ৪২ বিধান সরণি (কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট) কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত, ও বাণী-শ্রী প্রেস ৮৩ বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

স্বর্গত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

চিরস্মরণীয়েষু

মুদ্রণ-শুদ্ধি

পৃষ্ঠা ১১ দ্বিতীয় কবিতা হবে '১০১' সংখ্যক।
" ৭৬ '১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে' হবে '১২৯০ সালে'।
" ৯৬ শেষদিকে '১৩২২' এর পরিবর্তে '১৩০২' পঠনীয়
" ১১০ চতুর্থ পংক্তিতে 'দেখিয়াছ' হবে 'দেখিয়াছে'।
" ১১৭ ১২শ লাইনে 'নেচ' হবে 'সেই'।

ভূমিকা

'রবীন্দ্র সাহিত্য-পাঠ' পাঠকের আত্মচিন্তা; চূড়ান্ত কোনো সূত্র বা সিদ্ধান্তে লক্ষ্য রেখে রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক সৃষ্টি-প্রতিভা সম্বন্ধে কোনো রকম শেষকথা বলবার প্রয়াসও নয়, ঔদ্ধত্যও নয়। 'আদিকথা' নামে যে-অধ্যায়টির সাহায্যে এ-আলোচনার সূচনা, তাতে কবি-জীবনের আদি-পর্বের রচনা এবং অন্যান্য ঘটনাও যেমন জায়গা পেয়েছে, কবি-মানসের বিচিত্রতার কথা বলতে গিয়ে, তেমনি তাঁর আদি, মধ্য, অন্ত্য—সকল পর্বেরই নানা লক্ষণের কথা উঠেছে।

প্রথম খণ্ডে প্রধানতঃ তাঁর কবিসত্তার রুচি, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণার সামগ্রিক পরিচয়ের দিকেই লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এ-খণ্ডের বিষয়বস্তুর সঙ্গে আনুষঙ্গিক যোগবশতঃ চিত্রাঙ্গদা, মালিনী, পঞ্চভূত ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ রচনার বিস্তৃত আলোচনা সন্নিবিষ্ট হোলো। তাঁর কবিকাহিনী, বনফুল, ব্যঙ্গ-কৌতুক ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ রচনা-সম্পর্কিত আলোচনায় তাঁর স্রষ্টা-মনের ক্রমোদ্ঘাটনের দিকটি পরিস্ফুট করবার চেষ্টা আছে। রবীন্দ্রনাথের নাটক-নাটিকা সম্পর্কিত লেখাটি পূর্ণতর আলোচনার অংশমাত্র। স্নেহাস্পদ অধ্যাপক শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য, ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অশোক সেনের প্রীতিস্নিগ্ধ তাড়নায় এই লেখাটির সূচনা। দ্বিতীয় খণ্ডে এটি আরো অগ্রসর হবে। এগুলি এইসব প্রসঙ্গের বিশদ ভূমিকা হিসেবে ধর্তব্য। পরবর্তী খণ্ডে তাঁর এইসব রচনার অন্যান্য দিক সম্বন্ধে এবং তাঁর গল্প-উপন্যাস ও অন্যান্য বিভিন্ন সৃষ্টির বিস্তৃততর বিশ্লেষণের সুযোগ রইলো।

ডি এম. লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গোপালদাস মজুমদারের আগ্রহে এ বই প্রকাশিত হোলো। সেজন্যে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। প্রচ্ছদশিল্পী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র বিশ্বাসকেও আন্তরিক ধন্যবাদ।

হরপ্রসাদ মিত্র

মহালয়া, ১৩৭০

প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা

প্রসঙ্গ-নির্দেশিকা

রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠ

আদিকথা

বেঠিক পথের পথিক আমার
অচিন সে জন রে।
চকিৎ চলার কচিৎ হাওয়ায়
মন কেমন করে।
নবীন চিকন অশথ-পাতায়,
আলোর চমক কানন মাতায়,
যে-রূপ জাগায় চোখের আগায়
কিসের স্বপন সে।
কী চাই, কী চাই, বচন না পাই
মনের মতন রে।

—পূরবী : 'বেঠিক পথের পথিক' :

রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গেলে, নানা কথার সঙ্গে তাঁর 'পূরবী'র এই কবিতাটিই মনের মধ্যে বার-বার বেজে ওঠে! তাঁর অন্তর্যামী কী অর্থে এবং কী পরিমাণেই বা 'বেঠিক পথের পথিক' ছিলেন, তা নিয়ে শুরুতেই কোনোরকম তর্ক-বিতর্কের কথা নয়। আমাদের মানব-জীবন-রহস্যের অশেষ বৈচিত্র্য যে তাঁরই মধ্যে মূর্তি লাভ করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। জীবনের অন্তহীন চলা এবং অন্তহীন বিস্ময় তাঁর জীবনে, ব্যক্তিত্বে, এবং তাঁর রচনায় সর্বাঙ্গসুন্দর এক অন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর সাহিত্য পাঠের মধ্য দিয়ে সেই অন্বয়টি উপলব্ধি করবার চেষ্টাই এ-আলোচনার উদ্দেশ্য। কিন্তু কোন্ কথা দিয়ে সে-কথা শুরু করা যাবে? তাঁর নিজের কথাই আবার মনে পড়ে—'কী চাই, কী চাই, বচন না পাই মনের মতন রে।'

তাঁর জীবনে সমগ্রতার সন্ধান যে একটি স্থায়ী ব্যাপার ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তিনি সীমা থেকে অসীমের দিকে এগিয়ে গেছেন,—বেড়া থেকে কেবলই বেড়া মুছে দেবার দিকে! তাঁর কবিসত্তার আলোচনায় সেই কথাই বার বার মনে পড়ে। তিনি লিখে গেছেন :

'গৃহ আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, তাহা আমাদের বাসযোগ্য। মুক্ত আকাশ আমাদের পক্ষে সেরূপ বাসযোগ্য নহে, কিন্তু এই মুক্ত আকাশকে মুক্ত রাখাই আমাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।'[১]

আবার অন্যত্র তিনি লিখেছেন :

'যাহা নিতান্ত সহজেই পাওয়া যায়, সহজে ব্যতীত আর কোনো উপায়ে যাহা পাওয়া যায় না, নিজের প্রভূত চেষ্টার দ্বারাতেই তাহাকে একেবারে দুর্লভ করিয়া তোলা হয়। বেষ্টন করিয়া লইয়া সংসারের আর সমস্ত পাওয়াকেই আমরা পাইতে পারি,—কেবল ধর্মকে, ধর্মের অধীশ্বরকে বেষ্টন ভাঙিয়া দিয়া আমরা পাই।'[২]

উপনিষদের যে ক'টি মন্ত্র তাঁর সারা-জীবনে,—তাঁর নানা রচনার মধ্যে বার বার জায়গা পেয়েছে, তারই একটি মন্ত্রের কথা এখানে বিশেষভাবে মনে পড়ে :

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি
ততঃ সপত্নান্‌ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

তাঁরই নিজের ভাষাতে,—এখানে এ মন্ত্রের অনুবাদও তুলে দেখা যেতে পারে। তিনি লিখেছিলেন, 'অধর্মের দ্বারা আপাতত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়, আপাতত মঙ্গল দেখা যায়, আপাতত শত্রুরা পরাজিত হইতে থাকে, কিন্তু সমূলে বিনাশ পাইতে হয়।'

ধর্ম কি—এ প্রশ্নের উত্তরও তিনি নিজেই দিয়ে গেছেন :

'আমাদের ধর্ম রিলিজন নহে, তাহা মনুষ্যত্বের একাংশ নহে—তাহা পলিটিক্স হইতে তিরস্কৃত, যুদ্ধ হইতে বহিষ্কৃত, ব্যবসায় হইতে নির্বাসিত, প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে দূরবর্তী নহে। ধর্ম সংসারের আংশিক প্রয়োজন সাধনার জন্য নহে, সমগ্র সংসারই ধর্মসাধনের জন্য।'

ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন বিশিষ্টতার ধারায় নিজেকে তিনি সানন্দ সংযোগে অন্বিত হতে দিয়েছিলেন। সুদূর কালিদাসের কাল, —তৎপূর্ববর্তী বৌদ্ধ,—আর, তৎপরবর্তী বৈদিক যুগের কথা মনে পড়ে! 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালার

১। ধর্ম : 'ধর্মের সরল আদর্শ'
২। ঐ : 'ধর্মপ্রচার'

মধ্যেই তাঁর প্রসিদ্ধ 'তপোবন' প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে। সেই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে, পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতা নগরে অভিব্যক্তি পেয়েছে। 'কিন্তু ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ শহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশ দেখতে পাই—সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁসি করে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠেনি।' যারা বনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তারা হয় বাঘের মতো হিংস্র হয়ে ওঠে, নয়তো হরিণের মতো নির্বোধ হয়ে থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে অরণ্যের নির্জনতায় যে আরণ্যক সাধনা সম্ভব হয়েছিল, তাতে তার বিশ্বের গভীরে প্রবেশ করবার সুযোগ ঘটেছিল। সে শক্তি প্রধানতঃ বহিরভিমুখী হয়নি। রবীন্দ্রনাথ সেখানে সুস্পষ্ট ভাবে বলেছিলেন, 'সমুদ্রতীরে যে জাতিকে পালন করেছে তাকে বাণিজ্যসম্পদ দিয়েছে, মরুভূমি যাদের অন্নস্তন্যদানে ক্ষুধিত করে রেখেছে তারা দিগ্বিজয়ী হয়েছে।' সমতল আর্যাবর্তের অরণ্যভূমি সেই রকম ভারতবাসীকে নিখিলচরাচরের সঙ্গে নিজের প্রাণের, চেতনার, হৃদয়ের, বোধের এবং আত্মার আত্মীয়তা উপলব্ধির সুযোগ দিয়েছে। ভারতবর্ষের দুটি বড়ো বড়ো যুগ,—বৈদিক যুগ এবং বৌদ্ধ যুগকে 'বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করেছে'। তারপর, বিক্রমাদিত্য যখন রাজা, উজ্জয়িনী যখন মহানগরী, কালিদাস যখন কবি, তখন তপোবনের যুগ শেষ হয়ে মানুষের মহামেলার মধ্যে নাগরিকতা শুরু হয়েছে। সেই যুগের কবি কালিদাস যে বিশেষভাবে ভারতবর্ষেরই কবি, সে-কথা তাঁর তপোবন-বর্ণনা থেকেই সপ্রমাণ হয়। এই ধারায় ভাবতে ভাবতে তিনি লিখেছিলেন, 'মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সম্মিলনই আমাদের দেশের সমস্ত প্রসিদ্ধ কাব্যের মধ্যে পরিস্ফুট।' কালিদাসের আমলে ভারতবর্ষ যে বাইরের শত্রু শক-শক্তির দ্বারা আক্রান্ত এবং কালিদাসের রাজপ্রভুদের মধ্যে আত্মসুখ-পরায়ণতা যে প্রবল হয়ে উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথের ঐ আলোচনাতেই সে-কথা ব্যক্ত হয়েছে। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব-কাব্যে কালিদাস তপস্যার কথা তাই বিশেষভাবে দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়— 'কবি বলেছেন ত্যাগের সঙ্গে ঐশ্বর্যের, তপস্যার সঙ্গে প্রেমের সম্মিলনেই শৌর্যের উদ্ভব, সেই শৌর্যেই মানুষ সকল প্রকার পরাভব হতে উদ্ধার পায়।' তিনি আরো বলেছেন, 'ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্যেই পূর্ণ শক্তি। ত্যাগী

শিব যখন একাকী সমাধিমগ্ন তখনও স্বর্গরাজ্য অসহায়, আবার সতী যখন তাঁর পিতৃভবনের ঐশ্বর্যে একাকিনী আবদ্ধ তখনও দৈত্যের উপদ্রব প্রবল।'

এই প্রবন্ধটির এই সন্ধিতে পৌঁছে, অতঃপর তিনি যা লিখেছিলেন —তাঁর মানস-প্রকৃতির বিশেষত্ব বুঝে দেখবার জন্যেই তাঁর সেই কথাগুলি স্মরণ করা দরকার :

'প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলেই ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্য ভেঙে যায়।

'কোনো একটি সংকীর্ণ জায়গায় যখন আমরা অহংকারকে বা বাসনাকে ঘনীভূত করি তখন আমরা সমগ্রের ক্ষতি করে অংশকে বড়ো করে তুলতে চেষ্টা করি। এর থেকে ঘটে অমঙ্গল। অংশের প্রতি আসক্তিবশত সমগ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এই হচ্ছে পাপ।

'এই জন্যই ত্যাগের প্রয়োজন। এই ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করবার জন্যে নয়, নিজেকে পূর্ণ করবার জন্যেই। ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্য, অহংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য, সুখকে ত্যাগ আনন্দের জন্য। এই জন্যেই উপনিষদে বলা হয়েছে, ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, আসক্তির দ্বারা নয়।

'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করবে এইটি উপনিষদের অনুশাসন, এইটেই কুমারসম্ভব কাব্যের মর্মকথা এবং এইটেই আমাদের তপোবনের সাধনা। লাভ করবার জন্যে ত্যাগ করবে।'

কিন্তু ভারতবর্ষের এই ত্যাগের আদর্শ কেবলমাত্র দুঃখস্বীকৃতি নয়। তিনি বলেছেন, 'ত্যাগই গভীরতর আনন্দ'। 'যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ', অর্থাৎ যা-কিছু সমস্তের সঙ্গে ত্যাগের দ্বারা বাধাহীন মিলন, এইটেই হচ্ছে তপোবনের সাধনা'। এবং—'তপোবনের যে একটি বিশেষ রস আছে সেটি শান্তরস। শান্তরস হচ্ছে পরিপূর্ণতার রস। যেমন সাতটা বর্ণরশ্মি মিলে গেলে তবে সাদা রং হয় তেমনি চিত্তের প্রবাহ নানাভাগে বিভক্ত না হয়ে যখন অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিলের সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্যকে একেবারে কানায় কানায় ভরে তোলে, তখনই শান্তরসের উদ্ভব হয়।'

ঐ 'তপোবন' প্রবন্ধেরই আরো পরের অংশে তিনি বলেছেন, 'মানুষ দুই রকম করে নিজের মহত্ত্ব উপলব্ধি করে—এক, স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে, আর এক

মিলনের মধ্যে। এক ভোগের দ্বারা, আর-এক যোগের দ্বারা। ভারতবর্ষ স্বভাবতই শেষের পথ অবলম্বন করেছে। এই জন্যেই দেখতে পাই যেখানেই প্রকৃতির মধ্যে কোনো বিশেষ সৌন্দর্য বা মহিমার আবির্ভাব সেইখানেই ভারতবর্ষের তীর্থস্থান।'

তারপর কিঞ্চিৎ দুঃখের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একথাও লিখেছিলেন যে, তীর্থে অনেকেই যায় কিন্তু তীর্থের যথার্থ ফল লাভ করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। 'যারা দেখবার জিনিসকে দেখবে না, পাবার জিনিসকে নেবে না, শেষ পর্যন্তই তাদের বিদ্যা পুঁথিগত ও ধর্ম বাহ্য আচারে আবদ্ধ থাকে।'

রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই এই কথাগুলির অন্তর্নিহিত সতর্কবাণী লক্ষ্য করবেন। বোধশক্তির অসাড়তাকেই তিনি বলেছেন যোগভ্রষ্টতা! তিনি জেনেছেন—জ্ঞানের তপস্যাতেই মনের বাধা-মোচনের সম্ভাবনা। তাই শিক্ষাকে কোনোমতেই সংকীর্ণ করতে চাননি তিনি। তথাকথিত 'জাতীয়' শিক্ষার তিনি ছিলেন বিরোধী। সে-ক্ষেত্রেও তাঁর নিজের কথাই পুনরায় স্মরণীয়— 'জাতীয়তাকে আমরা পরম পদার্থ বলে পূজা করিনে এইটেই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা—ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, এইটিই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তার মন্ত্র।' আবার এই ভারতীয়-জাতীয়তার প্রশংসা করলেও অন্য জাতীয়তার নিন্দা করেননি রবীন্দ্রনাথ। তিনি বরং এই কথাই বলেছেন যে, 'মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যের সীমা নেই। সে তালগাছের মতো একটি মাত্র ঋজু রেখায় আকাশের দিকে ওঠে না, সে বটগাছের মতো অসংখ্য ডালেপালায় আপনাকে চারিদিকে বিস্তীর্ণ করে দেয়।' মানব-সংসারে এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির সম্পর্কটা শুধু অনুসরণের নয়,—স্বার্থান্ধ অধিকার-পরায়ণতারও নয়,—আমাদের সম্বন্ধ আদান-প্রদানের! তাই তাঁর মতে, যে-সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিন্তভাবে লাভ করতে পারবে, 'সে সত্য প্রধানত বণিগ্‌বৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়; সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। সেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্বমানবের নিত্যব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্যে তপস্যা করেছেন এবং

কালক্রমে নানাবিধ দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও কবির, নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরবর্তী মহাপুরুষগণ সেই সত্যকেই প্রচার করে গেছেন। ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা।' এই হোলো রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ। উপনিষদ, গীতা, বৌদ্ধশাস্ত্র তাঁর মধ্যে এক হয়ে আছে! তিনি আমাদের সম্পূর্ণ ঐতিহ্যের ধারক!

রবীন্দ্র-সমালোচনার আদর্শ

রবীন্দ্রনাথের নানা উক্তিতে বিপরীতের সমাবেশ ঘটতে দেখে কেউ কেউ বড়োই সংশয় বোধ করেছেন। শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর একটি প্রবন্ধে সে-কথার উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর সে প্রবন্ধের পাদটীকাতে তিনি জানিয়েছেন,—'একই দিনে, টাউন হলে এবং সেনেট-হাউসে, এই বিষয়ে তিনি দুটি ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। দুটি সভাতেই আমি উপস্থিত ছিলাম।'

এখন বিষয়টি কি, তা দেখা যাক। ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন: 'অজস্র জায়গায় তিনি বিপরীত মন্তব্য প্রকাশ করেন। কখনও লিখছেন তিনি প্রথমতঃ কবি, কখনও প্রথমতঃ সঙ্গীত-রচয়িতা; কখনও ইঙ্গিত করছেন তিনি প্রথমে বাঙালী, ভারতবাসী, এসিয়ান, আবার কখনও বিশ্বজনীন; কখন আভাস দিচ্ছেন তিনি প্রথমে ভবিষ্যতের, কখনও বর্তমানের, অতীতের। এমন কি এও লিখেছেন যে আর্টিষ্ট একাকী, আবার বলেছেন, যেমন ঐ চিঠিতে (১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'পূর্বাশা'য় শ্রীশৈলেন ঘোষের 'প্রকাশ' প্রবন্ধে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের চিঠির অংশ সম্বন্ধে), তাঁর মত আর্টিষ্টের সাধনা সমগ্রকে, অর্থাৎ অন্ততঃ সমাজকে নিয়ে।' এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাগুলি এই ছিল:—'আমি স্বভাবতই সর্বাস্তিবাদী—অর্থাৎ আমাকে ডাকে সকলে মিলে—আমি সমগ্রকেই মানি।'

ধূর্জটিপ্রসাদের মন্তব্য তো দেখা গেল। এবার এ-বিষয়ে তাঁরই দেওয়া মীমাংসাটুকুও প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলেছেন—'বস্তুতঃ, তাঁর পক্ষে মতামতগুলো স্বতঃবিরোধী নয়। মহৎ ক্ষুদ্র বৈপরীত্যের অতিরিক্ত, তাকে অগ্রাহ্য করে নয়, তাকে গ্রহণ করেই। একে কবির খামখেয়ালও বলা চলে না, যদিও তিনি খেয়ালী ছিলেন, এবং অনেক সময় শ্রোতা ও পাঠকের চাহিদা অনুসারে সমগ্রের পরিবর্তে মতামতের কোন বিশেষ অংশ বা দিক তাঁকে দেখতে হোতো।'

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যকে,—এবং বিশেষভাবে বাঙালীর লেখা রবীন্দ্র-সমালোচনাকে কিঞ্চিৎ তিরস্কার করে ধূর্জটিপ্রসাদ অতঃপর শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের রবীন্দ্র-সমালোচনা-রীতির ঈষৎ প্রশংসা-সূত্রে বলেছেন—'অন্নদাশঙ্কর রায়ের দু'তিনটি প্রবন্ধে অবশ্য আমি সমগ্রবোধের চেষ্টা লক্ষ্য করেছি। তিনি রবীন্দ্রনাথের জীবনটাকেই আর্ট বলেছেন। এটাও কিন্তু ঠিক সমগ্রদৃষ্টি নয়, কারণ এর পিছনে জীবন, জীবনী-শক্তি, কিংবা ঐ ধরনের একটা কিছু গুহ্য ঐক্যের প্রত্যয় আছে।'

এসব কথা এক্ষেত্রে গৌণ। রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজের বিপরীত-অন্বয়ী মনের কথা বলেছেন। সে-কথা 'মানসী' প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা তাঁর চিঠিতেই ব্যক্ত হয়েছে। পরে সে-প্রসঙ্গ দেখা যাবে।

: সমগ্রতা, জীবনবোধ, বিশ্বানুভূতি :

রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচককে 'সমগ্রতা' সম্বন্ধে সর্বদাই বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হয়। রবীন্দ্র সমালোচকের পক্ষে এ আদর্শ কখনোই ভোলবার নয়। কিন্তু 'সমগ্রবোধ' কথাটির মানে কি? জীবনের বিচিত্র ব্যবহার, বিভিন্ন মুহূর্ত, নানা অভিজ্ঞতা অথবা বহুধা-বিচ্ছিন্ন অভিব্যক্তির মধ্যে জীবনেরই অন্তর্নিহিত, অনিবার্য কোনো ঐক্য সম্বন্ধে ধারণাতে প্রত্যয় থাকলে সে-প্রত্যয় কেন যে জীবন সম্বন্ধে সমগ্র-দৃষ্টির অন্তরায় হবে, সে-কথা সত্যিই বুঝতে অসুবিধা হয়। ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বকে এখানেও ছাড়া চাই!' অর্থাৎ? অর্থাৎ—নিজের সমগ্রবোধ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের ঐ ঘোষণা! তিনি আরো বলেছেন,—'বিশাল সমগ্রবোধ রবীন্দ্রনাথের অর্জিত ধন' এবং 'এ বোধ তাঁর পূর্বে ছিল না।' অতঃপর আরো স্পষ্ট ভাবে,—আর-একটু পাণ্ডিত্যের ঝাঁজ দিয়ে তিনি লিখেছেন: 'জীবন-বোধ প্রত্যয়টি য়ুরোপীয় দর্শনের genetic fallacy of original substance, কিংবা অধ্যাপক রাইল সাহেবের ভাষায় 'ghost in the machine,' 'mistake of category' বলা চলে।'

তাঁর বক্তব্য এগুতে এগুতে ক্রমেই যেন ঝাপসা হয়ে এসেছে। এসব কথা আড়ম্বরময়,—এমন কি দুর্বোধ্য! 'সমগ্রদৃষ্টি' নিয়ে তর্ক শুরু হয়েছিল। সেখান

থেকে তিনি 'জীবনবোধ' শব্দটিতে এসে পৌঁছেছেন। এবং তারপর অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট আর-একটি কথা দেখা দিয়েছে—'যে-পাঠকের মনে কোনো না কোনো মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের সমগ্রতার নকসা স্থিরভাবে প্রতীয়মান হয়নি, তার পক্ষে রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনা বিড়ম্বনা মাত্র।' বলা বাহুল্য, ধূর্জটিপ্রসাদের এইকথাগুলি অবশ্যই মনে রাখবার মতন।

আসল কথা, সমালোচনার রাজ্যে ছোটো অনুভূতি এবং বড়ো অনুভূতি, দুইই আছে। ধূর্জটিপ্রসাদ পণ্ডিত ব্যক্তি। তাই এ-ক্ষেত্রে ন্যায়শাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি নানা শাস্ত্রের কথা তিনি এনে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন! কিন্তু তাঁর এ-কথা খুবই সত্য যে, 'সত্য-মিথ্যার কষ্টিপাথর অনুভূতি,—এবং সমালোচনার অর্থ analysis of meaning,—অর্থ-বিশ্লেষণ, causation নয়। সমগ্রের সঙ্গে যোগ ব্যতিরেকে যখন অর্থ অসম্পূর্ণ, তখন রস-সমালোচনার কাজই হোলো ঐ যোগের প্রক্রিয়া বোঝা ও বোঝানো।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের জীবন সম্বন্ধে 'সমগ্র লক্ষ্যবদ্ধ' ভাবে সচেতন হবার অভিজ্ঞতা নিজেই জানিয়ে গেছেন। 'সমগ্র-লক্ষ্যবদ্ধ' কথাটি তাঁরই প্রয়োগ! ঐ 'তপোবন' প্রবন্ধটিতেই তিনি লিখেছিলেন—'প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখায় বলেই তাকে বড়ো মনে হয়, কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায়নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে, এই যোগ অহংকারকে দূর করে বিনম্র হয়ে। এই বিনম্রতা একটি আধ্যাত্মিক শক্তি, এ দুর্বল স্বভাবের আনুগত্য নয়। বায়ুর যে প্রবাহ নিত্য, শান্ততার দ্বারাই ঝড়ের চেয়ে তার শক্তি বেশি। এইজন্যই ঝড় কেবল সংকীর্ণ স্থানকেই কিছুকালের জন্য ক্ষুব্ধ করে; আর শান্ত বায়ুপ্রবাহ সমস্ত পৃথিবীকে নিত্যকাল বেষ্টন করে থাকে। যথার্থ নম্রতা, যা সাত্ত্বিকতার তেজে উজ্জ্বল, যা ত্যাগ ও সংযমের কঠোর শক্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, সেই নম্রতাই সমস্তের সঙ্গে অবাধে যুক্ত হয়ে সত্যভাবে নিত্যভাবে সমস্তকে লাভ করে। সে কাউকে দূর করে না, বিচ্ছিন্ন করেনা, আপনাকে ত্যাগ করে এবং সকলকেই আপন করে।'

৩ মঙ্গলদের সামর্থ্য,—সমালোচক বিষের বন্ধু :

মানুষের ক্রিয়া এবং চিন্তা পরস্পরের সঙ্গে অন্বিত। এই অন্বয়ের সত্য

উপেক্ষা করলে এ-বিষয়ে বিচার সত্যিই পূর্ণতা পায় না। অর্থাৎ,– তাঁর নিজের কথা দিয়েই বলা যেতে পারে যে, সমালোচককে সৃজনশীল সাহিত্যিকের যথার্থ 'বন্ধু' হতে হয়। এবং একথা সকলেই জানেন যে যথার্থ বন্ধুর কাজই হোলো গুণ-গ্রহণ!

উনিশশ বারো সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ইংলণ্ড এবং অ্যামেরিকা ভ্রমণে যাত্রা করেন, তার ঠিক আগে,—এবং সেই ভ্রমণের মধ্যেও, তাঁর 'পথের সঞ্চয়'-এর প্রবন্ধগুলি লেখা হয়। তাঁর সেই সব প্রবন্ধেরই অন্তর্ভুক্ত 'বন্ধু' নামে একটি লেখাতে তিনি উইলিয়ম রোটেনস্টাইনের বন্ধুত্বের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। সেই সূত্রে বন্ধুত্বের স্বরূপ বা বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন –'বাগানের মধ্যে গোলাপ যেমন একটি বিশেষ ফুল, বন্ধু তেমনি একটি বিশেষ জাতের মানুষ। এক একটি লোক আছেন পৃথিবীতে তাঁহারা বন্ধু হইয়াই জন্ম গ্রহণ করেন। মানুষকে সঙ্গদান করিবার শক্তি তাঁহাদের অসামান্য এবং স্বাভাবিক। ...বন্ধু হইতে গেলে সঙ্গদান করিতে হয়। অন্যান্য সকল দানের মতো এ দানেরও তহবিল দরকার, কেবল মাত্র ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়।' তিনি নিজে এই অর্থেই সারা বিশ্বের বন্ধু ছিলেন। তাঁর সমালোচককেও যথার্থ বন্ধুত্বের মনোভঙ্গি অর্জন করতে হবে!

তাঁর এই দামী কথাটি মনে রেখে, ধূর্জটিপ্রসাদের বক্তব্যের পরের অংশ ভেবে দেখা যেতে পারে। রবীন্দ্র-কবিতার বিচারে অন্ততঃ দুটি দিকের উল্লেখ করেছেন তিনি। প্রথমতঃ ছন্দ, শব্দ, বাক্যসংগতি, ভাবার্থ ইত্যাদির বিচার,—যাকে তিনি বলেছেন 'সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ' থেকে বিচার; দ্বিতীয়ত, সামাজিক পরিবেশ, ঐতিহাসিক অবস্থান, রাষ্ট্র-চিন্তাগত ভূমিকা ইত্যাদি অন্যতর দিক,—যার নাম দিয়েছেন 'অ-সাহিত্যিক আলোচনা।' এই ভাবে শ্রেণী নির্দেশের পরে তিনি সমালোচকের সত্যিকার কর্তব্য সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন: 'কেবল কবিতার সাহিত্যিক বিচারে চলবে না, যেখানে কবিতা সংগীতের কোলে মূর্ছিত হচ্ছে তার সন্ধান দিতে হবে; কেবল সামাজিক বিচারও অসম্পূর্ণ, যেখানে সমাজ কবিকে, ঐতিহ্য কবিতার রূপ ও বিষয়কে মুক্ত হবার সুবিধা দিচ্ছে তার ঠিকানাও জানা চাই। এই ভাবে দেখলে খণ্ডবোধের দোষ বিনষ্ট হয় এবং সমগ্রবোধের আভাস ফিরে আসে, অথবা জন্মায়।'

এই প্রসঙ্গে 'পথের সঞ্চয়'-এর 'কবি য়েট্‌স্' প্রবন্ধটি মনে পড়া স্বাভাবিক। সেখানে রবীন্দ্রনাথ নিজেই কবিমানের তর-তম প্রভেদের ইশারা দিয়ে গেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ঠিক যে ধরনের, বা যে শ্রেণীর কবি তিনি,—সেই বিশেষ শ্রেণীর কথাই বিশেষভাবে বিবেচ্য। ভিড়ের মাঝখানেও কবি য়েট্‌স্‌কে বিশেষ একজন বলে চিনে নিতে যে অসুবিধা হয় না, রবীন্দ্রনাথের সে-উক্তির মধ্যে য়েট্‌সের বিশেষ কবিসত্তার সুগভীর বিশেষত্বেরই স্বীকৃতি ছিল! তিনি য়েট্‌সের স্বাতন্ত্র্যের কথা বোঝাতে গিয়ে লিখেছিলেন যে, কবিদের মধ্যে দুটি জাত আছে—একদল হলেন 'বিশ্বজগতের কবি,' অন্যদল 'সাহিত্য-জগতের কবি'। এই কথাটিই পরিস্ফুট করতে গিয়ে আরো লিখেছিলেন, 'এ দেশে (অর্থাৎ ইংলণ্ডে) অনেক দিন হইতে কাব্যসাহিত্যের সৃষ্টি চলিতেছে, হইতে হইতে কাব্যের ভাষা উপমা অলংকার ভঙ্গি বিস্তর জমিয়া উঠিয়াছে। শেষ-কালে এমন হইয়া উঠিয়াছে যে, কবিত্বের জন্য কাব্যের মূল প্রস্রবণে মানুষের না গেলেও চলে। কবিরা যেন ওস্তাদ হইয়া উঠিয়াছে, অর্থাৎ প্রাণ হইতে গান করিবার প্রয়োজনবোধই তাহাদের চলিয়া গিয়াছে, এখন কেবল গান হইতেই গানের উৎপত্তি চলিতেছে। যখন ব্যথা হইতে কথা আসে না, কথা হইতেই কথা আসে, তখন কথার কারুকার্য ক্রমশ জটিল ও নিপুণতর হইয়া উঠিতে থাকে; আবেগ তখন প্রত্যক্ষ ও গভীর ভাবে হৃদয়ের সামগ্রী না হওয়াতে সে সরল হয় না, সে আপনাকে আপনি বিশ্বাস করে না বলিয়াই বলপূর্বক অতিশয়ের দিকে ছুটিতে থাকে; নবীনতা তাহার পক্ষে সহজ নহে বলিয়াই আপনার অপূর্বতা প্রমাণের জন্য কেবলই তাকে অদ্ভুতের সন্ধানে ফিরিতে হয়।'

'সাহিত্যজগতের কবি'দের কবিত্ব সম্বন্ধে তাঁর এই মন্তব্য এখানে একটু বেশি পরিমাণেই তুলে দেওয়া গেল! রবীন্দ্র-কাব্যের অনুরাগীমাত্রেই একথা স্বীকার করবেন যে, রবীন্দ্রনাথ নিজে কখনোই এ-জাতের কবি ছিলেন না। তাঁর সমালোচনায় উদ্যত হবার আবশ্যিক প্রস্তুতি বা প্রাক্‌কর্তব্য হিসেবেই এ-কথা স্মরণীয়। ধূর্জটিপ্রসাদ যে 'সাহিত্যিক' বিচারের কথা বলেছেন, সে-রকম বিচার এই 'সাহিত্যজগতের কবি'দের সম্বন্ধেই সংগত,—'বিশ্বজগতের কবি'দের সম্বন্ধে নয়!

ধূর্জটিপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের সংগীত এবং নাটক বিচার সম্বন্ধেও বাঙালী সমালোচক-সমাজের ত্রুটির কথা বলেছেন। সংগীত সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য এই : 'রবীন্দ্র-সংগীত সম্বন্ধে কথা, সুর ও ভাবসমন্বয়ের যৎসামান্য বিচার হয়েছে। কিন্তু কবিতার ওপরেই বেশি জোর পড়েছে। আমার বিশ্বাস এই ধরনের বিচারই অসম্পূর্ণ; কারণ রবীন্দ্র-সংগীতে সুরবিন্যাসে যে প্রতিরূপ (image) ও প্রতীক (symbol) সৃষ্টি করে, তার সঙ্গে সংগীতের কথাকৃত ও ছন্দকৃত প্রতিরূপ ও প্রতীকের সন্ধান দেখানো হয়নি, দুয়ের মধ্যকার যোগ স্থাপিত হয়নি।' এই ত্রুটির তালিকায় তিনি আরো বলেছেন যে, কেবল তাই নয়, রবীন্দ্র-চিত্রগত প্রতিরূপ ও প্রতীক বাইরে পড়ে রয়েছে। অথচ কথা, ছন্দ, ভাব ও ধ্বনিগত রূপ ও প্রতীকের সঙ্গে সুরগত প্রতিরূপ ও প্রতীকের সম্বন্ধ নিগূঢ় এবং সেগুলো চিত্রগত প্রতিরূপ ও প্রতীকেরই অঙ্গাঙ্গী। কবিতায় মৃত্যু-কল্পনা, চিত্রে সাদা-কালো অর্ধ-উন্মুক্ত রহস্যময়ী মূর্তি এবং জীবনের শেষদিকের বহু সংগীতের সুরবিন্যাসের সাহায্যে (যথা পূরবী) সৃষ্ট প্রতিরূপ,—এইসব একই অখণ্ডিত সমগ্র পরিকল্পনার রূপান্তর।' এই তথ্যটিকেই তিনি তাঁর মূল বক্তব্য বলেছেন। এবং এও বলেছেন যে, এই 'অখণ্ড সমগ্র পরিকল্পনা'র ব্যাখ্যায় সুরজ্ঞান, চিত্রসাধনার ইতিহাস ইত্যাদি সব কিছুই আসতে পারে, তবে, কোনোটাই মূলতত্ত্ব নয়!

ধূর্জটিপ্রসাদ এইভাবে বিশেষ প্রযত্নের সঙ্গেই রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনার মহৎ এবং গুরু দায়িত্বের দিকটি বিশদ করবার চেষ্টা করেছেন বটে, তবে তাঁর ঐ 'বক্তব্য' বইখানির অনেক প্রবন্ধেই তাঁর বলবার ভঙ্গি আরো সরল হলে আরো ভালো হোতো। মাঝে মাঝে তাঁর বক্তব্য বড়োই জটিল হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তাঁর সমালোচকের দায়িত্বের কথাটা কোনো কোনো জায়গায় প্রচুর কৌতুক এবং পরিহাসের সঙ্গে বলেছেন। কিন্তু সাক্ষাৎভাবে নিজের দাবি তিনি নিজে কোথাও রূঢ়ভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন নি। তবে, তাঁর সমস্ত কৃতিত্বের মূলে তাঁর নিজের অন্তরের যে বিশিষ্টতা ছিল, তাঁর শেষ বয়সের কোনো কোনো রচনাতে পরম আবেগের সঙ্গেই সে-কথা তিনি বলবার চেষ্টা করেছেন। আর, কবির কাব্য-সৃষ্টির মধ্যে,—কবির মননে কল্পনায়,—জীবনের সমস্ত খণ্ডতা কী ভাবে পূর্ণ অন্বয়ে এসে পৌছোয়, সে-তত্ত্বের খুবই সহজ ব্যাখ্যা দেখা গিয়েছিল তাঁর

১২৯৮ সনের খুবই ছোটো একটি প্রবন্ধে। সে লেখাটির নাম 'কাব্য'। তাতে তিনি বলেছিলেন—'এই কাব্যরস কী তাহা বলা শক্ত। কারণ, তাহা তত্ত্বের ন্যায় প্রমাণযোগ্য নহে, অনুভবযোগ্য। যাহা প্রমাণ করা যায় তাহা প্রতিপন্ন করা সহজ; কিন্তু তাহা অনুভব করা যায় তাহা অনুভূত করাইবার সহজ পথ নাই। কেবলমাত্র ভাষার সাহায্যে একটা সংবাদ জ্ঞাপন করা যায় মাত্র।' অতএব, যাঁর অনুভূতি নেই, তিনি সমস্ত খণ্ডবিদ্যায় বিদ্বান হয়েও রবীন্দ্র-সমালোচনার চাবিকাঠিটি খুঁজে পাবেন না।

কবমানে, প্রেরণায়—সর্বাবস্থায় ঐক্যানুভূতি ও বিস্ময়বোধ

ছোটো ছোটো কাব্য-কণিকার নমুনা রবীন্দ্র-রচনাবলীতে যে বিরল নয়, সে-খবর তাঁর সুবিপুল পাঠকসমাজের অগোচর নয়। সেকালের 'কণিকা' তো সকলেরই সুপরিচিত কাব্য-সংকলন। 'কণিকা' অবিশ্যি নীতিগর্ভ পদ্য রচনার সংগ্রহ। 'কণিকা'র অনেকদিন পরে, অপেক্ষাকৃত শেষ-পর্বে তাঁর 'লেখন' ছাপা হয়। সে ১৩৩৪ সালের ঘটনা। সে বইখানিতে যেসব কবিতা সংকলিত হয়, সেই ধরনের আরো নানা লেখা তাঁর নানা পাণ্ডুলিপিতে, অসংখ্য পত্র-পত্রিকায় এবং স্নেহভাজন নানা জনের সংগ্রহে ছড়িয়ে ছিল। সেই সব লেখারই আংশিক সংগ্রহ দেখা যায় তাঁর 'স্ফুলিঙ্গ' বইখানিতে। 'স্ফুলিঙ্গ' প্রকাশিত হয় ১৩৫২ সালের ২৫শে বৈশাখ। এই সংগ্রহে সবসমেত ১৯৮টি কবিতা জায়গা পেয়েছে। এই বইয়ের শেষে ৫৮ জনের নাম ছাপা হয়েছে। এই নামাবলীর পরিচায়ক হিসেবে এই সম্পাদকীয় মন্তব্যটিই যথেষ্ট:—'যাঁহারা এইরূপ কবিতা সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিয়া বা প্রকাশককে পাঠাইয়া এই গ্রন্থ সংকলন সম্ভব করিয়াছেন, বা যাঁহাদের লেখন-সংগ্রহে এই গ্রন্থের কোনো কোনো কবিতা আছে বলিয়া জানা গিয়াছে তাঁহাদের নাম উদ্ধৃত হইল।'

সেই ভূমিকাতেই আরো বলা হয়েছে: 'লেখন গ্রন্থখানি প্রকাশের পূর্বে উহা 'স্ফুলিঙ্গ' নামে প্রকাশিত হইবে, একবার এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল। বর্তমান গ্রন্থে সেই নামটি ব্যবহৃত হইল। ইহার প্রবেশক কবিতাটি লেখন হইতে গৃহীত।' এ ছাড়া সেই ভূমিকায় আরো বলা হয়েছে যে, এইসব রচনার সময় নির্ধারণ করা খুবই শক্ত কাজ, কারণ, লেখার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজের দেওয়া কোনো কোনো তারিখ থাকলেও, সেই সব তারিখকেই মূল

রচনার তারিখ বলে ধরা সংগত হবে না। স্ফুলিঙ্গের এই মন্তব্যের মধ্যেই তাই একথাও বেশ স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, 'বহু কবিতা লেখন প্রকাশের পরবর্তীকালে রচিত, কতকগুলি লেখনের সমসাময়িক, বহুপুরাতন পাণ্ডুলিপি হইতে কয়েকটি কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে।'

'স্ফুলিঙ্গ' নামে এই লেখন-সংগ্রহের ১০৩ নম্বর কবিতায় প্রাচীনকাল আর নবীনকালের লেখক-ভেদের কথা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

পুরানো কালের কলম লইয়া হাতে
লিখি নিজ নাম নূতন কালের পাতে।
নবীন লেখক তারি পরে দিনরাতি
লেখে নানামতো আপন নামের পাঁতি।
নূতনে পুরানে মিলায়ে রেখার পাকে
কালের খাতায় সদা হিজিবিজি আঁকে।

এবং ঠিক তার আগের লেখাটিতে—অর্থাৎ ১০৩ সংখ্যক কবিতায়—

পাষাণে পাষাণে তব
শিখরে শিখরে
লিখেছ, হে গিরিরাজ,
অজানা অক্ষরে
কত যুগযুগান্তরে
প্রভাতে সন্ধ্যায়,
ধরিত্রীর ইতিবৃত্ত
অনন্ত-অধ্যায়।
মহান সে গ্রন্থপত্র,
তারি এক দিকে
কেবল একটি ছত্রে
রাখিবে কি লিখে—
তব শৃঙ্গশিলাতলে
দু'দিনের খেলা,
আমাদের ক'জনের
আনন্দের মেলা।

এই দু'টি কবিতাতেই বিশাল দেশ-কালের প্রগাঢ় অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। সেই সঙ্গে এই মর্ত্যলোকে মানব-জীবনের নশ্বরতার বোধও মিশে গেছে। অনন্ত

কালকে অতীত বর্তমান, ভবিষ্যৎ—এই ত্রিবিধ বিভাগে খণ্ডিত করে দেখাই মানুষের সাধারণ সংস্কার। এই সংস্কারে অভ্যস্ত মানব-চিত্ত বর্তমানের সঙ্গে একদিকে অতীতের,—অন্যদিকে ভবিষ্যতের একরকম বিরোধ বা সংঘাতের ভাবনা ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের পরিচিত এই ত্রি-কালের পারস্পরিক অন্বয়টি রবীন্দ্রনাথ যথার্থ শান্তমনে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। স্ফুলিঙ্গের ৯৮ সংখ্যক কবিতায় তারই পরিচয় আছে—

নূতন সে পলে পলে
অতীতে বিলীন,
যুগে যুগে বর্তমান
সেই তো নবীন।
তৃষ্ণা বাড়াইয়া তোলে
নূতনের সুরা,
নবীনের চিরসুধা
তৃপ্তি করে পুরা।

অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের অনিবার্য সংযোগ উপলব্ধির অনেক নমুনা ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্র-রচনাবলীর নানান্ পর্বে। আলোচ্য সংগ্রহের ৯৭ সংখ্যক কবিতায় তার-ই কিঞ্চিৎ নমুনা আছে—

নূতন যুগের প্রত্যুষে কোন্
প্রবীণ বুদ্ধিমান
নিত্যই শুধু সূক্ষ্ম বিচার করে—
যাবার লগ্ন, চলার চিন্তা
নিঃশেষে করে দান
সংশয়ময় তলহীন গহ্বরে।
নিঝর যথা সংগ্রামে নামে
দুর্গম পর্বতে,
অচেনার মাঝে ঝাঁপ দিয়ে পড়
দুঃসাহসের পথে,
বিঘ্নই তোর স্পর্ধিত প্রাণ
জাগায়ে তুলিবে যে রে—
জয় করি তবে জানিয়া লইবি
অজানা অদৃষ্টেরে।

৭৬ সংখ্যক কবিতায় তিনি বলেছেন—

তুমি বাঁধছ নূতন বাসা,
আমার ভাঙছে ভিত।
তুমি খুঁজছ লড়াই, আমার
মিটেছে হার-জিত।
তুমি বাঁধছ সেতারে তার,
থামছি শমে এসে।
চক্ররেখা পূর্ণ হল
আরম্ভে আর শেষে।

১৫৭ সংখ্যক কবিতায় এই ভেদ আর ঐক্যবোধের আরো স্পষ্ট প্রকাশ চোখে পড়ে। সে উদাহরণটিও এখানে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে—

যখন ছিলেম পথেরই মাঝখানে
মনটা ছিল কেবল চলার পানে
বোধ হত তাই, কিছুই তো নাই কাছে—
পাবার জিনিস সামনে দূরে আছে।
লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছব এই ঝোঁকে
সমস্ত দিন চলেছি একরোখে।
দিনের শেষে পথের অবসানে
মুখ ফিরে আজ তাকাই পিছু-পানে।
এখন দেখি পথের ধারে ধারে
পাবার জিনিস ছিল সারে সারে।
সামনে ছিল যে দূর সুমধুর
পিছনে আজ নেহারি সেই দূর।

অর্থাৎ যে প্রান্ত থেকেই দেখা যাক্ না কেন, জীবনের পথ সুন্দর এবং বিস্ময়জনক! 'লেখন'-এর একটি কবিতায় তিনি বলে গেছেন:

আকর্ষণ গুণে প্রেম এক করে তোলে।
শক্তি শুধু বেঁধে রাখে শিকলে শিকলে।

পথে ঘাটে ভ্রমণের সময়ে নানা অনুরাগীর খাতায় স্বাক্ষরলিপির দাবি মেটাতে মেটাতে তাঁর কলমে এইসব কবিতা দেখা দিয়েছিল। প্রধানতঃ এ লেখাগুলি ফরমায়েসী রচনা। কিন্তু কোনো রচনা ফরমায়েসী বলেই যে তা আন্তরিকতাবর্জিত, তুচ্ছ ব্যাপার হবে, তার কোনো মানে নেই। ইটালিতে,

জার্মানিতে, চীনে, জাপানে ভ্রমণের সময়ে তো বটেই,—তা ছাড়া তিনি যখন স্বদেশে বাস করেছেন, সে-পর্বেও বিশুদ্ধ প্রেরণাবশে ছাড়া, অনুরোধের খাতিরেও তাঁকে অনেক লেখা লিখতে হয়েছে। তের শ' পঁয়ত্রিশ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'লেখন' সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেই লেখাটির মধ্যে তিনি বলেছিলেন—'এই রকম অনেক সময়ই অনুরোধের খাতিরে লেখা শুরু হয়, তার পরে ঝোঁক চেপে গেলে আর অনুরোধের দরকার থাকে না।' এই মন্তব্যের অনতিকাল পরেই তাঁর 'মহুয়া' বইখানি ছাপা হয়। সে-বইয়েরও অনেক লেখা অনুরোধ-তাড়িত। ফরমায়েসী রচনা হলেও 'মহুয়া' যে আন্তরিক কবিত্বগুণে সমৃদ্ধ, তাতে মতান্তর হবে কেন? 'লেখন'-এর মধ্যে তাঁকে যখন বলতে শোনা গিয়েছিল—'আকর্ষণগুণে প্রেম এক করে তোলে',—তখন তাঁর সে মন্তব্য যেমন তাঁর সারা জীবনের আন্তরিক বিশ্বাস বলে চেনা গিয়েছিল, 'লেখন'-এর আর একটি কবিতায় তেমনি আন্তরিকতার সঙ্গেই তিনি বলেছিলেন :

> বিদেশে অচেনা ফুল পথিক কবিরে ডেকে কহে—
> 'যে দেশ আমার, কবি, সেই দেশ তোমারো কি নহে?'

শুধু বিশেষ দেশে, বিশেষ কালে আবদ্ধ বিশেষ মানবগোষ্ঠীরই দরদী ছিলেন না তিনি! তিনি সকল কালের সকল মানুষের কবি। সুন্দরের উপলব্ধিতে কোনো-রকম আঞ্চলিকতা নেই! 'বিশ্বানুভূতি' ও 'বিশ্বপ্রেম' কথা-দুটি তাঁর সম্বন্ধে যতো ব্যবহৃত হয়েছে, সে-রকম আর কারো সম্বন্ধেই নয়।

: রবীন্দ্র-জীবন ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের নানা আলোচনা :

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'Tagore—A Study' (১৯৪৩) নামে আর-একখানি বই আছে। তাঁর সে-বইয়েতে তিনি অল্প কথায় রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র এবং সুবিপুল সামর্থ্যের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কবির জীবনের অবশ্যস্মরণীয় তথ্যগুলি দ্রুত উল্লেখ করে,—রবীন্দ্র-মানস-প্রকৃতির মূল প্রবণতাটি বেছে নিয়ে, সেই দিকে দৃষ্টি রেখে,—অখণ্ড একটি কাব্যের অন্তরঙ্গ উৎস এবং উপাদান হিসেবে বিভিন্ন ছেদ-যতি সংবলিত রবীন্দ্র-জীবনের ঐক্যটি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন!

প্রভাতকুমারের 'রবীন্দ্র-জীবনী' (১ম খণ্ড-১৩৪০; ২য় খণ্ড-১৩৪৩),—'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে'র বিশেষ রবীন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যাতে (১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৪১) প্রকাশিত শ্রীঅমল হোম রচিত রবীন্দ্র-জীবনী, এবং ইংরেজি 'বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকী'র রবীন্দ্র-জন্মোৎসব সংখ্যায় (১৯৪১) ছাপা প্রভাতবাবুর লেখা রবীন্দ্র-জীবনীর একটি খসড়া—এই ক'টি লেখার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবন-কথার অনেক প্রামাণ্য উপাদান আছে।

এ ছাড়া আরো কতো যে বই আছে! 'Golden Book of Tagore'-এ ছাপা হয়েছে রবীন্দ্র-প্রশস্তিমালা। 'সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলী'র 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়' পুস্তিকা সম্পাদনা করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'শনিবারের চিঠি'র পৃষ্ঠায় ব্রজেন্দ্রনাথ এবং সজনীকান্ত 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের গোড়ার দিকের রচনা ও গ্রন্থের একটি পঞ্জী' প্রকাশ করেছিলেন। এই ভাবে 'শনিবারের চিঠি'তে যে কাজের সূচনা হয়েছিল, ব্রজেন্দ্রনাথ-সম্পাদিত এবং সজনীকান্তের ভূমিকা-সংবলিত 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়'-এর মধ্যে তারই সার্থক পরিণতি ঘটেছে। 'রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য' নামে সজনীকান্তের আর একখানি বই বেরিয়েছে ১৩৬৭ সালে। 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের 'রবীন্দ্র-পরিচয়' সম্পর্কিত প্রবন্ধমালা বেরিয়েছিল। সে প্রায় প্রভাতকুমারের 'রবীন্দ্র-জীবনী'র সমকালীন রচনা।

'কবিপরিচিতি' ও 'জয়ন্তী উৎসর্গ' (পৌষ ১৩৩৮) রবীন্দ্র-প্রসঙ্গমালার সুচারু দু'টি সংকলন। রানী চন্দের 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' (১৩৪৯), মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' (১৯৪৩), প্রতিমা দেবীর 'নির্বাণ, (১৩৪৯), নির্মলকুমারী মহলানবীশের 'বাইশে শ্রাবণ' (১৩৬৭)—রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের স্মরণীয় আলেখ্যমালা। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজিতে তাঁর স্মৃতিকথা লিখেছেন। উনিশ শ আটান্নো খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর সেই 'On the edges of time' বইখানিতে রবীন্দ্র জীবনের নানা কথা, নানা তথ্য ছড়িয়ে আছে। রবীন্দ্র-জীবনের বিচিত্র তথ্য উদ্ঘাটনের আয়োজনে কেবল যে কবির স্বদেশবাসীরাই উদ্যোগী হয়েছেন, তা নয়। Thompson, Lesney, Aronson, Marjorie Sykes প্রমুখ বহু বিদেশী লেখকও এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। এখানে কয়েকটিমাত্র আলোচনার নাম করা হোলো।

ঃ রবীন্দ্রনা জীবনী ঃ

ধূর্জটিপ্রসাদ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ভাষায় যে কথাটি[৩] জানিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের আত্মজীবনী মূলক রচনাগুলির প্রথমটিতে ('জীবনস্মৃতি' : ১৩১৯, খ্রীঃ ১৯১২) সেই কথারই ইশারা দিয়ে গেছেন। কেবল উপকরণের বৈচিত্র্য নয়,—তাঁর অন্তর্লোকে উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছিল নিরবচ্ছিন্ন এক অখণ্ডতার ধ্যান! 'জীবনস্মৃতি'র প্রারম্ভিক নিবন্ধটিতে তিনি লিখেছিলেন :

> 'মনে করিয়াছিলাম জীবন-বৃত্তান্তের দুই চারিটা মোটামুটি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কিন্তু দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে—তাহা কোন্ এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা।'

জীবনের পরিদৃশ্যমান ক্ষেত্রে—অর্থাৎ লোকচক্ষুর গোচর যে-অংশ, সে-দিকে তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। আবার এ-কথাও স্মরণীয় যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্যকে তিনি সুবিপুল অদৃশ্যের ইশারা হিসেবেই দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন! তাঁর জীবনে তথ্যের তুলনায় সত্যের বোধই সর্বাধিক আকাঙ্ক্ষিত,—খণ্ড-দৃশ্যের উত্তেজনার চেয়ে সুদূরের প্রসন্ন উপসংহারটিই বেশি কাম্য! তিনি বলেছেন, সৃষ্টিতে 'বস্তুরূপী তথ্য' ছাপিয়ে আছে 'সমগ্রতার ঐক্য'। তথ্যের পাত্র আশ্রয় করে সত্যের স্বাদ' নেওয়াতেই তাঁর অপরিসীম আগ্রহ। এ-বিষয়ে আবার তাঁরই এই নিজের কথা মনে পড়ে :

> 'আমাদের মন যে জ্ঞানরাজ্যে বিচরণ করে সেটা দুইমুখো পদার্থ ; তার একটা দিক হচ্ছে তথ্য, আর একটা দিক হচ্ছে সত্য। যেমনটি

৩। ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন : 'No sense of destiny hangs over Tagore's life : and therefore, Tagore's life-history is mainly the biography of ideas and artistic creations just as his own dramas are more idylls of the quest than stories of human conflict. In other words, Tagore's crises are all subjective, begotten by the spirit, even if nursed by the objective situation. That jealous guard over his soul completely defeats western biographers and baffles any Indian writer of this century who has accepted their model. In another language, the life of Tagore cannot be composed on the symphonic pattern of Goethe's whose variety of creative work most resembled his. Tagore's life-pattern was essentially melodic, with numerous improvisations indeed, but it was built round the regiant notes. This does not at all mean that he did not share in the tragedies of his country and the world. That he did, but his reactions remained essentially personal, spiritual.'

আছে তেমনটির ভাব হচ্ছে তথ্য, সেই তথ্য যাকে অবলম্বন করে আছে সেই হচ্ছে সত্য।' —['তথ্য ও সত্য']

অন্যত্র তিনি বলেছেন:

'ফুলে যেখানে সৌন্দর্য, ফলে যেখানে মধুরতা, জীবনের প্রতি যেখানে আছে করুণা, ভূমার প্রতি যেখানে আছে আত্মনিবেদন, সেখানে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের চিরন্তন যোগ অনুভব করি হৃদয়ে। একেই বলি বাস্তব, যে বাস্তবে সত্য হয়েছে আমার আপন।'

['সাহিত্যতত্ত্ব']

এই দুটি উদ্ধৃতি থেকে 'তথ্য'-জ্ঞান এবং 'বাস্তব'-চেতনা সম্বন্ধে তাঁর ধারণার বিশেষত্ব বোঝা যায়। 'তথ্য'কে সত্যের অধীনস্থ করে 'বাস্তব'কে বিশ্ব ও ব্যক্তির যোগানন্দরূপে দেখবার এই বিশেষ আগ্রহের শাসনেই তাঁর নিজের জীবন—এবং তাঁর 'জীবনস্মৃতি'-র শিল্প-প্রযুক্তি দুইই শাসিত! তাঁর জীবনী বিষয়ে যাবতীয় আলোচনার ধ্রুবতারা হিসেবে এ-সত্যটিকে গ্রহণ করতে বাধা নেই। ধূর্জটিপ্রসাদের যে মন্তব্যটি তুলে দেওয়া হয়েছে, তাতে এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন আছে। তিনি subjective, personal, spiritual ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে, রবীন্দ্র-জীবনীর পাঠকের দৃষ্টি বিশেষ দিকে আকর্ষণ করেছেন। 'জীবনস্মৃতি'র প্রারম্ভিক নিবন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই বইটির বিষয়ে যখন বলেছেন,—'এই স্মৃতি-চিত্রগুলিও…সাহিত্যের সামগ্রী,—ইহাকে জীবন-বৃত্তান্ত লিখিবার চেষ্টা হিসাবে গণ্য করিলে ভুল করা হইবে' —তখন ভেতরে ভেতরে তাঁরও মনে এই একই আগ্রহ কাজ করেছিল বলতে হয়! ঘটনার বৈচিত্র্যের তুলনায় অনুভূতির গভীরতাই যে 'জীবনস্মৃতি'র যোগ্য উপাদান,—হ্রস্ব-দীর্ঘ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, সম্ভব-অসম্ভব বিভিন্ন ঘটনার তালিকার চেয়ে বিস্ময়ে-আনন্দে-বেদনায় চিহ্নিত কয়েকটি উপলব্ধির উল্লেখের মধ্য দিয়েই কবিজীবনীর আন্তরিকতর, সার্থকতর অভিব্যক্তি যে সম্ভব,—সাংবাদিকের তথ্যাগ্রহের চেয়ে সাহিত্যিকের সত্যাগ্রহই যে এক্ষেত্রে বেশি গ্রাহ্য, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তো সেকথা লিখে গেছেন!

জীবনী-সাহিত্যের পাশ্চাত্য আদর্শ যে এই রকম লক্ষ্যের বিরোধী,—সেকথা মনে করা ঠিক নয়। ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন বটে,—বর্তমান শতকের কোনো ভারতীয় লেখক পাশ্চাত্য আদর্শে রবীন্দ্র-জীবনী রচনায় উদ্যত হলে

বিফল হবেন! কিন্তু কেন? কারণ, তিনি মনে করেন যে, রবীন্দ্র-জীবনের রূপকল্প—গ্যয়টের মতন symphonic নয়,—সে নাকি melodic! 'সিম্ফনি'র বৈশিষ্ট্য সুরগত বৈচিত্র্য—'মেলডি'র লক্ষ্য সুরগত ঐক্যে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে লিখেছেন, 'এক মনে তোর একতারাতে একটি যে সুর সেইটি বাজা'! 'জীবনস্মৃতি'র আলাপ-ঝংকারে, মীড়ে-মূর্চ্ছনায় একটি কথাই ফিরে ফিরে ধরা দিয়েছে! তাঁর সারা জীবনের সকল ঘটনাতে সেই একটি বাণীর একক ব্যঞ্জনাই যেন একমাত্র লক্ষ্য। তাঁর সেই 'একটি কথা' কোন্ কথা? প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথ যে কবি এবং কবি যে, সেই কথা! 'আত্মপরিচয়'-এ (১৩৫০) সংগ্রথিত প্রবন্ধগুলির প্রথমটিতে ('বঙ্গ ভাষার লেখক' গ্রন্থে ১৩১১ বঙ্গাব্দে প্রথম মুদ্রিত) এই কথাটিই অন্যভাবে স্বীকার করে তিনি লিখেছিলেন :

'এ স্থলে আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম। কেবল, কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যে-ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব।'

'আত্মপরিচয়'-এর শেষ প্রবন্ধে (১লা বৈশাখ ১৩৪৭) তিনি আবার লিখেছিলেন :

'নানা কাজে আমার দিন কেটেছে, নানা আকর্ষণে আমার মন চারিদিকে ধাবিত হয়েছে। সংসারের নিয়মকে জেনেছি, তাকে মানতেও হয়েছে, মূঢ়ের মতো তাকে উচ্ছৃঙ্খল কল্পনায় বিকৃত করে দেখিনি, কিন্তু এই সমস্ত ব্যবহারের মাঝখান দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমার মন যুক্ত হয়ে চলে গেছে সেইখানে যেখানে সৃষ্টি গেছে সৃষ্টির অতীতে। এই যোগে সার্থক হয়েছে আমার জীবন।'

ঃ জীবনস্মৃতি, ছিন্নপত্র, ছেলেবেলা, আত্মপরিচয় ঃ

রবীন্দ্রনাথ নিজে কোনো পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী লেখেন নি। তাঁর তিনখানি বাংলা বইয়ে - 'জীবনস্মৃতি', 'ছেলেবেলা' এবং 'আত্মপরিচয়'-এর মধ্যে—এবং তাঁর ইতস্ততঃ সংরক্ষিত বা গ্রন্থভুক্ত অসংখ্য চিঠিপত্রের মধ্যে তাঁর জীবনের নানা পর্বের ছবি সঞ্চিত আছে। 'জীবনস্মৃতি'র পরিধির মধ্যে বাঁধা পড়েছে

তাঁর শিক্ষারম্ভের প্রত্যূষকাল থেকে 'কড়ি ও কোমল'-এর (১৮৮৬) সময় অবধি—তাঁর জীবনের প্রথম বছর-কুড়ির আত্মকথা। তার পরের বছর দশেকের কথা আছে তাঁর 'ছিন্নপত্র' পত্র-সংগ্রহে।

'ছেলেবেলা' লিখতে বসে পরিণত বয়সের খ্যাতি-প্রতিপত্তির শিখর থেকে তাঁকে দৃষ্টিক্ষেপ করতে হয়েছে 'অতীতের প্রেতলোকে'—সেই দূর বিগত কালের অভিমুখে, যে-কালে 'বুদ্ধির এলাকায়·· বৈজ্ঞানিক সার্ভে আরম্ভ হয়নি, সম্ভব-অসম্ভবের সীমাসরহদ্দের চিহ্ন ছিল পরস্পর জড়ানো।' তিনি আরো জানিয়ে গেছেন যে. 'এই বিবরণটিকে ছেলেবেলাকার সীমা অতিক্রম করতে দেওয়া হয়নি—কিন্তু শেষকালে এই স্মৃতি কিশোর বয়সের মুখোমুখি এসে পৌঁছিয়েছে।'

'ছেলেবেলা'র বিষয়-পরিধির বর্ণনাসূত্রে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্রদত্ত এই মন্তব্যটির পাশাপাশি 'জীবনস্মৃতি'র সঙ্গে এই বইখানির আংশিক তুলনা সম্বন্ধে তাঁর অন্য প্রচেষ্টার কথাও স্মরণীয়। 'ছেলেবেলা'র ভূমিকাতে তিনি লিখেছিলেন:

> 'এই বইটির বিষয়বস্তুর কিছু কিছু অংশ পাওয়া যাবে জীবনস্মৃতিতে কিন্তু তার স্বাদ আলাদা—সরোবরের সঙ্গে ঝরনার তফাতের মতো। সে হোলো কাহিনী, এ হোলো কাকলী, সেটা দেখা দিচ্ছে ঝুড়িতে, এটা দেখা দিচ্ছে গাছে।'

'ছেলেবেলা'র এবং 'জীবনস্মৃতি'র বিষয়-পরিধি যদিও পরস্পর-সংস্পর্শী', তবু, এই দুটি রচনার মেজাজে দেখা যায় সুস্পষ্ট বিভেদ। রবীন্দ্রনাথ সেই কথাটি সরলভাবে বুঝিয়ে দিয়ে, তাঁর নিজের মানসিক অবস্থা বা মনোভঙ্গি ধ'রে তুলনা-সূত্রে 'ছড়ার ছবি'-র (আশ্বিন ১৩৪৪, ইং ১৯৩৭) সঙ্গে 'ছেলেবেলা'র ঐক্যের কথা জানিয়ে লিখেছিলেন:

> 'তাতে বকুনি ছিল কিছু নাবালকের কিছু সাবালকের। তাতে খুশির প্রকাশ ছিল অনেকটাই ছেলেমানুষি খেয়ালের। এ বইটাতে বালভাষিত গল্পে।'

'আত্মপরিচয়' সর্বসমেত ছ'টি প্রবন্ধের সংকলন। প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৩১১ সালে; দ্বিতীয়টি ২০-এ মাঘ, ১৩১৮-তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে প্রথম পঠিত হয়ে ১৩১৮-র ফাল্গুন সংখ্যার 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়; তৃতীয়টি ১৩২৪-এর আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যার 'সবুজ পত্রে' এবং চতুর্থটি ১৩৩৮-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে ছাপা হয়; পঞ্চমটি ১৩৩৮-এর ১৫-ই পৌষ সেনেট হলে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব-বাসরে পঠিত হয়; এবং ষষ্ঠ প্রবন্ধটি ১৩৪৭-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে 'জন্মদিনে' নামে আত্মপ্রকাশ করে। এ ছাড়া 'আত্মপরিচয়'-এর পরিশিষ্ট অংশে 'বেঙ্গলী' পত্রের সহকারী সম্পাদক পদ্মিনীমোহন নিয়োগীর অনুরোধে লেখা রবীন্দ্রনাথের ১৩১৭ সালের একখানি চিঠি ছাপা হয়েছে। সেই চিঠিখানিতে কবি অতি সংক্ষেপে তাঁর জন্মকাল থেকে ২৮শে ভাদ্র, ১৩১৭ অবধি জীবনযাত্রার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর উল্লেখ করে গেছেন। 'আত্মপরিচয়'-এ ১৩১১ থেকে ১৩৪৭ পর্যন্ত কবির প্রায় ছত্রিশ বছরের নানা লগ্নের আত্মোপলব্ধির বিবরণ সংকলিত হয়েছে।

'জীবনস্মৃতি', 'আত্মপরিচয়' প্রভৃতি লেখার সম্বন্ধে আত্মকথা, বা আত্মজীবনী—যে-নামই ব্যবহৃত হোক্ না কেন, পাশ্চাত্ত্য আদর্শে লেখা কোনো বিখ্যাত autobiography-র সঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'র নিখুঁৎ সাদৃশ্য নেই। তার হেতু খুঁজতে গিয়ে বার বার যে-কথা মনে পড়বে, সে হোলো রবীন্দ্রনাথের অন্তর্মুখিতা,—তাঁর সংশয়হীন আত্মস্থতা!

'জীবনী' এবং 'আত্মজীবনী'র মধ্যে রূপকল্প এবং শিল্পাঙ্গিকের কিছু পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। একজনের 'জীবনী' অন্যজনে লেখেন, কিন্তু আত্ম-জীবনী'র লেখক নিজেই নিজের জীবনীকার। ফলে, 'জীবনী' যে পরিমাণে তন্ময় (objective) হতে পারে, 'আত্মজীবনী' সে পরিমাণে নয়। আবার 'জীবনী'-লেখক তাঁর গ্রন্থের প্রতিপাদ্য জীবন-কাহিনীর বর্ণনায় প্রশংসায় যেমন প্রগল্ভ হতে পারেন, নিন্দায় তেমনি পঞ্চমুখ হতেও বাধা নেই! তবে, যাঁর নিন্দায় অথবা যাঁর প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ হতে চান, তাঁর সম্বন্ধে সুপ্রতিষ্ঠিত জনমত অথবা প্রামাণ্য তথ্যাবলীর বিরুদ্ধে গেলে তাঁর আদর হয় না। শ্রীচৈতন্যের জীবনকথা লিখতে বসে বৃন্দাবন দাস থেকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ পর্যন্ত সকলেই একবাক্যে শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তার কথায় মগ্ন হয়েছিলেন।

মহাপ্রভু যে রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন,—চৈতন্য-জীবনীর মধ্য ও অন্ত্য পর্বের রূপায়ণে লেখকরা তাঁদের পাঠকদের যেন সেই কথাটিই ভুলিয়ে দেবার সাধনায় নেমেছিলেন বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়! বৃন্দাবন দাসের 'আদি-লীলা'তে অথবা জয়ানন্দের লেখাতেও এই মনোভাবের ব্যতিক্রম আছে বটে,—কিন্তু সমগ্রভাবে দেখলে মহাপ্রভুর জীবনীগ্রন্থগুলির মধ্যে বিভিন্ন লেখকের মনোভাবের ঐক্যই দেখা যায়। তাঁরা সবাই ছিলেন ভক্তিরসে আপ্লুত! কিন্তু শ্রীচৈতন্য যদি নিজের জীবনী নিজে লিখতেন, তাহলে তাঁর নিজের মহিমা সর্বস্বীকৃত সত্য হলেও, তাঁকে অন্তত আত্ম-প্রশংসার অতিরেক সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হোতো! রবীন্দ্রনাথের 'আত্ম জীবনী'র বিরুদ্ধে এই রকম অভিযোগ একাধিকবার উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৩১৪ সালের মাঘ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে বর্তমান 'আত্মপরিচয়' এর মধ্যে সংকলিত প্রথম প্রবন্ধটি পড়ে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে 'দম্ভ ও অহম্মিকা'র অভিযোগ তুলেছিলেন। সেই অভিযোগের জবাবে তিনি লেখেন :

'বহুদিন হইল জর্মন কবিশ্রেষ্ঠ গ্যয়টের কোনো রচনার ইংরেজি তর্জমাতে একটা কথা পড়িয়াছিলাম ; যতদূর মনে পড়ে, তাহার ভাবখানা এই যে, বাগানের মধ্যে যে-শক্তি গোলাপ হইয়া ফোটে, সেই একই শক্তি মানুষের মনে ও বাক্যে কাব্য হইয়া প্রকাশ পায়।

এই বিশ্বশক্তিকে নিজের জীবনের মধ্যে ও রচনার মধ্যে অনুভব করা অহংকার নহে।'

সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীমূলক লেখার বিরুদ্ধে—দ্বিজেন্দ্রলালের পরেই সমালোচকের অভিযোগ যে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, তাও নয়। একদল বলেছেন, 'জীবনস্মৃতি'তে কবির পরিপূর্ণ আত্মোদ্ঘাটন নেই,—রুশোর স্বীকৃতির মতন আত্মপ্রকাশের পূর্ণতা নেই নাকি। এ-বিষয়ে বাগ্‌বিস্তার অনাবশ্যক। কারণ, রুশোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনের পার্থক্য এবং ব্যক্তিত্বের পার্থক্য যদি অসত্য না হয়, তাহলে দু'জনের 'আত্মজীবনী'-ই বা এক ছাঁচে গড়া হবে কেন? তবে, রুশোর আত্মজীবনী যেমন বহু দুঃখভোগী, বিদ্রোহী রুশোরই ব্যক্তিত্বে বিশিষ্ট, রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'ও তেমনি রবীন্দ্রনাথেরই উদার,

ব্যাকুল, কবিত্ব-প্রধান ব্যক্তিত্বের স্বরে বিশিষ্ট! ষোড়শ শতকের ফ্লোরেন্সের স্বর্ণকার সেলিনি (Benvenuto Cellini ১৫০০-১৫৭১), বিংশ শতকের নৃত্য-পটিয়সী ইসাডোরা ডানকান,—এবং ভারতের অমর জননায়ক মহাত্মা গান্ধী—এঁরা তিন জনে তিন মার্গের সাধক। তিনজনে তিনখানি জগদ্বিখ্যাত আত্মজীবনী লিখে গেছেন। সে তিনটি লেখা তো একই ছাঁচে গড়া হয়নি! রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীমূলক রচনাগুলিও তেমনি পৃথক ছাঁচের সামগ্রী। তাদের সার্থকতা তাদের উদ্দেশ্যের চরিতার্থতায়,—অন্য লেখকের কিংবা অনেক লেখকের অনুসৃত পথের অনুসারিতায় নয়। তবে, স্বদেশে-বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত অন্যান্য জীবনী-গ্রন্থের সঙ্গে তুলনা করলে রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীগুলির স্বাতন্ত্র্য যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, অন্যদিকে পৃথক আদর্শে লেখা আধুনিক জীবনী ও আত্মজীবনীর ভঙ্গি এবং কলাকৌশলও তেমনি আমাদের চিত্তাকর্ষণ করে। উনিশ শতকে, সাহিত্যিক কৌলীন্যে বাংলা গদ্যের যখন উন্নয়ন ঘটছিল, তখন থেকেই বাংলায় একটি-একটি করে জীবনী এবং আত্মজীবনী দেখা দিয়েছে। রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) এবং রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫) বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের জীবনী রচনার দৃষ্টান্ত।[8]

তারপর ক্রমশঃ রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীদের জীবনী লেখা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যসংগ্রহের ভূমিকা লেখবার সময়ে গুপ্তকবির জীবনীর খসড়া লিখেছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের 'জীবনবেদ' (১৮৮৪), যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের জীবনবৃত্তমালা, নবীন সেনের পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'আমার জীবন', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' (১৩২৫) প্রভৃতি বইয়ের কথা এই সূত্রে মনে পড়ে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'আত্ম-জীবনী'-র প্রথম সংস্করণ শতাব্দের শেষে ১৮৯৮—এ প্রথম ছাপা হয়। নিত্যকৃষ্ণ বসুর 'সাহিত্য সেবকের ডায়ারি', বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' প্রভৃতি

৪ শ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেন লিখেছেন : 'With the dawn of the nineteenth century we find two notable attempts at biographical literature, Krishnachandra-charit and Pratapaditya-charit, which were made under the auspices of the College of Fort William.--It is significant that both the heroes were lay and historical figures. Krishna-chandra-charit survived the general ruin or obloquy which overtook so many of the books written at this stage.' —Western influence in Bengali Literature.

বই জীবনী নয়, কিন্তু কতকটা সমধর্মী রচনা। একেবারে আধুনিক কালের 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'ও জীবনী-শ্রেণীর সাহিত্য। এ সমস্ত রচনাই প্রধানতঃ তথ্যনিষ্ঠ,—ঘটনাতালিকাপ্রণয়নব্রতী! কিন্তু আধুনিক জীবনীর আদর্শ অন্যরকম।[৫]

দীপবাহিকা (Lady of the lamp) ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের ছবি আঁকতে বসে লিটন স্ট্রেচি তাঁর রোষপ্রতিমা-সত্তার (Angel of wrath) কথা বিস্মৃত হননি! ম্যানিং, নিউম্যান, গ্ল্যাডষ্টোন, জেনারেল গর্ডন—বর্ণনীয় চরিত্রটি যাঁরই হোক না কেন, স্ট্রেচি তাঁকে রক্তমাংসের মানুষ করেই গড়েছেন। মহত্তের মহত্ত্ব ফুটেছে তাঁর লেখায়—কিন্তু দুর্বল মানুষের দৌর্বল্য গোপন করবার গোঁড়ামি তিনি পরিহার করেছেন। প্রয়োজন-মতন ব্যঙ্গরসের মৃতসঞ্জীবনী ছিটিয়ে, মরা মানুষকে তিনি বাঁচিয়ে তুলেছেন অভিনব কৌশলে!

রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীমূলক লেখাগুলি 'আত্মজীবনী' বলেই ভিন্নধর্মী। তাতে এই সব লেখার তন্ময়তা (objectivity) নেই—আছে মন্ময়তা (subjectivity)। লিটন স্ট্রেচি, আঁদ্রে মোরোয়া, ডেভিড্ সেসিল প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত আধুনিক জীবনীকারের রীতি তাঁর নয়। বিশ-শতকের অন্যতম খ্যাতনামা আত্মজীবনীকার এডমণ্ড গসের (১৮৪৯-১৯২৮) 'Father and Son' (১৯০৭) বইখানির অপ্রিয়-সত্যপরায়ণতাও তাঁর আদর্শ নয়।

আত্মজীবনীর প্রধানতম গুণ ঘনিষ্ঠ আলাপের ভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতিতে' অথবা 'ছেলেবেলা'য় সে গুণ যতোটা ফুটেছে, 'আত্মপরিচয়ে'

৫। আধুনিক জীবনীকার লিটন স্ট্রেচি বলেছেন: 'To preserve a becoming brevity—a brevity which excludes everything that is redundant and nothing that is significant—that surely is the first duty of the biographer. The second no less surely, is to maintain his own freedom of spirit. It is not his business to be complimentary ; it is his business to lay bare the facts of the case as he understands them.'

—Preface to Eminent Victorians : Lytton Strachey

লিটন স্ট্রেচির (১৮৮০-১৯৩২) কৌশলের তারিফ ক'রে বিখ্যাত চৈনিক সাহিত্যিক লিন্-যু টাঙ বলেছেন: ..'The very charm of biography, its very readability depends on showing the human side of a great character which is so similar to ours. Every touch of irrational behaviour in a biography is a stroke in convincing reality. On that alone Lytton Strachey's success depends.

—The Importance of Living : Lin yu tang.

ভত্তো নয়। প্রথম দু'খানি বইয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের বা কবিসত্তার রূপায়ণই যদিচ আত্তসক্য,—তথাপি তাঁর রক্তমাংসের চারাটি সে-সব ক্ষেত্রে একেবারে বাদ পড়েনি— বালক, কিশোর, যুবক রবীন্দ্রনাথের বাল্য-কৈশোর-যৌবনাবস্থার বিশেষ বিশেষ মনন এবং আচরণ—দুইই ফুটেছে। কিন্তু 'আত্ম-পরিচয়' অন্ত দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। এ বইয়ে প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ জগদ্বরেণ্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টির মহাসমুদ্র থেকে কতকগুলি শ্রদ্ধেয় উপলব্ধির সূত্র ও টীকাটিপ্পনী একই সঙ্গে উদ্ধার করছেন। প্রকৃতি তাঁকে কি দিয়েছে,—জীবনদেবতা তাঁর কতো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়—মৃত্যু অথবা প্রেম সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কী রকম, এই সব গম্ভীর আলোচনায় 'আত্মপরিচয়'-এর লেখক অতিশয় মনোযোগী। মানুষ-রবীন্দ্রনাথকে রঙ্গমঞ্চের বাইরে সরিয়ে দিয়ে সূক্ষ্মদেহী কবি এখানে যেন পণ্ডিতের কাছে আপন অস্তিত্বের জবাবদিহি করেছেন! অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' অথবা 'জোড়াসাঁকোর ধারে' যেমন ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে লেখা, 'আত্মপরিচয় তেমন নয়। চারুচন্দ্র দত্তের 'পুরানো কথা' অথবা প্রমথ চৌধুরীর 'আত্মকথা'র মতন প্রতিবেশী-সচেতনতাও সে-বইয়ে নেই। তাতে আছে সতর্ক বিনয়, সুশৃঙ্খল শোভনতা, পূর্ণ কবিখ্যাতির দায়িত্ববোধ। নিজের পুরোনো চিঠি, কবিতা, নাটক ইত্যাদি নানা লেখা থেকে অংশ তুলে-তুলে আত্মজীবন-কথার ক্ষীণ সুতোয় তিনি যা গেঁথে তুলেছেন, তাকে বলা যেতে পারে আত্মমাহাত্ম্য-স্মৃতির মণিহার! তাতে ঐশ্বর্যের অনিবার্য দূরত্ব!—তার সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশে আছে কেমন যেন অতৃপ্তিকর দুর্ম্ল্যতাবোধ,—অতিশুচি, অতিদূরবর্তী এক কবিমানসের স্বাতন্ত্র্য! দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে দৃক্‌কোণ থেকে 'আত্মপরিচয়' এর প্রথম প্রবন্ধটি লক্ষ্য করেছিলেন, তাতে এই প্রতিক্রিয়া ঘটাই স্বাভাবিক। ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর রবীন্দ্র-জীবনী সম্পর্কিত আলোচনার মধ্যে যথোচিত দৃক্‌কোণটিরই নির্দেশ দিয়েছেন!

রবীন্দ্রনাথের জীবনী মানে তাঁর ধ্যানের বিবর্তন,—তাঁর শিল্প-সৃষ্টির অশেষ প্রবাহ! তাঁর নাটকে যেমন মানব-সংসারের ঐহিক সংঘাতের বদলে চিরসত্যের সন্ধিৎসাই মুখ্যবস্তু,—তাঁর জীবনেও তেমনি খণ্ডের চেয়ে সমগ্রতার আগ্রহ বেশি ফুটেছে,—বিচিত্র বাসনা এবং নানা খণ্ড অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছে অচঞ্চল, আত্মস্থ, চিরশান্ত এক কবিপ্রাণ!

রবীন্দ্র-যুগের কথা :

রবীন্দ্রনাথের নাম আমাদের মজ্জায়, মননে, কল্পনায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তো বটেই, বাংলা দেশের গত শ'-পাঁচেক বছরের শিক্ষিত সমাজের কথা ভাবতে বসলে তাঁর মতন প্রবল, সাহিত্যসেবী ব্যক্তিত্ব আর দ্বিতীয় দেখা যায় নি। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে আমাদের দেশে যে-রকম চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল,—বাঙালীর মনে উনিশ শতকের শেষদিক থেকে শুরু করে আমাদের শতকের অন্তত মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত রবীন্দ্র-প্রতিভার সর্বব্যাপক কীর্তির আলোতেও মাঝে মাঝে তেমনি উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। শ্রীচৈতন্য ছিলেন মানবপ্রেমের সাধক; বৈষ্ণব ধর্ম-সম্প্রদায়ের নেতৃত্বগৌরবে তো বটেই, তাছাড়া চিরন্তন মানবপ্রীতির সাধনাতেও তিনি ছিলেন আমাদের সুপ্তিহর ভাব-নেতা! আর একাধারে কবি, শিক্ষক, ভূস্বামী, সংস্কৃতির স্বেচ্ছাসেবক, দেশ-কর্মী,—ধর্ম ও সমাজ-আন্দোলনের নেতা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর লেখাতে বাংলা সাহিত্যে বিশ্ব-জীবনের সংযোগটি বিশেষভাবে স্মরণীয় এবং স্বীকার্য হয়ে উঠেছে। আয়ুষ্কালের হিসেবে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সাধকের নাম রবীন্দ্রনাথের শতকে হলেও তাঁরা তাঁর পুরোবর্তী; তাঁর সমকালীন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের যুগান্তকারী ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রসিদ্ধ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতন মানব-সমাজের বিচিত্র বিভাগে অশেষ প্রকারের কর্মী এবং ধ্যানী মানুষ শুধু আমাদের দেশে কেন,—যে-কোনো দেশের ইতিহাসেই বিরল বললে অন্যায় হবে না।

প্রত্যেক দেশেই মহাপুরুষ যখন দেখা দেন, তখন অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সংযোগ এবং সম্পর্কের কথা নতুন করে ভাবা হয়,—নতুন করে মানা হয়! রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে এ দেশে সেই রকম ব্যাপারই ঘটেছিল। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে যা ছিল প্রধান ধ্যান, তিনি তাঁর নিজের কীর্তির মধ্যে তারই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে গেছেন। কিন্তু, আরম্ভেরও আরম্ভ থাকে। রবীন্দ্রনাথের জন্মকালের আগেই এদেশে সেই বিশেষ সূচনা-সংকেত দেখা দিয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধের পরের শ'খানেক বছরে দেশের নানা দুঃখকষ্টের মধ্যেও ধীরে ধীরে নতুন ধ্যানের সম্ভাবনা অঙ্কুরিত হয়ে উঠছিল। আঠারোর শতকের শেষদিকে রামপ্রসাদের শ্যামাসংগীতের পরে কবিওয়ালাদের প্রবলতার অনেকদিন কেটেছে। তারপর, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে,

—ঈশ্বর গুপ্তের প্রসিদ্ধির আগেই, পশ্চিমী শিক্ষাদর্শ প্রচারের পাশাপাশি দেশের নিজস্ব ভাষা এবং সাহিত্য সম্বন্ধেও নতুন আন্দোলন শুরু হয়েছিল। রামমোহন ছিলেন সেই আমলের নেতা। তারপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশ ঘোষ ইত্যাদি অনেকের পরে রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয় ঘটে। বিদ্যাসাগর, কেশব সেন, রামকৃষ্ণ আর বঙ্কিমচন্দ্র,—এই চারজনই ছিলেন তখনকার কীর্তিত বাঙালীদের মধ্যে স্মরণীয়তম।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা রবীন্দ্র-জীবনী থেকে রবীন্দ্রনাথের জীবন-কথার খুঁটিনাটি অনেক বৃত্তান্তই জানা যায়। তাঁর ব্যক্তিত্বের সুদূর-প্রসারী পরিধি অবলম্বন করে একটি ভাবের বৃত্ত দিনে দিনে সম্প্রসারিত হয়েছে। 'রবীন্দ্র-যুগ' কথাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের এবং তাঁর সাহিত্যকর্মের দীর্ঘকালব্যাপী বিশেষ প্রভাবের ধারণাই নিহিত। অতএব রবীন্দ্র-যুগের কথা বুঝতে হলে তাঁর নিজের, এবং তাঁর আগে-পরে প্রবহমান খানিকটা সময়ের যাবতীয় আদর্শবোধ, জীবন ধারণা, লাভ ক্ষতি হর্ষ-বিষাদ, আশা নৈরাশ্য এবং প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির কথাগুলি ভেবে দেখা দরকার।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে, বাংলা ১২৬৮ সালের পচিশে বৈশাখ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সপ্তম পুত্র রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথের নানা আত্মকথায় পিতা দেবেন্দ্রনাথের কথাই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বার বার বলা হয়েছে।

দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে খুলনা জেলার দক্ষিণ ডিহির পিরালী ব্রাহ্মণ রামনারায়ণ রায়চৌধুরীর ছ'বছরের মেয়ে সারদাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। দেবেন্দ্রনাথের বড়ো ছেলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয় ১৮৪০-এর ৮ই এপ্রিল তারিখে। দ্বিতীয় সত্যেন্দ্রনাথের জন্মতারিখ ১লা জুন, ১৮৪২; পঞ্চম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৮৪৯ সালে এবং মেয়েদের মধ্যে চতুর্থ স্বর্ণকুমারী ১৮৫৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ কবি ছিলেন। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' তাঁরই প্রসিদ্ধ কাব্য। সত্যেন্দ্রনাথ বাংলার প্রথম আই. সি. এস.। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিলেত থেকে ফিরে কাজে যোগ দেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। তিনি

মারা গেছেন ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। কন্যা স্বর্ণকুমারীও সাহিত্য রচনায় বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। তিনি দীর্ঘকাল বিখ্যাত 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকার কাজ করেছিলেন। তাঁর স্বামীর নাম জানকীনাথ ঘোষাল। সত্যেন্দ্রনাথের মেয়ের নাম ইন্দিরা দেবী। তাঁর স্বামীই 'সবুজ পত্রের' প্রমথনাথ চৌধুরী (বীরবল)।

ঠাকুর-পরিবারের আদিকথা :

খুলনা জেলার দক্ষিণডিহিতে কমলদেব, জয়দেব, রতিদেব ও শুকদেব রায়চৌধুরী নামে চার ভাইয়ের বাস ছিল। যশোরের মুসলমান দেওয়ান পীর আলীর কৌশলে এঁরা সমাজে পতিত হয়েছিলেন। শুকদেবের জামাই জগন্নাথ কুশারীই ছিলেন ঠাকুর-গোষ্ঠীর আদিপুরুষ। খ্রীষ্টাব্দের হিসেবে ১৬৮৬ থেকে ১৬৯০ সালের মধ্যে আওরঙ্গজেবের অনুগ্রহে ইংরেজরা যখন কলকাতায় তিন-খানি গ্রাম পান, সেই সময়ে শুকদেব এবং তাঁর ভাইপো পঞ্চাননও কলকাতায় এসেছিলেন। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে সেই পঞ্চাননই তখনকার কলকাতার গোবিন্দপুর অঞ্চলে এসে বাস আরম্ভ করেন। ব্রাহ্মণ-বর্জিত গ্রামে বসে প্রতিবেশীদের কাছে পঞ্চানন ক্রমশঃ পঞ্চানন ঠাকুর নামে পরিচিত হন। জাহাজে রসদপত্র সরবরাহের কাজে শুকদেব আর পঞ্চাননের সমৃদ্ধি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। পঞ্চাননের দুই ছেলে জয়রাম আর রামসন্তোষ ক্রমে ধনশালী হয়ে ওঠেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জয়রামের মৃত্যু হয়। পলাশীর যুদ্ধের পরে, তাদের কলকাতার সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ হিসেবে জয়রামের ছেলেরা ইংরেজদের কাছে কিছু টাকা পান। তখন জয়রামের বড়ো ছেলে নীলমণি ঠাকুর কলকাতার পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে জমি কিনে ঠাকুর-বাড়ির পত্তন করেন। সে হোলো ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। তার কিছু আগেই, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ যখন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী পান। তখন নীলমণি ঠাকুর উড়িষ্যায় কালেক্টরের সেরেস্তাদার হয়েছিলেন। সে সময়ে নীলমণির ছোটো ভাই দর্পনারায়ণ ছিলেন কলকাতার ঠাকুর-পরিবারের অভিভাবক। পরে দু'ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের সূত্রপাত হয়। বৈষ্ণব শেঠ-এর কাছ থেকে নীলমণি তখন জোড়াসাঁকোতে এক বিঘা জমি দেবত্র পান। তারপর, ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ির

সূত্রপাত হয়। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে নীলমণির মৃত্যুর পরে তাঁর বড়ো ছেলে রামলোচন পরিবারের অভিভাবক হন। রামলোচন অনেক টাকা উপায় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সন্তান হয়নি। রামলোচনের ছোটো রামমণির দুই বিবাহ। প্রথমা মেনকার চার সন্তানের কনিষ্ঠের নাম দ্বারকানাথ। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রামলোচন দ্বারকানাথকে পোষ্য নিয়েছিলেন। এই দ্বারকানাথই দেবেন্দ্রনাথের পিতা। আট বছর পরে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে রামলোচনের মৃত্যু হয়। দ্বারকানাথের জন্ম-বৎসর ১৭৯৪। সুতরাং তখন তাঁর বয়স ছিল বারো-তেরো বছর।

: দ্বারকানাথ :

শৈশবে দ্বারকানাথ প্রথমে ফার্সী, পরে ইংরেজি শিক্ষা পেয়েছিলেন। শেরবোর্ণ সাহেব তাঁকে ইংরেজি পড়াতেন। শেরবোর্ণ সাহেবের ইস্কুল থেকে বেরিয়ে তিনি পাদরী উইলিয়ম অ্যাডামস্ সাহেবের কাছে ইংরেজি পড়েন। পালক-পিতার মৃত্যুর পরে ম্যাকিন্টস্ কোম্পানির গোমস্তা হিসেবে দ্বারকানাথ কিছুদিন রেশম এবং নীল কেনার কাজ করেছিলেন। সেই সময়ে তাঁকে জমিদারির কাজও শিখতে হয়। সুপ্রীম কোর্টের ব্যারিষ্টার ফার্গুসনের সাহায্যে আইনেও তিনি বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন এবং আদালতের কাজকর্মে পারদর্শিতার ফলে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চব্বিশ পরগনার তদানীন্তন কালেক্টর ও নিমকি অধ্যক্ষের (Salt Agent) দেওয়ান নিযুক্ত হন। ম্যাকিন্টশ কোম্পানির কিছু অংশের অংশীদার হয়ে দ্বারকানাথ নিজে কিছু টাকা লোকশান দেন। ১৮৩৪-এ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি কার-ঠাকুর অ্যাণ্ড কোম্পানি নামে এক যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ব্যবসাতে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের জমিদারির আয়তনও বেড়ে যায় এবং বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে তাঁর কর্তৃত্ব ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। দ্বারকানাথ বৈষ্ণব পরিবারের মানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু রামমোহনের 'আত্মীয়-সভা'র সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগ ছিল। ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও (১৮২৬, ২০এ আগষ্ট) তিনি উৎসাহী ছিলেন। প্রথমে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে,—পরে, ১৮৪৫-এ মোট দু'বার তিনি বিলেত গিয়েছিলেন। একান্ন বছর বয়সে ১৮৪৬-এর পয়লা আগষ্ট বিলেতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

দ্বারকানাথের স্ত্রী দিগম্বরী দেবী স্বামীকে আহারাদি ব্যাপারে সাহেবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে দেখে, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে, কৃচ্ছ্র সাধনের ফলে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। বড়ো ছেলে দেবেন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন দ্বারকানাথের বয়স ছিল মাত্র তেইশ বছর।

: দেবেন্দ্রনাথ :

১৮৩৪ সালে দেবেন্দ্রনাথের পিতামহী (রামলোচনের পত্নী) অলকা দেবীর মৃত্যু হয়।[৩] দ্বারকানাথের বিলাস এবং তাঁর সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন,—তাঁর আমলের ঠাকুর-বাড়ির বৈষ্ণব হাওয়া,—এবং তারই মধ্যে অলকা দেবীর মৃত্যুতে শোক,—দেবেন্দ্রনাথের জীবনে সে সব ছিল বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। দেবেন্দ্রনাথ কিছুদিন হিন্দু-কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি সেখানকার নিরীশ্বরবাদী য়ুরোপীয় দর্শনের আলোচনা লক্ষ্য করেছিলেন। এদিকে মহাভারত পাঠের ফলে এবং রামমোহনের ঈশোপনিষদের একখানি ছিন্নপত্র আকস্মিকভাবে তাঁর চোখে পড়ে যাওয়াতে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে তাঁর অনুরাগ বেড়ে গিয়েছিল।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিজেদের বাড়িতে 'তত্ত্ববোধিনী' সভা স্থাপন করেন। ১৮৪৩-এ তাঁরই উদ্যমে এবং অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। ঐ বছর ২০এ ডিসেম্বর (৭ই পৌষ ১২৫০) দেবেন্দ্রনাথ এবং তাঁর কয়েকজন সঙ্গী ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৪৭ সালের ২৮এ মে তারিখের তত্ত্ববোধিনী সভাতে ব্রাহ্মসমাজের 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম' নামটি বদলে 'ব্রাহ্মধর্ম' নাম রাখা হয়।

সেই ১৮৪৭ সালেই ঠাকুর-পরিবারে বিশেষ অর্থসংকট দেখা দিয়েছিল। সে সময়ে ইউনিয়ন-ব্যাঙ্ক ফেল হয় এবং পরের বছর কার-ঠাকুর কোম্পানি উঠে যায়। দেবেন্দ্রনাথকে তখন সংসারের খরচ কমাবার দিকে মন দিতে হয়। আর, সেইসঙ্গে নতুন উদ্যমে তাঁর শাস্ত্রচর্চাও শুরু হয়। তখন প্রতি সন্ধ্যায় ছাদে বসে ধর্ম আলোচনা চলেছে। সে সব দিনের কথা তিনি নিজেই লিখে গেছেন—'এই সময়ে আমি সকালে দুই প্রহর পর্যন্ত গভীর দর্শনশাস্ত্রের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতাম। দুই প্রহরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বেদ-বেদান্ত মহাভারত

৩। পরে জানা গেছে যে অলকা দেবী লোকান্তরিত হন ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে।

প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনায় ও বাঙ্গালা ভাষায় ঋগ্বেদের অনুবাদে নিযুক্ত থাকিতাম। সন্ধ্যার সময়ে ছাদের উপর প্রশস্ত কম্বল পাতিয়া বসিতাম। সেখানে আমার কাছে বসিয়া ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু ব্রাহ্মেরা, ধর্ম-জিজ্ঞাসু সাধুরা, নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। এই আলোচনাতে কখন কখন রাত্রি দুই প্রহরও অতিবাহিত হইয়া যাইত। সেই সময় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধসকলও পরিদর্শন করিতাম।'

১৮৪৩ থেকে এই ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত বছর-পাঁচেকের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-জীবনে বহুধা-সমৃদ্ধ এক আত্মচিন্তার পর্ব গেছে। দ্বারকানাথের রাজসিক ভাবের পরে ঠাকুর-পরিবারে ক্রমেই যেন সাত্ত্বিক ভাবের প্রাধান্য ব্যক্ত হয়ে উঠছিলো। তা বলে দ্বারকানাথ কেবলই যে বিষয়মদে মগ্ন থাকতেন, সে-কথা নয়। তবে দেবেন্দ্রনাথের মতন বিশ্বরহস্যের কৌতূহল ছিল না তাঁর। ১৮৩৪ বা ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রামলোচন ঠাকুরের স্ত্রী দেবেন্দ্রনাথের পিতামহী অলকা দেবীর যখন মৃত্যু হয়, তখন তিনি আঠারো বছরের কিশোর মাত্র। তাঁর সেই সময়ের প্রথম আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে বলে গেছেন। তারপর, সংস্কৃত এবং ইংরেজি দর্শনশাস্ত্রের বইও তিনি অনেক পড়েছেন। প্রথম বয়সেই তিনি 'অনন্ত আকাশ হইতে অনন্তের পরিচয়' পেয়েছিলেন। জ্ঞানের পথ মানুষকে ঠিক কতোদূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে, সেই ভাবনাতে তখন তাঁর অনেক সময় কেটেছে। একবার বর্ষাকালে কালী-গ্রামে জমিদারি দেখতে গিয়ে, ফেরবার পথে পদ্মার বুকে দুর্যোগে পড়ে তাঁর যে কী রকম বিপদ ঘটেছিল, সে কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখে গেছেন—'এমন সময়ে অদূরে দেখি, একখানা ডিঙ্গি হাবুডুবু খাইতে খাইতে মোচার খোলার মত ওপার হইতে আসিতেছে। তাহার মাঝি আমাদের সাহস দেখিয়া সাহস দিয়া চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, 'ভয় নাই, চলে যান।' পরবর্তী জীবনে এই অভিজ্ঞতাটি মনে রেখে,—ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম-জ্ঞানের পথ-সন্ধানে তিনি সেইরকম উৎসাহের 'সায়' খুঁজেছিলেন। ১৮৩৮ থেকে ১৮৪৩-এর মধ্যেই তাঁর সেই সন্ধান-পর্বের বিস্তার ধরা হয়; ১৮৪৩-এর ২১এ ডিসেম্বর তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন; ১৮৪৫-এর ২০এ ডিসেম্বর (১৭৬৭ শকের ৭ই পৌষ) তাঁর গোরিটির বাগানে ব্রাহ্ম-ধর্মাবলম্বীদের প্রথম মেলা বসেছিল। সেও তাঁরই উদ্যোগে। গায়ত্রী মন্ত্রে যাদের ঠিক অর্থবোধ হয়নি, তাঁরাও যাতে ধর্মের

অনুভূতি বা বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরের আনন্দ-রূপের মর্মার্থবোধ থেকে বঞ্চিত না থাকেন, সেজন্যে তিনি অতঃপর ব্রাহ্মধর্মের যুগোচিত ভাষা খুঁজতে থাকেন। সেটা ১৮৪৪ সালের ঘটনা। সেই অনুসন্ধানের কথা-প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'আমি স্থির করিলাম যাহারা গায়ত্রী দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারে, তাহারা করুক; যাহারা তাহা না পারে, তাহারা যে-কোন সহজ উপায়ে ঈশ্বরে আত্মা সমাধান করিতে পারে তাহাই অবলম্বন করুক।' এই ভাবনাতে বিভোর হয়ে,—বহু অনুসন্ধানে তৈত্তিরীয় এবং মুণ্ডক উপনিষদ্ থেকে তিনি 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এবং 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'—যথাক্রমে এই দুটি উক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন 'গায়ত্র্যা-পরমোপাসনাবিধানম্' নামে এক পুস্তিকা লিখেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ এইভাবে ব্রাহ্মসমাজে গায়ত্রী-মন্ত্রে উপাসনার বিধি বদলে দিয়েছিলেন। তা হলেও রামমোহনের বেদান্তগ্রন্থে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার মূল ব্যাপারটির যে-রকম ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল, দেবেন্দ্রনাথ নিজে তার কোনো পরিবর্তন ঘটাননি। কেবল অন্তরের উপলব্ধির দিকেই তাঁর নিজের এবং তাঁর অনুচর ও সমবিশ্বাসী দলের বিশেষ নজর ছিল। তিনি লিখেছিলেন: 'জগন্মন্দিরের দেবতা এখন আমার হৃদয়মন্দিরের দেবতা হইলেন, এবং সেখান হইতে নিঃশব্দ গম্ভীর ধর্মোপদেশ শুনিতে লাগিলাম।' কেশব সেনের 'বিবেকবাণী'তেও এই অন্তর দেবতার কথাই অন্যভাবে বলা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনে আনন্দ কল্যাণ, ভূমা ইত্যাদি অধ্যাত্মভাবের অঙ্কুরোদ্গমের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের নিজস্ব এই সন্ধানের তত্ত্বই নিহিত আছে। দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাবের চুলচেরা বিশ্লেষণ সময়সাপেক্ষ কাজ। কিন্তু সাধারণভাবে এখানে সে-বিষয়ে এ-কথা নিশ্চয় বলা যায় যে, বেদান্তের অভ্রান্ততায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। তিনি নিজে কাশীতে গিয়ে শাস্ত্রচর্চা করে, ১৮৪৭-এর নভেম্বর মাসে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশকে নিয়ে কলকাতায় ফিরেছিলেন। তারপর ১৮৪৮-এ 'ব্রাহ্মধর্ম' বইখানির প্রথম খণ্ড সংকলিত হয়। বছর-দুয়েকের মধ্যেই সারা বাংলা দেশের শিক্ষিত-সমাজে সে-সব কথা যথারীতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের মাঘোৎসবে অক্ষয়কুমার দত্তের বক্তৃতায় অতঃপর প্রকাশ্যভাবে এই কথাই ঘোষণা করা হয় যে, 'বেদ-বেদান্ত ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট' নয়, এবং তা ব্রাহ্মসমাজের শাস্ত্রও নয়!

দেবেন্দ্রনাথের বিষয়ে সেকালে রাজনারায়ণ বসু লিখে গেছেন—'দেবেন্দ্র বাবু চিরকাল ভক্তিপ্রধান, রক্ষণশীল ব্যক্তি, অথচ সংস্কারক।' ভাবের ব্যাকুলতা, এবং মনের যুক্তিনিষ্ঠা—এই দুটি গুণের সমন্বয় সাধনের মধ্যেই তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবের বিশেষত্ব!

শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই ঠাকুর-পরিবারে লক্ষ্মী-সরস্বতীর এইরকম কৃপা, দাক্ষিণ্য আর মক্তিভেদ ঘটে গেছে। তারপর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব!

দ্বারকানাথ যেমন কর্মী ছিলেন, তেমনি ছিল তাঁর বিলাসের বিপুলতা! সেকালের নানা জনকল্যাণকর কাজের সঙ্গে যোগ ছিল তাঁর। হিন্দু কলেজ এবং মেডিক্যাল কলেজের পত্তনে,—সতীদাহ নিবারণে,—রামমোহনের 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠায়,—ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনে তাঁর সত্যিকার আনুকূল্য ছিল। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম বিলেত যান,—দু'বছর পরে পুনর্বার। এসব কথা অনেকেই অনেকবার বলেছেন। সেই সঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনীর বিচিত্র তথ্যের ভাণ্ডারী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের এই কথাগুলিও মনে পড়ে :

> 'দ্বারকানাথের বদান্যতা, সৌন্দর্যপ্রিয়তা, বিলাসিতা সম্বন্ধে এত গল্প আছে যে তাহা বলিয়া শেষ করা যায়না। তবে একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার—সেটি হইতেছে তাঁহার অসীম সৌন্দর্যভোগের ক্ষমতা। যে বিলাসিতা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা তাহার বেলগাছিয়ার বাগানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, ভোজনে উৎসবে যেসব আড়ম্বর প্রকাশ পাইত—তাহাই উত্তরকালে বংশধরদের মধ্যে নানাভাবে অপরূপ সৌন্দর্য-সৃষ্টির মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়াছিল।'

: দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র সেন :

দ্বারকানাথের [১৭৯৪-১৮৪৬] ছেলে দেবেন্দ্রনাথ [১৮১৭-১৯০৫] ছিলেন জ্ঞানী, কর্মী,—ভাবুক, অথচ সংসারী! ১৮৪৬-এ প্রবাসে পিতা দ্বারকানাথের মৃত্যু,—পরের বছর ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক-ফেল দুর্ঘটনা,—১৮৪৮-এ ব্যবসাতে দুস্তর ক্ষতি—এইসব দুর্যোগ সত্ত্বেও তিনি তাঁর আত্মস্থতা হারাননি। ধীরে ধীরে তাঁর মন অন্তর্মুখী হয়েছে। অক্ষয়কুমার দত্তের সাহায্যে তিনি ব্রাহ্ম-ধর্মগ্রন্থ

সংকলন করেছেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিজেই 'তত্ত্ববোধিনী সভার' সম্পাদক হয়েছেন। ১৮৫৬-র অক্টোবরে নদীপথে কলকাতা থেকে কাশী যাত্রা করে ফিরে এসেছেন ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। ফিরে এসে, কেশবকে পেয়েছেন। কেশব সেনের বয়স তখন মোটে একুশ বছর। তার এক বছর পরে কেশবচন্দ্রকে এবং নিজের মেজ ছেলে সত্যেন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনি সিংহলে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পচিশে জুলাই [১১ই শ্রাবণ ১২৬৭] তিনি নিজে ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসে ধর্ম আলোচনা শুরু করেন।

১৮৬১-তে—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের জন্ম-বৎসরেই কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কাজে নেমেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহাস্পদ ছিলেন তিনি। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন চুয়াল্লিশ বছর,—কেশবের মাত্র বাইশ। চুয়াল্লিশের সঙ্গে বাইশের দৃষ্টির মিল না ঘটাই স্বাভাবিক। সে-ঘটনার বছর পাঁচেক পরেই—আঠারো শ ছেষট্টি খ্রীষ্টাব্দের এগারোই নভেম্বর [২৬এ কার্তিক ১২৭৩]—দেবেন্দ্রনাথের 'আদি-ব্রাহ্মসমাজ' থেকে বেরিয়ে এসে কেশব তাঁর 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে, রবীন্দ্রনাথের জন্মের বছর-দুয়েক পরে, রায়পুরের সিংহ-পরিবারের জমিদারিভুক্ত বোলপুরের বিস্তীর্ণ জমি কিনেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। সেই জমিতেই শান্তিনিকেতনের পত্তন হয়।

দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে [৬ই মাঘ, ১৩১১]। জীবনের শেষ চল্লিশ বছর তিনি নানা ভ্রমণে,—কখনো বা শান্তিনিকেতনে কাটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মের কয়েক বছর আগে থেকেই তাঁর ভ্রমণ শুরু হয়। ১৮৭৩-এর প্রথম দিকেই ছেলেদের উপনয়নের জন্যে—১৮৭২-এর শেষ দিকে তিনি একবার কলকাতায় ফিরে আসেন। ৬ই ফেব্রুয়ারি [২৫এ মাঘ ১২৭৯] একসঙ্গে সত্যপ্রসাদ, সোমেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের বয়স হয়েছে এগারো বছর। পরিণত বয়সে, খুব ছেলেবেলার কথা-প্রসঙ্গে তিনি লিখে গেছেন :

> 'আমরা তিনটি বালক একসঙ্গে মানুষ হইতেছিলাম। আমার সঙ্গী দুটি আমার চেয়ে দুই বছরের বড়ো। তাঁহারা যখন গুরুমহাশয়ের কাছে পড়া আরম্ভ করিলেন আমারও শিক্ষা সেই সময়ে শুরু হইল কিন্তু সে কথা আমার মনেও নাই।'

: রবীন্দ্রনাথের বাল্যপর্ব :

কিন্তু সে সময়ের কিছুই যে তাঁর মনে না ছিল, তাও নয়। অনেক-কালের সুরসিক খাজাঞ্চি কৈলাস মুখুজ্যের কথা মনে ছিল। কৈলাস মুখুজ্যের ছড়া, হাসিতামাশা, প্রসন্নতার কথা তিনি কখনো ভোলেন নি। 'কর' 'খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটিয়ে বালক রবীন্দ্রনাথ তখন সবেমাত্র কূল পেয়েছেন! তখন ছেলেবেলার পাঠাভ্যাসের মধ্যে দেখা দিয়েছে আশ্চর্য কয়েকটি শব্দের ইশারা—জল পড়ে, পাতা নড়ে! তাকেই বলেছেন 'আদিকবির প্রথম কবিতা'। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান' ছড়াটি ছিল তাঁর 'শৈশবের মেঘদূত'! সেই ছড়া, কবিতা, স্বপ্ন আর সংগীতের মধ্য দিয়েই পথ এগিয়ে গেছে অন্তঃপুর থেকে বহির্জগতে। বহির্জগৎ তখন কেবল ইস্কুল, আর, বাড়ির সামনেকার রাস্তা! বয়োজ্যেষ্ঠ সহচর সত্যপ্রসাদের তিনি মামা। সেই সত্যপ্রসাদ কোনো এক মেঘলা দিনে তাঁকে ভয় দেখাবার জন্যে 'পুলিসম্যান' 'পুলিসম্যান' বলে ডেকেছেন! আবার, কান্নার জোরে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি ইস্কুলে অকালে ভর্তি হয়েছেন তিনি। সেখানে পড়া বলতে না-পারলে ছেলেকে বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে, প্রসারিত দুটি হাতের ওপর ক্লাসের অনেকগুলি স্লেট একসঙ্গে চাপিয়ে দেওয়া হোতো। সেই স্মৃতি সম্বন্ধে পরিণত জীবনে রবীন্দ্রনাথ কৌতুকের সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন: 'এরূপে ধারণাশক্তির অভ্যাস বাহির হইতে অন্তরে সঞ্চারিত হইতে পারে কি না তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্‌দিগের আলোচ্য।' ছেলেবেলার এইসব শিশুপীড়নের স্মৃতিই তাঁকে একদিন শান্তিনিকেতনে আদর্শ একটি বিদ্যালয় গড়ে তোলবার প্রেরণা দিয়েছিল।

বাড়িতে চাকরদের মহলে চাণক্য-শ্লোকের বাংলা অনুবাদ পড়বার রেওয়াজ ছিল। তা ছাড়া ছিল কৃত্তিবাসের রামায়ণ। জোড়াসাঁকোর অন্দর-মহলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণের অভাব ছিল না। দিদিমা পড়তেন সে-কাব্য—কোনো-এক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মায়ের খুড়ি ছিলেন তিনি। সত্যপ্রসাদ যেদিন 'পুলিশম্যান' বলে ডাক দিয়েছিলেন, সেদিনকার পরবর্তী আর-একটি ঘটনা তিনি নিজেই লিখে গেছেন:

> 'সেই মার্বেলকাগজ-মণ্ডিত, কোণছেঁড়া-মলাটওয়ালা মলিন বইখানি কোলে লইয়া মায়ের ঘরের দ্বারের কাছে পড়িতে বসিয়া গেলাম। সম্মুখে অন্তঃপুরের আঙিনা ঘেরিয়া চৌকোণা বারান্দা;

সেই বারান্দায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে অপরাহ্ণের ম্লান আলো আসিয়া পড়িয়াছে। রামায়ণের কোনো একটা করুণ বর্ণনায় আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া দিদিমা জোর করিয়া আমার হাত হইতে বইটা কাড়িয়া লইয়া গেলেন।'

বিলাসে লালিত হবার দুর্যোগ থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'জীবনস্মৃতি'র 'ঘর ও বাহির' আর 'ভৃত্যরাজক তন্ত্র' পাশাপাশি দুটি অধ্যায়। দুটিতেই ভৃত্যমহলের কথা আছে। চাণক্য-শ্লোকের বঙ্গানুবাদ আর কৃত্তিবাসী রামায়ণের কথা আছে 'ঘর ও বাহির' অধ্যায়ে। পরের অধ্যায়ে তিনি সেই ছেলেবেলার ভৃত্যপ্রভুদেরই নির্মমতার কথা বলেছেন। হয়তো উনিশ শতকের মধ্যকালীন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ির সেই নির্মম ভৃত্যরাজাদের শাসন-স্মৃতির মধ্যেই 'অচলায়তন'-এর পঞ্চকের উৎস নিহিত ছিল। তিনি বলে গেছেন :

'আসল কারণটা এই, ভৃত্যদের উপরে আমাদের সম্পূর্ণ ভার পড়িয়াছিল। সম্পূর্ণ ভার জিনিসটা বড়ো অসহ্য। পরমাত্মীয়ের পক্ষেও দুর্বহ। ছোটো ছেলেকে যদি ছোটো ছেলে হইতে দেওয়া যায়—সে যদি খেলিতে পায়, দৌড়িতে পায়, কৌতূহল মিটাইতে পারে তাহা হইলেই সে সহজ হয়। কিন্তু যদি মনে কর উহাকে বাহির হইতে দিব না, খেলায় বাধা দিব, ঠাণ্ডা করিয়া বসাইয়া রাখিব তাহা হইলে অত্যন্ত দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করা হয়। তাহা হইলে ছেলেমানুষ ছেলেমানুষির দ্বারা নিজের যে-ভার নিজে অনায়াসেই বহন করে সেই ভার শাসনকর্তার উপরে পড়ে।'

ছেলেবেলার সেই ভৃত্য-অভিভাবকদের মধ্যে দু'জনের কথা খুবই মনে ছিল তাঁর। একজন শ্যাম, অন্যজন ঈশ্বর। আগে গুরুমশায়গিরি করতো ঈশ্বর।—'সে অত্যন্ত শুচি-সংযত আচারনিষ্ঠ বিজ্ঞ এবং গম্ভীর প্রকৃতির লোক।' তার সম্বন্ধে তিনি আরো বলেছেন—'জলে স্থলে আকাশে এবং লোকব্যবহারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অসংখ্য দোষ প্রবেশ করিয়া আছে, অহোরাত্র সেইগুলাকে কাটাইয়া চলা তাহার এক বিষম সাধনা ছিল।' তা ছাড়া আরো এক বৈশিষ্ট্য ছিল ঈশ্বরের স্বভাবে। 'বরানগর'কে সে বলতো 'বরাহনগর', —'অমুক লোক বসে আছেন' বলতে হলে সে বলতো 'অমুক লোক অপেক্ষা

করেছেন'। সেই সুদূর অতীতের কথা-প্রসঙ্গে পঞ্চাশ বছর বয়সে 'জীবনস্মৃতি' লিখতে বসে তিনি মন্তব্য করেছেন :

> 'ইহা হইতে দেখা যায় বাংলায় গ্রন্থের ভাষা ক্রমে চলিত ভাষার দিকে নামিতেছে এবং চলিত ভাষা গ্রন্থের ভাষার দিকে উঠিতেছে ; একদিন উভয়ের মধ্যে যে আকাশ পাতাল ভেদ ছিল, এখন তাহা প্রতিদিন ঘুচিয়া আসিতেছে।'

'ঈশ্বর' পরিচারকের এই সাধুভাষা-প্রীতির প্রসঙ্গ থেকেই মনে পড়ে আরো পরের পর্বের আর-একজনের কথা। তিনি দ্বারিকানাথ মজুমদার—রবীন্দ্রনাথের জমিদারি কয়া-গ্রামের একজন শিক্ষিত বর্দিষ্ণু জোতদার। 'ছিন্নপত্রে' রবীন্দ্রনাথ এঁর কথা লিখে গেছেন– এবং পরে এঁকে আরো পরিস্ফুট ভাবে দেখিয়েছেন 'রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে' বইখানির লেখক শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। 'বিশ্বভারতী পত্রিকায়' (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫২) প্রকাশিত, ৬ই জুলাই ১৮৯৪ সালে শিলাইদহ থেকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে দেখা যায় বিরাহিমপুরের এই 'সুবিখ্যাত বক্তা দ্বারী মজুমদারের' রেখাচিত্র! রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন—'সে প্রথমে আরম্ভ করে দিলে--মহারাজ, পুরাকালে যুধিষ্ঠিরের হিষ্টিরিয়া (হিস্ট্রি) পাঠ করে অনেকেই অবিশ্বাস করে থাকেন। তাঁরা বলেন—এতদূর কি কখনও সম্ভব হতে পারে? কিন্তু এতকাল পরে আপনাকে চাক্ষুষ দেখে যুধিষ্ঠিরের কীর্তিকলাপের প্রতি তাঁদের সন্দেহভঞ্জন হয়েছে।'

এ অবিশ্যি অনেক পরের কথা। সেকালের—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার—ঠাকুরবাড়িতে ফিরে, পুনরায় সেই 'ঈশ্বর' পরিচারকের কথাই স্মরণ করা যাক। তার আফিমের অভ্যাসের কথা সুপরিচিত। ঠাকুরবাড়ির বালকদের বরাদ্দ দুধ থেকে সে তার নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে নিতো! বালক-রবীন্দ্রনাথের জলখাবার পরিবেষণ সম্বন্ধে তার খুবই সংকোচ ছিল! 'জীবনস্মৃতিতে' তার কথা বলতে-বলতেই 'পরিবেষণ কর্তার কুণ্ঠিত দক্ষিণ হস্তের দাক্ষিণ্যের' উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ!

: ঠাকুরবাড়ির আবহাওয়া :

ঠাকুরবাড়ির সাহিত্য, সংগীত, শিল্পচিন্তার আবহাওয়াতেই রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। 'জীবনস্মৃতিতে' নিজের ছেলেবেলার সেই

বিশেষ পারিবারিক আবহাওয়ার কথা তিনি নিজেই জানিয়ে গেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্য রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। সেই পারিবারিক ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে, তেমনি 'স্বপ্নপ্রয়াণের' কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই। ছেলেবেলায় গণেন্দ্রনাথের ভাই গুণেন্দ্রনাথের,—এবং রবীন্দ্রনাথের নিজের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরও নাটক অভিনয়ের দিকে খুব আগ্রহ ছিল। তাঁদেরই চেষ্টায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একটি নাটকের দল গড়ে ওঠে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে, কেশবচন্দ্র সেনের ভাই কৃষ্ণবিহারী সেন,—ঠাকুরবাড়ির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং গুণেন্দ্রনাথ,—যদুনাথ মুখোপাধ্যায়—এবং অক্ষয় চৌধুরী—তখন এই পাঁচজনেরই বয়স ছিল উনিশ থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে। এঁরাই ছিলেন ঠাকুরবাড়ির সেই নাট্যোৎসাহী দলের পঞ্চ সদস্য। রবীন্দ্রনাথের যখন মাত্র ছ'বছর বয়স, সেই সময়ে এই নাট্যসমিতির উদ্যোগে, রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নবনাটক' বইখানির প্রথম অভিনয় হয়। সে ছিল ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারির ঘটনা। পর পর ন'বার ঠাকুরবাড়িতে এই নাটকের অভিনয় হয়। মনে পড়ে, প্রভাতকুমার লিখেছেন,—'একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাল্যকালে নাটক ও অভিনয়ের যে দৃষ্টান্ত ও আদর্শ স্পষ্টবোধের অগোচরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা বাংলাদেশের যাত্রাগান, কৃষ্ণলীলা, নিমাইসন্ন্যাস নহে, তাহা সম্পূর্ণ য়ুরোপীয়-আদর্শে গড়া থিয়েটারের অনুকরণে রচিত নাটকের অভিনয়। এইসব অভিনয়ের ক্ষীণ স্মৃতি-কণিকাগুলি বালকের অবচেতন মনের গভীর স্তরে সঞ্চিত ছিল এবং উত্তরকালে তাহারাই পূর্ণাঙ্গ আর্টরূপে কবির জীবনে প্রকাশ পায়।'

সেই সুদূর ১৮৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দেরই কোনো-একদিন—রবীন্দ্রনাথের এক ভাগিনেয়—জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় [১৮৫৫-১৯১৯] তাঁকে পয়ারের রীতি-পদ্ধতিটুকু বুঝিয়ে দিয়ে কবিতা লিখতে বলেন!

সাহিত্য-পাঠ এবং সাহিত্য-রচনা ছাড়া—নাটক রচনা ও অভিনয়ের দিকে সেকালের ঠাকুরবাড়িতে এই যেমন উৎসাহের নজীর দেখা গেল,

সংগীতের দিকেও সেইরকম উৎসাহের খবর পাওয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথের বন্ধু, গুণগ্রাহী শ্রীকণ্ঠ সিংহ তখন দিনরাত গানেই তলিয়ে থাকতেন! শুধু তাই নয়, 'ছেলেবেলা'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'তিনি তো গান শেখাতেন না, গান তিনি দিতেন, কখন তুলে নিতুম জানতে পারতেন না।'

: নানা শিক্ষা :

বিচিত্র বিষয়ে শিক্ষার উৎসাহী ছিলেন সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৪৪-৮৪] রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগীত-শিক্ষক ছিলেন আদি-ব্রাহ্মসমাজের গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী [১৮:৯-১৯০১]। তাঁর দাদারা গানের খুবই ভক্ত ছিলেন। তাঁর যখন আরো একটু বয়স হয়, তখন যদুভট্টের কাছে গান শেখেন তিনি। সেইসময়ে মার্গ-সংগীত আয়ত্ত করেন। এইভাবে বাড়ির আবহাওয়া থেকেই সাহিত্য, সংগীত, অভিনয় ইত্যাদি শিল্পের বিভিন্ন শাখায় উৎসাহ পেয়েছিলেন তিনি। পরিণত বয়সের নানা রচনায় তাই তাঁর ছেলেবেলার কথাই নানাভাবে ছড়িয়ে আছে 'ছড়ার ছবি'তে সংকলিত 'বালক' কবিতাটিতে তিনি লিখে গেছেন :

কিশোরী চাটুজ্জে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হোলে,
বাঁ হাতে তার থেলো হুঁকো, চাদর কাঁধে ঝোলে।
দ্রুতলয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া,
থাকত আমার খাতা লেখা, পড়ে থাকত পড়া ;
মনে মনে ইচ্ছে হোত যদিই কোনো ছলে
ভর্তি হওয়া সহজ হোতো এই পাঁচালির দলে,
ভাবনা মাথায় চাপত নাকো ক্লাসে ওঠার দায়ে,
গান শুনিয়ে চলে যেতুম নতুন নতুন গাঁয়ে।

একসময়ে এই কিশোরী চাটুজ্জে ছিলেন পাঁচালির দলের গায়ক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুচর ছিলেন তিনি।

'সোনার তরী'র 'শৈশব সন্ধ্যা' কবিতায় [১২৯৮ সালে রচিত] তাঁর ছেলেবেলার সেই তিনসঙ্গীর উল্লেখ দেখা যায়, – অর্থাৎ তিনি নিজে, তাঁর দাদা সোমেন্দ্রনাথ [১৮৫৯-১৯২৩] এবং ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ [১৮৫৯-১৯৩৩]! ছেলেবেলায় এঁরা যে একই সঙ্গে বেড়ে উঠেছিলেন,—সেই সময়ের সুখ-স্মৃতি ঐ কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে। প্রায় একই সময়ে লেখা তাঁর 'কঙ্কাল' গল্পটিতে এই 'তিন বাল্যসঙ্গী যে ঘরে শয়ন' করতেন, সেই ঘরেরও উল্লেখ আছে!

মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন বাঁকুড়া জেলার লোক। তাঁরই কাছে এই তিনজনের প্রথম বিদ্যারম্ভ হয়। বড়োদের সঙ্গে ইস্কুলে যাবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ যখন কান্না শুরু করেন, তখন গৌরমোহন আঢ্যের [১৮০৫-৫৪] ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হয়। সেখানে তিনি অবিশ্যি বেশি দিন পড়েন নি। তারপর তিনি নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন। নর্মাল স্কুল ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম স্থাপিত হ'য়ে—দু'বছর পরে একবার উঠে যায় —তারপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় ১৮৫৫তে সংস্কৃত-কলেজের বাড়িতে সে-বিদ্যায়তন পুনরায় স্থাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন সেই নর্মাল স্কুলে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর বয়স সাত-আট বছর—এবং সেখানে তখন আর বিদ্যাসাগরের প্রভাব ছিল না বলে শোনা যায়। নর্মাল স্কুলে বিলিতি ছাঁচের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা তাঁর পক্ষে মোটেই রুচিকর হয় নি। সেকালের সেই নর্মাল স্কুলে ছাত্রদের জন্যে যে গান নির্দিষ্ট ছিল, সেটিকে লক্ষ্য করেই 'ছেলেবেলা' বইখানিতে 'কলোকী, পুলোকী, সিঙ্গিল, মেলালিং মেলালিং মেলালিং' ইত্যাদি অদ্ভুত ধরনের উদ্ধৃতিটি দেওয়া হয়েছে। সেই নর্মাল স্কুলেই তাঁর 'গিন্নী' [১২৯৮ সালে প্রকাশিত] গল্পের হরনাথ পণ্ডিত নামে কুখ্যাত শিক্ষকটিও নিযুক্ত ছিলেন হাঁ, সেই হরনাথই তাঁর 'গিন্নী' গল্পের শিবনাথ পণ্ডিত!

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন আট বছর, সেই সময় ডেঙ্গুজ্বরের তাড়ায় কলকাতা থেকে তাঁরা কিছুদিনের জন্যে পেনেটি বা পানিহাটিতে ছাতুবাবুর [আশুতোষ দেব ১৮০৪-৫৬] বাগান-বাড়িতে যেতে বাধ্য হন। জোড়াসাঁকোর ঘর থেকে দেখা, তাঁর বাল্যকালের সেই বহির্জগতের ছবি 'প্রভাত-সংগীতের' 'পুনর্মিলন' কবিতায় একবার চকিতে দেখা দিয়েছে। 'শিশু' বইখানির 'পুরানো বট' কবিতায় তিনি সেই ঠাকুরবাড়ির পুকুরপাড়ের চীনা-বটের কথা স্মরণ করে লিখেছিলেন,—'নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,—ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে ওগো প্রাচীন বট'। সেই 'পুনর্মিলন' কবিতাতেই পেনেটির বাগানবাড়ির ছবিও দেখা গেছে:

আরেকটি কোটোখর মনে পড়ে নদীকূলে
সম্মুখে পেয়ারা গাছ ভরে আছে ফুলেফলে।
বসিয়া ছায়াতে তারি ভুলিয়া শৈশব-খেলা,
জাহ্নবীপ্রবাহ পানে চেয়ে আছি সারা বেলা।

'জীবনস্মৃতি'তে সেই পেনেটির বাগানবাড়ির কথা, আর, ছেলেবেলার নর্মাল স্কুলের কটু, নীরস দিনগুলির কথাও বলা হয়েছে। নর্মাল স্কুলের নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়ের বাইরে, তাঁকে বাড়িতেও নানা বিষয়ে পাঠ নিতে হোতো। সে-সময়ে হীরা সিং নামে এক শিখ পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করতে হোতো তাঁদের। তারপর নর্মাল স্কুলের শিক্ষক নীলকমল ঘোষাল সকাল ছটা থেকে সাড়ে নটা পর্যন্ত তাঁদের পড়াতেন। অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ', রামগতি ন্যায়রত্নের 'বস্তুবিচার' এবং সাতকড়ি দত্তের 'প্রাণিবৃত্তান্ত'—অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এইগুলিই তখন রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে পড়তে হোতো।

: বিজ্ঞান-পাঠে উৎসাহ :

সেই পর্বেই সন্ধ্যার পর অঘোরবাবু আসতেন ইংরেজি পড়াবার জন্যে। রবিবার বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী গান শেখাতেন। সীতানাথ ঘোষ [১২৪৮-৯০] —যিনি প্রাকৃত-বিজ্ঞান শেখাতেন,—তাঁর সম্বন্ধে বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের খুবই শ্রদ্ধা ছিল। তিনি কিছুদিন তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। রবিবার সকালে সেই বিজ্ঞান-শিক্ষক সীতানাথ ঘোষ না এলে বালক-রবীন্দ্রনাথ খুবই অতৃপ্তি বোধ করতেন। পরে, বিজ্ঞান-চর্চায় তাঁর যে-উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, তার সূচনা ঘটেছিল সেই বাল্যপর্বে। এই উৎসাহের জোরেই, শেষ বয়সে—১৩৪৪ সালে তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' বইখানি আত্মপ্রকাশ করে।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে, তাঁর মনে যে-বইগুলি বিশেষভাবে রেখাপাত করেছিল, প্রভাতকুমারের 'রবীন্দ্র-জীবনীর' মধ্যে যথাক্রমে সেগুলির নাম করা হয়েছে :—মৎস্যনারীর কথা, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের সুশীলার উপাখ্যান এবং শ্রীরামপুরের ছাপা জন্ রবিন্সনের অনুবাদ—ড্যানিয়েল ডিফোর রবিনসন ক্রুশো। ১২৫৮ সাল থেকে ১২৬৪ সালের মধ্যে অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের [১৮২১-১৮৯১] 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামে সচিত্র মাসিক পত্র তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। তাঁর বড়োদাদার আলমারিতেই তিনি 'অবোধবন্ধু' পেয়েছিলেন এবং সেই পত্রিকাতেই তিনি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের অনুবাদ 'পৌল বর্জিনী'রও দেখা পান। 'আধুনিক সাহিত্যে'র অন্তর্ভুক্ত 'বিহারীলাল' প্রবন্ধটিতে এইসব পত্র-পত্রিকার ভাবনাই দেখা দিয়েছিল। সেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন—'বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতসূর্য

বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যুষের শুকতারা বলা যাইতে পারে।'

: প্রিয় ঋতু বর্ষা :

১৩৪৪ সালের আষাঢ় মাসে 'ছড়ার ছবি' নামে একটি পদ্যরচনার মধ্যে বাল্যকালের স্মৃতি বর্ণনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

স্কুলের ছুটি হয়ে গেলে বাড়ির কাছে এসে
হঠাৎ দেখি মেঘ নেমেছে ছাদের কাছে ঘেঁষে
আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে, রাস্তা ভাসে জলে
ঐরাবতের শুঁড় দেখা দেয় জল-ঢালা সব নলে।
অন্ধকারে শোনা যেত রিমঝিমিনি ধারা
রাজপুত্তুর তেপান্তরে কোথা সে পথহারা।

বর্ষাকালের বাংলাদেশ তাঁর কিশোর-মনে কতো যে আবেদন দিয়ে গেছে, তার স্বীকৃতি আছে 'জীবনস্মৃতি'র ছত্রে-ছত্রে। তিনি লিখে গেছেন – 'বাল্যকালের দিকে যখন তাকাইয়া দেখি তখন সকলের চেয়ে স্পষ্ট করিয়া মনে পড়ে তখনকার বর্ষার দিনগুলি।' —'সেই বাল্যকালের বর্ষা এবং এই যৌবনকালের শরতের মধ্যে একটা প্রভেদ এই দেখিতেছি যে, সেই বর্ষার দিনে বাহিরের প্রকৃতিই অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সমস্ত দলবল সাজসজ্জা এবং বাজনা বাদ্য লইয়া মহাসমারোহে আমাকে সঙ্গদান করিয়াছে। আর এই শরৎকালের মধ্যে যে উৎসব, তাহা মানুষের।'

নিজের কবি-জীবনের ক্রমাভিব্যক্তির আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ এইভাবে তাঁর এই প্রিয় দুটি ঋতু-সৌন্দর্যের প্রতীক ব্যবহার করেছেন। তাঁর গানে তিনি একবার লিখেছেন—'মন মোর মেঘের সঙ্গী', আবার অন্যত্র লিখেছেন :

আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে
কী জানি পরাণ কী যে চায়!

শৈশবে 'জল পড়ে, পাতা নড়ে', এই শিশুপাঠ্য কথাগুলিই ছিলো আদি কবির প্রথম কবিতা! 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' ছড়াটির আবেদনে মুগ্ধ হন তিনি। আবার, 'কুমারসম্ভব'-এর মন্দাকিনীনির্ঝরশীকরের খণ্ড-চিত্রটুকুতেই

তিনি অভিভূত বোধ করেছেন! তাঁর প্রথম আত্মোপলব্ধির সঙ্গে মেঘ-জল-অন্ধকারের দৃশ্য খুবই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। 'ভানুসিংহের পদাবলী' যখন লেখা হয়, সেই সময়ের কথা-প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'তেই তিনি পুনরপি জানিয়ে গেছেন—'একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা-দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে'। লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম ·····।' ছেলেবেলারই– আরো আগেকার একটি স্মৃতিচিত্র এইসূত্রে মনে দেখা দেয়, তখন ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের এক ছাত্রের কাছে বাল্যশিক্ষা চলছিল; রবীন্দ্রনাথ তখন নর্মাল স্কুলের ছাত্র। সেই সময়ে একদিন—'সন্ধ্যা হইয়াছে; মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; রাস্তায় এক হাঁটু জল দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পুকুর ভর্তি হইয়া গিয়াছে; বাগানের বেলগাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলা জলের উপরে জাগিয়া আছে; বর্ষা-সন্ধ্যার পুলকে মনের ভিতরটা কদম্বফুলের মতো রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে।'

বর্ষাঋতুর এই রোমাঞ্চ লেগেছিল কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনে। তাঁর নানা রচনায় তাঁর সেই অনুভূতিই সঞ্চারিত হয়েছে। কখনো বলেছেন:

আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে
আসে বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে ··

কখনো বা আরো গভীর আরো নিবিড় আবেগে-উদ্দীপনায় ব্যাকুল হয়ে বলেছেন,—'নীল নব ঘন আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে'—

কিংবা—

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে ··!

এইসব ব্যাকুলতার মূল ভাবটি ধ্বনিত হয়েছে তাঁরই আর-একটি গানের মধ্যে:

পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে
পাগল আমার মন জেগে উঠে ··।

বর্ষাই রবীন্দ্রনাথের সর্বাধিক প্রিয় ঋতু। এবং তাঁর এই বর্ষা-প্রীতি তাঁর রোম্যান্টিক কবি-মনেরই পরিচায়ক। ১৩৪২ সালের পঁচিশে বৈশাখ তাঁর 'শেষ সপ্তক' বেরিয়েছিল। সেই কবিতা-সংগ্রহের পঞ্চম রচনাটিতেও বর্ষা-ঋতুর সঙ্গে তাঁর অন্তরের আত্মীয়তার কথা আছে। বিদেশে গিয়ে বাংলার বর্ষা ঋতুর দেখা না-পেয়ে দুঃখিত হয়েছিলেন তিনি। বাংলার খোলা

মাঠে অনিমন্ত্রণে যে-বর্ষা এসে দেখা দেয়,—সার-বাঁধা তালের চূড়ায়, বাঁধের কালো জলে যার সঞ্চার ঘটে বছরে-বছরে, তারই কথা ভেবে—তাঁর সেই 'শেষ সপ্তক'-এ তিনি বলেছিলেন :

বনস্পতির অঙ্গের আয়তি
ঐ তো দেয় বাড়িয়ে
বছরে বছরে ;
তার কাষ্ঠফলকে চক্রচিহ্নে স্বাক্ষর যায় রেখে।

তিনি বলে গেছেন :

বর্ষা নামে হৃদয়ের দিগন্তে
যখন পারি তাকে আহ্বান করতে।
কিছুকাল ছিলেম বিদেশে।
সেখানকার শ্রাবণের ভাষা
আমার প্রাণের ভাষার সঙ্গে মেলেনি।
তার অভিষেক হল না
আমার অন্তরপ্রাঙ্গণে।

কারণ, বনস্পতির পিপাসা বা প্রতীক্ষা তো লঘু-বর্ষণে পরিতৃপ্ত হয় না! বনস্পতির উপমা দিয়েই তিনি বলেছিলেন :

তেমনি করে প্রতি বছরে বর্ষার আনন্দ
আমার মজ্জার মধ্যে রসসম্পদ
কিছু যোগ করে।

এবং 'বহু বিচিত্রের কারুকলায় চিত্রিত' তাঁর 'সমগ্র সত্তা'—'বছরে বছরে শিল্পকারের অঙ্গুরি-মুদ্রার গুপ্ত সংকেত' পেতে-পেতে,—পরিশেষে একদিন 'কোনো দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে পরিপূর্ণ অবারিত হবে',—এই ছিল তাঁর একান্ত মনোবাঞ্ছা! 'বর্ষা'র কথা থেকে 'বনস্পতি'-র প্রসঙ্গে,—এবং তা' থেকে ক্রমশঃ 'বধূ'-র উপমা খুঁজে নিয়ে,—তাঁর সেই দিব্য-গোচরতার সম্ভাবনাটি তিনি সেই কবিতায় এইভাবে প্রকাশ করে গেছেন :

বধূ যেমন সত্য করে জানে আপনাকে,
সত্য করে জানায়,
যখন প্রাণে জাগে তার প্রেম,
যখন দুঃখকে পারে সে গলার হার করতে,
যখন দৈন্যকে দেয় সে মহিমা,
যখন মৃত্যুতে ঘটে না তার সমাপ্তি।

তাঁর এক বয়সের কথা থেকে, এইভাবেই এক লহমায় অন্য বয়সের কথা উঠে পড়ে। কারণ, তাঁর সারা-জীবনের বিস্তারে শাশ্বত কয়েকটি মর্জিরই অভিব্যক্তি দেখা গেছে বারে বারে।

খ্রীষ্টাব্দের হিসেবে 'শেষ সপ্তক' বেরিয়েছিল ১৯৩৫-এ। তার প্রায় ন'বছর আগে, বাংলা ১৩৩২ সালের ভাদ্র মাসে 'বিচিত্রা'-গৃহে 'শেষ বর্ষণ' নামে এক গীতানুষ্ঠান হয়,—এবং সেই বছরেই, অল্পদিন পরে, জোড়াসাঁকোতে 'শেষ-বর্ষণ' গীতিনাট্য অভিনীত হয়। ১৩৩২-এর ভাদ্র মাসের সেই গীতোৎসবের গানগুলি 'শেষ বর্ষণ'-এর মধ্যে জায়গা পেয়েছিল। সেই বছরেই কার্তিকের 'সবুজ পত্রে' 'শেষ বর্ষণ' প্রথম ছাপা হয়। 'কবি'-কে সেখানে বলতে শোনা গিয়েছিল—'বর্ষাকে না জানলে শরৎকে চেনা যায় না। আগে আবরণ তারপরে আলো।' এবং সেই পূর্বস্বীকৃতির ভূমিকাটুকু শিরোধার্য করেই 'শেষ-বর্ষণ'-এর নটরাজ বর্ষাকে আহ্বান জানিয়েছিলেন এই ব'লে:

এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে
এসো করো স্নান নবধারা জলে ॥

সেই 'শ্যামল শোভন শ্রাবণ-ছায়া'-র পরের দৃশ্যটিও অনিবার্যভাবে তারই সঙ্গে সংবদ্ধ! যে পুব-হাওয়াতে হৃদয়-নদীর কূলে কূলে লহরী জেগে ওঠে, সেই একই হাওয়া আবার যথাসময়ে অন্য ঋতুর অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত হয়:

পুব হাওয়া কয়, 'কালোর এবার যাওয়াই ভালো,'
শরৎ বলে, 'মিলনে যুগল কাশের আলো ।'

রবীন্দ্রনাথের মনে বর্ষার আবেদন তাই একদিকে গ্রীষ্মের সঙ্গে জড়িত, অন্যদিকে শরতের সঙ্গে! তাঁর মনোধর্মে বিচিত্রের এই গভীর সমাবেশের কথা আবার মনে পড়ে।

: হিমালয়—সুদূরের পিপাসা, সত্যের সন্ধান :

দেবেন্দ্রনাথ সেবার 'লেনু' নামে এক পাঞ্জাবী বালককে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। সেই বিদেশী পরিচারককে কাছে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ খুবই খুশি হন। তখন তাঁর 'মনে খুব একটা স্ফীতি' দেখা দিয়েছিল। সে-সময়ে গাব্রিয়েল নামে একটি ইহুদিকেও তাঁর খুবই ভালো লাগে। সে তার ঘুন্টি-দেওয়া ইহুদি পোষাক পরে ঠাকুরবাড়িতে আতর

বেচ্‌তে আসতো। আর, ভালো লাগ্‌তো কাবুলিওয়ালাদের। তিনি নিজেই বলে গেছেন—'ঝোলাঝুলিওয়ালা ঢিলাঢালা ময়লা পায়জামা পরা বিপুলকায় কাবুলিওয়ালাও আমার পক্ষে ভীতিমিশ্রিত রহস্যের সামগ্রী ছিল।'

তাঁর সেই বাল্যপর্বে যাঁরা তাঁর খুবই কাছের স্বজন ছিলেন, তাঁদের সংখ্যা তবু যেন খুবই কম বলে মনে হয়। দেবেন্দ্রনাথ তখন হিমালয়বাসী। ঠাকুরবাড়ির দফ্‌তরখানায় মহানন্দ মুনশির শরণার্থী হয়ে,—জননীর আদেশে, পিতার উদ্দেশে বালক রবীন্দ্রনাথের চিঠি লেখার প্রয়াস শুরু হয়েছে তখন। দেবেন্দ্রনাথ যখন বিদেশ থেকে ফিরতেন, বাড়িতে ছোটো ছেলেমেয়েদের সাবধান করে দেওয়া হোতো—'চুপ্‌, চুপ্‌, আস্তে হাঁটো!' কিনু হরকরা বুড়ো মানুষ। সে তার তকমাওয়ালা পাগড়ি আর সাদা চাপকান পরে দরজায় হাজির থাকে তখন।

উপনয়নের পরে গায়ত্রী-মন্ত্র জপ করবার দিকে খুবই ঝোঁক হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। আরো যখন কম বয়স, সেই সময়ে পেনেটিতে গঙ্গার ধারের বাগানে,—তাঁদের বাড়ির ছাদে—বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথকে তিনি একবার মেঘদূত আবৃত্তি করতে শুনেছিলেন। পিতার সঙ্গে গঙ্গায় বোটে বেড়াতে-বেড়াতে বাংলা হরপে ছাপা একখানি গীতগোবিন্দ পেয়েও ভারি খুশি হয়েছিলেন একবার। তারপর, আরো-বড়ো-রকমের খুশি হবার সুযোগ এসেছিল জীবনে। জোড়াসাঁকোর বাড়ির তেতলার ঘরে দেবেন্দ্রনাথ সেবার তাঁকে নিজেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন :

> 'পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন আমি তাঁহার সঙ্গে হিমালয় যাইতে চাই কিনা। 'চাই' এই কথাটা যদি চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়া বলিতে পারিতাম তবে মনের ভাবের উপযুক্ত উত্তর হইত। কোথায় বেঙ্গল একাডেমি আর কোথায় হিমালয়।'

ছেলেবেলায় এই হিমালয় দর্শন তাঁর জীবনের খুবই বড়ো একটি অভিজ্ঞতা। হিমালয়ের পথে,—পিতা-পুত্র সেবার বোলপুরে পৌঁছেছিলেন ১২৭৯ সালের ফাল্গুন মাসে। ১৮৭৫-এ 'হিন্দু-মেলা'র প্রথম কবিতা-পাঠ,—এবং দ্বিভাষিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় তাঁর কবিতা-প্রকাশ ['হিন্দু মেলার উপহার' ১৪ই ফাল্গুন ১২৮১—২৫এ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫ তারিখে প্রকাশিত হয়], —সেই বছরেই তাঁর মাতৃবিয়োগ,—১৮৭৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর প্রথম

সমুদ্রযাত্রা,—এইসব স্মরণীয় ঘটনার সঙ্গেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সেই হিমালয়-ভ্রমণের অভিজ্ঞতাটি গ্রথিত রাখা যেতে পারে। 'হিন্দু-মেলার-উপহার'-এর আগেই এগারো-বছর সাত মাস বয়সে 'অভিলাষ' নামে তিনি একটি কবিতা লেখেন। ১২৮১ সালের অগ্রহায়ণের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় সেটি ছাপা হয়। তারই কাছাকাছি সময়ে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র—গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে কালিদাসের কুমারসম্ভব আর শেক্স্পীয়রের ম্যাকবেথ পড়েছেন তিনি। শুধু পড়া নয়, এই দু'কাব্যের অনুবাদও করেছিলেন তিনি। আর, মেট্রোপলিটান ইনস্টিট্যুশানের হেড্-পণ্ডিত রামসর্বস্ব তাঁকে ম্যাক্বেথের অনুবাদ সমেত বিদ্যাসাগরের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর [১৮২০-৯১] এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় [১৮৪৬-৮৬] দু'জনেই উপস্থিত ছিলেন।

রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির উৎসাহে হিন্দু-মেলা স্থাপিত হয় ১২৭৩ সালের চৈত্র-সংক্রান্তিতে [১২ই এপ্রিল, ১৮৬৭]। হেম বাঁড়ুজ্যের 'ভারতসংগীত' কবিতার অনুকরণে লেখা রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটি পড়া হয় এই মেলার নবম অধিবেশনে। আর, প্রভাতকুমার জানিয়েছেন -'তেরো বৎসর বয়সের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ছাপার অক্ষরে নিজনামে কোনো রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া এখন পর্যন্ত জানা যায় নাই।'

১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে 'জ্ঞানাঙ্কুর' এবং 'প্রতিবিম্ব'—এই দুখানি পত্রিকা মিলে 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব'—নামে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। হিমালয় থেকে ফিরে এসে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বনফুল' কাব্যোপন্যাস লিখেছিলেন। সে-লেখা এই 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকাতেই ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। সে-পত্রিকার লেখকদের মধ্যে ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, রজনীকান্ত গুপ্ত, কালীবর বেদান্তবাগীশ, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় বালক-রবীন্দ্রনাথের 'প্রলাপ' কবিতাগুচ্ছও ছাপা হয়। 'ভুবন-মোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী' নামে তাঁর প্রথম মুদ্রিত গদ্য-রচনাও ১২৮৩ সালের কার্তিক সংখ্যার 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকাতেই ছাপা হয়। এই তিনখানিই কবিতার বই—যথাক্রমে, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,

রাজকৃষ্ণ রায় এবং হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, নামে তিনজন কবির লেখা। রবীন্দ্রনাথ এই তিন কবির তিনখানি বইয়ের সমালোচনা লিখেছিলেন তাঁর সেই প্রবন্ধে।

সেই বছরেই—১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে হিন্দু-কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয়েছিল মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'মরকতকুঞ্জে'। রাজনারায়ণ বসু ছিলেন সেই সভার প্রধানদের অন্যতম। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রও ছিলেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু [১২৫১-১৩১৭] তখনকার নবীন সাহিত্যিকদের অগ্রণী। তিনিই বালক-রবীন্দ্রনাথকে সে-সভায় নিয়ে যান। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখলেন! বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর আগেই তাঁর দেখা হয়ে গেছে।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে হিমালয়-দর্শন,—বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শন-লাভ—আর, তাঁর মাতৃবিয়োগ [সারদা দেবীর আয়ুষ্কাল ১৮২৬ ?-১৮৭৫]—এই তিনটি ঘটনাই বোধ হয় এই পর্বের সর্বাধিক স্মরণীয় ঘটনা। অন্তরতম এই সব অভিজ্ঞতারই সন্নিহিত মণ্ডলে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের আর তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদা-নন্দিনীর ['মেজবৌঠান'] প্রভাব শুরু হয়েছে তখন,—'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এবং তাঁর স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর [রবীন্দ্রনাথের 'নতুন দা' আর 'বৌঠানের'] প্রভাবও গভীর অনুভূতির বিষয় হয়ে উঠেছে। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী এবং অক্ষয় চৌধুরীও তখন বালক-রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে প্রবেশ করেছেন। আর, হিন্দুমেলার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লববাদী মাৎসিনির ভক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সঞ্জীবনী সভা'ও হয়তো তাঁর মনে দাগ রেখে গেছে সে-সময়ে! সেই গুপ্ত সভা 'হাঞ্চু-পামু-হাফের' কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে বলে গেছেন,—রবীন্দ্রনাথও বলে গেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের, আর, তাঁর স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর গভীর লালনের কাহিনী অল্প কথায় শেষ হবার নয়। সে-প্রসঙ্গ স্মরণ করবার আগে, হিমালয়ের কথাই পুনরায় স্মরণীয়। একদিকে এই হিমালয় দর্শন,—অন্যদিকে যৌবনে পদ্মার চরে বিচরণ—এই দর্শন-ভ্রমণের সঙ্গে তাঁর সহানুভূতি,—তাঁর সুদূরের পিপাসা,—'কর্মসংসার' আর 'বিশ্বজগৎ' সম্বন্ধে তাঁর নানা তুলনার ইতিহাস জড়িত! এই পর্বের 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'শৈশবসংগীত'-এর কয়েকটি লেখা,—তাঁর 'ভগ্নহৃদয়' ইত্যাদির আলোচনায় এগিয়ে যাবার আগে তাঁর 'সত্য-বোধের' দিকটা এই সূত্রেই দেখে নেওয়া যেতে পারে।

শেষ বয়সে 'পরিশেষ'-এর 'আছি' কবিতায় তিনি লিখেছিলেন :

'না থাক্ খ্যাতি, না থাক্ কীর্তিভার,
পুঞ্জীভূত অনেক বোঝা অনেক দুরাশার—
আজ আমি যে বেঁচেছিলেম সবার মাঝে মিলে সবার প্রাণে
সেই বারতা রইল আমার গানে।'

কিন্তু এ ধরণী অন্যমনা। কাছের জগতের দুঃখদ্বন্দ্ব, অপূর্ণতা ইত্যাদিই আমাদের দৃষ্টির বাধা। যথার্থ শান্ত মনই সত্যের যথার্থ ধারণা পেতে পারে। সানাইয়ের সারঙের তানে সেই সত্য সেই ঐক্যেরই সংকেত অনুভব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

: 'সত্যবোধ,' 'সত্যকে দেখা,' 'সত্য হওয়া' :

১৩১৯ সালের ভাদ্রমাসে 'সত্যবোধ' নামে তাঁর একটি আলোচনা দেখা দেয়। সেই পৌষমাসেই সত্য হওয়া' নামে তাঁর আর-একটি আলোচনা বেরিয়েছিল ; মাঘ মাসে, তৃতীয় এক আলোচনায় 'সত্য' সম্বন্ধে তিনি পুনরায় তাঁর আরো কিছু মন্তব্য প্রকাশ করেন। সেই তৃতীয় প্রবন্ধটির নাম 'সত্যকে দেখা'। 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধ-সংগ্রহে এই তিনটি লেখাই ছাপা হয় এবং রচনাবলীর ষোড়শ খণ্ডে 'শান্তিনিকেতনে'র অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে এই লেখাগুলি পুনর্বার প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁর 'ছিন্নপত্রে' যেমন,—এই সব লেখা থেকেও তেমনি জানা যায় যে, তিনি যখন পদ্মা নদীতে বাস করতেন, সেই সময়ে অনেক নির্জন, আত্মীয়তার মুহূর্তে এই ইন্দ্রিয়-জগৎ, এই মর্ত্য-সংসার এবং পরিদৃশ্যমান এই বিচিত্র রূপলোক তাঁর কাছে পরম রমণীয় বলে মনে হোতো। এ-সবের অন্তর্নিহিত এবং এ-সবের অতিশায়ী অন্য এক জগতের কথা তাঁর মনে পড়তো। তাঁর নৌকা বাঁধা থাকতো পদ্মার চরে। শুক্লপক্ষে চন্দ্রালোকিত ধূ ধূ চরে তিনি একা একা ঘুরে বেড়াতেন। তখন তাঁর দুটি পা ছুঁয়ে থেকে তাঁরই সঙ্গে ঘুরে বেড়াতো তাঁর ছায়া!

সেই ছায়া ছাড়া আরো-এক সঙ্গী পেয়েছিলেন তিনি। সে-লোকটি ঠাকুরপরিবারেরই একজন কর্মচারী। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পদ্মার চরে বেড়াতে-বেড়াতে, চারদিকের বিশ্বপ্রকৃতির আবেদন উপেক্ষা ক'রে, প্রতিদিনের নিকট-

সংসারের নানাবিধ প্রয়োজনের কথা বলে যাওয়াই তাঁর অভ্যাস ছিল। সেই জ্যোৎস্নালোকিত, জনশূন্য চরে কবির পাশে পাশে হাঁটতে-হাঁটতে তাঁর সেই প্রাত্যহিক ভ্রমণ সমাধা করতেন তিনি,—এবং ভ্রমণ শেষ হলেই চলে যেতেন। আর, তিনি চলে যাবার পরেই রবীন্দ্রনাথের হঠাৎ মনে হোতো যে, কাজের কথার বাড়াবাড়িতে,—প্রয়োজনের প্রসঙ্গের অতিরিক্ত উৎপাতে তিনি যেন খুবই ছোটো হয়ে গেছেন!

নিজের জীবনের অতীত পর্বের সেই সব কথার খেই ধরেই উত্তরকালে তিনি লিখেছিলেন—'তিনি চলে গেলে হঠাৎ দেখতে পেতুম আমি এতক্ষণ অত্যন্ত ছোটো হয়ে গিয়েছিলুম, সেইজন্য চারদিকের বড়োকে আমি আর সত্য বলে জানতে পারছিলুম না।'

'সত্যবোধ' প্রবন্ধে বলা হয়েছে—'সত্যকে আমরা সম্পূর্ণরূপে বোধ করতে চাই।' আবার 'সত্য হওয়া' লেখাটিতে তিনি বলেছেন—'ব্রহ্মকে সহজ করে জানবার শক্তিই আমাদের সত্যকার শক্তি, সেই শক্তি আমাদের আছে, জানতে পারছিনে বলে সে শক্তিকে কখনোই অস্বীকার করব না।' আর 'সত্যকে দেখা' নামে তৃতীয় লেখাটিতে তিনি বলেছিলেন—'জগতে কেবল আমরা বস্তুকে দেখবো না, সত্যকে দেখবো, এই একটি নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মানুষের অন্তরের মধ্যে গভীর করে জাগছে।'

তাঁর 'সত্যবোধ' প্রবন্ধে পদ্মার চরে, সেই সুদূরকালের জ্যোৎস্নালোকে তাঁর নিত্য ভ্রমণের যে-সঙ্গীটির কথা তিনি বলে গেছেন, তাঁদের সেই কর্মচারীটির কথা একদিকে,—অন্যদিকে প্রকৃতির শুভ্র বিস্তার,—এ-দুয়ের অন্তর্বর্তী অসামঞ্জস্য সে-সময়ে তাঁকে খুবই চিন্তিত করেছিল। এ-বিষয়ে তাঁর নিজের কথা :

> 'শুধু তাই নয়, তখন আমার মনের মধ্যে যে ভাব, যে ভাবনা,—চারিদিকের বিশ্বজগতের সঙ্গে তার যেন কোন সত্য যোগ নেই। নিখিলের মাঝখানে তাকে ধরে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় সে একটা অদ্ভুত মিথ্যা। জমিজমা হিসাব-কিতাব মামলা-মকদ্দমা এ সমস্ত শূন্যগর্ভ বুদ্‌বুদ্ বিশ্বসাগরের মধ্যে কোনো চিহ্নমাত্র না রেখে মুহূর্তে মুহূর্তে কত শতসহস্র বিদীর্ণ হয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।
>
> 'তা হোক, তবু সমুদ্রের মধ্যে বুদ্‌বুদেরও স্থান আছে। সমুদ্রের সমস্ত

সত্যটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে ওই বুদ্‌বুদ্‌দেরও যেটুকু সত্য সেটুকুকে একেবারে অস্বীকার করবার দরকারই হয় না। কিন্তু, আমরা যখন এই বুদ্‌বুদের মধ্যে বেষ্টিত হয়ে সমুদ্রের দিকে আমাদের দৃষ্টি একেবারে হারাই তখনই আমাদের বিপদ ঘটে।'

• বৃহত্তের পরিব্যাপ্তি :

আমরা আমাদের সকল দিকে পরিব্যাপ্ত এক বৃহত্তের মধ্যেই যে বিদ্যমান, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নানা রচনায় নানা ভাবে সে সত্য আস্বাদন করেছেন, এবং তা তাঁর পাঠকদের মনেও তিনি সঞ্চার করতে চেয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন, 'ছোটোর পক্ষে বড়োর একটি গভীরতম অন্তরতম দরকার আছে। সে একদিকে অত্যন্ত ছোটো হয়েও আর এক দিকে অত্যন্ত বড়োকে এক মুহূর্তের জন্যেও হারায় নি এই সত্যের মধ্যেই সে বেঁচে আছে।' এই সূত্রে আবার গায়ত্রী-মন্ত্রের কথা স্মরণ করেছেন তিনি। 'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ'—এই মন্ত্রের মধ্যেই,—আমাদের সংসার-ক্ষেত্রের অতি-সীমিত অবরোধের বাইরে, —মানব-জীবনের বিচিত্র সম্ভাবনার ইশারা নিহিত আছে। মানুষকে যখন আমরা তার খাওয়া-পরার একান্ত বাস্তব পরিসীমার মধ্যে আবদ্ধ করে দেখি, তখন মানুষের সত্য স্বরূপের পরিচয় থেকে আমরা বঞ্চিত হই। সে দেখা তাকে ছোটো করে দেখা। সে শুধু প্রয়োজনের ওজন। জগৎকে এই ভাবে ছোটো করে দেখলে জগৎও ছোটো হয়ে যায়, যিনি দেখেন—সেই দর্শক নিজেও ছোটো হয়ে যান। তাতে শক্তিও ছোটো হয়, প্রীতিও ছোটো হয়। রবীন্দ্রনাথকে তাই বলতে শোনা গেছে: 'জগতে যাঁরা মহাত্মা লোক তাঁরা মানুষকে মানুষ বলে দেখেছেন, নিজের সংস্কার বা নিজের প্রয়োজনের দ্বারা তাকে টুকরো করে দেখেননি। এতে করে তাঁদের নিজেদের মনুষ্যত্বের মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। মানুষকে তাঁরা দেখেছেন বলেই নিজেকে তাঁরা মানুষের জন্যে দান করতে পেরেছেন।'

রবীন্দ্রনাথ যে প্রধানতঃ কবি ছিলেন, সে-পরিচয় তাঁর এই সব গুরুচিন্তাময় গম্ভীর প্রবন্ধেও অব্যক্ত থাকেনি। যোগ্য উপমা ব্যবহার করে অনুরাগী পাঠক-মনে তিনি সর্বত্রই তাঁর নিজের অনুভূতির রসটুকু সঞ্চার করে গেছেন।

আত্ম-পরের ভেদ সম্বন্ধে কথা-সূত্রে তিনি তাঁর সেই 'সত্যবোধ' প্রবন্ধেই বলে গেছেন :

'নিজের দিক থেকেই যখন আমরা অন্যকে দেখি তখন আমরা অতি অনায়াসেই অন্যকে নষ্ট করতে পারি। এমন গল্প শোনা গেছে, ডাকাত মানুষকে খুন করে ফেলে শেষকালে তার চাদরের গ্রন্থি থেকে এক পয়সা মাত্র পেয়েছে। নিজের প্রয়োজনের দিক থেকে দেখে মানুষের প্রাণকে সে এক পয়সার চেয়েও ছোটো করে ফেলেছে। নিজের ভোগপ্রবৃত্তি যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন মানুষকে আমরা ভোগের উপায় বলে দেখি, তাকে আমরা মানুষ বলে সম্মান করিনে—আমরা লুব্ধ বাসনা দ্বারা অনায়াসেই মানুষকে খর্ব করতে পারি। বস্তুত মানুষের প্রতি অত্যাচার অবিচার ঈর্ষা ক্রোধ বিদ্বেষ এ-সমস্তেরই মূল কারণ হচ্ছে মানুষকে আমরা আমার দিক থেকে দেখার দরুন তার মূল্য কমিয়ে দিই এবং তার প্রতি ক্ষুদ্র ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।'

যথার্থ শাস্ত্র বিবেচনার বলেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, 'মানুষের যথার্থ আশ্রয় মানুষ—এবং 'আমরা বড়ো হয়ে পরস্পরকে বড়ো করি।' এই সত্যবোধের মধ্য দিয়েই মনুষ্যত্বের সম্মান সার্থক হতে পারে। কিন্তু যেখানে আমরা নিজেদের বড়ো এবং অন্যকে ছোটো বলে মনে করি, সেখানে আমরা তামসিকতাগ্রস্ত। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন-আশ্রমে মানুষের এই সংকীর্ণতা থেকে মানুষকে মুক্ত করবার সাধনা শুরু হয়েছিল।

সংসারে নানা স্বার্থের সংঘাতে,—শ্রমে,—যন্ত্রণায়,—ক্লান্তিতে—আমাদের বিচিত্র কর্ম থেকে, নিজেদের অগোচরেই কী-ভাবে যে আমরা কেবলই সংকীর্ণতায় গিয়ে পৌঁছোই! এই অবস্থা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হলে কী যে উপায় অবলম্বন করা যায়, ঐ 'সত্যবোধ' প্রবন্ধেই তিনি তারো উল্লেখ করে গেছেন :

'কর্ম করতে করতে কর্মের সংকীর্ণতা আমাদের ঘিরে ফেলে; কিন্তু দিনের মধ্যে অন্তত একবার মনকে তার বাইরে নিয়ে গিয়ে সত্যকে আমাদের প্রাত্যহিক কর্মপ্রয়োজনের অতীত ক্ষেত্রে দেখে নিতে হবে। সপ্তাহের মধ্যে অন্তত একদিন এমনভাবে যাপন করতে হবে যাতে

বোঝা যায় যে আমরা সত্যকে মানি। আমাদের সত্য করে বাঁচতে হবে ; সমস্ত মিথ্যার জাল, সমস্ত কৃত্রিমতার জঞ্জাল সরিয়ে ফেলতেই হবে—জগতে যিনি সকলের বড়ো তিনিই আমার জীবনের ঈশ্বর একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। আমরা যে তাঁর মধ্যে বেঁচে আছি এ কথা কি জীবনে একদিনও অনুভব করে যেতে পারব না ? এই নানা সংস্কারে ঢাকা, নানা প্রয়োজনে আঁটা, আমির পর্দাটাকে মাঝে মাঝে সরিয়ে ফেলতে পারলেই তখনই চারিদিকে দেখতে পাব জগৎ কী আশ্চর্য অপরূপ। মানুষ কী বিপুল রহস্যময়! তখন মনে হবে এই সমস্ত পশুপক্ষী গাছপালাকে এই যেন আমি প্রথম সমস্ত মন দিয়ে দেখতে পাচ্ছি ; আগে এরা আমার কাছে দেখা দেয় নি !'

এসব কথা তাঁর বাল্যকালের কথা নয়। এখানে এসব কথার বিস্তার কতকটা আকস্মিক অথবা অবান্তর বলে মনে হতে পারে। কিন্তু, সত্যিই তা নয়। ছেলেবেলায় হিমালয়-দর্শনে তাঁর জীবনে বৃহত্তের যে স্বীকৃতি অনিবার্য ছিল,—সেই ধারণা অনুসরণ করেই এখানে রাষ্ট্র সমাজ-ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমাবোধের প্রসঙ্গ স্মরণ করা গেল—এবং তাঁর হিমালয়-দর্শনের সঙ্গেই এ-আলোচনায় সে-প্রসঙ্গ জড়িত রইলো।

আরো একটি কথা—'কালান্তর' প্রবন্ধমালায় 'কর্ম' এবং 'সাধনা',—'ছোটো' আর 'বড়ো'—'কর্মসংসার' এবং 'বিশ্বজগৎ' ইত্যাদি কিছু কিছু বিপরীতার্থক শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। ১৩২৪ সালের প্রবন্ধ 'ছোটো ও বড়ো'তে তিনি ব্রিটিশ-শাসক-মহলের ছোটো ইংরেজ আর বড়ো ইংরেজ,—এই দুই শাখার কথা বলেছিলেন। তারই মধ্যে আমাদের নিজেদের আভ্যন্তরিক ক্ষেত্রে, নিজের রাজনীতি-চিন্তা সম্বন্ধেও অনুধাবনীয় এই সূত্রটি তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে,—অধর্মের দ্বারা মানুষ বেড়ে ওঠে, অধর্ম থেকেই সে আপন কল্যাণ দেখে, অধর্মের দ্বারা সে শত্রুকেও জয় করে, কিন্তু একেবারে মূল থেকে বিনাশ পায়।

'কালান্তরের' ঐ প্রবন্ধেরই শেষ দিকে কীপলিঙের প্রচারিত প্রাচ্য-প্রতীচ্যের চিরবিরোধ-তত্ত্বের প্রতিবাদ করে তিনি পূর্ব-পশ্চিমের মিলনের কথা খুবই জোরের সঙ্গে ব্যক্ত করেছিলেন। রাজনীতি-চিন্তার ক্ষেত্রে সর্বত্রই তিনি

মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। দেশের শাসন-প্রণালীতে এই কারণেই তিনি স্বাভাবিকতার প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন। পরাধীন দেশের আমলাতন্ত্রে মানুষের মনুষ্যত্ব ব্যাহত হয়। কাজে-কাজেই সে-অবস্থায় দেশের লোকের মনঃস্বত্বের সঙ্গে দেশের শাসনতন্ত্রের যোগ থাকে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সত্যবোধের পথ ধরেই সংকীর্ণ দেশ-পরিসীমা উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্বমানবের অধিষ্ঠান-ভূমির স্বপ্ন দেখেছেন,—রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রেও ভয়দ্বেষবিবর্জিত আধ্যাত্মিক মুক্তি-সাধনের আদর্শ তাই তাঁর কাছে অবাস্তব মনে হয়নি। লাঠিয়ালের লাঠি এবং শাসনকর্তার ন্যায়দণ্ড,—এই দুইয়ের মধ্যে হৃদয়বোধের যে পার্থক্য সুস্পষ্ট, সেই প্রভেদের কথাই তিনি বিশেষভাবে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। সে পর্বে এদেশে ইংরেজ-শাসকের হাতে দেশের যুবশক্তি যে-ভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে সেই সুদূর ১৩২৪ সালেই তিনি লিখেছিলেন :

> 'দেশের সমস্ত বালক ও যুবককে আজ পুলিসের গুপ্তদলনের হাতে নির্বিচারে ছাড়িয়া দেওয়া—এ কেমনতরো রাষ্ট্রনীতি। এ-যে পাপকে হীনতাকে রাজপেয়াদার তকমা পরাইয়া দেওয়া। এ যেন রাতদুপুরে কাঁচা ফসলের খেতে মহিষের পাল ছাড়িয়া দেওয়া। যার ক্ষেত সে কপাল চাপড়াইয়া হায় হায় করিয়া মরে, আর যার মহিষ সে বুক ফুলাইয়া বলে—বেশ হইয়াছে, একটা আগাছাও আর বাকি নাই।'

আমাদের চিত্তবৃত্তির সর্বপ্রকার সংকোচের বিরুদ্ধে আত্মার অক্লান্ত অভিযানের কথাই তিনি বলে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের সত্যবোধের মূল কথা সেখানেই। ধর্ম তাঁর কাছে ভারতের চিরকালের ব্যাপ্তিবোধেরই স্মারক, সংকেত এবং উপায়! তবু, সাধারণ মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতার জগৎকেও তিনি উপেক্ষা করেন নি। সেখানকার সম্ভাবনার কথা মনে রেখে, তিনি একথাও বলেছিলেন যে, এক-এক সময়ে মানুষের কাছে উচ্চতম সত্যের কথা অবজ্ঞাভাজন হয়ে ওঠে। কারণ,—'রিপুর সংঘাতে রিপু জাগে'। কিন্তু মানুষকে এতৎসত্ত্বেও প্রমত্ততা ত্যাগ করে কল্যাণের পথই বেছে নিতে হয়!

: কর্মসংসার ও বিশ্বজগৎ :

রবীন্দ্রনাথের কথায়—মানুষের 'কর্ম সংসারে' তাই বারে বারে 'বিশ্বজগৎ' এসে প্রবেশ করে! শান্তিনিকেতন-প্রবন্ধমালার 'সত্য হওয়া', 'সত্যকে দেখা', 'বিশেষত্ব ও বিশ্ব' এবং আরো নানা রচনার সঙ্গে কালান্তরের 'বাতায়নিকের

পত্র' এই দিক থেকে মিলিয়ে দেখা দরকার। 'বাতায়নিকের পত্রে'র প্রথম অনুচ্ছেদেই তিনি লিখেছিলেন :

'একদিকে আমাদের বিশ্বজগৎ, আরেক দিকে আমাদের কর্মসংসার। সংসারটাকে নিয়ে আমাদের যত ভাবনা, জগৎটাকে নিয়ে আমাদের কোনো দায় নেই। এইজন্যে জগতের সঙ্গে আমাদের অহেতুক আত্মীয়তার সম্বন্ধটাকে যতটা পারি আড়াল করে রাখতে হয়, নইলে সংসারের ভাগে মনোযোগের কমতি পড়ে কাজের ক্ষতি হয়। তাই আমাদের আপিস থেকে বিশ্বকে বারোমাস ঠেকিয়ে রাখতে রাখতে এমনি হয় যে দরকার পড়লেও আর তার উদ্দেশ পাওয়া যায় না।'

তিনি বলেছেন যে, সত্যের সঙ্গে কাজের সম্বন্ধ নাও যদি থাকে, তবুও অন্য সম্বন্ধ অস্বীকার করা চলে না। বিশ্বকে তিনি অনিবার্যভাবে 'সত্য' বলে স্বীকার করেছেন তাঁর ঐ 'বাতায়নিকের পত্র' লেখাটিতেই। প্রকৃতি যে নানা উপায়ে বিনা মাইনেয় মানুষকে খাটিয়ে নিচ্ছে এবং তার এই অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে মানব-চিত্তের অহংকারই যে সকলের সেরা অস্ত্র উপায়, সেকথাও তিনি বলেছেন। এই সূত্রে অহংকার সম্বন্ধে তাঁর নানা সুভাষিতাবলীর একটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন টাকা নিয়ে যারা কাজ করে তারা সেই টাকার পরিমাণেই কাজ করে, সেটা একটা বাঁধা পরিমাণ; কাজেই তাদের ছুটি মেলে—বরাদ্দ ছুটির বেশি কাজ করাকে তারা লোকসান বলে গণ্য করে। কিন্তু অহংকারের তাগিদে যারা কাজ করে তাদের আর ছুটি নেই ; লোকসানকেও তারা লোকসান জ্ঞান করে না।

: অহংকার ও মুক্তি :

সংসারে মানুষ যখন অহংকারে প্রমত্ত হয়ে প্রকৃতির সেবা করে থাকে, তখন সে তো প্রকৃতিরই দাসত্ব। হঠাৎ যখন সেই মনোভাব থেকে মুক্তি এসে দেখা দেয়, তখন সে যেন 'আমি-নইলে-চলে-না'র দেশ থেকে 'আমি-নইলে-চলে'র দেশে ধাঁ করে এসে পড়ে! তখন মনে পড়ে, বৌদ্ধেরা বলে গেছেন —এই 'অহংকারটাকে বিসর্জন করলেই টিকে থাকার মূল মেরে দেওয়া হয়, কেননা তখন আর টিকে থাকার মজুরী পোষায় না।' কিন্তু এইটুকু বলে নিয়েই রবীন্দ্রনাথ অহং-এর অহংকারের সার্থকতা যেন আর-এক দৃককোণ থেকে দেখেছেন। 'আমি'-কে রাখা এবং না-রাখা,—এই দুকাজেই তাঁর

কৃতিত্ব সুস্পষ্ট। পাশা-পাশি দুটি অনুচ্ছেদে তিনি একবার 'অহং'-কে বর্জনীয় বলেছেন, পর-মুহূর্তেই আবার অহংবোধের অন্য দিকটাও দেখিয়েছেন। পরপর সেই দুটি অনুচ্ছেদ এখানে তুলে দেওয়া গেল :

> 'আমি যে আছি সেই থাকার মূল্যই হচ্ছে অহংকার। এই মূল্য যতক্ষণ নিজের মধ্যে পাচ্ছি ততক্ষণ নিজেকে টিকিয়ে রাখবার সমস্ত দায় সমস্ত দুঃখ অনবরত বহন করে চলেছি। সেইজন্য বৌদ্ধরা বলেছে, এই অহংকারটাকে বিসর্জন করলেই টিকে থাকার মূল মেরে দেওয়া হয়, কেননা তখন আর টিকে থাকার মজুরি পোষায় না।'
>
> 'যাই হোক এই মূল্য তো কোনো-একটা ভাণ্ডার থেকে জোগানো হয়েছে। অর্থাৎ আমি থাকি এরই গরজ কোনো-এক জায়গায় আছে; সেই গরজ অনুসারেই আমাকে মূল্য দেওয়া হয়েছে। আমি থাকি এই ইচ্ছার আনুচর্য সমস্ত বিশ্ব করছে, বিশ্বের সমস্ত অণুপরমাণু। সেই পরম-ইচ্ছার গৌরবই আমার অহংকারে বিকশিত। সেই ইচ্ছার গৌরবেই এই অতিক্ষুদ্র আমি বিশ্বের কিছুর চেয়েই পরিমাণ ও মূল্যে কম নই।'

: প্রতাপ ও প্রীতি :

এই মন্তব্যের পরেই তিনি প্রতাপ এবং প্রীতির কথায় এগিয়ে গেছেন। মানুষের অহংকারে পরম যে-ইচ্ছার গৌরব প্রতিফলিত, সেই ইচ্ছাকে মানুষ দু'ভাবে দেখেছে :

> 'আমার থাকাটা শক্তির প্রকাশ, না, প্রীতির প্রকাশ, এইটে যে-যেমন মনে করে সে সেইভাবে জীবনের লক্ষ্যকে স্থির করে। শক্তিতে আমাদের যে-মূল্য দেয় তার এক চেহারা, আর প্রীতিতে আমাদের যে-মূল্য দেয় তার চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। শক্তির জগতে আমার অহংকারের যে-দিকে গতি, প্রীতির জগতে আমার অহংকারের গতি ঠিক তার উল্টো দিকে।'

: সামঞ্জস্য ও আত্মবোধ :

শক্তি বা প্রতাপের বিরোধিতা এবং প্রীতির বন্দনা,—তাঁর নানা রচনায় এ-আদর্শের কথা বার বার উচ্চারিত হয়েছে। 'বাতায়নিকের পত্রে'ও তিনি সেই কথাই বলেছেন। শান্তিনিকেতন-প্রবন্ধমালার 'আত্মবোধ' নামে

একটি লেখাতে সত্য-সন্ধানী রবীন্দ্রনাথের প্রীতি-বন্দনার গভীর কথাটি বলা হয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন যে, প্রবৃত্তির তাপে ও বেগে আমাদের মন নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সে-অবস্থায় আমরা যথার্থভাবে কিছু পাইও না, দিইও না। নিজেকে সংহত সংযত করে বিশ্বের সঙ্গে নিজের গভীর এবং অনিবার্য অন্বয়ের উপলব্ধিই—তাঁর মতে, যথার্থ সত্যোপলব্ধি। 'আত্মবোধ' লেখাটিতে তিনি সেই কথাই বলেছেন :

'যখনই সমস্তকে সংহত সংযত করে এক করে আত্মাকে পাই, যখনই আমি সত্য যে কী তা জানি, তখনই আমার সমস্ত বিচ্ছিন্ন জানা একটি প্রজ্ঞায় ঘনীভূত হয়, সমস্ত বিচ্ছিন্ন বাসনা একটি প্রেমে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং জীবনের ছোটো বড়ো সমস্তই নিবিড় আনন্দে সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়। তখন আমার সকল চিন্তা ও সকল কর্মের মধ্যেই একটি আত্মানন্দের অবিচ্ছিন্ন যোগ থাকে। তখনই আমি আধ্যাত্মিক ধ্রুবলোকে আপনার সত্যপ্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করে সম্পূর্ণ নির্ভয় হই। তখন আমার সেই ভ্রম ঘুচে যায় যে আমি সংসারের অনিশ্চয়তার মধ্যে, মৃত্যুর আবর্তের মধ্যে ভ্রাম্যমান। তখন আত্মা অতি সহজেই জানে যে সে পরমাত্মার মধ্যে চিরসত্যে বিধৃত হয়ে আছে।

এই লেখাতেই তিনি জানিয়ে গেছেন যে, 'এই আমার সকলের চেয়ে সত্য আপনটিকে নিজের ইচ্ছার জোরে আমাকে পেতে হবে - অসংখ্যের ভিড় ঠেলে টানাটানি কাটিয়ে এই আমার অত্যন্ত সহজ সমগ্রতাকে সহজ করে নিতে হবে। আমার ভিতরকার এই অখণ্ড সামঞ্জস্যটি কেবল জগতের নিয়মের দ্বারা ঘটবে না, আমার ইচ্ছার দ্বারা ঘটে উঠবে।'

তাঁর সত্য-ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যের বোধ এইরকম অবিচ্ছেদ্য সূত্রে জড়িত। যা কোনোরকম কেন্দ্রে যুক্ত নয়, যা অস্থায়ী, চঞ্চল, বিচ্ছিন্ন এবং ছায়াবৎ, তাকে কখনোই 'সত্য' বলা যায় না। যখন আত্মাকে পাই, তখনই আমরা ধ্রুবকে পাই। আত্মার কেন্দ্রেই বিশ্বপরিধি সুসমঞ্জসভাবে ধরা আছে তাতেই সৌন্দর্য, তাতেই সৌষম্য। কিন্তু মানুষের সামঞ্জস্য যে প্রকৃতির সামঞ্জস্যের মতো সহজ নয়,— সমস্ত বিরুদ্ধতার চেতনা মেনে নিয়ে মানুষকে যে যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সামঞ্জস্যের সন্ধানে এগিয়ে যেতে হয়,—মানুষের সত্য-সাধনায় সেই বিশেষ প্রকৃতিও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। সেই জন্যে

সামঞ্জস্যের তত্ত্ব জানতে হলে মানুষকে তার স্বাভাবিক, সংশয়রহিত, বোধ-শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এই বোধশক্তি কী রকম,- তার উত্তরে উপনিষদ স্মরণ করে তিনি বলেছেন যে, সে অত্যন্ত সহজ দৃষ্টি,—সে একেবারেই যুক্তিতর্কের দৃষ্টি নয়। তাঁর নিজের কথায়—এ হচ্ছে 'দিবীব চক্ষুরাততং'! 'চক্ষু যেমন একেবারে সহজেই আকাশে বিস্তীর্ণ পদার্থকে দেখতে পায় এ সেই রকম দেখা! আমাদের চক্ষুর স্বভাবই হচ্ছে সে কোনো জিনিসকে ভেঙে ভেঙে দেখে না, একেবারে সমগ্র করে দেখে। সে স্পেকট্রস্কোপ যন্ত্র দিয়ে দেখার মতো করে দেখে না, সে আপনার মধ্যে সমস্তকে বেঁধে নিয়ে আপন করে দেখতে জানে।'

যাক্ এসব কথা। ছেলেবেলার সেই হিমালয়-ভ্রমণের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর সারা জীবনের সত্য-সন্ধানের কথা উঠে পড়েছিল। তাই এ বাক্-বিস্তার! এইবার তাঁর আদি-পর্বের হিমালয়-সংক্রান্ত রচনার দিকে চোখ ফেরানো যাক্।

কবিকাহিনী, বনফুল

১২৮৬ সালে [৯ই মার্চ, ১৮৮০] রবীন্দ্রনাথের পদ্যে লেখা উপন্যাস 'বনফুল' প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর প্রথম রচনা 'কবিকাহিনী' তার বছর দেড়েক আগে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হয়েছে। ১২৮২-৮৩ সালে 'বনফুল' প্রথম 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় ছাপা হয়। 'কবি-কাহিনী' তার পরের রচনা—১২৮৪ সালের 'ভারতী'তে ছাপা হয়। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষোল বছর। মাত্র চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সেই তাঁর সে-কাব্য লেখা হয়। এই দু'খানি বইয়ে সে-যুগের প্রবীণ কবিদের মধ্যে মধুসূদন দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রভৃতির প্রভাব লক্ষ্য করেছেন অনেকেই। অধ্যাপক সুকুমার সেন আরো মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, বাংলা সাহিত্যে প্রথম 'কাব্যোপন্যাস' বা 'গাথা-কাব্যের প্রবর্তন করেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। স্বর্ণকুমারী আর রবীন্দ্রনাথ তাঁরই অনুসরণ করে গেছেন।

অধ্যাপক সুকুমার সেন রবীন্দ্রনাথের বাল্য-রচনাবলীর কালানুক্রমিক তিনটি পর্ব কল্পনা করেছেন। ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৬-এর মধ্যে যে-সব লেখা, সেগুলিকে তিনি বলেছেন 'আদি-কৈশোরক' রচনা। ১৮৭৫ থেকে ৮১-র মধ্যে গেছে 'মধ্য-কৈশোরক' পর্ব ; এবং ১৮৮১ থেকে '৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 'অন্ত্যকৈশোরক' পর্ব। 'মধ্য-কৈশোরক' পর্বেই রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ তাঁর গাথা-কাব্যগুলি লিখেছিলেন।

অধ্যাপক সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' বইখানির দ্বিতীয় খণ্ডে 'বনফুল'এর আখ্যানসার ছাপা হয়েছে এবং সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় বলা হয়েছে : 'অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী [১৮৫০-৯৮] বাঙ্গালা সাহিত্যে রোমান্টিক আখ্যায়িকা-কাব্য ও গাথা-কবিতার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইহার অনেক-কাল পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র একটি গাথা-জাতীয় কবিতা লিখিয়াছিলেন, 'ললিতা' [১৮৫৬]। কিন্তু ইহার সহিত নব-প্রবর্তিত গাথা-কাব্যের সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। অক্ষয়চন্দ্রের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, নবীনচন্দ্র সেন ও ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আখ্যায়িকা-কাব্য ও গাথা-কবিতা রচনা

করিয়াছিলেন।'—এবং 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা 'বনফুল' প্রভৃতি কাব্যে বিহারীলালের প্রভাব পাই কচিৎ রচনারীতিতে, কিন্তু আখ্যানবস্তুর পরিকল্পনায় জাজ্বল্যমান দেখি অক্ষয়চন্দ্রের প্রভাব।'

'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু এই অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর কথাই উল্লেখ করে গেছেন। তিনি ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যে এম-এ। দেশী এবং বিদেশী সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ ছিল খুবই ব্যাপক। ১২৮১ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে' তাঁর 'উদাসিনী' কাব্যের প্রশংসা বেরিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল' যে-বছর প্রথম 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় ছাপা আরম্ভ হয়, অক্ষয়চন্দ্রের 'মাধব মালতী' রচনার কিছুটা সেই ১২৮২ সালেই সেই 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকাতে ছাপা হয়। 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' নামে 'ভারতী'তে প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্রের আর-একটি কবিতা 'ভারতসংগীত'-এর প্রথম সংস্করণে [১৮৮৩] একত্র ছাপা হয়।

: গাথা, কাব্যোপন্যাস :

গাথা-কবিতা কথাটি ইংরেজি Ballad-এর বঙ্গানুবাদ। অধ্যাপক গাম্মিয়ার [Prof. Gummere] তাঁর 'The Popular Ballad' বইখানিতে আদি-গাথাকবিতা বা প্রাচীন 'ব্যালাড'-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, গানের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক রীতিতে রচিত,—আখ্যানধর্মী,—এবং সম্ভবতঃ পুরাকালে সংঘনৃত্যের [Communual dance] সঙ্গে সম্পৃক্ত, লোক-মুখে প্রচারিত,—আর, সাহিত্য-প্রভাবহীন [free from literary influences] হওয়াই এই শ্রেণীর রচনার বিশেষত্ব। বাংলায় 'ময়মনসিংহ-গীতিকা' গার্হস্থ্য-গাথার নিদর্শন। য়ুরোপে রাজা-রাজড়ার কাহিনী নিয়ে বীর-গাথা লেখা হয়েছে। ডেনমার্কের গাথা-সাহিত্যে এই শাখার উদাহরণ আছে। রবিনহুডের কাহিনীতে দুঃসাহসের গাথা-কবিতার প্রেরণা ছিল। ইংরেজি সাহিত্যে Percy-র 'Reliques'-এর মধ্যে অষ্টাদশ শতকের গাথা-সংগ্রহের নমুনা পাওয়া যায়। সে-দেশে খ্রীষ্টাব্দের সতেরোর শতকে রাজনৈতিক-গাথার রেওয়াজ দেখা দিয়েছিল। রবার্ট বার্নসের 'Election Ballads'-এর দৃষ্টান্তে তারই পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। উনিশ শতকের শেষ

দিকে, ১৮৮২ থেকে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংরেজি এবং স্কটিশ লোকগাথার সংগ্রহ প্রকাশিত হয় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্রান্সিস জেম্‌স্ চাইল্ডের সম্পাদনায়। ঔপন্যাসিক ও কবি স্যর ওয়াল্টার স্কট নিজেও গাথা-সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিগোষ্ঠীর ওপর গাথা-কবিতার কিছু প্রভাব পড়েছিল। দুঃসাহসিকতার গল্পে যে বিশেষ আবেগের অভিব্যক্তি ঘটে থাকে, ডান্টে গ্যাব্রিয়েল রসেটি তাঁর 'The White Ship' কবিতায় সেই আবেগই কাজে লাগিয়েছিলেন। তারপর কিপ্‌লিংও গাথা চর্চা করে গেছেন। উনিশ শতকে,—বোধ হয়, ইংরেজি থেকেই বাংলাতে এই নব্য গাথারীতি দেখা দিয়েছিল। 'ময়মনসিংহ-গীতিকা'র ওপর আমাদের ব্যাপকতর মনোযোগ তার পরের ঘটনা।

: কবিকাহিনী, বনফুল .

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বনফুল'-এর আলোচনায় 'কাব্যোপন্যাস' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। 'বনফুল'-এর পরে লেখা এবং গ্রন্থাকারে আগে প্রকাশিত—তাঁর 'কবিকাহিনী'তেও কতকটা একই ধরনের গল্প বলা হয়েছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ নায়ক কবিজনোচিত অতৃপ্তি ভোগ করে, ধীরে ধীরে বালিকা নলিনীর প্রতি অনুরক্ত হন। কিন্তু অনুরাগ নয়,—কবির অন্তরে সেই অতৃপ্তিই প্রাধান্য পেয়েছে :

> মনের অন্তর-তলে, কি যে কি করিছে হু হু
> কি যেন আপন ধন নাইক সেখানে,...

তাই—

> একদিন বালিকারে কবি সে কহিল গিয়া
> নলিনি ! চলিনু আমি ভ্রমিতে পৃথিবী !

নলিনীর কাছে বিদায় নিয়ে, অতঃপর তাঁকে এগিয়ে যেতে হয়েছে কাশ্মীর, রুশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ-মহাদেশের সৌন্দর্য আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। দেশভ্রমণের পরে, কবি ফিরে এসে দেখেন যে, নলিনীর জীবনান্ত ঘটে গেছে ! আর, ব্যক্তিগত অনুরাগ তখনই বিশ্ববোধের অঙ্গীভূত হয়। সেই অবস্থায় :

> 'বাহিরের কত কি যে ভাঙিল চুরিল,
> বাহিরের কত কি যে হইল নূতন

কিন্তু ভিতরের দিকে চেয়ে দেখ দিখি,
আগেও আছিল যাহা এখনো তা আছে,
বোধ হয় চিরকাল থাকিবে তাহাই।'

কবির মনে তখন একটি প্রবল বিশ্বাসের অভ্যুদয় ঘটেছে :

'যা কিছু সুন্দর দেবি;
তোমার সুন্দর রাজ্যে হে প্রকৃতি দেবি,
তিল অমঙ্গল কভু পারে না ঘটিতে।'

অনন্তকালের প্রবাহে পৃথিবীর প্রেম চির-ভাস্বর হয়ে থাকবে,—তার মৃত্যু নেই, বিস্মৃতি নেই;—এই সত্যবোধই কিশোর-কবির জীবনাভিজ্ঞতা হয়ে দেখা দিয়েছে। 'বনফুল' কাব্যেও মৃত্যু-প্রসঙ্গ আছে। তবে, মৃত্যু সেখানে —আরো হিংস্র ভয়াল, অভিশপ্ত। প্রাচীন গাথা-সাহিত্যের সারল্য বজায় রেখে,—রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই কৈশোরক রচনাগুলিতে তাঁর কবিচৈতন্যের প্রধান এবং গভীর কয়েকটি কথা ব্যক্ত করে গেছেন। তাঁর পরিণততর কাব্য-কবিতায় তাঁর সেই মূল বিশ্বাসের পরিবর্তন হয়নি বটে—তবে, কাব্য-রূপের ঐশ্বর্য এবং বৈচিত্র্য দুই-ই বেড়েছে।

বাংলা সাহিত্যে, পদ্যের বাহনে স্কট প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য কবির প্রভাবের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে রবীন্দ্রনাথের এই কৈশোরক 'কাব্যোপন্যাস'-গুলির কথা মনে পড়া অনিবার্য। তাঁর 'কবিকাহিনী' মোট চারটি সর্গে সম্পূর্ণ। তৃতীয় সর্গে কিশোর কবিনায়ক তাঁর প্রণয়িনী নলিনীর মৃতদেহ সমাধিস্থ ক'রে, চতুর্থ সর্গে নিষ্ঠুর কালের উদ্দেশে এই খেদোক্তি প্রকাশ করেছিলেন :

হা নিষ্ঠুর কাল, তোর এ কিরূপ খেলা,
সত্যের মতন তুই গড়িলি প্রতিমা
স্বপ্নের মতন তাহা ফেলিলি ভাঙিয়া?

এবং প্রবল দুঃখবোধ সত্ত্বেও তিনি এই স্থির বিশ্বাসে এসে পৌঁছেছিলেন যে—

জগতের, প্রকৃতির ফুল্ল মুখ হেরি,
আপনার ক্ষুদ্র দুঃখ রহে কি গো আর?

মাত্র চারটি সর্গের মধ্যেই সেখানে কিশোর-কবির বয়োবৃদ্ধির কথাও আছে। তাঁর অভিজ্ঞতার বিস্তার না থাক্, গভীরতার ইশারা আছে। কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে রুশিয়া, আফ্রিকা ইত্যাদি দূর দেশে গিয়ে তিনি প্রকৃতির

রূপৈশ্বর্য দেখে এসেছেন। প্রিয়-বিয়োগের গভীর দুঃখে তাঁর মন আলোড়িত হয়েছে। এবং—

ক্রমে কবি যৌবনের ছাড়াইয়া সীমা
গম্ভীর বার্ধক্যে আসি হোলো উপনীত!

পরিণত জীবনাভিজ্ঞতার সৌন্দর্যে তাঁর মুখশ্রী তখন শান্তভাব ধারণ করেছে। তাঁর দৃষ্টিতে তখন সমগ্রতার আগ্রহ। হিমালয়ের দৃশ্যপট তখন তাঁর চোখের সামনে স্থির আলোকে উদ্ভাসিত। রাতের অন্ধকারে তিনি বলেছেন:

আমিও একাকী হেথা রয়েছি পড়িয়া,
আঁধার মহা-সমুদ্রে গিয়াছি মিশায়ে,
ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র নর আমি, শৈলরাজ।

পৃথিবীর মানব-সমাজে 'রক্তপাত, অত্যাচার, পাপ-কোলাহল' দেখে-শুনে, মানুষের অর্থহীন অহংকারে লজ্জিত হয়ে,—তাঁকে বল্‌তে হয়েছে:

ভাবিয়া দেখিলে মন উঠে গো শিহরি
ভ্রমান্ধ দাসের জাতি সমস্ত মানুষ।

আর হিমালয়ের উদ্দেশে তাঁর মনে এই প্রশ্ন জেগেছে:

তবে বল কবে গিরি, হবে সেই দিন
যে দিন স্বর্গই হবে পৃথ্বীর আদর্শ!
সে দিন আসিবে গিরি, এখনিই যেন
দূর ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে
যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানবহৃদয়

এই বিশ্বাস নিয়েই 'কবিকাহিনী'র বৃদ্ধ কবিনায়ক অবশেষে তাঁর ইহজীবনের পথ-পরিক্রমা শেষ করেছেন। প্রকৃতির শান্ত, নিয়মিত বিকাশ ও বিলুপ্তির শোভাযাত্রার ধারায় তাঁর স্মৃতি রইলো অটুট হয়ে।

'বনফুল' এর প্রথম সর্গে সেই হিমালয়ের দৃশ্যপটই পুনরায় দেখা দিয়েছে। হিমালয় সেখানে:

তুষারে আবরি শির, ছেলেখেলা পৃথিবীর
ভুরুক্ষেপে যেন সব করিছে লোকন
কত নদী, কত নদ, কত নির্ঝরিণী হ্রদ
পদতলে পড়ি তার করে আস্ফালন!

মানুষ বিস্ময়ে ভয়ে, দেখে রয় স্তব্ধ হয়ে
অবাক হইয়া যায় সীমাবদ্ধ মন।

রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সে 'রাশিয়ান কর্তৃক ভারত-আক্রমণের আশঙ্কা লোকের মুখে মুখে আলোচিত হবার কথা তিনি তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তেই বলে গেছেন। সেই জনমত আর জনশ্রুতির চাপেই—বোধ হয়,—'কবি-কাহিনী'র কবির দেশ-ভ্রমণের তালিকায় রুশিয়ার নাম একটু বিশেষ জায়গা পায়!

পরে, গায়ত্রীমন্ত্র জপ করবার দিকে রবীন্দ্রনাথের খুবই ঝোঁক পড়েছিল। সে-কথা আগেই বলা হয়েছে! মন্ত্রের সম্পূর্ণ অর্থ না বুঝলেও তিনি তখন সে-মন্ত্র সম্বন্ধে কেন যে আগ্রহ বোধ করতেন, সে-বিষয়ে 'জীবনস্মৃতি'তেই তিনি জানিয়ে গেছেন: 'আমার বেশ মনে আছে আমি 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই অংশকে অবলম্বন করে মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কি বুঝিতাম কি ভাবিতাম তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় জিনিস নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড় অঙ্গটা—বুঝাইয়া দেওয়া নহে,—মনের মধ্যে ঘা দেওয়া।' তাঁর মনে গায়ত্রী-মন্ত্র তখন সেই ঘা দিয়েছিল! তারই অনতিকাল পরে দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে হিমালয়-ভ্রমণে নিয়ে যান। পথে, বোলপুরে অল্পকালের সুখপ্রবাস-যাপন,—সেখানে বাগানের এক প্রান্তে একটি শিশু-নারকেল গাছের তলায় মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে তিনি কবিতা লিখতেন। সেইখানে বসেই তিনি 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' নামে এক বীররসাত্মক কাব্য লিখেছিলেন। তাঁর সুবিপুল পাঠকসমাজের হাতে পৌছোবার আগেই সে-কাব্য বিনাশ লাভ করেছে!

হিমালয়-অঞ্চলে পৌছোবার আগে বোলপুরের খোয়াই দেখে বালক-রবীন্দ্রনাথের কতকটা উপত্যকা-অধিত্যকার ধারণা হয়েছিল। তারপর তাঁরা সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর হয়ে অমৃতসরে পৌছেছিলেন। মাসখানেক অমৃতসরে কাটিয়ে, ডালহৌসি পাহাড়ে গিয়ে উঠেছিলেন তাঁরা। বক্রোটায় তখন বৈশাখ মাস, কিন্তু প্রবল শীত। সেখানকার বর্ণনা আছে 'জীবনস্মৃতি'তে। প্রকৃতির রহস্যময়, প্রাণময় স্তব্ধতা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন:

'আমাদের বাসার নিম্নবর্তী এক অধিত্যকায় বিস্তীর্ণ কেলুবন ছিল। সেই বনে আমি একলা আমার লৌহফলকবিশিষ্ট লাঠি লইয়া প্রায় বেড়াইতে যাইতাম। বনস্পতিগুলা প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো মস্ত মস্ত ছায়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের কত শত বৎসরের বিপুল প্রাণ! কিন্তু এই সেদিনকার অতি ক্ষুদ্র একটি মানুষের শিশু অসংকোচে তাহাদের গা ঘেঁষিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা একটি কথাও বলিতে পারে না। বনের ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র যেন তাহার একটা বিশেষ স্পর্শ পাইতাম।'

আবার—

'আমার শোবার ঘর ছিল একটা প্রান্তের ঘর। রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাচের জানালার ভিতর দিয়া নক্ষত্রালোকের অস্পষ্টতায় পর্বতচূড়ার পাণ্ডুরবর্ণ তুষারদীপ্তি দেখিতে পাইলাম।'

বাল্যকালে সেই অমৃতসরে অবস্থানের সময়েই 'প্রক্টরের লিখিত সরল পাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষ গ্রন্থ' থেকে গ্রহনক্ষত্র সম্বন্ধে পাঠ নিতে হয়েছিল তাঁকে। 'বনফুল', 'কবিকাহিনী' প্রভৃতি বাল্যরচনার নানা ক্ষেত্রে সেই বাল্যভ্রমণের এবং বাল্যশিক্ষার প্রসঙ্গ দেখা দিয়েছে। 'বনফুল'-এর প্রথম সর্গে হিমালয়ের স্তব্ধতার কোলে কমলার বৃদ্ধ পিতার মৃত্যুর দৃশ্যটি রবীন্দ্রনাথের সেই ডালহৌসি-ভ্রমণেরই স্মারক। দ্বিতীয় সর্গে, যখন অপরিচিত যুবক এসেছেন কমলাকে উদ্ধার করতে,—এবং কমলার পিতার মৃতদেহ 'হিমানিক্ষেত্রের মাঝে' প্রোথিত ক'রে সেই যুবক যখন বলেছেন :

'কিসের বিলম্ব আর? ত্যজিয়া কুটীরদ্বার
আইস আমার সাথে কাল বহে যায়!'

তখন—

'তটিনী-তরঙ্গকুল, ভিজায়ে গাছের মূল
ধীরে ধীরে বলে যেন 'যেও না! যেও না'—
বনদেবী নেত্র খুলি—পাতার আঙুল তুলি
যেন বলিছেন আহা—'যেও না!—যেও না!—'

তৃতীয় সর্গে বিজয়-কমলা, এবং নীরদ-নীরজা,—এই দুই দম্পতি-সমাবেশের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির স্তব্ধতা যেন দূরে সরে গেছে! সেখানে দৃশ্যপটও পৃথক্‌, চিত্তভাবও পৃথক্‌। সখী নীরজা জিগেস করেছেন—'আজো তুই বোন! ভুলিবি নে বল?' সুদূর হিমাচলবর্তী অরণ্যশোভার কথা স্মরণ ক'রে কমলা ব্যাকুল বোধ করেছেন। তাঁর মনে পড়েছে—স্নেহময় বৃদ্ধ পিতার স্মৃতি! এবং পরিশেষে গভীর দুঃখের সঙ্গে তাঁকে বলতে শোনা গেছে :

'হায় রে সে দিন ভুলাই ভালো।
সাধের স্বপন ভাঙ্গিয়া গেছে!
এখন মানুষে বেসেছি ভালো—
হৃদয় খুলিব মানুষ কাছে!'

'জীবনস্মৃতি'তে পিতা দেবেন্দ্রনাথের যে শান্ত সৌন্দর্যের কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলে গেছেন, 'বনফুল' কাব্যের এই কমলার পিতার সঙ্গে সে-ছবির সাদৃশ্য কল্পনা করা অসংগত নয়। দেবেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে পুত্র রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'যেমন করিয়া তিনি পাহাড়ে পর্বতে আমাকে একলা বেড়াইতে দিয়াছেন, সত্যের পথেও তেমনি করিয়া চিরদিন তিনি আপন গম্যস্থান নির্ণয় করিবার স্বাধীনতা দিয়াছেন। ভুল করিব বলিয়া তিনি ভয় পান নাই, কষ্ট পাইব বলিয়া তিনি উদ্বিগ্ন হন নাই। তিনি আমাদের সম্মুখে জীবনের আদর্শ ধরিয়াছিলেন কিন্তু শাসনের দণ্ড উদ্যত করেন নাই।' কমলার পিতার প্রসঙ্গে ঠিক এ-ধরনের ছবি আঁকবার অবকাশ ছিল না, বটে—তবে, কমলার পিতৃভক্তির বিশদ পরিচয়ের আয়োজনে—হয়তো রবীন্দ্রনাথের এই আত্মজীবনেরই কিছু প্রভাব ছিল!

'বনফুল'-এর চতুর্থ সর্গে নীরদ আর কমলার কথোপকথনের মধ্যে মানবচিত্তের জটিলতার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। কমলা নীরদের প্রেমাবিষ্টা। নীরদ বলেছেন:

'চাই না বাসিতে ভাল, ভাল বাসিব না!
দেবতার কাছে এই করিব প্রার্থনা—
বিবাহ করেছ যারে, সুখে থাক লয়ে তারে
বিধাতা মিটান তব সুখের কামনা!'

নীরদও কমলার প্রতি আকৃষ্ট বটে। তবু চতুর্থ সর্গের শেষে:

'নীরদ উদ্‌গামী অশ্রু করি নিবারিত
সবেগে সেখান হতে করিল প্রয়াণ।
উচ্ছ্বাসে কমলা বালা উন্মত্ত চিত
অঞ্চল করিয়া সিক্ত মুছিল নয়ান।'

পঞ্চম সর্গে বিজয়-নীরজার কথোপকথন থেকেই কমলা সম্বন্ধে বিজয়ের মনোভাবটি জানা যায়:

'যদি সে ভাল না বাসে আমায়
আমি কিন্তু ভাল বাসিব তাহায়—
যত দিন দেহে শোণিত চলে।'

এই কথা প্রকাশ করেই বিজয় স্বস্থানে ফিরে গেছেন। নীরজা তাতে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছেন। কারণ, নীরজাও বিজয়ের প্রতি অনুরক্তা। ষষ্ঠ সর্গে নীরজা কমলাকে বলেছেন :

'কে দিয়েছে মনমাঝে জ্বালায়ে অনল ?
বলি তবে তুই সখি তুই ! আর নয়—
কে আমার হৃদয়েতে ঢেলেছে গরল ?
কমলারে ভালবাসে আমার বিজয় !

* * * *

পরাণ হইতে অগ্নি নিভিবে না আর
বনে ছিলি বনমালা সে ত বেশ ছিলি
জ্বালালি !—জ্বলিলি বোন। খুলি মর্মদ্বার—
কাঁদিতে করিগে যত্ন যেথা নিরিবিলি।'

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র মতন রবীন্দ্রনাথের 'বনফুলে'র এই কমলাও সামাজিক সংস্কারে অনভিজ্ঞা। বিবাহ-বহির্ভূত প্রণয়ে বিবাহিতা হিন্দু নারীর অধিকার নেই,—এ প্রথা তাঁর কাছে বড়োই অসম্ভব মনে হয়েছে। তিনি বলেছেন :

'এ ত পাপ বিধি ! পাপ কেন হবে ?
বিবাহ করেছি বলে নীরদে আমার
ভাল বাসিব না ? হায় এ হৃদয় তবে
বজ্র দিয়া দিক বিধি করে চুরমার !'

সেকালের রবীন্দ্র-কাব্যে এই পরকীয় প্রেমের প্রসঙ্গ মনে রেখেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সে-যুগে তাঁর 'আনন্দ-বিদায়'-এর মধ্যে কঠোর তিরস্কার প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের ভাষাতে—'মনোসাধে' কথাটায় সন্ধির ভুল ধরেছিলেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ! রবীন্দ্রনাথের গভীর কথা তখনো অব্যর্থভাবে,—সমুচিত এবং সবস্বীকার্য শিল্প-বাহনের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়নি বললে ভুল হবে না। আবার, একথাও স্বীকার্য যে, যথার্থ গভীর সমালোচনায় সত্যিই সে-যুগের সামর্থ্য ছিল না ! সেকালের সমালোচক-মহলে যদি সে নজর থাকতো, তাহলে প্রেমের বৈধ-অবৈধ ভেদ-প্রসঙ্গে—অথবা বানানের অশুদ্ধি সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার পরিবর্তে,—'বনফুলে'র ষষ্ঠ সর্গের অতি-নাটকীয় লক্ষণ নিয়েই বরং বেশি আলোচনা হোতো !

নীরদের সমাজ-বিবেক খুবই সজাগ ছিল। নিজের অঙ্গে গৈরিক বেশ ধারণ করে, উদাসভাবে গৃহত্যাগ করলেন তিনি। তখন :

'যুবা কমলারে দেখি ফিরাইয়া লয় আঁখি
চলিল ফিরায়ে মুখ দীর্ঘশ্বাস ফেলি
যুবক চলিয়া যায় বালিকা তবুও হায় !
চাহি রয় এক দৃষ্টে আঁখিদ্বয় মেলি।
ঘুম হোতে যেন জাগি, সহসা কিসের লাগি,
ছুটিয়া পড়িল গিয়া নীরদের পায়।
যুবক চমকি প্রাণে, হেরি চারিদিক পানে
পুনঃ না করিয়া দৃষ্টি ধীরে চলি যায়।'

সমাজ-বিবেকও একরকম আধ্যাত্মিক শক্তি বটে! রবীন্দ্র-জীবনের আরো পরের অধ্যায়ে—'চতুরঙ্গে'র শচীশ-দামিনী সম্পর্কের মধ্যে যে-সব তীব্র চমকময় ভাব-সংঘাত—আরো সার্থকভাবে ঘটতে দেখা গেছে, 'বনফুল'-এর নীরদ-কমলার মধ্যে তারই যেন পূর্বাভাস দেখা দিয়েছিল। তাকে ঠিক অতি-নাটকীয় বলা যায় না। কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বের সেই অভিব্যক্তির সঙ্গে জড়িত হয়েই অতি-নাটকীয়তার দোষ প্রবেশ করেছিল! তীব্র ভাবাবেগে আত্মসমর্পণ করে কমলা যখন বলেছেন :

'নীরদ। তোমার পদে লইনু শরণ—
লয়ে যাও যেথা তুমি করিবে গমন।
নতুবা যমুনা জলে—এখনই অবহেলে—
ত্যজিব বিষাদ-দগ্ধ নারীর জীবন।'

তখন, সেই অন্তরালোড়নের দৃশ্যেই—

'পড়িল ভূতলে কেন নীরদ সহসা ?
শোণিতে মৃত্তিকাতল হইল রঞ্জিত।
কমলা চমকি দেখে সভয়ে বিবশা
দারুণ ছুরিকা পৃষ্ঠে রয়েছে নিহিত।

প্রণয়-দ্বন্দ্বের বিষফল ফলেছে এইভাবেই! বিজয়ের ছুরিকাঘাতেই নীরদ নিহত হয়েছেন এবং বকুলতলার মাটি রক্তাক্ত হয়ে গেছে! বিজয় কমলাকে পাননি। অবিবেকী বাহুবলের সাহায্যে রমণীরত্ন জয় করা যায় না, রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাসই তাঁর 'বনফুল' কাব্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে!

সপ্তম সর্গের শ্মশান-দৃশ্যটি খুবই দীর্ঘ এবং বিস্তৃত। বহু যত্নে নীরদের চিতা সাজিয়ে কমলা তাঁর অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন করে অবশেষে—

'শ্মশানের ভস্মমাখা অঞ্চল তুলিয়া
যেদিকে চরণ চলে যাইল চলিয়া।'

এই সপ্তম সর্গেই আর-একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার স্মরণীয়। 'বনফুল' গ্রন্থ-নামের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এই অংশে :

'বনফুল ফুটেছিলি ছায়াময় বনে,
শুকাইলি মানবের নিশ্বাসের বায়ে,
দয়াময়ী বনদেবী শিশির সেচনে
আবার জীবন তোরে দিবেন ফিরায়ে।'

অষ্টম সর্গে 'বালিকা ত্যজিতে প্রাণ করেছে মনন'। সপ্তম সর্গের হত্যাকাণ্ডের পরে, হিমালয়ের তুষার-শোভার মধ্যে কমলার আত্মহত্যার দৃশ্যটি ফুটিয়ে তুলে, সেকালে কিশোর-রবীন্দ্রনাথ এই শেষ সর্গে তীব্র করুণরসেরই ঘনঘটা সৃষ্টি করেছিলেন! তাতে অতি-নাটকীয় ভাব-কুহেলিকা সত্যিই ঘনীভূত হয়েছিল।

সে-পর্বে তিনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয় চৌধুরী, বিহারীলাল প্রভৃতি প্রবীণ ভাবুকের নবীন শিষ্য। হিমালয়ের নিসর্গ-সৌন্দর্য তাঁর মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যোগেশকাব্য', রাজকৃষ্ণ রায়ের 'নিভৃতনিবাস' প্রভৃতি সেকালের কোনো কোনো রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এইসব কৈশোরক-রচনার ভাবগত সাদৃশ্য আছে। তবে, তখনকার প্রসিদ্ধ কাব্য 'স্বপ্নপ্রয়াণ' একটু অন্য ধরনের রচনা। ১৮৭৫-এ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয়। এবং সেই বছরেই তাঁদের মাতৃবিয়োগ ঘটে।

: 'বনফুল' ও 'স্বপ্নপ্রয়াণ' :

'স্বপ্নপ্রয়াণের' খুবই প্রশংসা করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'স্বপ্নপ্রয়াণ রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ' বটে,—কিন্তু 'স্বপন-রমণীর' আনুকূল্যে কবির মনোমন্দিরের বিচিত্র রহস্য উন্মোচনের যে রীতি দ্বিজেন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন,—সে রীতিতে কী যেন এক বাধা ছিল,—তাতে যথার্থ কালজয়ী কাব্যগুণের স্ফুরণ সম্ভব হয় নি। বাংলা কবিতায় সংযুক্ত-ব্যঞ্জনের বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি ছিল সে যুগের সাধারণ লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ নিজেও সে-রীতি উপেক্ষা করতে

পারেন নি। দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' বইখানির মধ্যেও স্বরভক্তির পৌনঃপুনিক প্রয়োগ দেখা যায়। ফলে, তাতে প্রকাশের যুগোচিত কৃত্রিমতা তো ছিলই,—তাছাড়া সর্গানুক্রমে কবির মনোরাজ্যপ্রয়াণ, নন্দনপুরপ্রয়াণ, বিলাসপুরপ্রয়াণ, রসাতলপ্রয়াণ, সমরপ্রয়াণ, শান্তিপ্রয়াণ ইত্যাদি পরিকল্পনার মধ্যে একরকম প্রয়াসাধিক্যের লক্ষণও ছিল। এই সব রূপকের মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় আছে, কিন্তু সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা সত্ত্বেও একথা বলতে বাধা নেই যে, সত্যিকার গভীর কোনো আবেদন পাওয়া যায় না সেখানে। 'বনফুল' এবং 'কবি-কাহিনী' কিন্তু সে-রকম নয়। এই দুটি কাব্যের গল্পবস্তুর মধ্যে ভাবাবেগময় পরিমণ্ডল রূপায়িত হয়েছে এবং গল্পেরও স্বীকারযোগ্য কিছু টান আছে,—যদিও শব্দচয়নের ব্যাপারে মাঝে মাঝে খুবই অপরিণত বোধের নমুনা পাওয়া যায়। 'পর্ণশালা', 'কল্পনা', 'ভগ্ন' ইত্যাদি শব্দের স্বরভক্তি-ঘটিত 'পরণশালা', 'কলপনা', 'ভগন' ইত্যাদি রূপান্তর তো আপত্তিকর বটেই,—তাছাড়া 'থেক্যো থেক্যো' বানানটিও সেকেলে,—এবং 'বনফুল'-এর তৃতীয় সর্গে :

> 'যবে জলধর শিখরের পর
>
> উড়িয়া উড়িয়া বেড়াত দলে
>
> শিখরেতে উঠি বেড়াতাম ছুটি
>
> কাপড় চোপড় ভিজিত জলে।'

—এই অংশে 'কাপড় চোপড়' কথাটা কি বড়োই বেমানান নয়? ঐ তৃতীয় সর্গে নীরদের অতি-দীর্ঘ গানটিও মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। 'এলো থেলো' শব্দটি 'বনফুল'-এ একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে এবং সপ্তম সর্গে 'ভূষণ-বিহীন-দেহে, শুষ্ক মুখে, এলো থেলো কেশে' প্রয়োগটি নিঃসন্দেহে শ্রুতিপীড়ক মনে হয়। পান করিতেছে অর্থে 'পিতেছে' ক্রিয়ারূপটিও সুখকর নয়। তবে ঊষার আবির্ভাবে মূর্চ্ছিতা কমলার :

> 'কপোলে, আঁখির পাতে পড়েছে শিশির
>
> নিস্তেজ সুবর্ণ করে পিতেছে মিহির!'

—এই ছবিটির মধ্যে 'পিতেছে' শব্দটি মানিয়ে গেছে যা-হোক্। রবীন্দ্রনাথের কবিমন তখন ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছে। এবং কমলার একটি উক্তিতে তাঁর তৎকালীন জীবন-দর্শনও ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর নিজের কথায়—জীবন তখন ছিল 'বিষাদের রাত্তি'!

মানসী পর্ব, সাধনা পর্ব

কবিকাহিনী, বনফুল ইত্যাদি প্রথম যুগের কাব্য-কবিতাবলীর সঙ্গে তাঁর সেই পর্বের রচনা 'কড়ি ও কোমল', 'ভানুসিংহের পদাবলী' ইত্যাদির কথাও স্মরণীয়। আর, সেই প্রথম পর্বেরই শেষ বইখানির নাম 'মানসী'। সেই 'মানসী'র কথা দিয়েই ১৮৮০ থেকে ১৮৯০ পর্যন্ত রবীন্দ্র-রচনা পর্বটির আলোচনা শুরু করা যাক্। এ পর্বের সব রচনার কথাই একে একে আলোচ্য। 'মানসী' এ-পর্বের অপেক্ষাকৃত পরের বই বটে,-- তবে, এ-পর্বের সাধারণ প্রকৃতি এবং বিশেষত্বের কথা বলতে গেলে সেই 'মানসী' দিয়েই আলোচনা শুরু করা সংগত।

'রচনাবলী' সংস্করণের ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর 'মানসী'-পর্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে যে পরিচিতি দিয়েছিলেন, তাতে 'মানসী'র রচনাস্থল গাজিপুরের বর্ণনা আছে। তিনি বলে গেছেন যে, বাল্যকাল থেকে পশ্চিম-ভারত তাঁর কাছে রোম্যান্টিক কল্পনার বিষয় ছিল। সেখানে তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয় গগনচন্দ্র রায় ছিলেন আফিম-বিভাগের এক বৃদ্ধ কর্মচারী। গঙ্গার ধারে, বড়ো একটি বাংলোতে রবীন্দ্রনাথ বাস করতেন। বাড়ির সংলগ্ন জমি, ইঁদারা, গোলকচাঁপার ঘন পল্লব, প্রাচীন মহানিম গাছ,—সেখানকার রৌদ্রতপ্ত দুপুরে কোকিলের ডাক, শাদা ধুলোর রাস্তা ইত্যাদি তো বটেই, তাছাড়া দূরে গঙ্গার স্রোতে গুণটানা নৌকোর যাতায়াত, বিস্তৃত চরে যব-ছোলা-শর্ষের ক্ষেত প্রভৃতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা তিনি তাঁর পরিণত বয়সেও ভুলতে পারেন নি। তাঁর নিজের কথায়—'গাজিপুর আগ্রা-দিল্লির সমকক্ষ নয়, সিরাজ সমরখন্দের সঙ্গেও এর তুলনা হয়না, তবু মন নিমগ্ন হল অক্ষুণ্ণ অবকাশের মধ্যে।' তারপর, নিজের লেখা গানের উল্লেখ করে নিজের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে তিনি লিখেছিলেন,—'আমার গানে আমি বলেছি, আমি সুদূরের পিয়াসী। পরিচিত সংসার থেকে এখানে আমি সেই দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত হলুম, অভ্যাসের স্থূলহস্তাবলেপ দূর হবামাত্র মুক্তি এল মনোরাজ্যে। এই আবহাওয়ায় আমার কাব্য রচনার একটা নতুন পর্ব আপনি প্রকাশ পেল।'

'মানসী'র আগের বই 'কড়ি ও কোমল' প্রথম ছাপা হয় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর ১৮৮৭তে একে-একে তাঁর দু'খানি গদ্যগ্রন্থ 'রাজর্ষি' আর 'চিঠিপত্র' বেরিয়েছিল। ১৮৮৮তে গদ্যগ্রন্থ 'সমালোচনা' ছাড়া 'গীতিনাট্য' 'মায়ার খেলা' ছাপা হয়। ১৮৮৯-এ বেরিয়েছিল 'রাজা ও রানী'। অতঃপর ১৮৯০-এ 'মানসী'-র আগেই 'বিসর্জন' নাটক এবং 'মন্ত্রী-অভিষেক' প্রবন্ধ ছাপা হয়। এই সূত্রে আরো একটি কথা স্মরণীয়। তিনি অন্যত্রও সেকথা জানিয়ে গেছেন, —'মানসী'র প্রসঙ্গেও লিখেছেন : 'আমার কল্পনার উপর নূতন পরিবেষ্টনের প্রভাব বার বার দেখেছি। এই জন্যেই আলমোড়ায় যখন ছিলুম আমার লেখনী হঠাৎ নতুন পথ নিল 'শিশু'র কবিতায়, অথচ সে-জাতীয় কবিতার কোনো প্রেরণা কোনো উপলক্ষ্যেই সেখানে ছিল না। পূর্বতন রচনা-ধারা থেকে স্বতন্ত্র এ একটা নূতন কাব্যরূপের প্রকাশ। মানসীও সেই রকম।' অর্থাৎ, গাজিপুরে তাঁর মন সে-সময়ে বিশেষ তৃপ্তিকর এক পরিবর্তন উপভোগ করে। প্রকৃতির পট পরিবর্তনের সুযোগ ঘটেছিল সেখানে।

তাঁর বাল্যবোধে পশ্চিম-ভারত সম্বন্ধে যে রোম্যান্টিক কল্পনা লালিত হয়েছে, তারই ব্যাখ্যাসূত্রে তিনি বলেছিলেন—'এইখানেই নিরবচ্ছিন্নকাল বিদেশীয়দের সঙ্গে এদেশের সংযোগ ও সংঘর্ষ ঘটে এসেছে।' কিন্তু গাজিপুরে বাস করতে গিয়ে আসল পশ্চিম-ভারতের যে ছবি তিনি দেখেছিলেন, তাতে তাঁর কল্পনার সেই রমণীয় গোলাপের ক্ষেত অথবা গোলাপ-বিলাসী সিরাজের ছবিও যেমন ছিল না, 'মহিমান্বিত প্রাচীন ইতিহাসের স্বাক্ষরও তেমনি অনুপস্থিত মনে হয়েছিল। তৎসত্ত্বেও গাজিপুরের নিসর্গ-শোভা তাঁকে তৃপ্তি দিয়েছিল। এ-পর্বের কবিতার মধ্যে ভাব-পরিবর্তনের সেই দিকটি লক্ষণীয়। অপর পক্ষে, কবিতার বহিরঙ্গ-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও নতুনত্ব ঘটেছে—'নূতন আবেষ্টনে এই কবিতাগুলি সহসা যেন নবদেহ ধারণ করল। পূর্ববর্তী 'কড়ি ও কোমল'-এর সঙ্গে এর বিশেষ মিল পাওয়া যাবে না। আমার রচনার এই পর্বেই যুক্ত-অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে পেরেছি। মানসীতেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে।'

'মানসীর' উৎসর্গ কবিতাটির নাম 'উপহার'। সেটির রচনাকাল ৩০এ বৈশাখ, ১৮৯০। জগতের তরঙ্গ-আঘাতে কবিমনে সুখ-দুঃখের যে ধ্বনি উঠে থাকে, সেই বিশেষত্বের উল্লেখ ক'রে, কবি তাতে জানিয়েছিলেন :

এ চিরজীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা ;
আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা।

এই উৎসর্গ-কবিতাটি ধরে 'মানসী'র মোট রচনা-সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৬। কিন্তু বইয়ের মধ্যে লেখাগুলি বিষয়ক্রমে অথবা অন্য কোনো বিশেষ আদর্শক্রমে সাজানো হয়নি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সে-কথা আগেই জানিয়েছেন। সমালোচকরা তাঁর এ-বইয়ের লেখাগুলির মধ্যে প্রসঙ্গের বিচিত্রতা অনুসারে এখানকার প্রেমের কবিতাগুলির উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া স্মরণীয় এখানকার সমাজচিন্তা,—সেই ভাবনাসূত্রেই মনে পড়ে তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপময় রচনার কথা,—দেশের অন্ধ সংস্কার, ক্ষীণ স্বাস্থ্য, দুর্বল ধর্মজ্ঞান ইত্যাদির বিভিন্ন সমালোচনা,—এসব ছাড়া—তাঁর কাব্য-সমালোচনার নামে সেকালে স্বল্পদর্শী কোনো কোনো ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী যেসব নিন্দা প্রচার করছিলেন, সে-সবের উদ্দেশে তাঁর নিবেদন অথবা প্রতিবাদও আছে এই 'মানসী'তেই! আর আছে প্রকৃতির কবিতা—এবং সেই সূত্রে পুনরায় প্রেম, কাব্যতত্ত্ব, জীবনের নিত্যগতি, অতীতের মায়া-মরীচিকা ইত্যাদি স্বপ্ন আর ভাবনার উল্লেখও 'মানসী'তে চোখে পড়ে। 'মানসীতে তাঁর নানা কথার বিচিত্রতা সহজেই স্বীকার্য। তবু, এইসব কথার মধ্যেই একটি কথা তাঁর প্রধান কথা ছিল। প্রমথ চৌধুরীকে লেখা একখানি চিঠির মধ্যে তিনি নিজে সে-বিষয়ে এই জানিয়েছিলেন যে, 'ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে, মানসীর ভালোবাসার অংশটুকুই কাব্যকথা—বড়ো রকমের সুন্দর রকমের খেলা মাত্র—ওর আসল সত্যি কথাটুকু হচ্ছে এই যে, মানুষ কী চায় তা কিছু জানে না—একঘটি জল চায় কি আধখানা বেল চায় জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারে না ; আমি এমন অবস্থায় মনের সঙ্গে আপসে বোঝাপড়া করে কল্পনার কল্পবৃক্ষের মায়াফল পাড়বার চেষ্টা করছি।' এই চিঠিরই পরের অংশে তিনি জানিয়েছিলেন—'আমি ভালোবাসি অনেককে—কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেছি

সে মানসেই আছে, সে আর্টিষ্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কি ?'

অন্যান্য কথার আড়ালে 'মানসী' পর্বের এই গূঢ় ক'টি কথা যেন হারিয়ে না যায়, সেদিকে সমালোচকের সজাগ থাকা দরকার। এতে পাওয়া গেছে প্রথমতঃ, তাঁর নিজের মনের ভালোবাসা সম্বন্ধে ব্যাকুল আত্মজিজ্ঞাসা; দ্বিতীয়ত, তাঁর ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্বন্ধে সংশয়, কৌতূহল, অনতি-উচ্চারিত আশা! প্রথমবার বিলেত থেকে ফেরবার সময় থেকে—অর্থাৎ ১৮৮০ থেকে শুরু ক'রে শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত—প্রায় বছর-কুড়ির যে সময়-বিস্তার, সেই পর্বেই 'বালক', হিতবাদী, 'সাধনা' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর জীবনের গভীর যোগ ঘটেছিল।

'মানসী' পর্বের বিস্তার যদি 'মানসী' বই প্রকাশের কিছু আগে থেকে শুরু ক'রে প্রকাশকাল ১৮৯০ পর্যন্ত ধরা যায়, তাহলে তাঁর 'সাধনা-পর্ব তার খুবই সন্নিহিত—এমন কি ঠিক তার পরবর্তী বলা চলে।

'সাধনা' পর্বের রবীন্দ্রনাথ

১২৯৬ সালের ২৬-এ শ্রাবণ তারিখে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখেছিলেন; সে লেখাটির নাম 'ধ্যান', 'মানসীতে' সেটি ছাপা হয়েছিল। তাতে তিনি বলেছিলেন :

আমি অশান্ত বিরামবিহীন
তুমি প্রশান্ত চির নিশিদিন
চঞ্চল অনিবার,
যতদূর হেরি দিগ্‌দিগন্তে
তুমি আমি একাকার।

এই 'তুমি'-র রহস্য ভেদ করবার ভূমিকা হিসেবে নয়,—১৮৯০ থেকে শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বছর-দশেকের কর্মব্যস্ততার কথা-প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের সে আত্মকথা স্মরণীয়। 'রাজা ও রানী' তখন সবে বেরিয়েছে,—তার আগে লেখা হয়েছে 'মায়ার খেলা',—তারও আগে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। 'কড়ি ও কোমল'ও সেই পর্বের রচনা।

: 'ছিন্নপত্র,' 'কড়ি ও কোমল' প্রভৃতিতে সে-কালের আত্মকথা :

'ছিন্নপত্র' এবং অন্যান্য চিঠিপত্রের মধ্যে তাঁর সে-সময়ের জীবনকথা তিনি নিজেই লিখে গেছেন। সেইসব বর্ণনার মধ্যে শিলাইদহ, কালিগ্রাম, সাহাজাদপুর, পতিসর প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ বার বার চোখে পড়ে। যে-বছর তাঁর বিবাহ হয়, - সেই ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আদেশে তিনি তাঁদের জমিদারি পরিদর্শনের ভার নিয়েছিলেন। প্রায় বছর-কুড়ি পরে,—১৯০৭ সালে শিলাইদহে কিশোরদের নিয়ে তিনি পল্লী-সংগঠনের কাজে হাত দেন। শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর লেখা 'রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে' (২৫, বৈশাখ, ১৩৬৬) বইখানির মধ্যে সে-প্রসঙ্গ বেশ বিস্তৃতভাবেই আলোচিত হয়েছে।

তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল পরে ১৩৪৯ সালে তাঁর প্রথম খণ্ড 'চিঠিপত্র' ছাপা হয়। প্রথম খণ্ডে সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীর কাছে লেখা যে ছত্রিশখানি চিঠি বেরিয়েছে, তার চতুর্থ চিঠির শেষে, সম্পাদক এই জায়গাগুলির পরিচয় দিয়েছেন—'বিরাহিমপুর, সাহাজাদপুর ও কালিগ্রাম তিনটি জমিদারি পরিদর্শনের জন্য কবি জলপথে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। বিরাহিমপুর পরগনার কাছারি শিলাইদহে, কালিগ্রাম পরগনার কাছারি পতিসর গ্রামে। সাহাজাদপুর গ্রামের নামেই পরগনার নাম। পদ্মা থেকে ইচ্ছামতী ও বড়াল নদী দিয়ে চলন বিলে যাওয়া যায়। সাহাজাদপুর যমুনার একটি শাখানদীর ধারে, পতিসর চলন বিলের অনতিদূরে নাগর নদীর উপর।' জমিদারির কাজে এইসব অঞ্চলে, এবং অন্যান্য কাজে অন্যান্য অঞ্চলে ভ্রমণে—রবীন্দ্রনাথের সেই নবযৌবন যে খুবই চাঞ্চল্যে কেটেছিল, সেকথা তিনি জানিয়ে গেছেন। 'মানসী' প্রকাশের সময়ে তাঁর বয়স ছিলো কুড়ির কোঠার শেষ প্রান্তবর্তী। তার বছর তিনেক আগে, বাংলা ১২৯৩ সালে তাঁর 'কড়ি ও কোমল' যখন ছাপা হয়, তখনকার এবং তারও কয়েক বছর আগেকার মনোভাব সম্বন্ধে — পরে, তিনি জানিয়েছিলেন—'যৌবন হচ্ছে জীবনের সেই ঋতুপরিবর্তনের সময় যখন ফুল ও ফসলের প্রচ্ছন্ন প্রেরণা নানা বর্ণে ও রূপে অকস্মাৎ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে ...আত্মপ্রকাশের একটা প্রবল আবেগ তখন

যেন প্রথম উপলব্ধি করেছিলুম। মনে পড়ে তখনকার দিনে নিজের মনের একটা উদ্বেল অবস্থা। তখন আমার বেশভূষায় আবরণ ছিল বিরল। গায়ে থাকত ধুতির সঙ্গে কেবল একটা পাৎলা চাদর, তার খুঁটে বাঁধা ভোরবেলায় তোলা একমুঠো বেলফুল, পায়ে একজোড়া চটি।' ১৩৪৬ সালের পৌষ মাসে 'রচনাবলী-সংস্করণের জন্যে 'কড়ি ও কোমল'-এর নতুন ভূমিকাতে তিনি এই স্মৃতিকথা জানিয়ে গেছেন,—এবং সেই সূত্রে এও জানিয়েছিলেন যে, সেই সাজসজ্জাতেই 'থ্যাকারের দোকানে বই কিনতে গেছি কিন্তু এর বেশি পরিচ্ছন্নতা নেই, এতে ইংরেজ দোকানদারের স্বীকৃত আদব কায়দার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ হোত।'

কিন্তু উপেক্ষার ভাবটাই প্রধান নয়,—নবযৌবনের আকুতির মর্জিটাই সে-পর্বের প্রধান ধর্তব্য বিষয়। 'কড়ি ও কোমল'-এর 'কবির অহংকার' নামে একটি চতুর্দশপদীতে তিনি বলেছিলেন—'প্রাণে মরে গানে কি রে বেঁচে থাকা যায়!' এবং এই মনোভাব নিয়েই তাঁর 'চিত্রা'-র আগেই সে-কবিতায় বিশ্ববাসীকে তিনি এই আহ্বান শুনিয়েছিলেন:

কে আছ মলিন হেথা, কে আছ দুর্বল—
মোরে তোমাদের মাঝে করো গো আহ্বান।
বারেক একত্রে বসে ফেলি অশ্রুজল—
দূর করি হীন গর্ব, শূন্য অভিমান।
তারপরে একসাথে এসো কাজ করি
কেবলি বিলাপ গান দূরে পরিহরি।

'বিজনে' নামে আর একটি চতুর্দশপদীতে তাঁর সে-সময়ের অহং-ভাবনা এবং বিশ্ব-ভাবনার আর-একদিক ব্যক্ত হয়েছিল। তাতে তিনি বলেছিলেন:

আমারে ডেকো না আজি, এ নহে সময়—
একাকী রয়েছি হেথা গভীর বিজন,
রুধিয়া রেখেছি আমি অশান্ত হৃদয়,
দুরন্ত হৃদয় মোর করিব শাসন।
মানবের মাঝে গেলে এ যে ছাড়া পায়,
সহস্রের কোলাহলে হয় পথহারা,
লুব্ধ মুষ্টি যাহা পায় আঁকড়িতে চায়—
চিরদিন চিররাত্রি কেঁদে কেঁদে সারা।

'কড়ি ও কোমল'-এর 'সিন্ধুতীরে,' 'সত্য', 'আত্মাভিমান', 'আত্ম অপমান', 'ক্ষুদ্র আমি' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে এই ধরনের আত্ম-ভাবনার বহুতর উদাহরণ চোখে পড়ে। কিন্তু তাঁর এ-আত্মভাবনা সংকীর্ণ নয়,—আত্মসর্বস্বতা মাত্র নয়। 'মানসী'-র 'আমি অশান্ত বিরামবিহীন'—ভাবনাটাই এইসব রচনার মধ্যে ক্রমশঃ পরিণত হয়ে উঠেছিল। 'কড়ি ও কোমল'-এর 'পত্র' থেকে এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশদতর আত্মব্যাখ্যান স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি জানিয়েছিলেন :

মধুপাত্রে হতপ্রাণ পিপীলির মতো
ভোগরসে জীর্ণ হয়ে থাকা,
ঝুলে থাকা বাদুড়ের মতো শির-নত
আঁকড়িয়া সংসারের শাখা,
জগতের হিসাবেতে শূন্য হয়ে হায়
আপনারে আপনি ভক্ষণ,
ফুলে উঠে ফেটে যাওয়া জলবিম্ব প্রায়—
এই কিরে সুখের লক্ষণ।

পরের স্তবকে আরো জোর দিয়ে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—'এই অহিফেন-সুখ কে চায় ইহাকে !'

'কড়ি ও কোমল'-ই তাঁর প্রথম কবিতার বই—যাতে মনের নানা কথা এবং বাইরের বিচিত্র জগৎ তুল্য সমাদর পেয়েছে। 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'—এ ঘোষণা তাঁর 'কড়ি ও কোমলে'র আমল থেকেই বিশেষভাবে শোনা গেল,—সেই সঙ্গে মৃত্যুর পদধ্বনি,—প্রকৃতির বন্দনা,—যৌবনের প্রেম, আর স্বপ্ন, আর বিচিত্র অঙ্গীকার !

: 'ভারতী,' 'বালক' পত্রিকায় সেকালের আত্মপ্রকাশ :

'কড়ি ও কোমল' ছাপা হবার বছরখানেক আগে ১২৯২ সালের বৈশাখ থেকে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় ঠাকুরবাড়ির 'বালক' পত্রিকখানি প্রকাশিত হয়। 'বিষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর'-এর সুরে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ শিশু-কবিতাটি তো বটেই, তা ছাড়া তাঁর এই ধরনের আরো ক'টি কবিতা বেরিয়েছিল 'বালক'-এর বিভিন্ন সংখ্যায়। 'মুকুট' এবং 'রাজর্ষি' দেখা দিয়েছিল সেই 'বালক' পত্রিকাতেই। ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের সঙ্গে ঠাকুরপরিবারের ঘনিষ্ঠতা আরো আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। 'মুকুট',

'রাজর্ষি, এবং 'বিসর্জন'-এর মধ্যে কবির ব্যক্তিগত প্রীতির স্বাক্ষরে, সেই পারিবারিক মৈত্রী চিরস্থায়ী হয়ে রইলো। এই সব প্রীতি-শ্রদ্ধা-আনন্দকথার পাশাপাশি চলছিলো ব্যঙ্গ-কৌতুকের স্রোত। সে-পর্বের 'ভারতী' এবং 'বালক', এই দুই পত্রিকাতেই তাঁর গদ্য-পদ্য উভয় বাহনে বাহিত ব্যঙ্গরচনার প্রাচুর্য দেখা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ তখন সোলাপুরে জজিয়তি করেন। অসুস্থ হয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন আমেদাবাদে,—আমেদাবাদ থেকে সমুদ্র-তীরবর্তী বন্দোরায়। রবীন্দ্রনাথও কিছুদিন সে-সব অঞ্চলে ঘুরে আসেন। সেই ভ্রমণের মধ্যেও তাঁর রচনার স্রোত ছিল অব্যাহত,—অপ্রতিহত। ১২৯২-এর শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতী'তে 'সাকার ও নিরাকার' প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনি; নব্য হিন্দুসমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের তখন প্রবল কথা-কাটাকাটি চলছিলো। রবীন্দ্রনাথের আক্রমণের লক্ষ্য ছিলেন নব্য হিন্দুসমাজ; তাঁদের 'আর্যামি'-র নিন্দা করে 'কড়ি ও কোমল'-এরই আর একখানি 'পত্র'-কবিতায় তিনি লিখেছিলেন :

> দাঁতের জোরে হিন্দুশাস্ত্র তুলবে তারা পাঁকের থেকে,
> দাঁত কপাটি লাগে তাদের দাঁত-খিঁচুনির ভঙ্গি দেখে।

জোড়াসাঁকোয় বসে এ-কবিতা লেখবার অব্যবহিত আগেই উত্তর-বাংলার নদীপথে তিনি কিছুদিন কাটিয়ে এসেছিলেন। সেই ভ্রমণেরও উল্লেখ দেখা যায় কবিতাটির নানা মন্তব্যে। সেই সঙ্গে সে-সময়ের সাহিত্য-সংস্কৃতিরও কিছু পরিচয় আছে এইসব ছত্রে :

> জলে বাসা বেঁধেছিলেম, ডাঙায় বড়ো কিচিমিচি—
> সবাই গলা জাহির করে, চেঁচায় কেবল মিছিমিছি।
> সস্তা লেখক কোকিয়ে মরে, ঢাক নিয়ে সে খালি পিটোয়,
> ভদ্রলোকের গায়ে প'ড়ে কলম নেড়ে কালি ছিটোয়।
> এখানে যে বাস করা দায় ভনভনানির বাজারে,
> প্রাণের মধ্যে গুলিয়ে উঠে হট্টগোলের মাঝারে।
> কানে যখন তালা ধরে উঠি যখন হাঁপিয়ে
> 'কোথায় পালাই' 'কোথায় পালাই'—জলে পড়ি ঝাঁপিয়ে।

এ-কবিতার কথা এ-বইয়ে পরে আবার উঠবে। এখন এই কথাটাই বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, প্রকৃতি, প্রেম, সমাজ, স্বাধীনতা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ভাবনার অন্ত ছিলনা সে-সময়ে। আর, এই সব বড়ো-বড়ো ভাবনার

ফাঁকে-ফাঁকে স্ত্রীর কাছে লেখা চিঠিপত্রের মধ্যে তিনি জানিয়ে গেছেন ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে তাঁর তৎকালীন কৌতুক-সুস্মিত আগ্রহের কথা,—বলেছেন. —'কবিত্ব এবং সংসার এই দুটোর মধ্যে বনিবনাও আর কিছুতে হয়ে উঠ্‌ল না দেখছি',—অনুযোগের সুরে জানিয়েছেন,—'পাছে তোমাদের চিঠি পেতে একদিন দেরি হয় বলে কোথাও যাত্রা করবার সময় আমি একদিনে উপরি উপরি তিনটে চিঠি লিখেচি। কিন্তু আজ থেকে নিয়ম করলুম চিঠির উত্তর না পেলে আমি চিঠি লিখব না'! 'সাধনা' পত্রিকার কাজ তখন চলছে,—তারই মধ্যে সহজ ঘরোয়া মানুষ রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীকে জানান -'সংসারের সমস্তই ত নিজের সম্পূর্ণ আয়ত্ত নয়! যে অবস্থার মধ্যে অগত্যা থাকতেই হবে তার মধ্যে যতটা পারা যায় প্রাণপণেই নিজের কর্তব্য করে যেতে হবে—তারই মধ্যে যতটা ভাল করা যায় তা ছাড়া মানুষ আর কি করতে পারে বল।

'ব্যঙ্গ-কৌতুক'

১২৯২ সালের চৈত্র মাস আজ থেকে সুদূর অতীত! মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের একটি ব্যঙ্গ-প্রবন্ধের মধ্যে তখন এক ডেঞ্চে পিঁপড়ের মন্তব্য শোনা গিয়েছিল। পিঁপড়ে বলেছিল :

'দেখো দেখো, পিঁপড়ে দেখো! খুদে খুদে রাঙা রাঙা সরু সরু সব আনাগোনা করছে—ওরা সব পিঁপড়ে, যাকে সংস্কৃত ভাষায় বলে পিপীলিকা। আমি হচ্ছি ডেঞ্চে, সমুচ্চ ডাঁই বংশসম্ভূত, ওই পিঁপড়েগুলোকে দেখলে আমার অত্যন্ত হাসি আসে।

'হা হা হা, রকম দেখো, চলছে দেখো, যেন ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে গেছে; আমি যখন দাঁড়াই তখন আমার মাথা আকাশে ঠেকে! সূর্য যদি মিছরির টুকরো হোতো, আমার মনে হয় আমি দাঁড়া বাড়িয়ে ভেঙে ভেঙে এনে আমার বাসায় জমিয়ে রাখতে পারতুম। উঃ, আমি এত বড়ো একটা খড় এতখানি রাস্তা টেনে এনেছি, আর ওরা দেখো কী করছে —একটা মরা ফড়িং নিয়ে তিন জনে মিলে টানাটানি করছে। আমাদের মধ্যে এত ভয়ানক তফাৎ! সত্যি বলছি আমার দেখতে ভারী মজা লাগে।'

ডেঞ্চে পিঁপড়ে নিজেদের ছ'পায়ের পদমর্যাদা সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন তো ছিলই, তা ছাড়া তুচ্ছ খুদে পিঁপড়েদের উপকার করবার আগ্রহে সে বড়োই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। সামান্য খুদে পিঁপড়েরা কিন্তু এই ধরনের উপকার এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছে এবং সেই ক্ষোভে ডেঞ্চে পুনরপি বলেছে :

'তারা উন্নতি চায় না—তারা নিজের শর্করা নিজে খেতে এবং নিজের বিবরে নিজে বাস করতে চায়, তার কারণ তারা পিঁপড়ে, নিতান্তই পিঁপড়ে। কিন্তু আমরা যখন ডেঞ্চে

তখন আমরা তাদের উন্নতি দেখব, এবং তাদের শর্করা আমরা খাব ও তাদের বিবরে বাস করব—আমরা এবং আমাদের ভাইপো, ভাগ্নে, ভাইঝি ও শ্যালকবৃন্দ।'

ডেঞ্চো পিঁপড়ের এই বিচিন্তা সে-কালের শিক্ষিত বাঙালী মনের নানা ভাবনার ইশারা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'ব্যঙ্গ-কৌতুক' প্রবন্ধ-সংগ্রহের মধ্যে ছাপার হরপে আজও বিদ্যমান! এ-রচনার নিহিত লক্ষ্যটি বেশ স্পষ্ট। ভারতবর্ষে ইংরেজ-শক্তির অবাঞ্ছিত অধিকারের কথা মনে পড়ে। দুর্বল জাতির লাঞ্ছনা এবং প্রবলের স্বার্থপরতা, দুইই এতে ব্যক্ত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর ভঙ্গি এবং তার বিষয়গত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেও এর যোগ অনুমান করা যেতে পারে। 'লোকরহস্য' সম্বন্ধে সাহিত্য-পাঠকের অন্তত্তর স্মৃতিও—এই অনুষঙ্গে মনে দেখা দিয়ে যায়! রবীন্দ্রনাথ শুধু যে বিদেশী শক্তির অনধিকার-চর্চার কথাই সে সময়ে ভাবছিলেন, তা নয়। সজাগ, সক্রিয়, সমবেদনাময় মানুষের মনে স্বদেশ, বিদেশ, স্ব-সমাজ এবং অন্যান্য সমাজ সম্বন্ধে স্বভাবতঃই যে-সব ভাবনা দেখা দেওয়া সম্ভব, তাঁর মনে সেই সব ভাবনারই স্রোত বয়েছিল।

সম্পূর্ণ ভিন্ন ভূমিকায়—'আমিত্ব' সম্বন্ধে তাঁর সে-কালের আর-একটি মন্তব্য তাঁর এই গল্প-নিবন্ধের কয়েক বছর আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। সে একটি কবিতা। 'প্রভাত সংগীত'-এর মধ্যে সেই লেখাটি গ্রন্থভুক্ত হয়েছে। লেখাটির নাম 'স্রোতে'। তাতে তিনি জগৎ-স্রোতের বিচিত্রতা দেখতে দেখতে লিখেছিলেন :

অবোধ ওরে, কেন মিছে করিস আমি আমি।
উজানে যেতে পারিবি কি সাগরপথগামী।
জগৎ-পানে যাবি নে রে, আপনা পানে যাবি,
সে যে রে মহা মরুভূমি কী জানি কী যে পাবি।
মাথায় করে আপনারে, সুখ-দুখের বোঝা,
ভাসিতে চাস প্রতিকূলে সে তো রে নহে সোজা।
অবশ দেহ, ক্ষীণ বল, সঘনে বহে শ্বাস।
লইয়া তোর সুখ-দুখ এখনি পাবি নাশ।

ডেঞ্চো পিঁপড়ের প্রসঙ্গে, জগৎ-স্রোত সম্পর্কিত এই লেখাটি—এক সূত্রে, এক নিঃশ্বাসে, একত্র উল্লেখ করতে হয়তো একটু সংকোচ ঘটতে পারে।

কারণ, দুটি দু'জাতের রচনা। তা ছাড়া সময়ের দিক দিয়েও দুটির মধ্যে বছর-কয়েকের ব্যবধানের কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু তা হলেও এই দুটি লেখার মধ্য দিয়ে তাঁর মনের প্রকৃতি বা স্বভাবের ধারা একই বিশ্বাসের সমর্থন ক'রে গেছে। 'স্রোতে' কবিতাটির যেটুকু ওপরে তুলে দেওয়া হয়েছে, তার পরের ক' লাইনে তিনি বলে গেছেন :

জগৎ হয়ে রব আমি একেলা রহিব না
মরিয়া যাব একা হলে একটি জলকণা।

অর্থাৎ, বৃহৎ জগৎ-সংসারে চলতে চলতে পথিক তার একান্ত স্বত্ব বা আত্মবৈশিষ্ট্যও উপলব্ধি করবে,—আবার, জগতের অন্বয়ও বোধ করবে,—এই অভিজ্ঞতাই মানুষমাত্রের অভিজ্ঞতা! রবীন্দ্রনাথ সেই ভাবেই জগৎকে দেখে গেছেন।

: 'হাতে কলমে' ; 'প্রচার' ও 'নবজীবন' :

রবীন্দ্রনাথ নাকি যথেষ্ট স্বদেশী ছিলেন না, এদেশে এই অদ্ভুত ধারণা অনেকবার উচ্চারিত হয়েছে! বেশ ব্যাপকভাবে এবং অনেকবারই এ-কথা নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ ঘটে গেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও অনেক সময়ে সে-সব আলোচনায় যোগ দিয়েছেন। ঠাট্টা-বিদ্রূপও কম হয়নি। স্বদেশী কাজ বলতে কী বোঝায় কিংবা কী ঠিক বোঝানো উচিত, সে-বিষয়ে ১২৯১ সালের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যার 'ভারতী'তে তিনি নিজে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর সেই 'হাতে কলমে' প্রবন্ধের মধ্যে তিনি মানুষের মনে আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলবার পরামর্শ দিয়ে জীবনের প্রাত্যহিক ছোটো ছোটো কর্তব্য পালনের শুভ আবশ্যিকতার কথা বলেছিলেন। সে-ঘটনার বছর দেড়েক আগে কলকাতার সাহিত্যিক-সমাজে 'বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম'বাদী শশধর তর্কচূড়ামণি দেখা দিয়েছেন! রবীন্দ্রনাথ যখন 'ভারতী'তে 'হাতে কলমে' লেখেন, তার দু'বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হয়ে গেছে। ১২৯১-এর শ্রাবণ থেকে বঙ্কিমের জামাতা রাখালচন্দ্র তাঁর 'প্রচার' পত্রিকা, এবং প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর 'নবজীবন' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। য়ুরোপের তৎকালীন কোনো কোনো দার্শনিক মতের প্রভাব তখন এ-দেশের শিক্ষিত হিন্দু সমাজের মধ্যে এতো প্রবল ছিল যে, 'নবজীবন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতে বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর ধর্ম-জিজ্ঞাসা সম্পর্কিত আলোচনায় কোমতের

মতকে প্রকৃত হিন্দুধর্ম বলে অভিহিত করেন। বঙ্কিমের কলুটোলার বাড়িতে তখন প্রতি রবিবার সাহিত্যিকদের সম্মিলন হোতো। সেই সব সম্মিলনে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি অনেকেই থাকতেন। শশধর তর্কচূড়ামণিও মাঝে মাঝে আসতেন। চন্দ্রনাথ বসু সেই সময়ে তর্কচূড়ামণির ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। ১২৮৫ সালের [১৮৭৮ খ্রীঃ] কাছাকাছি সময় থেকেই নববিধান ও সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের সূচনার ফলে ব্রাহ্ম-আদর্শের বিরুদ্ধে শিক্ষিত হিন্দু-সমাজের আক্রমণ ঘনীভূত হয়। 'হাতে কলমে' যখন ছাপা হয়, সেই সময়ে, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে রবীন্দ্রনাথ আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক হয়েছিলেন। কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা ছিল তখনকার উগ্র ব্রাহ্মপন্থীদের মুখপত্র। তাতে পরিহাসযোগ্য নব্যহিন্দুদের বিদ্রূপ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'দামু ও চামু' কবিতায় লিখেছিলেন : 'দামু বোস আর চামু বোসে কাগজ বেনিয়েছে'! 'কড়ি ও কোমল'-এর প্রথম সংস্করণে সে লেখাটি গ্রন্থভুক্ত হয় বটে, কিন্তু পরে বই থেকে বর্জিত হয়। 'প্রচার' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতে, সেই উত্তেজনার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছিলেন যে, 'মনুতে যাহা কিছু আছে, তাহাই···ধর্ম নহে'। আবার শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দু আচারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন : 'পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় যে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত, তাহা আমাদের মতে কখনই টিকিবে না এবং তাঁহার যত্ন সফল হইবে না।' তাঁর আরো একটি উক্তি এই সূত্রে স্মরণীয়। তিনি লিখেছিলেন : 'হিন্দুধর্মেই তাহার প্রকৃত সম্পূর্ণতা আছে। হিন্দুধর্মে যেরূপ আছে, এরূপ আর কোন ধর্মেই নাই। সেইটুকুই সারভাগ। সেইটুকুই হিন্দুধর্ম। সেইটুকু ছাড়া আর যাহা থাকে—শাস্ত্রে থাকুক অশাস্ত্রে থাকুক বা লোকাচারে থাকুক—তাহা অধর্ম।'

: রবির পিছনে ছায়া :

বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ খুবই উত্তেজিত অবস্থায় একটি জবাব লিখেছিলেন বলে শোনা যায়। রবীন্দ্র-জীবনীর লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সে-ইতিহাস সরবরাহ করতে গিয়ে জানিয়েছেন যে, ১২৯১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'ভারতী'তে তাঁর সেই জবাবটি ছাপা হয়েছিল। তাতে বঙ্কিমের আলোচনা সম্বন্ধে অসংগত উষ্মা ছিল। অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'প্রচার'

পত্রিকায় আদি-ব্রাহ্মসমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায় সম্বন্ধে আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র সেই উত্তরের প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক স্নেহ আর শুভকামনা জানিয়েও বঙ্কিম এই ইঙ্গিত প্রকাশ করেছিলেন যে, 'এই রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি। রবীন্দ্রবাবু আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। সম্পাদক না হইলেও আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ, তাহা বলা বাহুল্য'। তাঁর এই ইশারা কিন্তু ঠিক ইশারামাত্র ছিল না। বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই তিনি এটি সুপরিস্ফুট করেছিলেন। এবং এখানেই সে-যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। ঐ বছর পৌষ সংখ্যার 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথ 'কৈফিয়ৎ' লিখেছিলেন। তারপর বঙ্কিমের স্নেহগুণে এবং রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাগুণে তর্কের গ্লানি দূর হ'য়ে, তাঁদের দুই ব্যক্তিত্বের মধ্যে পরস্পরের স্বীকৃতি এবং মার্জনাই স্থায়ী হয়েছিল। এ সব ঘটনার অনেক দিন পরে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছিলেন: 'আমি তখন আমার কোণ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িতেছিলাম। আমার তখনকার এই আন্দোলন-কালের লেখাগুলিতে তাহার পরিচয় আছে। তাহার কতক বা ব্যঙ্গকাব্যে কতক বা কৌতুকনাট্যে, কতক বা তখনকার 'সঞ্জীবনী' কাগজে পত্র আকারে বাহির হইয়াছিল। ভাবাবেশের কুহক কাটাইয়া তখন মল্লভূমিতে আসিয়া তাল ঠুকিতে আরম্ভ করিয়াছি।'

বঙ্কিমচন্দ্রের সেই 'রবির পিছনে একটি ছায়া' উক্তির সঙ্গে তারই কয়েক মাস পরে, রবীন্দ্রনাথের সেই সময়কার কয়েকটি গানের [১২৯১ এর শেষ পর্যন্ত তিনি যতো গান লিখেছিলেন প্রায় সবগুলিই] সংগ্রহ-গ্রন্থ 'রবিচ্ছায়া' নামটির কোনো যোগ ছিল কি ছিল না—সে-কথা কে বলবে? রবীন্দ্রনাথের গহন মনে বঙ্কিমের উক্তিটি হয়তো বা আপনার কাজ করেছিল। এই 'রবিচ্ছায়া' গানের বইখানিতে তাঁর ব্রহ্মসংগীত, জাতীয় সংগীত এবং বিবিধ বিষয়ে অন্যান্য সংগীতও জায়গা পেয়েছিল। যে বছর 'রবিচ্ছায়া' বের হয়, তার পরের বছর, অর্থাৎ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'কড়ি ও কোমল' কবিতার বই ছাপা হয়। সে-সময়ে 'ভারতী' এবং 'বালক' পত্রিকাতে তিনি শ্লেষ-পরিহাসময় অনেক লেখা লিখেছিলেন। 'বালক' অবিশ্যি ১২৯১ সালের বৈশাখ মাসে প্রথম বেরিয়ে মোট এক বছর মাত্র চলেছিল। কিন্তু 'ভারতী' অনেক দিনের প্রতিষ্ঠিত কাগজ। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর চেষ্টায় ঠাকুরবাড়ির

কিশোরদের সাহিত্য-চর্চার পত্রিকা হিসেবে 'বালক' বের হয়। রবীন্দ্রনাথ তাতে 'চিরঞ্জীবেষু' ও 'শ্রীচরণেষু' এই পারস্পরিক সম্বোধন ব্যবহার করে ঠাকুর্দা এবং নাতির মতামতের বিপরীত দৃষ্টি সম্বন্ধে যুক্তি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র তেইশ-চব্বিশ বছর। এই হাস্যকৌতুকময় তর্কবিতর্কের মধ্যেই তিনি তাঁর 'হেঁয়ালি নাট্য' লেখা আরম্ভ করেন। ফরাসী সাহিত্যের 'শারাড্' শ্রেণীর লেখা সম্বন্ধে তিনি খুবই সজাগ ছিলেন। তাঁর 'হেঁয়ালি নাট্য' সেই 'শারাড্'-শ্রেণীরই প্রতিধ্বনি। এইসব রচনায় বিভিন্ন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামত আছে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আছে,—আবার বোধ, বুদ্ধি দুইয়েরই আবেদন আছে তাঁর 'আর্য অনার্য' হেঁয়ালি নাটকের মধ্যে [প্রথম প্রকাশ ১২৯২ চৈত্রের 'বালক']। স্বদেশীয়ানা সম্বন্ধে তাঁর সে সময়কার মতামতের কথাও এইসব লেখায় পাওয়া যাচ্ছে। সেই চৈত্রেরই 'ভারতী' পত্রিকাতে প্রিয়নাথ সেন-কে লেখা তাঁর এক পত্র-কবিতা ছাপা হয়। আগেই সে-লেখাটি স্মরণ করা হয়েছে। সেই পত্র-কবিতার মধ্যেই এই লাইন দুটি ছিল :

দাঁতের জোরে হিন্দুশাস্ত্র তুলবে তারা পাঁকের থেকে
দাঁত কপাটি লাগে তাদের দাঁত খিঁচুনীর ভঙ্গি দেখে।

কবিতার ভাবে, বিষয়ে, ছন্দে অথবা শব্দে বিচিত্র পরীক্ষার আয়োজন— তাঁর সারা জীবনের বহুবিধ কাব্য-প্রয়াসের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। পরমের অনুভূতি জেগেছিল তাঁর মনে। ভাবের ছোট বড়ো নানান ঢেউ দেখা দিয়ে গেছে তাঁর সত্তার গভীরে। সেই সঙ্গে দেশের সুপ্রাচীন সামাজিক বিশ্বাসগুলি তাঁর নিজের কালের পরিবর্তিত আদর্শের সঙ্গে সংগতি বা বৈচিত্র্যের সূত্রে কতোদূর জড়িত, এবং কী পরিমাণেই বা বাঞ্ছিত,—সে-কথা ভাবতেও ক্লান্তি ছিল না তাঁর। ব্রাহ্ম-সমাজের আদর্শ যে সেকালের হিন্দু-সমাজেরই প্রগতিপন্থী দলের নজীর,—ব্যাপক ভাবে দেখলে এ-কথা মানতে আপত্তি হবার কথা নয়। রামমোহনের মধ্যে যে সামাজিক-বিবেক দেখা দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তারই স্বীকৃতি জানিয়ে গেছেন। আবার, ১২৯৪ সালের বৈশাখের 'ভারতী'তে হেঁয়ালি-নাট্য 'একান্নবর্তী পরিবার' লিখেছিলেন তিনি। এই রকম আরো অনেক লেখা আছে। কিন্তু সব কথা এক আসনে বলবার নয়। মাঝে মাঝে আসন বদলে নেওয়া দরকার।

: রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-আলোচনা :

তাঁর অল্প বয়সের এই সব প্রসঙ্গের পরে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের আর একটি তর্ক-বিতর্কের কথা বলা যেতে পারে। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বর্তমান বাংলা সাহিত্য' বইখানির মধ্যে জার্মানীর sturm and drung বিপ্লব সম্বন্ধে জানিয়েছিলেন—'জার্মানীতে Herder এই বিপ্লবের প্রবর্তক, Goethe ইহার কেন্দ্র, এবং Schiller-এ ইহার সমাপ্তি।' তিনি লিখে গেছেন : 'Percy's Reliques of Ancient Poetry পাঠ করিয়া Herder ও যুবক Goethe—Alsatiaর কৃষকগণের নিকট হইতে গান সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।' হার্ডারকে তিনি ইউরোপের লোক-সাহিত্যের প্রধান ভক্ত বলে মেনেছিলেন, এবং ফরাসী বিপ্লবের নেতা রুশোকে বলেছিলেন 'অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক'। ফ্রান্সে যখন ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে,—কৃষক আর জমিদারের মধ্যে,—গির্জায়,—রাজা-প্রজায়, সর্বত্র অনৈক্য ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই ঘোরতর অসাম্যের যুগেই রুশোর অভ্যুদয়। রুশো তাঁর Le Contract Social বইখানিতে প্রজাশক্তির মধ্যে উদ্দীপনা সঞ্চারের আয়োজন করেছিলেন। ফলে, সামন্ত-শাসন, পীড়ন-নীতি এবং পুরোহিত-প্রভুত্ব দূর হয়ে সেই সঙ্গে বিপ্লবের ভয়াবহ সন্ত্রাসপর্ব শুরু হয়। সে-সময়ে ফরাসী জাতি উচ্চকণ্ঠে মানুষের দাবি বা মানবাধিকারের স্বীকৃতি সম্বন্ধে ঘোষণা জানিয়েছিল।

রুশো যে সাম্যের বাণী প্রচার করেছিলেন, ব্রিটিশ-দ্বীপ-সীমানার মধ্যে স্কটল্যাণ্ডের কৃষক কবি বার্নস-এর রচনাতেই তার প্রথম প্রকাশ দেখা যায়। বার্নস-এর মতন ইংলণ্ডে ওয়ার্ডস্বার্থ, কোলরিজ এবং সাদে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে প্রথম দিকে খুবই উৎসাহ বোধ করেছিলেন; কিন্তু বিপ্লবের জিঘাংসাবৃত্তিতে তাঁরা মনে মনে আহত হন। তবে, সেকালের চিন্তা-জগতে ফরাসী-বিপ্লবের ফলে যে ব্যক্তি-পূজার ভাবটি জেগে উঠেছিল—তার আকর্ষণ তাঁরা এড়িয়ে চলতে পারেন নি। ওয়ার্ডস্বার্থ, কোল্‌রিজ, শেলি, বায়রন—এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কবি।

ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে জার্মান সাহিত্যের ভাবাদর্শ তুলনা করে রাধাকমল এই সূত্রে লিখেছিলেন : 'জার্মান সাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যের

মত রাজসভায়, ধনিগৃহে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিপুষ্ট হয় নাই। জার্মান সাহিত্যের প্রাণ জার্মান জাতির হৃদয়ে। তাই যখন জার্মান সাহিত্য অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নব-জীবন লাভ করিয়াছিল, তখন সমগ্র সমাজে এমন একটা আন্দোলন হইয়াছিল, যাহাতে জার্মান-জাতি একেবারে নূতন প্রাণ পাইয়াছে।' তিনি শীলর প্রভৃতি কবিকেই 'জার্মান-জাতির হৃদয়ে জার্মান-সাম্রাজ্যের যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা বলে স্বীকার করেছেন।

গেটে এবং শীলর-এর শেষ বয়সে জার্মান সাহিত্যে ভাষার পারিপাট্য আর কারুকার্যের দিকে ঝোঁক পড়েছিল। সে সময়ে Schlegel, Novalis, Eichendorf ও Heine রোম্যাণ্টিক আন্দোলন প্রবর্তিত করেন। অতঃপর চিন্তার ক্ষেত্রে হেগেল তাঁর বিশ্ব-বিজ্ঞান নিয়ে আবির্ভূত হন। সে-ঘটনার উল্লেখ করে রাধাকমল জানিয়েছিলেন: 'তাহার পর ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। দেশে নূতন নূতন সমস্যা আসিয়াছে। সাহিত্যেও পরিবর্তন দেখা গিয়াছে। কিন্তু জার্মান সাহিত্যের জন্ম হইতে যে একটা সার্বজনীন ভাব ছিল, তাহার কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। এখনও জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষাই সাহিত্যে প্রকাশিত হইতেছে; শুধু ভাষা ও রচনাপ্রণালী Classicism আন্দোলনের ফলে আরও মার্জিত হইয়াছে।' অতঃপর তিনি আরো একটি বিশেষত্বের কথা বলেছিলেন। আর একদিক থেকে ইংরেজি ও জার্মান সাহিত্যের তুলনা করে তিনি লিখেছিলেন: 'লণ্ডনই দেশের সমগ্র চিন্তা ও সাহিত্যের আদর্শ নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, মফঃস্বলের সমস্ত বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য মুছিয়া ফেলিতেছে। জার্মানির ছোট ছোট রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য মুছিয়া ফেলিতেছে। জার্মানির ছোট ছোট রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য হেতু জার্মান সাহিত্য সতেজ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। কিন্তু মফঃস্বলের সাহিত্যের বিশেষত্ব সাহিত্যের রাজধানী Weimarকে অবজ্ঞা করে নাই।'

ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং জার্মানির সাহিত্যরাজ্যের এইসব বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা সম্বন্ধে আলোচনা শেষ ক'রে, রবীন্দ্র-যুগের বাংলা সাহিত্যের নতুন প্রাণ-চাঞ্চল্যের কথা বোঝাতে গিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি স্মরণ করেছিলেন। সেই সূত্রেই তিনি বলেছিলেন:

'রবীন্দ্র-সাহিত্যে আমরা Sturm and drungএর অশান্তি ও ব্যাকুলতার পরিচয় পাই, Goetheর Werther ও Schillerএর অশান্তি ও ব্যাকুলতা পাই; Wordsworthএর মত ক্লিষ্ট মানবাত্মার প্রকৃতির নিকট আত্মসমর্পণ পাই—What man has made of man পাই,—Byron ও Shelleyর বিপ্লববাদ পাই, নূতন করিয়া জগৎ গড়িবার আকাঙ্ক্ষা পাই।'

ঠিক এই মন্তব্যের পরেই বলা হয়েছিল:

'কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে জগৎ গড়িয়াছেন, তাহা ভাবের রাজ্য। তাহার সহিত বাস্তব জীবনের সামঞ্জস্য নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাবের রাজ্য স্বপ্নের রাজ্য, Shelleyর মত Utopia। তাহার সবই সুন্দর, সবই মহৎ, শুধু তাহা সজীব নহে। রবীন্দ্র-সাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন। 'প্রকৃতির পরিশোধ,' 'অচলায়তনে' তিনি এক অপরূপ জগৎ গড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন; Goethe ও Schiller, Novalis ও Heine যে বস্তুর জগৎ গড়িয়াছেন, তিনি সে জগৎ গড়িতে পারেন নাই; তাঁহার জগৎ স্বপ্নের জগৎ, তাহা তাঁহার কল্পনায় ধারণা হইয়াছে মাত্র, জাতির হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তাঁহার 'গোরায় আমরা একটি সজীব বস্তুর জগৎ গঠনের উপাদান পাইয়াছি মাত্র; সে উপাদানগুলি ব্যবহার করিয়া একটি সম্পূর্ণ বাস্তব জগৎ এখনও গঠিত হয় নাই।'

রবীন্দ্রনাথের রচনায়,—তথা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক ক্ষেত্রে, তিনি যে অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করেছিলেন, তিনি নিজেই সে-বিষয়ে একটি ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন: 'বাংলা সাহিত্যের এই অসম্পূর্ণতার প্রধান কারণ,—কবিগণের ভাবপ্রবণতা, আত্মসর্বস্বতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, Egoistic Subjectivity, কিংবা বাস্তব জগতের অভাবের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজেদের কল্পনার তৃপ্তিসাধন উচ্ছৃঙ্খলতা নহে, ইহার কারণ আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের অবস্থাহেতু আমাদের কর্ম-প্রবণতার অভাব।'

রবীন্দ্রনাথের ভাবে এবং ভাষায়,—দু'দিকেই নানা ত্রুটি অনুভব ক'রে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁর এই বইখানির মধ্যে সে-সময়ের রবীন্দ্র-বিরোধী সমালোচকদের মনোভাবটি ব্যক্ত করেছিলেন। সাহিত্যে সামাজিক নীতির

শ্রেয়ত্ব ঘোষণা করাই তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি বলেছিলেন: 'বঙ্কিমবাবু যখন কুন্দনন্দিনী ও রোহিণীকে, রবিবাবু যখন বিনোদিনী ও বিমলাকে, শরৎচন্দ্র যখন কিরণময়ীকে মোহিনী মূর্তিতে ফুটাইয়া তুলিলেন, তখন আমরা আলঙ্কারিকের মত বলিব রসাভাস হইয়াছে। হোলোই বা সেখানে, প্রতিভার পরিচয় কিন্তু শিল্প হিসাবেও সেগুলিকে খাট বলিতেই হইবে।' রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' আর 'ঘরে-বাইরে' সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য এই: 'রবিবাবু তাঁহার art for art's sake থিওরিতে অতলে পড়তে পড়তে কি করে সামলে গিয়েছেন তাহা এই দুইখানি বইয়ে দেখান হইয়াছে। ফলে হইয়াছে tragedy of passion যাহা হইলেও হইতে পারিত তাহা হয় নাই অপরদিকে লোকপ্রিয়তা লক্ষ্য করাতে চরিত্র দুইটি যেভাবে ক্রমবিকাশ করিতেছিল তাহাতে অসংগতি আনা হইয়াছে অথচ তাহা লোকপ্রিয়ও হইতে পারে নাই। হঠাৎ-কাশীবাসিনী বিনোদিনী ও হঠাৎ-সতী বিমলা art for art's sake ও art with a purpose, সত্যহীন শিল্প ও সত্যমূলক শিল্প, এই দুই থিওরির দুই নৌকায় পা দিয়া গল্পের মাঝ-দরিয়ায় ডুবিয়া গিয়াছে।'

. বস্তুতন্ত্র ও রবীন্দ্রনাথ:

রাধাকমলের এই বইয়েরই 'সাহিত্যের আভিজাত্য' নামে একটি প্রবন্ধের মধ্যে বলা হয়েছিল:

> 'আমাদের সাহিত্যের প্রাণ জ্ঞান ও সাধনা নহে, বিদ্যা ও বুদ্ধি হইয়াছে। .. আমাদের সাহিত্যে এখন অনুকরণের স্রোত খুব প্রবল। সাধনার ফলে কেহই একটা নূতন জগতের আবিষ্কার করিতেছেন না। রবীন্দ্রনাথ যে ভাবরাজ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা হইতেই সকলে উপাদান সংগ্রহ করিতেছেন।'

রবীন্দ্র-সাহিত্যের 'বস্তুতন্ত্রহীনতা' সম্বন্ধে অভিযোগ প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যের কোন্ অঞ্চলে তথাকথিত 'বস্তুতন্ত্র' রক্ষিত হয়েছে, সে-বিষয়ে নির্দেশ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন:

> 'কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বস্তুতন্ত্রহীনতার অভাব জন্য রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রকৃতভাবে দেশের যুগধর্ম ব্যক্ত করিতে অসমর্থ হইয়াছে। আমাদের সাহিত্যে বস্তুতন্ত্র খুঁজিতে হইলে আমাদিগকে ঐতিহাসিক নাটকের শরণাপন্ন

হইতে হয়,—প্রতাপাদিত্য, শাহজাহান, মেবার-পতন, ভীষ্ম, শঙ্করাচার্য, চৈতন্যলীলা প্রভৃতি নাটকের শরণাপন্ন হইতে হয়, অথবা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের শোণিত-তর্পণের মধ্যে ঢুকিতে হয়, বর্তমান দৈনন্দিন জীবন হইতে সাহিত্য realism খুঁজিয়া পায়না। আমাদের অনেকগুলি সুন্দর সামাজিক নাটক আছে সত্য, কিন্তু সমগ্র দেশ ও সমাজের যুগধর্মের ইঙ্গিত তাহাতে পাওয়া যায় না, তাহাতে গৃহধর্ম, পরিবার ধর্ম ও জাতির-ধর্মের এই দুইটি সমস্যা পূরণের চেষ্টা হইয়াছে মাত্র। উপন্যাস ক্ষেত্রেও তাহাই। হিন্দু, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, খৃষ্টান, পার্শী ও মুসলমানের যুগধর্ম নাটক-উপন্যাসে ব্যক্ত হয় নাই। ভবিষ্যৎ ভারত-সমাজের সুস্পষ্ট চিত্র আমরা নাটক-উপন্যাসে এখনও পাই নাই। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ও 'অচলায়তনে' আমরা কেবল সূচনা দেখিয়াছি।'

: কর্ম, অহং, বিশ্বানুভূতি, মায়াবাদ :

সেকালের পাঠক সেকালের রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যাই ভেবে থাকুন না কেন, নিজের গভীর মনের কথা নানা রচনায় তিনি নিজেই বলে গেছেন। সাহজাদপুরের পথ থেকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে লেখা 'ছিন্নপত্রে'র একখানি চিঠিতে 'শৈশবসন্ধ্যা' কবিতাটির ভাবের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন: 'মানুষ ক্ষুদ্র এবং ক্ষণস্থায়ী, অথচ ভালোমন্দ এবং সুখদুঃখ-পরিপূর্ণ জীবনের প্রবাহ সেই পুরাতন সুগভীর কলস্বরে চিরদিন চলেছে ও চলবে—নগরের প্রান্তে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই চিরন্তন কলধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।' 'শান্তিনিকেতন' সপ্তম খণ্ডে 'তরী বোঝাই' নামে তাঁর যে উপদেশ-ভাষণ [৪, চৈত্র, ১৩১৫] ছাপা হয়েছে, তাতে তাঁর সেই পর্বের কবিতা 'সোনার তরী'র ব্যাখ্যাসূত্রে তিনি বলেছিলেন,—'প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু না কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না—কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে, তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে।'

১২৯৮ সালের ফাল্গুন থেকে ১৩০০ সালের অগ্রহায়ণের মধ্যে লেখা কবিতাগুলিই তাঁর 'সোনার তরী'তে সংকলিত হয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের

সমালোচকরা যাকে 'বিশ্বানুভূতি' বলেছেন, 'সোনার তরী'র অনেক কবিতাতেই তাঁর সেই বিশ্বানুভূতির অভিব্যক্তি ঘটেছিল। আর 'মায়াবাদ' প্রভৃতি চতুর্দশপদী কবিতায় এই লৌকিক, বাস্তব, মর্ত্যজগতেরই সানন্দ এবং অকুণ্ঠ স্বীকৃতি উচ্চারিত হতে শোনা গেছে।

তারপর ১৩০০ সালের মাঘ থেকে ১৩০২ সালের ২০এ ফাল্গুনের মধ্যে লেখা কবিতাগুলিই তাঁর 'চিত্রা'য় সংগৃহীত হয়। সেই ১৩০০ সালেই রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। 'চিত্রা'র কবিতা-গুলি যখন লেখা শুরু হয়, তখন থেকেই তিনি সে-পর্বের রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখায় আত্মনিয়োগ করেছেন। এবং তার আগেই তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্যে'র 'মেঘদূত' [১২৯৮] প্রবন্ধটি লেখা হয়ে গেছে।

'প্রাচীন সাহিত্য :

রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' বইখানির কথা উঠলেই বলেন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে। একালের বাংলা সাহিত্যের লেখক বা পাঠকের মনে সংস্কৃত সাহিত্যের ঐশ্বর্যের কথা যত সমাদর পায়, উনিশ শতকে আমাদের সাহিত্যানুরাগী বিদগ্ধ সমাজে, বোধ হয়, সে-তুলনায় অনেক বেশিই পেয়েছে। সে-যুগে রাষ্ট্রগত পরাধীনতা সত্বেও অন্তরের বিচিত্র চৈতন্যলোকে আমরা ব্যাপক সত্যানুসন্ধানেরই সাধনা দেখতে পাই। সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম—সকল বিষয়েই ছিল আন্তরিক সক্রিয়তা। রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ, কিংবা ঈশ্বর গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির মধ্যে দেখা গেছে এই 'ঐতিহ্য-সচেতন' ব্যক্তিত্ব।

মানুষ ঘুমিয়ে থাকলে কলি,—ঘুম ভাঙলে দ্বাপর,—উঠে দাঁড়ালে ত্রেতা —এবং এগিয়ে চললেই সত্যযুগ—'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র এই যুগার্থ-নির্দেশনা অনুসারে সে-সময়ে আমাদের ভাব-জগতে আমরা যে সত্যযুগের চলচ্ছক্তি অনুভব করেছি, তাতে সন্দেহ নেই। ধর্মের অথবা সমাজের ভাবনাচিন্তাতে যেমন,- সাহিত্যের অনুশীলনেও তেমনি পাশাপাশি দুটি শক্তি দেখা দিয়েছে। একদিকে বিসর্জন, অন্যদিকে সংরক্ষণ। ডিরোজিও, রিচার্ডসন প্রভৃতির আমল থেকে শুরু ক'রে, শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত উত্তেজনার যেন অন্ত ছিল না! ভাঙনের কলরোলের মধ্যেই অতীতের সম্পদ তার প্রাপ্য শ্রদ্ধা আদায়

করেছে। সে-যুগের 'প্রগতিশীলেরা' যত ভাঙতে চেয়েছেন, রক্ষণশীলেরা ততই, গোঁড়ামি দেখিয়েছেন। ইংরেজি সাহিত্যের টানে ইংরেজি ভাষার দিকে বাঙালীর মন এগিয়েছে দ্রুতবেগে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি সংস্কৃত-বিশারদদের প্রচেষ্টায় সংস্কৃতের চর্চা তবু অব্যাহত ছিল। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বীটন সোসাইটিতে বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' পড়া হয়। এই লেখাটিতে এবং 'মেঘদূতের' ভূমিকায় সংস্কৃত কাব্য আস্বাদনের অপরিসীম সামর্থ্যের নমুনা আছে। অধ্যক্ষ কাউয়েল সাহেবের অনুরোধে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নন্দকুমার শর্মা মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস, শকুন্তলা ও কিরাতাজুর্নীয়ের পরিচয় সংবলিত ছোট একখানি বই লিখেছিলেন। 'সংস্কৃত প্রস্তাব' নামে এই রচনা ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অধ্যাত্মতত্ত্ব বা দার্শনিক প্রসঙ্গের আলাপ-আলোচনা অবিশ্যি বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমারের আগেই শুরু হয়েছিল। বাংলায় রামমোহন সে-প্রসঙ্গের প্রসিদ্ধ প্রবর্তকদের একজন। ঋগ্বেদের অনুবাদকদের অগ্রণী ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের নামও এই সূত্রে স্মরণীয়। তবে, এই অল্প কয়েকটি নামেই যে তালিকা সম্পূর্ণ, তা' মনে করবার কারণ নেই। ঐতিহ্য-সচেতন অনেক মনীষীর আন্তরিক চেষ্টার ফলেই সে-যুগে পশ্চিমের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রবল জোয়ারের মুখে সংস্কৃত-চর্চার অভ্যাস টিঁকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল। সমাজের রক্ষণশীল দল সংস্কৃতের পঠন-পাঠন চালু রাখবার চেষ্টা করেছেন। আর, বিবেচকরা, নবাগত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে দেশের সনাতন ভাবসাধনার সমন্বয় ঘটাতে ব্রতী ছিলেন। এবং সেই যুগসন্ধির ব্যাপক ভাঙনের মত্ততার মধ্যে অভ্যাসে-প্রবণতায় যাঁরা ছিলেন রক্ষণশীল গোঁড়া দলের মানুষ,—তাঁরা অতীতের এতো অনুরাগী ছিলেন, সংরক্ষণের আদর্শে এতোই একনিষ্ঠ ছিলেন এবং বৈদেশিক আচার-আচরণ-মনন-বচনের সংস্পর্শ প্রতিরোধের প্রয়াসে এত বেশি উৎসাহী ছিলেন যে, নতুনের দিকে বিমুখতাই ছিল তাঁদের ঐকান্তিক লক্ষ্য! এই টানা-পোড়েনের মধ্যেই আমরা আমাদের প্রাক্তন উপলব্ধির দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছিলাম। একদল যখন নতুনের কাছে সর্বস্ব সমর্পণ ক'রে বসে,—অন্যদল তখনই পুরোনো সংস্কারকে বেশি ক'রে আঁকড়ে ধরে! অন্ধ অনুকরণ এবং অন্ধ সংরক্ষণ,—সমাজে দুইই পাশাপাশি চলতে থাকে।

রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি স্থিতধী ব্যক্তিরা ছিলেন সমন্বয়পন্থী। সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম,—তিন প্রসঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্র দিয়ে গেলেন সমন্বয়ের শ্রেয়বাদ। প্রাচীন ঐতিহ্যের উদ্দেশ্যে তিনি দিলেন শ্রদ্ধা। আবার, নবীন আগন্তুক পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তিনি জানালেন সমাদর। সংস্কৃত সাহিত্যের সমাদর-প্রয়াস 'বঙ্গদর্শনের' আমলেই প্রথম বিশেষভাবে উদ্দীপিত হয়। অবিশ্যি, তার আগেও ইতিহাস আছে। সাহিত্য সমালোচনার নতুন আদর্শ স্থাপন করেছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ছাপা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তো সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছিলেন। মধুসূদনের লেখাতেও সংস্কৃত সাহিত্যের অশেষ প্রভাব দেখা গিয়েছিল। বর্ধমানের রাজা মহাতাপচাঁদ অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচারে সাহায্য করে গেছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের লেখা সংস্কৃত মহাভারতের গদ্যানুবাদ তৈরি হয় ১৮৬০ থেকে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। সেদিন সংস্কৃত সাহিত্যের পক্ষে এবং অনুশীলনে আরো অনেক কর্মী, লেখক, বক্তা ও প্রচারক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন ভবভূতির 'উত্তরচরিত', কালিদাসের 'শকুন্তলা', জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কাব্যের সমালোচনা লিখছিলেন, তার কাছাকাছি সময়েই রজনীকান্ত গুপ্তের 'জয়দেব চরিত' [১৮৭৩] আর ও পানিনি [১৮৭৫ ছাপা হয়েছে। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'বাল্মীকি ও তৎসমসাময়িক বৃত্তান্ত' প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'কাদম্বরী'- অনুবাদ তার অনেক আগেকার রচনা [১৮৫৪]। রাজনারায়ণ বসু ছিলেন সেকালের বিশেষ স্মরণীয় মানুষ। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। যৌবনে তিনি ছিলেন রিচার্ডসনের ছাত্র। ইংরেজি বিদ্যাতেই তাঁর পুষ্টি আর পরিণতি; তবু স্বদেশীয়ানায় তাঁর আন্তরিকতার তুলনা হয় না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'হাঞ্চু-পামু হাফ' এরও সভাপতি ছিলেন এই পলিতকেশ প্রবীণ। সে-সভায় দীক্ষার ব্যবস্থা ছিল ঋক্ মন্ত্রের মাধ্যমে। সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রনাথের এই তিন অগ্রজেরই বিশেষ টান ছিল। ১৮৬৬ থেকে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববিদ্যা' ছাপা হয়। সত্যেন্দ্রনাথের 'মেঘদূতে'র অনুবাদ, দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুবাদ,—লালমোহন গুহ এবং ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ,—কালীপ্রসন্ন সিংহের উদ্যোগে 'বিক্রমোর্বশী'র অনুবাদ—

এবং 'মালতীমাধবের' স্বকৃত অনুবাদ,—এঁরা ছাড়া নন্দকুমার রায়, রামনারায়ণ তর্করত্ন, শৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির নানা প্রয়াস শতাব্দীর মধ্যপর্বের সংস্কৃত-চর্চার দৃষ্টান্ত হিসেবে স্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'উত্তরচরিত', 'দ্রৌপদী' প্রভৃতি প্রবন্ধ সে-যুগের ব্যাপক সংস্কৃত-সাহিত্য পাঠেরই সংকেতবহ ঘটনা। কিশোর রবীন্দ্রনাথের কাছে 'কুমারসম্ভবের' প্রথম শ্লোকটি আবৃত্তি ক'রে, বিহারীলাল চক্রবর্তী কালিদাসের ঐ রচনায় পর-পর বহু 'আ-স্বরের' সমাবেশ-রহস্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কালিদাস এবং বাল্মীকির কবিত্বে তিনি মুগ্ধ ছিলেন। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ সে-কথার উল্লেখ করেছেন। ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ নিজেও মুগ্ধবোধ মুখস্থ করেছেন। 'কুমারসম্ভব' এবং 'গীতগোবিন্দের' শ্লোক তাঁকে কিশোর বয়সেই বার বার নাড়া দিয়ে গেছে।

বিচ্ছিন্নভাবে এইসব দৃষ্টান্ত স্মরণ করলেই উনিশ শতকে বাংলার সংস্কৃত-সাহিত্যের সব কথা,—সব প্রভাবের আলোচনা শেষ হয় না। বাংলা নাটকের সূত্রপাত ঘটেছিল সংস্কৃত নাটক-নাটিকার অনুবাদের মধ্য দিয়ে। শুধু তাই নয়, মহাভারতের আদিপর্ব থেকে কাহিনী নিয়ে, মধুসূদন তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' লিখেছিলেন। 'পদ্মাবতী' নাটকের গল্প বিদেশী হ'লেও, তার নাট্য-প্রযুক্তিতে সংস্কৃতের প্রভাব আছে। সংস্কৃত-সাহিত্য মন দিয়ে পড়ে নিয়ে বাংলা-সাহিত্যের সাধনায় নেমেছিলেন তিনি। 'তিলোত্তমাসম্ভব' ও 'মেঘনাদবধ কাব্যে' কালিদাসের নানা ছত্রের হুবহু অনুবাদ জায়গা পেয়েছে। তারপর নাটক-নাটিকায় এবং কাব্য-কবিতায় প্রসিদ্ধ সংস্কৃত রচনাবলীর প্রসঙ্গ এবং প্রযুক্তিগত অল্পবিস্তর সাদৃশ্য রক্ষা করা ছাড়া সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহারের বিচিত্র প্রয়াস দেখা গেছে বলদেব পালিত প্রভৃতি কবির রচনায়।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্যে'র প্রবন্ধগুলি এক হিসেবে সংস্কৃত সাহিত্যে আমাদের শতাব্দীব্যাপী অভিনিবেশের ফল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৯১-এর অগ্রহায়ণ মাসে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্পাদক নিযুক্ত ক'রে রবীন্দ্রনাথ যখন 'সাধনা' পরিচালনায় নেমেছিলেন,—'প্রাচীন সাহিত্যের' সূচনা কিন্তু সেই সময়ের ঘটনা।

'হিতবাদী'তে তিনি তখন গল্প লেখা শুরু করেছিলেন। ১৮৯১-এর অগ্রহায়ণ থেকে 'সাধনা'র জন্যে গল্প লেখার উদ্যম-আয়োজন ঘনীভূত হয়। সেই সঙ্গে সাহিত্য সমালোচনায় এবং বিশেষভাবে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে আগ্রহের লক্ষণ ফুটে উঠেছে তাঁর একাধিক প্রবন্ধে, চিঠিতে, কবিতায়। 'সাধনা'তে লোকেন পালিতের সঙ্গে তাঁর সাহিত্য আলোচনা বেশ জমে উঠেছিল। কালিদাসের শকুন্তলা এবং মহাভারতের শকুন্তলা যে এক নয়, সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য দেখা দেয় সেই সময়ে। আগেই বলে নেওয়া গেছে যে, তাঁর 'মেঘদূত' প্রবন্ধটি লেখা হয় ১২৯৮ সালে [১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে]। তার প্রায় আট বছর পরে, ১৩০৬ সালে 'কাদম্বরী চিত্র',—১৩০৭-সালে কাব্যের উপেক্ষিতা' এবং 'রামায়ণ',—১৩০৮ সালে 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা', —পরের বছর 'শকুন্তলা', —এবং ১৩১২ সালে প্রাচীন সাহিত্যের 'ধম্মপদং' লেখা হয়েছিল। অর্থাৎ ১৮৯১-৯২ থেকে শুরু ক'রে ১৯০৬-৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 'প্রাচীন সাহিত্যে'র রচনাকাল সীমিত। ১২৯৮-৯৯ সালের 'সাধনা' পত্রিকাতেই রবীন্দ্রনাথের ব্যাকরণ ও শব্দতত্ত্বের কয়েকটি আলোচনা ছাপা হয়। 'সাধনা'-পর্বের এই বহু বিচিত্র কর্মব্যস্ততার মধ্যে ১২৯৯ সালের ফাল্গুনে বলেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কটক থেকে পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তার এক মাস আগে, 'সাধনার' মাঘ সংখ্যায় 'পঞ্চভূতের ডায়েরী' শুরু হয়েছে। পুরী থেকে বেরিয়ে, খণ্ডগিরি ভুবনেশ্বর দেখে, বালিয়া, তীরন প্রভৃতি কয়েকটি জায়গায় ঘুরে, জমিদারির কাজ সেরে তিনি বৈশাখ মাসে কলকাতায় ফিরেছিলেন। ১৮৯৩ সালের মার্চ মাসে তীরন থেকে লেখা একখানি চিঠিতে তাঁর এই সখেদ মন্তব্যটি দেখা গেছে: 'অন্যবার বরাবর আমার বৈষ্ণব কবি এবং সংস্কৃত বই আনি, এবার আনিনি, সেই জন্যে ঐ দুটোরই প্রয়োজন বেশি অনুভব হচ্চে। যখন পুরী, খণ্ডগিরি প্রভৃতি ভ্রমণ করছিলুম তখন যদি মেঘদূতটা হাতে থাকত ভারি সুখী হতুম।'

১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ থেকে ১৩০২-এর কার্তিক, এই চার বছর 'সাধনা' বেরিয়েছিল। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি নানা জাতের রচনার মধ্যে মগ্ন থেকে,—চন্দ্রনাথ বসু বা শশধর তর্কচূড়ামণির তর্ক-বিতর্কের জবাব দিতে-দিতে এবং 'সাধনা'র জন্যে নিয়মিত লেখা জোগাতে-জোগাতে হয়তো তাঁর আর ফুরসৎ ছিল না! 'মেঘদূত' প্রবন্ধটি লেখবার পরে, তাই অনেক দিন অন্য

লেখা লিখতেই তাঁর সময় কেটে গেছে,—'প্রাচীন সাহিত্যে'র বাকি লেখাগুলি তাঁর মনের নানা ভাবনার মধ্যে বীজের মতো সুপ্ত ছিল। 'সোনার তরী' এবং 'চিত্রা',—দু'খানি প্রসিদ্ধ কবিতার বইয়ের বেশির ভাগ রচনাই এই 'সাধনা'-পর্বের সৃষ্টি। এ সময়ে বৈষ্ণব কবিতার বিষয়ে তিনি নানাভাবে নানা দিকের কথা যে ভেবেছেন,—তার প্রমাণ আছে 'সোনার তরী'র 'বৈষ্ণব কবিতা' ছাড়া আরো কয়েকটি কবিতায়। ১৩০১ সালের ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হয় 'চিত্রা'র 'ব্রাহ্মণ' কবিতা। ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি কাহিনী এর বিষয়বস্তু। ১৩০২ সালের আষাঢ় মাসে লেখা কটাক্ষময় রচনা 'শীতে ও বসন্তে'র ['চিত্রা'] একটি অংশে 'মেঘদূত' ও নৈষধের উল্লেখ দেখা যায়। তারই কয়েক বছর পরে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'ক্ষণিকা' ছাপা হয়। 'ক্ষণিকা'র অনেক কবিতাতেই কৌতুকের সুরে কবির গভীর আত্মচিন্তা ধ্বনিত হয়েছে। গীতিকাব্য এবং মহাকাব্য, এই দুই রীতির মধ্যে তাঁর আপন রুচির নির্বাচন,—সমালোচকদের অপপ্রয়াস সম্বন্ধে তাঁর তিরস্কার,— বৈষ্ণব কবিতার দূর, দুর্লভ বৃন্দাবনের স্বপ্ন,—কবির অন্তর্জগতের সঙ্গে বহির্জগতের সম্বন্ধ—ইত্যাদি বিষয়ের বিশিষ্টতা 'ক্ষণিকা'র কৌতুক-প্রগল্‌ভতার মধ্যে গাম্ভীর্য সঞ্চার করেছে। এই বইখানিরই অন্তর্ভুক্ত 'সেকাল' কবিতাটি কালিদাসের 'মেঘদূত', 'ঋতুসংহার', 'বিক্রমোর্বশী', 'শকুন্তলা' ও 'মালবিকাগ্নিমিত্রমে'র উল্লেখে সমৃদ্ধ। 'হায় রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল',—এ অনুভূতি তাঁর 'সাধনা'-পর্বের গভীর অনুভূতি! 'নববর্ষা'র 'শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস' সংস্কৃত সাহিত্যের স্মৃতিমধুময় উচ্ছ্বাস! অনেকেই বার বার বলে গেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই পর্বটি নানা দিক থেকে স্মরণীয়। উনিশ শতকের শেষ বছর-দশেক তিনি গভীর মননে মগ্ন ছিলেন। একথা ঠিকই যে, তাঁর মন কোনো কালেই চিন্তায় বিমুখ ছিল না, কিন্তু এই পর্বে তাঁর চিন্তার যেন তিলেক বিরতি ছিল না!

: বলেন্দ্রনাথ :

বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা নতুন নয়। ১৩২২ সালের ২২-এ মাঘ বলেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। সেই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নদী' বইখানি তাঁর নামে উৎসর্গ করেন। সে ছিল ১৮৯৬-এর ঘটনা। তার আগে

বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে উড়িষ্যা-ভ্রমণের কথা বলা হয়েছে। ১৩০০ সালের মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় পর পর বলেন্দ্রনাথের তিনটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। তিনটিরই বিষয়বস্তু ছিল সংস্কৃত কাব্য।

১৩০৬ সালের ভাদ্র মাসে [১৮৯৯] মাত্র ২৯ বছর বয়সে বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তার বছর দেড়েক আগে ১৩০০ সালে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন। সে সময়ে রাজনৈতিক প্রবন্ধের দিকেই তাঁর মন পড়েছিল। নানা কারণে তিনি ক্লান্ত বোধ করছিলেন। ১৩০৫ সালের শেষে সরলা দেবীর ওপর 'ভারতী'র ভার দিয়ে তিনি শিলাইদহে ফিরে যান।

'মেঘদূত' প্রবন্ধের পরে,—'কাদম্বরী চিত্র' লেখবার আগে পর্যন্ত সংস্কৃত-সাহিত্যের নানা উল্লেখ চোখে পড়লেও সে-বিষয়ে কোনো দীর্ঘ গদ্য-রচনায় তাঁকে আত্মনিয়োগ করতে দেখা যায় নি। বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেই তিনি যেন এ-বিষয়ে নতুন উদ্যমে উদ্যত হয়েছিলেন। এই ঘটনা দেখে আর একটি কথা মনে হয়। তাঁর নিজের পত্রিকা 'সাধনা'তে তাঁরই একান্ত স্নেহভাজন বলেন্দ্রনাথ, তাঁরই বিশেষ অভিপ্রেত কাজ শুরু করেছিলেন। বলেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু না ঘটলে আগের রচনা 'মেঘদূত' এবং পরের লেখা —'রামায়ণ' [দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকা] ছাড়া 'প্রাচীন সাহিত্যে'র শেষ লেখা 'ধম্মপদং'-ও [চারুচন্দ্র বসু সম্পাদিত গ্রন্থের পরিচয়] হয়তো লেখা হোতো, কিন্তু বাকি লেখাগুলির ভার বোধ হয় বলেন্দ্রনাথকেই নিতে হোতো। সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে বলেন্দ্রনাথের অনুরাগ সঞ্চারের শুভ দায়িত্ব অবিশ্যি একা রবীন্দ্রনাথের নয়; জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির হাওয়াতেই সে প্রেরণা ছিল! তবে, বলেন্দ্রনাথ যে রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন, সে কথাও ভোলবার নয়।

রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বিশেষ রচনা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা কিংবা তাঁর বিশেষ বিশেষ বিশ্বাস বা মনোভঙ্গির বিশদ পরিচিতি লিপিবদ্ধ করবার প্রয়াস রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠেরই আনুষঙ্গিক কৃত্য। কিন্তু তার আগে তাঁর সম্পূর্ণ মনোভূমিটি সমগ্রভাবে অনুভব করবার প্রস্তুতি দরকার। উপস্থিত 'আদিকথা' অধ্যায়ে সেই প্রস্তুতি-সূত্রেই তাঁর জীবনবোধ, ঐক্যানুভূতি, পারিবারিক

ঐতিহ্য, সত্যবোধ, কর্মসংসার ও বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা, তাঁর সুদূরের পিপাসা,—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা,—'কবিকাহিনী', 'বনফুল', 'মানসী', 'কড়ি ও কোমল', 'ব্যঙ্গ' কৌতুক' ইত্যাদি তাঁর কৈশোর ও নবযৌবনের কয়েকটি বইয়ের প্রসঙ্গ,—'জীবনস্মৃতি'তে 'ছিন্নপত্রে' তাঁর আত্মকথার কোনো কোনো কথা, 'প্রাচীন সাহিত্য' সম্বন্ধে তাঁর অনুরাগ ইত্যাদি নানা কথায় উল্লেখ অনিবার্য। 'রবির পিছনে ছায়া'র উল্লেখও সেই সূত্রে,—আবার, বলেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গও রবীন্দ্রব্যক্তিমানসের সেই একই অনুসন্ধানসূত্রে!

: রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ ও প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে চিন্তা :

'প্রাচীন সাহিত্য' বই আকারে ছাপা হবার অনেক কাল আগে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জ্ঞানদানন্দিনীর 'বালক' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' ছাপা হয়। 'চিঠিপত্রে'র মধ্যে পিতৃসত্য পালনের জন্যে রামচন্দ্রের যৌবরাজ্য ত্যাগ,—সত্যরক্ষার জন্যে হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গত্যাগ,—পরহিতের জন্যে দধীচির দেহত্যাগ প্রভৃতি মহত্ত্বের উল্লেখ আছে। 'ষষ্ঠীচরণ দেবশর্মণ' রামায়ণ-মহাভারতের কথা বার বার স্মরণ করেছেন।

তারপর ১২৮৭-৯১ সালের মধ্যে 'ভারতী'তে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে সংস্কৃত কাব্য-পুরাণের কথা দেখা গেছে,—সে কতকটা প্রাসঙ্গিকভাবে। মুখ্যতঃ সে-প্রদেশের সমালোচনায় না নেমেও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গতঃ রামায়ণ-মহাভারতের কথা বলেছেন তাঁর 'সমালোচনা'র [১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ] কোনো কোনো লেখাতে। মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে তাঁর প্রথম জীবনের বহু-আলোচিত সমালোচনার এক জায়গায় তিনি সত্যের অনুরোধে রামের আত্মত্যাগ, প্রেমের অনুরোধে, লক্ষ্মণের আত্মত্যাগ,—এবং ন্যায়ের অনুরোধে বিভীষণের সংসারত্যাগের মহিমা স্মরণ করেছেন। 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি'—লেখাটিতেও রামায়ণ-মহাভারতের উল্লেখ আছে। 'কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন' নামে আর-একটি প্রবন্ধে 'শকুন্তলা', 'উত্তররামচরিত' প্রভৃতির উল্লেখও এই সূত্রে স্মরণীয়। 'মেঘনাদবধ কাব্য' ছাড়া এই গ্রন্থে 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি', 'বসন্ত রায়' প্রভৃতি বিখ্যাত কয়েকটি লেখা আছে। কিন্তু 'ভারতী'র সেই পর্বে সংস্কৃত সাহিত্যের কোনো বিশেষ তথ্য পর্যালোচনায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন নি।

'সাধনা'-পর্বের পরেই এদিকে তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখা শুরু হয়। ১৩০৮ সালে লেখা 'নববর্ষা' ['বিচিত্র-প্রবন্ধে' সংকলিত] 'প্রাচীন সাহিত্যের' লেখাগুলিরই সমপর্যায়ভুক্ত। বোধহয়, ১৯০১-এর জুন মাসে শিলাইদহে এই প্রবন্ধটি লেখা হয়। তাঁর স্ত্রীর কাছে লেখা এই সময়ের একখানি চিঠিতে এ-লেখাটির উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথ সে চিঠিতে জানিয়েছিলেন—'মেঘদূতের উপর একটা প্রবন্ধ লিখচি।......প্রবন্ধের উপরে আজকের এই নিবিড় বর্ষার দিনের বর্ষণমুখর ঘনান্ধকারটুকু যদি এঁকে রাখতে পারতুম, যদি আমার শিলাইদহের সবুজ ক্ষেতের উপরকার এই শ্যামল আবির্ভাবটিকে পাঠকদের কাছে চিরকালের জিনিস করে রাখতে পারতুম তাহলে কেমন হ'ত!'

বলেন্দ্রনাথের লেখাতেও এই রকম নিবিড় অনুভূতির চিহ্ন আছে। তাঁর সাহিত্য-সমালোচনা শুধু দোষ-গুণের তালিকা নয়। নিজের গভীর অনুভূতির পথ ধরে তিনি তাঁর পাঠককে সংস্কৃত সাহিত্যের সৌন্দর্য উপলব্ধির আনন্দে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেছেন। সাহিত্য সমালোচনার এ রীতি বিশেষভাবে রবীন্দ্র-রীতিরই স্মারক!

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের উড়িষ্যা-ভ্রমণের প্রায় বছরখানেক পরে ১৮৯৪-এর আগষ্ট মাসে বলেন্দ্রনাথের 'চিত্র ও কাব্য' [রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ] প্রকাশিত হয়। 'কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা', 'উত্তরচরিত,' 'মৃচ্ছকটিক', 'জয়দেব', 'পশুপ্রীতি' [প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পশুপক্ষীর উল্লেখ সম্পর্কে], 'কাব্যে প্রকৃতি', 'রবি বর্মা' [দাক্ষিণাত্যের চিত্রশিল্পী রবি বর্মার চিত্রে সংস্কৃত কাব্য-পুরাণের বিষয় রূপায়ণ প্রসঙ্গে],—মোট এই সাতটি প্রবন্ধ এ-বইয়ে জায়গা পেয়েছে। ১২৯৯ থেকে ১৩০১ সালের মধ্যে 'সাধনা'-র পৃষ্ঠায় এগুলি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এ ছাড়া ১২৯৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'ভারতী ও বালক'-এ প্রকাশিত 'মেঘদূত',—১২৯৭ এর আশ্বিন-সংখ্যায় প্রকাশিত 'দুষ্মন্ত',—১২৯৮ সালের পৌষ সংখ্যা 'সাধনা'য় প্রকাশিত 'রত্নাবলী',—মাঘ সংখ্যার 'মালবিকাগ্নিমিত্র',—১৩০৫-এর ভাদ্রের 'ভারতী'তে ছাপা 'প্রাচ্য প্রসাধন কলা'—এই পাঁচটি রচনাও বলেন্দ্রনাথের সংস্কৃতসাহিত্য-চিন্তার দৃষ্টান্ত এবং তাঁর অনুভূতিময় পর্যালোচনারীতির নিদর্শন।

'কণারক', 'দিল্লীর চিত্রশালিকা', 'গুজরাটে গরবা', 'খণ্ডগিরি', 'উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র' প্রভৃতি প্রবন্ধেও শিল্প-প্রসঙ্গের আলোচনা আছে। বলেন্দ্রনাথের

অনুভূতির বিশিষ্টতা তাঁর এসব লেখাতেও বিদ্যমান। তাঁর অন্যান্য ছোট-বড় নানান রচনায় এই ব্যক্তিগত অনুভূতির স্বাদটিই বিশেষ স্মরণীয়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর লেখাতে রবীন্দ্র-প্রভার প্রতিফলন লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছিলেন: 'বাংলার সাহিত্য-জগতের বহু গ্রহ উপগ্রহ ও বহুতর উল্কাপিণ্ড যাঁহার নিকট হইতে স্থায়ী বা ক্ষণিক প্রভা সংগ্রহ করিয়া দীপ্তি লাভ করিতেছে, বলেন্দ্রের মত অনুগামী ও অনুচরে তাঁহার জ্যোতির আংশিক প্রতিফলনে ক্ষুণ্ণ হইবার হেতু নাই। বরং এত সন্নিধানে অবস্থান করিয়াও তিনি যে তাঁহার নিজস্ব প্রতিভা প্রচুর পরিমাণে দেখাইতে পারিয়াছিলেন ইহাতেই তাঁহার সামর্থ্যের বিশিষ্টতা।'[৩]

রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহভাজন তরুণ পার্শ্বচরদের মধ্যে শতাব্দ-অতিক্রান্তির অব্যবহিত পরের দশকের আর দুজন লেখকের কথা এই সূত্রে মনে পড়া স্বাভাবিক। সতীশচন্দ্র রায় এবং অজিতকুমার চক্রবর্তী,—এঁরা উভয়েই ছিলেন কতকটা ব্যক্তিগত রীতির সাহিত্য-সমালোচক। সংস্কৃত-সাহিত্য সম্পর্কে সতীশ রায় প্রায় নীরব। মাত্র বাইশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়! ব্রাউনিং বা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি টুকরো যে ক'টি লেখা লিখতে সময় পেয়েছিলেন, সেগুলিতে বলেন্দ্রনাথের মত পরিণত শক্তির চিহ্ন না থাকলেও ভঙ্গির সাদৃশ্য আছে। তবে, তাঁর তুলনায় অজিতকুমার আরো কিছু দীর্ঘ আয়ু নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর লেখাতে ব্যক্তিগত সুরটি আরো পরিণত হবার সুযোগ পেয়েছিল।

এই দুজনের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করবার হেতু এই যে, বলেন্দ্রনাথ যেমন অল্প বয়সে মারা গেছেন, এঁরাও তেমনি অল্প বয়সেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। শেষের দু'জন রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় না হলেও অন্তরঙ্গতা লাভ করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের গদ্য-নিবন্ধগুলিতেও সাহিত্যের আলোচনায় মধ্যে এমনি ব্যক্তিগত দৃষ্টির আনন্দ-বিস্ময় মর্যাদা পেয়েছে। তিনিও রবীন্দ্রসান্নিধ্য-সৌভাগ্যের অংশীদার। এঁরা ছাড়া, প্রবীণদের মধ্যে সংস্কৃতির বিবিধ আলোচনায় সেকালে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অক্ষয় মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, নিখিলনাথ রায়, প্রিয়নাথ সেন, জগদীশচন্দ্র বসু, দীনেশচন্দ্র সেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি লেখকের রচনায় রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য'

পর্যায়ের পুরাকীর্তি উপলব্ধির বিশিষ্ট রীতির অন্নবিস্তর ছোঁয়াচ লেগেছিল। দীনেন্দ্রকুমার রায় এবং জলধর সেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গের লেখক হয়েও এ প্রভাব এড়িয়ে চলতে পারেন নি। উমেশচন্দ্রের দার্শনিক প্রবন্ধেও রবীন্দ্রসদৃশ ব্যক্তিগত বিস্ময়বোধের চিহ্ন আছে!

কেবলমাত্র 'প্রাচীন সাহিত্য' পড়েই যে সেকালের লেখকরা রবীন্দ্রনাথের এই অনির্বচনীয় ভঙ্গি ও উপলব্ধির ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন, সে কথা নয়; 'আত্মশক্তি,' 'ভারতবর্ষ,' প্রভৃতি প্রবন্ধের বইগুলি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের আগেই ছাপা হয়েছে; ১৯০৯-এ কলকাতায় ওভারটুন হলে তাঁর 'তপোবন' প্রবন্ধটি পড়া হয়। সে ঘটনাও ভোলবার নয়। 'কথা ও কাহিনীর' কবিতাগুলিও সে যুগের গদ্য-লেখকদের মনে ভারতবর্ষের পুরামহিমার দিকে বিশেষ আগ্রহ—এবং সে-বিষয়ে আলোচনায় বিশেষ এক রীতি গ্রহণের প্রেরণা জুগিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই 'আদি কথা'য় এখানে এই সত্যই স্মরণীয় যে, উনিশ শতকের শুরু থেকে এদেশে প্রাচীন ভারতবর্ষের পূত-মধুর ভাবাদর্শ ফিরে পাবার সাধনা আরম্ভ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রসাদে প্রাচীন ভারতের দর্শন সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইত্যাদির কথা-প্রসঙ্গে বাঙালীর সম্মিলিত ভাবনাই যেন তার যোগ্য ভাষা পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' সেই ধ্যানেরই কাব্য। বঙ্কিম-যুগের শেষে বলেন্দ্রনাথের লেখাতে দেখা গেল এদিকে অভিব্যক্তির নতুন তাগিদ। তারপর রবীন্দ্রনাথের নিজের কলমেই সে ধ্যান-ধারণার পূর্ণতর প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। 'প্রাচীন সাহিত্য' আমাদের সাহিত্যগত ঐতিহ্য-চিন্তার শতাব্দীব্যাপী প্রয়াসেরই পরিণতি! তাতে শিল্পীর ব্যক্তিগত আবিষ্কার এবং সমাজের সুদীর্ঘ অনুসন্ধান দুই-ই মিলেছে।

: মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সমালোচনা :

কেবল সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধেই নয়,—বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগ সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ ছিল। সোনার তরীর 'বৈষ্ণব কবিতা'র মধ্যে যেমন তাঁর মৌলিকতার লক্ষণ দেখা গেছে, বাংলা মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে একাধিক গদ্য নিবন্ধেও তেমনি তাঁর জিজ্ঞাসা দেখা গেছে। শুধু জিজ্ঞাসা নয়,—আন্তরিক অভিনিবেশের সঙ্গে সে-সাহিত্য পাঠ করে, তিনি

তাঁর পাঠকচিত্তের নিজস্ব প্রশ্নগুলি পরিবেষণ করে গেছেন। তাঁর এইসব প্রশ্ন ও পর্যালোচনা ছড়িয়ে আছে সমগ্র রবীন্দ্ররচনাবলীর মধ্যে। কোথাও বা প্রসঙ্গতঃ, কোথাও আবার মূলতঃ বাংলা মঙ্গলকাব্যের বিষয়ে তিনি নানা আলোচনা করেছেন।

মধ্যযুগে,—অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দের ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে আমাদের সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী ও চরিতগ্রন্থ,—এবং এই দুটি শাখা ছাড়া রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত প্রভৃতি বাংলা অনুবাদ-গ্রন্থেরও প্রাচুর্য ছিল। এই ত্রি-শাখার অন্তর্ভুক্ত বৈষ্ণব কাব্যের মধ্যে তিনি আমাদের সেকালের সাহিত্য-লোকের 'রোম্যান্টিক মুভ্‌মেন্ট' লক্ষ্য করেছিলেন! বৈষ্ণবকাব্যের মধ্যে তিনি যেমন 'বৈচিত্র্যচেষ্টা' এবং 'স্বাতন্ত্র্যের উদ্যম'—দুই-ই লক্ষ্য করেছিলেন, মঙ্গলকাব্যের মধ্যেও তেমনি এই সব লক্ষণ তিনি খুঁটিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের আদিযুগেও যেমন, মধ্যযুগেও তেমনি নানা সম্প্রদায়চিহ্নে, প্রথালক্ষণে, মুদ্রাদোষে এবং অন্যান্য সংকীর্ণতায় যথার্থ সাহিত্য-প্রয়াস ছিল নিরন্তর ভারাক্রান্ত। লোকশ্রুতির প্রসাদে আমরা সাহিত্যের কোনো-কোনো কীর্তিকে একটু বিশেষভাবে সমীহ করে চলতে পারি বটে, কিন্তু সমীহ করা বা আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রদ্ধামাত্র প্রকাশ করা এক জিনিস, আর যথার্থ প্রীতিবশে বরণ করে নেওয়া অন্য ব্যাপার! মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—এঁরা তিনজনেই মুকুন্দরামের প্রশংসা করে গেছেন। চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যে কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস সম্বন্ধে তো বটেই, তা ছাড়া ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য সম্পর্কে, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল প্রসঙ্গেও শ্রদ্ধা ও প্রীতির পরিচয় আছে। মুকুন্দরামের কাব্যে কমলে-কামিনীর যে বর্ণনা আছে, সেই বিষয়ে মধুসূদনের একটি চতুর্দশপদী রয়েছে। সেই বর্ণনা সম্বন্ধে তাঁর নিজের প্রীতির কথা তিনি এইভাবে জানিয়েছিলেন:

কমলে কামিনী আমি হেরিনু স্বপনে
কালিদহে। বসি বামা শতদল-দলে
(নিশীথে চন্দ্রিমা যথা সরসীর জলে
মনোহরা।) বাম করে সাপটি হেলনে
গজেশে, গ্রাসিছে তারে উগরি সঘনে।

গুঞ্জরিছে অলিপুঞ্জ অন্ধ পরিমলে,
বহিছে দহের বারি মৃদু কলকলে।—
কার না ভোলে রে মনঃ এ হেন ছলনে!

আন্তরিক এই প্রীতিবশেই মধুসূদন মুকুন্দরামকে বলেছিলেন—'কবিতা-পঙ্কজ-রবি'! রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অন্যান্য নানা কারণে মুকুন্দরামের প্রশংসা করলেও ঠিক এই ছবিটির বিষয়ে বিপরীত মত পোষণ করতেন। সে তাঁর অল্প বয়সের কথা। ১২৮৭ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় 'বাঙালি কবি নয়' নামে একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন :

'কবিকঙ্কণের কমলে-কামিনীতে একটি রূপসী ষোড়শী হস্তী গ্রাস ও উদ্গার করিতেছে, ইহাতে এমন পরিমাণ-সামঞ্জস্যের অভাব হইয়াছে, যে, আমাদের সৌন্দর্যজ্ঞানে অত্যন্ত আঘাত দেয়। শিক্ষিত, সংযত, মার্জিত কল্পনায় একটি রূপসী যুবতীর সহিত গজাহার ও উদ্গীরণ কোন মতেই একত্র উদয় হইতে পারে না।'

সেই লেখাটির মধ্যে কেবল এইটুকু মাত্র মন্তব্য করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। 'সমালোচনা' বইখানির মধ্যে তাঁর সে আলোচনা ছাপা হয়েছিল 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি' নামে। উদ্ধৃত মন্তব্যের সঙ্গে পাদটীকা দিয়ে তিনি আরো জানিয়েছিলেন :

'অনেকে তর্ক করেন যে গণেশকে দুর্গা এক একবার করিয়া চুম্বন করিতেছিলেন, তাহাই দূর হইতে দেখিয়া ধনপতি গজাহার ও উদ্গীরণ কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। কারণ, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেই আছে যে চৌষট্টি যোগিনী পদ্মের দলরূপ ধারণ করিল, ও জয়া হস্তিনীরূপে রূপান্তরিত হইল। অতএব গণেশের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কেহ বা তর্ক করেন যে, যখন কবির উদ্দেশ্য বিস্ময়ভাবের উদ্দীপনা করা, তখন বর্ণনা যাহাতে অদ্ভুত হয় তাহারই প্রতি কবির লক্ষ্য। কিন্তু এ-কথায় কোন অর্থ নাই। সুকল্পনার সহিত বিস্ময়রসের কোন মনান্তর নাই।'

রবীন্দ্রনাথের এইসব মন্তব্য দেখবার পরে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কমলে-কামিনীর কবিকল্পনায় মধুসূদনের শ্রদ্ধার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে একালের সাধারণ পাঠক যদি কিঞ্চিৎ সন্দিহান হন, তাহলে তাঁকে অপরাধী করা চলে না।

ধনপতির গল্পের মধ্যে একাধিকবার এই মায়ামূর্তির প্রসঙ্গ জায়গা পেয়েছে। মুকুন্দরামের টীকাকার চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রামায়ণের সুন্দরাকাণ্ড থেকে এবং 'ভবিষ্যপুরাণ', 'মৎস্যপুরাণ' ইত্যাদি থেকেও উদ্ধৃতি তুলে 'কমলে-কামিনী' মূর্তির একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। 'মৎস্যপুরাণে'র বর্ণনা স্মরণ করে তিনি জানিয়েছিলেন—'এইরূপ পদ্মাসনস্থা গজসেবিতা দেবীর সঙ্গে বৌদ্ধ আদ্যাদেবী খুব সহজেই মিলিয়া এক হইয়া কমলে-কামিনী উপাখ্যানের সৃষ্টি করিলেন।' শুধু তাই নয়। তিনি আরো লিখে গেছেন—'এই কমলে-কামিনী দেখা গিয়াছিল সিংহলের নিকট কালীদহে। ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম বহিষ্কৃত হইয়া সিংহলেই আশ্রয় লইয়াছিল।'

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার কথা স্থগিত রেখে কেবল মঙ্গলকাব্যের কথাই বিশেষভাবে অনুসরণ করতে হলে সেকালের এই কবি-সম্প্রদায়ের কল্পনাদৃষ্টির নিগূঢ় বিশেষত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আর একটি মন্তব্য এখানে স্মরণ করা দরকার। সাহিত্যে আমাদের নিজস্ব স্বভাবেরই প্রতিফলন ঘটে থাকে ; আবার যা 'আমাদের সুখ দুঃখ বেদনার স্বাক্ষরে চিহ্নিত, যা আমাদের কল্পনার দৃষ্টিতে সুপ্রত্যক্ষ', রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন 'বাস্তব'। এবং এইসূত্রে তিনি আরো বলেছিলেন—'কারো কারো জগতে আন্তরিক কারণে বা বাহিরের অবস্থাবশত বেশি করে আলো পড়ে বিশেষ কোনো সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে।' অতঃপর মঙ্গলকাব্যের কবিকল্পনা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য :

> 'মঙ্গলকাব্যের ভূমিকাতেই দেখি কবি চলেছেন দেশ ছেড়ে। রাজ্যে কোন ব্যবস্থা নেই, শাসনকর্তারা যথেচ্ছাচারী। নিজের জীবনে মুকুন্দরাম রাষ্ট্রশক্তির যে পরিচয় পেয়েছেন তাতে তিনি সবচেয়ে প্রবল করে অনুভব করেছেন অন্যায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা। বিদেশে উপবাসের পর স্নান করে তিনি যখন ঘুমোলেন, দেবী স্বপ্নে তাঁকে আদেশ করলেন দেবীর মহিমাগান রচনা করবার জন্যে। সেই মহিমাকীর্তন ক্ষমাহীন, ন্যায়ধর্মহীন, ঈর্ষাপরায়ণ ক্রূরতার জয়কীর্তন। কাব্যে জানালেন, যে-শিবকে কল্যাণময় বলে ভক্তি করা যায়, তিনি নিশ্চেষ্ট, তাঁর ভক্তদের পদে পদে পরাভব। ভক্তের অপমানের বিষয় এই যে, অন্যায়কারিণী শক্তির কাছে সে ভয়ে মাথা করেছে

নত, সেই সঙ্গে নিজের আরাধ্য দেবতাকে করেছে অশ্রদ্ধেয়। শিব-শক্তিকে সে মেনে নিয়েছে অশক্তি বলেই।'

'চণ্ডীমঙ্গল' সম্বন্ধে এই বিশ্লেষণ 'মনসামঙ্গল' সম্বন্ধেও যে অবান্তর বা অপ্রযোজ্য নয়, সে-কথা তিনি পরের অনুচ্ছেদেই স্পষ্টভাবে জানিয়ে গেছেন। সাধারণভাবে এ-বিষয়ে তাঁর এই মন্তব্য স্বীকার্য যে, 'নির্মম দেবতার কাছে নিজেকে হীন করে ধর্মকে অস্বীকার করে তবেই ভীরুর পরিত্রাণ, বিশ্বের এই বিধানই কবির কাছে ছিল প্রবলভাবে বাস্তব।' কবিমনের এ যে অতি দুরবস্থা, তাতে সন্দেহ নেই। এ-দৃষ্টি ব্যক্তি বা জাতির স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নয়। এর বিপরীত দৃষ্টির দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি আমাদের 'পুরাণ কথা-সাহিত্যে'র প্রহ্লাদ চরিত্রের কথা তুলেছিলেন এবং পাশ্চাত্ত্য কবি শেলির আদর্শও স্মরণ করেছিলেন। তিনি বলে গেছেন যে, প্রহ্লাদ চরিত্রকে যাঁরা রূপ দিয়েছিলেন, 'তাঁরা উৎপীড়নের কাছে মানুষের আত্মপরাভবকেই বাস্তব বলে মানেন নি'। শেলির সম্বন্ধেও তাঁর ছিল অনুরূপ মন্তব্য: 'এই কবির কাছে অত্যাচারীর পীড়নশক্তির দুর্জয়তাই সবচেয়ে বড় সত্য হয়ে প্রকাশ পায় না, তাঁর কাছে তার চেয়ে বাস্তব সত্য হচ্ছে অত্যাচারিতের অপরাজিত বীর্য।'[৭]

মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব সম্বন্ধেও তাঁর নিজের বিশেষ ধারণার কথা এইসূত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধের মধ্যে তিনি জানিয়েছিলেন যে দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে প্রথমে কতকগুলি ভাব পরস্পরবিচ্ছিন্ন কাব্য আকারে ঝাঁক বেঁধে ঘুরতে থাকে। তারপর, কোনো একজন কবি এসে সেই টুকরো টুকরো কাব্য থেকে পরস্পর সংযুক্ত নতুন আয়তনময় নতুন কাব্য রচনা করে পুরোনো জিনিসের নবরূপ সৃষ্টি করে থাকেন। 'সাহিত্য' বইখানির মধ্যে তাঁর এ মত তিনি পুনরায় প্রকাশ করে গেছেন। সেখানে নির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দিয়ে গেছেন—'মুকুন্দরামের চণ্ডী, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, কেতকাদাস প্রভৃতির মনসার ভাসান, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, এইরূপ শ্রেণীর কাব্য— তাহা বাংলার ছোট ছোট পল্লীসাহিত্যকে বৃহৎ সাহিত্যে বাঁধিবার প্রয়াস। এমনি করিয়া একটা বড়ো জায়গায় আপনার প্রাণপদার্থকে মিলাইয়া

(৭) বাংলাভাষা পরিচয় পৃঃ ২৮-৩৪

দিয়া পল্লীসাহিত্য ফল-ধরা হইলেই ফুলের পাপড়িগুলার মতো, ঝরিয়া পড়িয়া যায়।'[৮]

বিশ্বের সাহিত্যজগতে এ-রকম ছড়ানো ভাবের এক হয়ে ওঠবার চেষ্টা বিশেষভাবে দেখা গেছে গ্রীসে হোমরের কাব্যে এবং ভারতবর্ষের রামায়ণ-মহাভারতে। এ-অভিমতও তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধের মধ্যেই উচ্চারিত। প্রসঙ্গতঃ সেখানে তিনি মহাকাব্যের একটি সংজ্ঞা বা সংক্ষিপ্ত প্রকৃতি-বর্ণনা দিয়েছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল—'এইরূপ কালে কালে একটি সমগ্রজাতি যে-কাব্যকে একজন কবির কবিত্বশক্তি আশ্রয় করিয়া রচনা করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকেই যথার্থ মহাকাব্য বলা যায়।'

এই সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা অনুসারে আমাদের মঙ্গলকাব্যগুলিকে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে 'মহাকাব্য' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মনে করলে তাঁর অভিপ্রায়ের বিরোধিতা করা হয় না। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের বিশেষ অনুশীলন-কাল ধরে নিয়ে আমাদের তৎকালীন জনসাধারণের বিশেষ মনোভাবটির দিকে এবার দৃষ্টি দেওয়া দরকার। কিন্তু তার আগে, এখানেই স্পষ্ট করে উল্লেখ করা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথ নিজে জগতের যে-চারখানি যথার্থ মহাকাব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেছিলেন, সে-তালিকায় মঙ্গলকাব্যের জায়গা হয় নি। ইলিয়ড, অডিসি, রামায়ণ ও মহাভারত—এই চারখানিকেই তিনি 'ভারতবর্ষের গঙ্গা, মিশরের নীল ও চীনের ইয়াংসিকিয়াং' প্রভৃতি নদীর সঙ্গে তুলনা করে, 'প্রাচীন সভ্যতার স্তন্যদায়িনী ধাত্রী' নামে অভিহিত করেছিলেন! বলা বাহুল্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি সে-পর্যায়ের রচনা নয়। তৎসত্ত্বেও মহাকাব্যের বহুজনযোগের লক্ষণ বা জনচিত্তপ্রভাবগুণ যে মঙ্গলকাব্যেরও অন্যতম অন্তর্লক্ষণ, রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা অনুসারে সে-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। খাঁটি মহাকাব্য না হলেও এগুলি তাহলে অংশতঃ মহাকাব্য। ছাপাখানার আবির্ভাব ঘটবার আগেই এসব রচনা জন্মলাভ করেছিল। ছাপাখানার কথা এইজন্যে বলতে হোলো যে, অন্যান্য আলোচকের মতন রবীন্দ্রনাথও মনে করতেন, ছাপাখানার শাসনে মহাকাব্য গড়ে ওঠবার ক্ষীণ সম্ভাবনা পর্যন্ত একালে লোপ

(৮) সাহিত্যসৃষ্টি—'সাহিত্য' দ্রষ্টব্য

পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, যে-চারখানি মহাকাব্যের কথা আগে বলা হয়েছে, সেই চারখানি ছাড়া অন্যান্য প্রসিদ্ধ এবং আধুনিকতর মহাকাব্যকে তিনি 'মহাকাব্য' বলে মানতে চান নি। তিনি ঐ 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধটির মধ্যে তাই আরো বলে গেছেন—'অলঙ্কারশাস্ত্রের কৃত্রিম আইনের জোরেই রঘুবংশ, ভারবি মাঘ বা মিল্‌টনের প্যারাডাইস লস্ট, ভল্‌টেয়ারের হারিয়াড প্রভৃতিকে মহাকাব্যের পংক্তিতে জোর করিয়া বসানো হইয়া থাকে।'

বিধিসংগতভাবে মঙ্গলকাব্য যে 'মহাকাব্য' নয়, সে-কথা স্বীকার্য। তবু বিস্তার, জনচিত্তসংস্পর্শ,—'টুকরো টুকরো ভাবের' নতুন আয়তনলাভ ও ঐক্য-প্রাপ্তি ইত্যাদি লক্ষণের কথাসূত্রে আমাদের দেশের আলোচ্য মধ্যযুগের বিশেষ মনোভাবের কথা আপনিই এসে পড়ে। বাংলা রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে যেমন,—বাংলা মঙ্গলকাব্যেও তেমনি দেশব্যাপী এক সাধারণ মনন বা তৎকালীন এক বিশেষ চিত্তলক্ষণ ধরা পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কথায়—'ঈশ্বরের অধিকার যে কেবল জ্ঞানিদিগেরই নহে, এবং তাঁহাকে পাইতে হইলে যে তন্ত্রমন্ত্র ও বিশেষ বিধির প্রয়োজন করে না, কেবল সরল ভক্তির দ্বারাই আপামর চণ্ডাল সকলেই ভগবানকে লাভ করিতে পারে, এই কথাটা হঠাৎ যেন একটা নূতন আবিষ্কারের মতো আসিয়া ভারতের জনসাধারণের দুঃসহ হীনতাভার মোচন করিয়া দিয়াছিল। সেই বৃহৎ আনন্দ দেশব্যাপ্ত করিয়া যখন ভাসিয়া উঠিয়াছিল, তখন যে সাহিত্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহা জনসাধারণের এই নূতন গৌরবলাভের সাহিত্য। কালকেতু, ধনপতি, চাঁদ সদাগর প্রভৃতি সাধারণ লোকেই তাহার নায়ক; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় নহে, মহাজ্ঞানী সাধক নহে, সমাজে যাহারা নীচে পড়িয়া আছে, দেবতা যে তাহাদেরও দেবতা, ইহাই সাহিত্য নানাভাবে প্রচার করিতেছিল।'

দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হবার পরে রবীন্দ্রনাথ যে সমালোচনা লিখেছিলেন, তাতে এই দেব-মনুষ্য সম্পর্কের তদানীন্তন বিশেষত্বের কথা আরো বিশদভাবে বলা হয়েছিল। প্রাচীন শিবের প্রতি চণ্ডী, বিষহরি এবং শীতলার আক্রমণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন: 'এই সকল স্থানীয় দেবদেবীরা জনসাধারণের কাছে বল পাইয়া কিরূপ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের ব্যবহারে

দেখিতে পাওয়া যায়।' চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডীর খেয়ালের উল্লেখ করে, সে-প্রবন্ধের মধ্যেও তিনি পূর্বকথারই যেন পুনরাবৃত্তি করেছিলেন :

'যে নীচের, তাহাকেই উপরে উঠাইবেন—ইহাতেই দেবীর শক্তির পরিচয়। নিম্নশ্রেণীর পক্ষে এমন সান্ত্বনা—এমন বলের কথা কী আছে! যে দরিদ্র, দুইবেলা আহার জোটাইতে পারে না, সে-ই শক্তির লীলায় সোনার ঘড়া পাইল; যে ব্যাধ নীচজাতীয় ভদ্রজনের অবজ্ঞাভাজন, সে-ই মহত্ত্বলাভ করিয়া কলিঙ্গরাজের কন্যাকে বিবাহ করিল ;—ইহাই শক্তির লীলা।'

চণ্ডীর স্বামী শিব। সেই সম্পর্ক সত্ত্বেও স্বামীর পূজাকে হতমান করে দেবার জন্যে চণ্ডীর এই যে লড়াই, এ যেন প্রতিষ্ঠিত প্রভুত্বের বিরুদ্ধে, প্রথার বিরুদ্ধে, সংস্কার এবং অভ্যাসের বিরুদ্ধে সেকালের জনচিত্তেরই নিজস্ব বিদ্রোহ! নীচজাতির সন্তান কালকেতু পরমাশ্চর্য কোনো ভক্তির বলেই যে দেবীর কৃপা লাভ করেছিলেন, তা নয়। কালকেতুর প্রতিষ্ঠালাভের কথা তুলে রবীন্দ্রনাথ বরং জানিয়েছিলেন যে, সে 'কেন উঠিয়াছে, তাহার কোন কারণ নাই—ব্যাধ যে ভক্ত ছিল, এমনো পরিচয় পাই না। বরঞ্চ সে দেবীর বাহন সিংহকে মারিয়া দেবীর ক্রোধভাজন হইতেও পারিত। কিন্তু দেবী নিতান্তই যথেচ্ছাক্রমে তাহাকে দয়া করিলেন। ইহাই শক্তির খেলা।' মুকুন্দরামের কাব্যে তো বটেই, বাংলা মঙ্গলকাব্যের সারা জগৎটার মধ্যেই তিনি দেখেছিলেন নির্মম দেবশক্তির প্রাধান্য! তাই তিনি বলেছিলেন—'এই দয়ামায়াহীন ধর্মাধর্মবিবর্জিত শক্তিকে বড়ো করিয়া দেখা তখনকার কালের পক্ষে বিশেষ স্বাভাবিক ছিল।'

: শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব :

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' বইখানির মধ্যে দীনেশচন্দ্র সেন-ই তখন আমাদের মধ্যযুগের এইসব সাহিত্য-প্রসঙ্গ স্মরণ করে, ইতিহাসের সূত্র-সন্ধানের ভাবনা ভাবিয়েছিলেন। তাঁর বইয়ের সমালোচনা-সূত্রে,—সেই একই ধারাতে, রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুলেছিলেন—'কবিকঙ্কণে দেবী এই যে ব্যাধের দ্বারা নিজের পূজা মর্তে্য প্রচার করিলেন, স্বয়ং ইন্দ্রের পুত্র যে ব্যাধরূপে মর্তে্য জন্মগ্রহণ করিল, বাংলাদেশের এই লোকপ্রচলিত কথার কি কোন ঐতিহাসিক অর্থ নেই?' ব্যাধসমাজে প্রচলিত পশুবলির প্রথাই যে কালক্রমে সমাজের উচ্চস্তরে প্রবেশ করেছিল, সে-অনুমান লিপিবদ্ধ করে, সংস্কৃত কাদম্বরীকাব্যে বর্ণিত শবরনায়ক ক্রূরকর্মা ব্যাধজাতির পূজাপদ্ধতি'র সঙ্গে তিনি সে-প্রথার সাদৃশ্য

লক্ষ্য করেছিলেন। সমাজের উচ্চস্তরে প্রাচীনকালে পৌরাণিক অকিঞ্চন শিব-দেবতার যে আদর্শ প্রচলিত ছিল, কালক্রমে তাতে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে; সে-কথা আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করেছিলেন যে, 'অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার তরঙ্গ যখন চারিদেকে জাগিয়া উঠিয়াছে, তখন যে-দেবতা ইচ্ছাসংযমের আদর্শ, তাঁহাকে সাংসারিক উন্নতির উপায় বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দুর্গতি হইলেই মনে হয়, আমার নিশ্চেষ্ট দেবতা আমার জন্য কিছুই করিতেছেন না, ভোলানাথ সমস্ত ভুলিয়া বসিয়া আছেন।' সেই কারণেই সেকালে শিবের জায়গা চণ্ডী প্রভৃতি লৌকিক শক্তি-দেবীর দখলে এসেছিল। দীনেশবাবুর বইয়ের আলোচনা-সূত্রে চণ্ডী, মনসা, দক্ষিণরায় প্রভৃতি দেবীদের এই অভ্যুদয়-বৃত্তান্তের উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ শৈবধর্মের ওপর বাংলার শাক্ত এবং বৈষ্ণবধর্মের বিশেষ অধিকারের রহস্য উদ্ঘাটন করেছিলেন। এই ধর্ম-আন্দোলনের গোড়ার কথাটা পরবর্তী কালে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের আলোচনায় বেশ বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত H.D. Bhattacharya প্রণীত 'Foundations of Living Fa.ths' বইয়ের প্রথম খণ্ডের উল্লেখ করে আশুবাবু জানিয়েছেন—'ভারতীয় যে সকল প্রাগ্‌বৈদিক দেবতা পরবর্তী হিন্দুসমাজেও নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে শিবই সর্বপ্রধান। ইহা হইতে স্বভাবতই অনুমিত হইবে যে, এদেশের প্রাগ্‌বৈদিক সমাজে তৎকালীন শৈবধর্মের অত্যন্ত ব্যাপক প্রভাব ছিল—মাহঞ্জোদারোর সাম্প্রতিক আবিষ্কার হইতেও এই বিষয় সমর্থিত হয়। সেইজন্যই মনে করা হয় যে, বর্তমানে ভারতের যে অঞ্চলে আর্যেতর জাতির লোক অধিক সংখ্যায় বসবাস করে সেই অঞ্চলেই শৈবধর্মের ও যে অঞ্চলে আর্যজাতির বংশধরগণ অধিক পরিমাণে বাস করে সেই অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্মেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। ··বাংলা দেশে প্রথম হইতেই যে শৈবধর্মের প্রচার হইয়াছিল তাহার সঙ্গে আর্যেতর সমাজের উপাদান পূর্ব হইতে মিশ্রিত ছিল। ···বহিরাগত শৈবধর্ম বাংলার সমাজের উচ্চস্তরেই সর্বপ্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই ক্রমে তাহা নিম্নতর সমাজেও প্রসারলাভ করে। কিন্তু নিম্নতর সমাজের মধ্যে প্রচারিত হইয়া এই শৈবধর্ম ইহার পৌরাণিক আদর্শ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়।'[১] রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবধর্মের বিজয়-গৌরবের ব্যাখ্যাসূত্রে

(১) বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস [২য় সং] পৃঃ ৬২-৬৩

জানিয়েছিলেন—'শঙ্করের অভ্যুত্থানের পর শৈবধর্ম ক্রমশই অদ্বৈতবাদকে আশ্রয় করিতেছিল। বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়, জনসাধারণের ভক্তি-ব্যাকুল হৃদয়সমুদ্র হইতে, শাক্ত ও বৈষ্ণব, এই দুই দ্বৈতবাদের ঢেউ উঠিয়া সেই শৈবধর্মকে ভাঙিয়াছে। এই উভয় ধর্মেই ঈশ্বরকে, বিভক্ত করিয়া দেখিয়াছ।[১০] এই দুই ধর্মের মধ্যে শাক্তের বিভাগকে তিনি অপেক্ষাকৃত গুরুতর মনে করতেন। কারণ সে-পথে ঈশ্বরকে অশেষ শক্তিধর খেয়ালীমাত্র বলে কল্পনা করা হয়েছিল। তিনি বিশদভাবে সে-সব বুঝিয়ে মন্তব্য করেছিলেন—'শক্তিপূজায় নীচকে উচ্চে তুলিতে পারে, কিন্তু উচ্চ-নীচের ব্যবধান রাখিয়া দেয়—সক্ষম অক্ষমের প্রভেদকে সুদৃঢ় করে।' অপর পক্ষে, বৈষ্ণবধর্মের শক্তি হ্লাদিনী শক্তি—সে-শক্তি বলরূপিণী নহে, প্রেমরূপিণী। শাক্তধর্মের প্রেমের নিশ্চিন্ত সম্বন্ধ।...শাক্তধর্মে ভেদকেই প্রাধান্য দিয়াছে—বৈষ্ণবধর্মে এই ভেদকে নিত্যমিলনের নিত্য উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।'

মঙ্গলকাব্যের দেব-পরিকল্পনার কথা থেকে বাংলার বৈষ্ণবধর্ম অভ্যুদয়ের প্রসঙ্গে এগিয়ে এসে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্য' গ্রন্থের সেই প্রবন্ধটিতে পরিশেষে এই কথাটির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন যে,—'মুক্তি কেবল জ্ঞানীর নহে, ভগবান কেবল শাস্ত্রের নহেন, এই মন্ত্র যেমনি উচ্চারিত হইল, অমনি দেশের যত পাখি সুপ্ত হইয়াছিল, সকলেই নিমেষে জাগরিত হইয়া গান ধরিল।' তিনি বলেছেন—'ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে, বাংলাদেশ আপনাকে যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছিল বৈষ্ণবযুগে।' শাক্তযুগে শক্তির বশ্যতাটাই ছিলো মানুষের অদৃষ্ট, বৈষ্ণবযুগে প্রেমের অধিকারে, সৌন্দর্যের অধিকারে কাহারও কোনো বাধা রহিল না।' ১৩২৪ সালে 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রবন্ধটি লিখতে বসে একথা তিনি পুনরায় বলেছিলেন।[১১]

কিন্তু বৈষ্ণবযুগের সেই ভাবোচ্ছ্বাসও যে স্থায়ী হয় নি, সে-প্রসঙ্গও তিনি উল্লেখ করেছিলেন। বৈষ্ণব ভাবাদর্শ কেন যে দেশের মনে সত্যিকার বড়ো এবং স্থায়ী কোনো বিশ্বাস, বল বা শক্তি দিয়ে যেতে পারে নি, সে-

(১০) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—'সাহিত্য' দ্রষ্টব্য।

(১১) ছন্দ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [আষাঢ়, ১৩৫৩] পৃঃ ১৭৪-১৭৫

দুর্দশার কারণ দেখিয়ে তিনি লিখেছিলেন—'ভাবস্বজনের শক্তি প্রতিভায়, কিন্তু ভাব রক্ষা করিবার শক্তি চরিত্রের।' আমরা ভাববিলাসী জাত। 'আমরা শক্তিপূজায় নিজেকে শিশু কল্পনা করিয়া মা মা করিয়া আবদার করিয়াছি এবং বৈষ্ণব-সাধনায় নিজেকে নায়িকা কল্পনা করিয়া মান-অভিমানে, বিরহ-মিলনে ব্যাকুল হইয়াছি। শক্তির প্রতি ভক্তি আমাদের মনকে বীর্যের পথে লইয়া যায় নাই, প্রেমের পূজা আমাদের কর্মের পথে প্রেরণ করেন নাই।.. একদিকে দুর্গায় ও আর একদিকে রাধায় আমাদের সাহিত্যে নারীভাবই অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—বেহুলা ও অন্যান্য নায়িকার চরিত্র সমালোচনায় দীনেশবাবু তাহার আভাস দিয়াছেন।'

কিন্তু তৎসত্ত্বেও মঙ্গলকাব্যের শক্তিপূজার চেয়ে বৈষ্ণবযুগের ভাবধর্মকেই তিনি উঁচু আসন দিয়ে গেছেন। মঙ্গলকাব্যকে তিনি বলেছেন জেলখানার দেয়ালে বন্দীর আঁকা জেলখানারই প্রাসাদোপম ছবি—'সে যেন কারাগারের ভিত্তিতে ছবি আঁকিয়া কারাগারকে প্রাসাদের মতো সাজাইতে চেষ্টা'...! মঙ্গলকাব্য আমাদের তখনকার সমাজের বাস্তবচিত্র রেখে গেছে বটে,—'এই চেষ্টা কারাগারের মধ্যে কিছু আনন্দ—কিছু সান্ত্বনা আনে বটে, কিন্তু কারাগারকে প্রাসাদ করিয়া তুলিতে পারে না। এই চেষ্টা সাহিত্যকে তাহার বিশেষ দেশকালের বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না।'

মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণব সাহিত্য,—মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এই দুটি শাখাকে কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথকভাবে, পরস্পর-বিচ্ছিন্নভাবে দেখবার উপায় নেই। মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত প্রথার ওপর বৈষ্ণব অভ্যুদয়ের নতুন মনোধর্ম সে-যুগে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। মুকুন্দরাম প্রভৃতি মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবির কাব্য শ্রীচৈতন্যপ্রভাবেই বিশেষভাবে চিহ্নিত! ডক্টর সুকুমার সেনের অনুমান অনুসারে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল রচনার সময় ধরতে হয় ১৫৭৪ থেকে ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। মহাপ্রভুর তিরোধান থেকে সে অন্তত: চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পরের ঘটনা! মুকুন্দরাম নিজে শ্রীচৈতন্যের বন্দনাও করে গেছেন। অবিশ্যি সুকুমারবাবু জানিয়েছেন যে 'চতুর্দশপঞ্চদশ শতকের পূর্বেই চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনী দুইটি এদেশে দৃঢ়মূল হইয়া গিয়াছিল,'—কিন্তু তিনি আবার এও বলেছেন যে, 'ষোড়শ শতকের পূর্বে লেখা কোন চণ্ডীমঙ্গল পাওয়া যায় নাই'।[১২]

(১২) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [১৯৪৮] ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৪৭-৩৪৮

বৈষ্ণব ভাবাদর্শের উজ্জীবনমন্ত্রে উজ্জীবিত মধ্যযুগের এইসব মঙ্গলকাব্যে রবীন্দ্রনাথ প্রশংসার যোগ্য কয়েকটি দিক লক্ষ্য করেছিলেন। মুকুন্দরামের ভাঁড়ুদত্ত তারই অন্যতম। তাঁর নিজের কথায়—'কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্ত তাহার সমস্ত অনাবশ্যক বাহুল্য বর্জন করিয়া কেবল একটি সমগ্র রসের মূর্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে।'[১৩] তবু, মোটকথা এই থেকে যায় যে, এইসব সাফল্য সত্ত্বেও মঙ্গলকাব্যের আসল মনোভঙ্গি বা নিষ্ঠাভূমি বলতে যা বোঝায়, অনিয়ন্ত্রিত, অসংযত দৈবী শক্তির ওপর সেই ঘোরতর আস্থার দুর্বলতা তিনি কখনোই প্রশংসা করেন নি। 'কালান্তর'-এর 'বাতায়নিকের পত্রে' ১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি তাঁর বহুবার-বলা এই একটি কথাই পুনরায় বলেছিলেন।

চাঁদ সদাগর এবং চণ্ডীমঙ্গলের উল্লেখ করে ১৩২৪ সালের ভাদ্র-সংখ্যায় 'প্রবাসী'তে ছাপা 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধটিতেও তিনি আমাদের মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের দেশ-কাল সম্বন্ধে বলেছিলেন—'আইন নাই, বিচার নাই, জোর যার মুলুক তার; প্রবলের অত্যাচারে বাধা দিবার কোনো বৈধ পথ নাই; দুর্বলের একমাত্র উপায় স্তবস্তুতি, ঘুষঘাষ এবং অবশেষে পলায়ন। দেব-চরিত্র কল্পনাতেও যেমন, সমাজেও তেমন, রাষ্ট্রতন্ত্রেও সেইরূপ।' বহুকালক্রমাগত দুর্বল জাতির অতিমাত্র 'প্রেষ্টিজ'-কাতরতার প্রতিনিধি বা প্রতীক ছিলেন বাংলা মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা। রবীন্দ্রনাথ খুবই স্পষ্টভাবে সে-কথা জানিয়ে গেছেন।

'কবিকাহিনী', 'বনফুল' ইত্যাদি প্রথম পর্বের লেখাগুলির কথা বলতে বলতে ১৮৮০ থেকে শুরু করে, গত শতকের শেষ প্রান্ত পার হয়ে, বর্তমান শতকেরও অনেক বছর পেরিয়ে আসা গেছে। কথায় কথায় তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য' বইখানির কথা উঠেছিল। সেইসূত্রে সেকালের বাংলা সাহিত্যের আসরে সংস্কৃত সাহিত্যের সমাদর সম্বন্ধেও আনুষঙ্গিক কয়েকটি কথা বলে নেওয়া গেল। এবং সেই সূত্র ধরেই ১৮৮০র পর্বে এবং তার পরেও নানা সময়ে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন, সে সব কথার আংশিক এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে স্মরণ করা হোলো। অতঃপর তাঁর সাহিত্য-ধারণার বিশেষত্বের প্রসঙ্গ ভেবে দেখা দরকার।

(১৩) সৌন্দর্য ও সাহিত্য—'সাহিত্য' দ্রষ্টব্য।

সাহিত্যকে তিনি ইন্দ্রিয়বিশেষ বলে মনে করতেন।

॥ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব একটি প্রয়োগ—'সাহিত্য-ইন্দ্রিয়' ॥

'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে 'কাদম্বরীচিত্র' নামে প্রসিদ্ধ প্রবন্ধে তিনি ভাব এবং ভাষার ঐশ্বর্যের কথা বলেছিলেন। ভাব কখনোই সত্যের মতো কৃপণ নয়,—অর্থাৎ বাইরের জগতে যা যা ঘটছে, ঘটেছে বা ঘটে থাকে, সাহিত্যে ঠিক সেই আদর্শ রক্ষা করে কবির ভাবকে যে ব্যক্ত করতেই হবে, এ রকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এই কথাটি ব্যাখ্যা করে তিনি জানিয়েছিলেন—'সত্যের নিকট যে ছেলে কানা, ভাবের নিকট তাহার পদ্মলোচন হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। ভাবের সেই রাজকীয় অজস্রতার উপযোগী ভাষা সংস্কৃত ভাষা। সেই স্বভাববিপুল ভাষা কাদম্বরীতে পূর্ণ বর্ষার নদীর মতো আবর্তে তরঙ্গে গর্জনে আলোকচ্ছটায় বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে।'

সংস্কৃত ভাষার স্বরবৈচিত্র্য, ধ্বনিগাম্ভীর্য, বাগ্‌বিস্তার, উপমাকৌশল, বর্ণনানৈপুণ্য ইত্যাদি গুণের উল্লেখ করে এই প্রবন্ধেই তিনি বলেছিলেন যে, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে লেখকদের অথবা শ্রোতাদের গল্পলোলুপতার নিদর্শন তাঁর কাছে বিরল বলে মনে হয়েছিল। কালিদাসের কুমারসম্ভবে, রঘুবংশে গল্পের তাগিদ বা তাড়নার তুলনায় বর্ণনায় ঝোঁকই বিশেষভাবে চোখে পড়ে। অতঃপর বাণভট্টের প্রসঙ্গে সংস্কৃত গদ্যের বিশেষ সীমিত সামর্থ্যের উল্লেখ করেছিলেন তিনি। তিনি বলেছিলেন: 'দুর্ভাগ্যক্রমে সংস্কৃত গদ্য সর্বদা ব্যবহারের জন্য নিযুক্ত ছিল না, সেইজন্য বাহুশোভার বাহুল্য তাহার অল্প নহে। মেদস্ফীত বিলাসীর ন্যায় তাহার সমাসবহুল বিপুলায়তন দেখিয়া সহজেই বোধ হয় সর্বদা চলাফেরার জন্য সে হয় নাই,—বড়ো বড়ো টীকাকার ভাষ্যকার পণ্ডিত বাহকগণ তাহাকে কাঁধে করিয়া না চলিলে তাহার চলা অসাধ্য।' অলঙ্কারের দিকেই সংস্কৃত গদ্যের আগ্রহ বেশি থাকায় সচলতার দিকে তার এই যে ঘাটতি ঘটেছিল, তারই দৃষ্টান্ত হিসেবে রবীন্দ্রনাথ বাণভট্টের কাদম্বরীর উল্লেখ করে গেছেন। তাঁর অননুকরণীয় রীতিতে তিনি বলে গেছেন যে, বাণভট্ট ভাষার গৌরব লাঘব করে তাঁর গল্পকে কোথাও দৌড় করাননি—'সংস্কৃত ভাষাকে অনুচরপরিবৃত সম্রাটের মতো অগ্রসর করিয়া দিয়া গল্পটি তার পশ্চাতে প্রচ্ছন্নপ্রায়ভাবে ছত্র বহন করিয়া চলিয়াছে

মাত্র। ভাষার রাজমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য গল্পটির কিঞ্চিৎ প্রয়োজন আছে বলিয়াই সে আছে, কিন্তু তাহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই।'

কাদম্বরী কাব্যে ভাষার কারুকার্য সম্বন্ধে আরো বিস্তৃত আলোচনা করে তিনি যে-সব নমুনা দিয়েছেন, তারই একটি এখানে তুলে দেখা যেতে পারে। তিনি দেখিয়েছেন যে, ভাষা আর ভাবের বিশাল বিস্তার রক্ষা করেও সে-কাব্যের চিত্রগুলি কবির অভিপ্রেত আদর্শেই জেগে উঠেছে। 'কাদম্বরী'র প্রথম আরম্ভ-চিত্রটিই তার প্রমাণ।

> 'তখন ভগবান মরীচিমালী অধিক দূরে উঠেন নাই; নূতন পদ্মগুলির পত্রপুট একটু খুলিয়া গিয়াছে, আর তাহার পাটল আভাটি কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত হইয়াছে।'

ভাষার ইন্দ্রজালগুণে, এই ছবিটির মধ্য দিয়ে, যা ব্যক্ত হয়েছে,—রবীন্দ্রনাথের কথায় সে হোলো—'একটি সুরম্য সুগন্ধ সুবর্ণ সুশীতল প্রভাতকাল!' এইসব অংশের অনুবাদ যে সত্যিই অসম্ভব, তিনি সেকথাও জানিয়ে গেছেন। কাদম্বরী কাব্য থেকে একটি সকাল, আর, একটি সন্ধ্যার দৃশ্য বিশেষভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। সকালের কথা একটু আগেই বলা হয়েছে; এবার সেই সন্ধ্যার ছবি—'দিবাবসানে লোহিততারকা তপোবনধেনুরিব কপিলা পরিবর্তমানা সন্ধ্যা'। এই ছবিরই অনুবাদ দিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ—'দিনশেষে তপোবনের রক্তচক্ষু ধেনুটি যেমন গোষ্ঠে ফিরিয়া আসে, কপিলবর্ণা সন্ধ্যা তেমনি তপোবনে অবতীর্ণা।' এই ছবিরই ব্যাখ্যাসূত্রে তিনি লিখেছিলেন—'কপিলা ধেনুর সহিত সন্ধ্যার রঙের তুলনা করিতে গিয়া সন্ধ্যার সমস্ত শান্তি এবং শ্রান্তি এবং ধূসরচ্ছায়া কবি মুহূর্তেই মনের মধ্যে ঘনাইয়া তুলিতেছেন।'

সাহিত্যে ভাব আর ভাষার এই পারস্পরিকতার ফলে যা উৎপন্ন হয়, সে তো কেবল বহির্জগতের যথাযথ বর্ণনামাত্র নয়! সাহিত্যে এই ইঙ্গিতে, ব্যাখ্যানে,—এই ভাবতরঙ্গের উত্থান-পতনের সাহায্যে আমরা সত্যের বোধ লাভ করি। তিনি বলেছেন: 'সত্য যে পদার্থপুঞ্জের স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য, সত্য যে কার্যকারণপরম্পরা, সে-কথা জানাইবার জন্য শাস্ত্র আছে—কিন্তু সাহিত্য জানাইতেছে, সত্যই আনন্দ, সত্যই অমৃত।' আর, এ-মন্তব্য তিনি তাঁর 'সাহিত্য' বইখানির 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধে বিশেষভাবে প্রকাশ

করেছিলেন। সেটি তেরশ' তের সালের লেখা। সেই 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধেই তিনি সাহিত্যের ইঙ্গিতধর্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এদিক থেকে সাহিত্য, সংগীত এবং চিত্রকলার সমধর্মিতার উল্লেখ করেছিলেন। সে বিষয়ে তাঁর নিজের কথাগুলি এই: 'সত্যের এই আনন্দরূপ, অমৃতরূপ, দেখিয়া সেই আনন্দকে ব্যক্ত করাই কাব্যসাহিত্যের লক্ষ্য। সত্যকে যখন শুধু আমরা চোখে দেখি, বুদ্ধিতে পাই, তখন নয়, কিন্তু যখন তাহাকে হৃদয় দিয়া পাই, তখনি তাহাকে সাহিত্যে প্রকাশ করিতে পারি। তবে কি সাহিত্য কলাকৌশলের সৃষ্টি নহে, তাহা কেবল হৃদয়ের আবিষ্কার? ইহার মধ্যে সৃষ্টিরও একটা ভাগ আছে। সেই আবিষ্কারের বিস্ময়কে, সেই আবিষ্কারের আনন্দকে হৃদয় আপনার ঐশ্বর্যদ্বারা ভাষায় বা ধ্বনিতে বা বর্ণে চিহ্নিত করিয়া রাখে—ইহাতেই সৃষ্টি-নৈপুণ্য—ইহাই সাহিত্য, ইহাই সংগীত, ইহাই চিত্রকলা।'

এইভাবে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-চিন্তা অনুসরণ করে গেলে ভাবের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক, বহির্জগতের সঙ্গে অন্তর্জগতের সংযোগ, ইঙ্গিতের সঙ্গে স্পষ্টোক্তির প্রভেদ এবং সাহিত্যের মনোহর রূপের সঙ্গে তার সত্য-সঞ্চার-সামর্থ্যের নৈকট্য বা ব্যবধানের প্রসঙ্গে গিয়ে পৌঁছুতে হয়। 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি বলে গেছেন যে, আনন্দকে বিশুদ্ধ করে পেতে হলে তাকে খণ্ডতা থেকে ছুটি দিয়ে সমগ্রের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এটি তাঁর সারাজীবনের অতি প্রিয় কথা। সাহিত্য যে আমাদের বিশেষ এক ইন্দ্রিয়,—অর্থাৎ, আমরা যেমন চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি,—তেমনি ভাষার ভিতর দিয়ে জগৎকে বিশেষভাবে দেখবার সাধনা যে সাহিত্যের বাহনেই সম্ভব হয়ে উঠেছে,—তাঁর এই বিশ্বাসই তিনি ঐ প্রবন্ধটিতে ব্যক্ত করে গেছেন,—'এইরূপে সাহিত্য আমাদের নূতন একটি ইন্দ্রিয়ের মতো হইয়া জগৎকে আমাদের কাছে নূতন করিয়া দেখায়।' সাহিত্যের এই ইঙ্গিতধর্ম সম্বন্ধে তিনি নিজে তো অনেক কথা বলেইছেন,—তাঁর প্রভাবাধীন অনুগামী লেখকরাও সে-বিষয়ে নানা কথা ভেবেছেন।

১৩২১-এর আষাঢ় সংখ্যার সবুজপত্রে 'বর্ষার কথা' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী জানিয়েছিলেন, 'বর্ষার রূপগণ সম্বন্ধে যা কিছু বক্তব্য ছিল, তা কালিদাস সবই বলে গেছেন—বাকি যা ছিল, তা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। এ বিষয়ে একটি নতুন উপমা কিংবা নতুন অনুপ্রাস খুঁজে পাওয়া ভার। বর্ষা সম্বন্ধে সেকালে

বাঙালী কবিদের নতুন কিছু করবার ছিল না বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর সুপরিচিত কৌতুকের রীতিতেই তিনি বলেছিলেন, 'বর্ষায় রূপ কালো, রস জোলো, গন্ধ পঙ্কজের নয়—পঙ্কের, স্পর্শ ভিজে এবং শব্দ বেজায়। সুতরাং যে বর্ষা আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, তার যথাযথ বর্ণনাতে বস্তুতন্ত্রতা থাকতে পারে, কিন্তু কবিত্ব থাকবে কিনা তা বলা কঠিন। তবু সেই মাসেই সত্যেন দত্ত সেই 'সবুজপত্রে'ই তাঁর 'আষাঢ়ের গান' কবিতাটি লিখেছিলেন। তাতে তিনি জানিয়েছিলেন :

'ঘরে আর নয় রে থাকা,
নয় রে থাকা, নয় রে কভু
পোড়ে তো পুড়বে পাখা।
উড়বে চাতক উড়বে তবু
বাইরে কদম ফুটে
নূতনের পরশ লুটে
হরষের তুফান উঠে
প্রাণ সায়রে'

তারই পরের সংখ্যায় 'সবুজপত্রে'র প্রথম কবিতা ছিল রবীন্দ্রনাথের 'সর্বনেশে'। তিনি লিখেছিলেন :

'এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।
বেদনায় যে বান ডেকেছে
রোদনে যায় ভেসে গো।'

তাঁর এই কবিতারই অন্য এক ছত্রে তিনি বলেছিলেন :

'পথটাকে আজ আপন করে নিয়ো রে।'

১৩২১ সালের সেই 'বর্ষার কথা' প্রবন্ধের মধ্যেই প্রমথ চৌধুরী সুকৌশলে কবিতার বিশেষ কাজ বা বিশেষ লক্ষ্যের কথা জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন,—'ব্যক্তদ্বারা ইন্দ্রিয় এবং অব্যক্তদ্বারা কল্পনাকে অভিভূত না করতে পারলে, দেহ ও মনের সমষ্টিকে সম্পূর্ণ মোহিত করা যায় না।'

সাহিত্য যে একটি স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়,—এবং তার সাহায্যে জগৎকে যে নতুন ভাবে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ সেই কথাই তাঁর নিজস্ব রীতিতে বলে গেছেন।

কল্পনাকে অভিভূত করবার জন্যে সাহিত্যে যথাযোগ্য আয়োজনের যেন আর অন্তই নেই। এই কারণেই এদেশে, বিদেশে—সব কালে, সব দেশে শিল্পাঙ্গিকের বার বার পরিবর্তন ঘটছে। সংকেত, ব্যঞ্জনা, শ্লেষ, রূপক, প্রতীক, সাদৃশ্য-চিন্তার কতো যে বৈচিত্র্য! এই সূত্রে একালের তথাকথিত নানা রকম ইঙ্গিতবাদী সাহিত্যের কথা মনে পড়ে। এডগার অ্যালান পো কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলে গেছেন যে, কোনো একটি আইডিয়া বা ভাবের সঙ্গে সংগীতধর্ম জড়িত হয়ে অনির্দেশ্য যে-সব অনুভূতি সৃষ্টি করে, কাব্য তারই সঙ্গে অন্বিত! এডগার অ্যালান পো'র এই ধারণাটি ফরাসী সাহিত্যে বদলেয়ার গোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। কবিতার প্রকৃতি সম্বন্ধে পো'র এই ধারণা যখন ফরাসী সাহিত্যের মধ্য দিয়ে অ্যামেরিকায় গিয়ে পৌছোয়, তখন কিন্তু সেই আদি ধারণাটি এই সব আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে অনেকটা বদলে গেছে! পো যা বলেছিলেন, সে তো সব দেশের, সব কালের, সব রুচির কবিতা সম্বন্ধে সর্বস্বীকার্য মন্তব্য!—অর্থাৎ তাকে বলা যায় কবিতার সনাতন সংজ্ঞা। ফরাসী সাহিত্যে 'ইম্‌প্রেশনিষ্ট' কবিরা কিন্তু কবিতার অনির্দেশ্য অনুভূতির ওপরেই বিশেষ জোর দিয়ে একটা বিশেষ আঙ্গিক বা কাব্যপ্রযুক্তি প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কোনো একটি কবিতা লেখবার সময়ে কবির মানসিক অবস্থাটি ঠিক যে-রকম হয়, সেই কবিতা পড়বার সময়ে পাঠকের মনের মধ্যে যাতে ঠিক সেই অবস্থার হুবহু প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে, সেই লক্ষ্যেই তাঁরা নিষ্ঠা দেখাতে চেয়েছিলেন। যথার্থ 'ইম্‌প্রেশনিষ্ট' কবিতা অনির্দিষ্ট 'রূপময়'—অর্থাৎ তাতে কবিতার 'রূপ' বা ফর্মের নির্দিষ্ট বাঁধন নেই। কবিতার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সেই বিষয়বস্তুজনিত অনুভূতির অন্বয় থেকে পাওয়া বাচনিক অভিব্যক্তিকে তাঁরা একরকম সামগ্রিক প্রকাশ বলে ধরে নিলেন। তাকেই বলা হোলো 'ইম্‌প্রেশনিষ্ট' প্রকাশ। কবির বিশেষ বিষয়বস্তু আর সেই বিষয়বস্তুজনিত অনির্দেশ্য অনুভূতির মিশ্রণের জন্যেই যে এ-ধরনের প্রকাশকে অনির্দেশ্য ভাবসঞ্চারী বলা যাবে, তা নয়। সব মিলিয়ে অন্বয়টাই হোলো 'ইম্‌প্রেশনিষ্ট' ধরনের। পিটার কুইনেল তাঁর বদলেয়ার ও প্রতীকধর্মী লেখক-সম্প্রদায়ের বিষয়ে আলোচনার মধ্যে অবিশ্যি এডগার অ্যালান পোর প্রভাবের কথাতে কোনোরকম গুরুত্ব দেখাননি। ক্যাথলিক খ্রীষ্টীয় মতবাদের প্রভাবও তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। কিন্তু এখানে সে-প্রসঙ্গের

বিস্তার অনাবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের রচনা-রীতি এবং তাঁর সংকেত-ভাষণের কথাতেই ফেরা যাক।

: মানে, ইশারা, বোঝা, বাজা, 'ভালোবাসা', 'স্নেহবীক্ষণ' :

সাহিত্যের ধারায় রবীন্দ্রনাথ কোনো নব্য-সংকেতবাদের প্রবর্তন করেন নি বটে,—কিন্তু 'মানে', 'ইশারা', 'বোঝা', 'বাজা' ইত্যাদি শব্দ তাঁর কলমে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। সাহিত্যের ইঙ্গিতধর্ম সম্বন্ধে তিনি নানা জায়গায় মনে রাখবার মতন কতো কথাই না বলেছেন! তাঁর প্রত্যেকটি গানই জীবনের আনন্দের ইশারা,—তাঁর প্রত্যেকটি রচনাতেই পরমার্থের গভীর সংকেত! তাঁর 'ফাল্গুনী' নাটকের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে উপমায়—রূপকে—সমাসোক্তিতে তাঁর গভীর অনুরাগ। তিনি যে কত বিচিত্র সাদৃশ্য-চিন্তার ঐশ্বর্য দেখিয়ে গেছেন, সে কি গুণে শেষ করা যায়? মনে পড়ে তাঁর ১৩০১ সালের প্রবন্ধ 'ছেলে-ভুলানো ছড়া'র শেষ দিকে তিনি লিখেছিলেন,—'আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছাভাসমান। দেখিয়া মনে হয়, নিরর্থক। ছড়াও কলাবিচার-শাস্ত্রের বাহির, মেঘবিজ্ঞানও শাস্ত্রনিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়জগতে এবং মানবজগতে এই দুই উচ্ছৃংখল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনাবৃষ্টিতে শিশু-হৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে। লঘুকায়, বন্ধনহীন মেঘ আপন লঘুত্ব এবং বন্ধনহীনতাগুণেই জগদ্‌ব্যাপী হিতসাধনে স্বভাবতই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে, এবং ছড়াগুলিও ভারহীনতা অর্থবন্ধন-শূন্যতা এবং চিত্রবৈচিত্র্যবশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে—শিশুমনোবিজ্ঞানের কোনো সূত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় নাই।'

সাহিত্য-সৃষ্টিতে, বুদ্ধির তুলনায় বোধের নিয়ন্ত্রণ মেনে চলাই যে বেশি আবশ্যিক, সেকথা তিনি তাঁর নানা রচনায় বলে গেছেন। এই 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধেও তিনি বলেছেন—'স্ত্রীলোকদের মধ্যে যে বহুল পরিমাণে যুক্তিহীনতা দেখা যায় তাহা বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক নহে। তাঁহারা যে জগতে থাকেন সেখানে ভালোবাসারই একাধিপত্য। ভালোবাসা স্বর্গের

মানুষ। সে বলে, আমার অপেক্ষা আর-কিছু কেন প্রধান হইবে?' তাঁর এই 'ভালোবাসা' কথাটির মধ্য দিয়েই কবি-মনের বিশেষত্ব সম্বন্ধে তাঁর নিজের ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। এই 'ভালোবাসার' রহস্য সম্বন্ধে তাঁর এ মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য: 'ভালোবাসা একদিকে যেমন প্রভেদসীমা লোপ করিয়া চাঁদে ফুলে খোকায় পাখিতে এক মুহূর্তে একাকার করিয়া দিতে পারে, তেমনি আবার আর-এক দিকে যেখানে সীমা নাই সেখানে সীমা টানিয়া দেয়, যেখানে আকার নাই, সেখানে আকার গড়িয়া বসে। অর্থাৎ তিনি নিজে যাকে 'নির্বস্তুক ভাবনা' বলে গেছেন, কবিরা সেই নির্বস্তুক বা অ্যাব্স্ট্রাক্ট্ বিষয়কেও যে রূপময় করে তোলেন—এবং গ্রাম্যসাহিত্যের ক্ষেত্রেও যে সে কৃতিত্ব বিরল নয়, তারই বিশ্লেষণ এবং দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছিল তাঁর এই 'ছেলেভুলানো ছড়া'-তে। বিশ্লেষণের কথা এতক্ষণ বলা হোলো, এইবার তাঁর নিজের দেওয়া দৃষ্টান্তের কথা:

হাটের ঘুম, ঘাটের ঘুম, পথে পথে ফেরে।
চার কড়া দিয়ে কিন্‌লেম ঘুম, মণির চোখে আয় রে॥

এই উদাহরণে তাঁর গভীর আন্তরিকতা ব্যক্ত হয়েছিল। এটিকে তাঁর কৌতুক-প্রবণতার নিদর্শনমাত্র মনে করা ঠিক নয়। এই কথা থেকেই তিনি মধুসূদনের কাব্যে ব্যবহৃত ঘুমের মানবী-মূর্তির কথা তুলে লিখেছিলেন:

'শুনা যায় গ্রীক কবিগণ এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘুমকে স্বতন্ত্র মানবীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু নৃত্যকে একটা নির্দিষ্ট বস্তুরূপে গণ্য করা কেবল আমাদের ছড়ার মধ্যেই দেখা যায়।

'খেনা নাচন খেনা। বট পাকুড়ের ফেনা॥
বলদে খালো চিনা, ছাগলে খালো ধান।
সোনার জাদুর জন্যে যায়ে নাচনা কিনে আন্॥'

কেবল তাহাই নহে। খোকার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এই নৃত্যকে স্বতন্ত্র সীমাবদ্ধ করিয়া দেখা সেও বিজ্ঞানের দূরবীক্ষণ বা অণুবীক্ষণের দ্বারা সাধ্য নহে, স্নেহবীক্ষণের দ্বারাই সম্ভব।'

পুরাকালে আমাদের দেশে সাহিত্য-চিন্তাশীল মনীষীরা সহৃদয়-হৃদয়সংবেদ্যতার কথা বলেছিলেন। তাঁরা সমবেদনার কথা বলে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ 'ভালোবাসা', 'স্নেহবীক্ষণ' ইত্যাদি শব্দের সাহায্যে সেই একই কথা বলে গেছেন বা এসব শব্দ তিনি সেই একই অভিপ্রায়ে ব্যবহার করেছেন।

'ফাল্গুনী' নাটকে কবিশেখরকে রাজা বলেছিলেন 'ওহে কবিশেখর আমাকে কিছুমাত্র সময় দিয়ো না—প্রাণটাকে জাগিয়ে রাখো—একটা যা হয় কিছু করো—যেমন এই ফাল্গুনের হাওয়াটা যা-খুশি তাই করছে তেমনিতরো।'

সেই ফরমাশের জবাবে কবিশেখর একেবারে তাঁর তৈরি রচনা নিয়েই তখুনি সাড়া দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন: 'তৈরি আছে—কিন্তু সেটা নাটক, কি প্রকরণ, কি রূপক, কি ভাণ তা ঠিক বলতে পারব না।'

তখন রাজা জিগেস করেছিলেন—'তার অর্থ কি কিছু গ্রহণ করতে পারব?'

রাজার মুখে সে-প্রশ্ন শুনে কবিশেখর অসংকোচে আবার জবাব দিয়েছিলেন,—'না মহারাজ, রচনা তো অর্থগ্রহণ করবার জন্যে নয়।'

রচনামাত্রেরই মানে থাকা চাই—আর মানেটা তখনই সুস্পষ্টভাবে গ্রহণ-যোগ্য হতে পারে, যখন আমাদের শব্দজ্ঞান, অর্থজ্ঞান, বস্তুজ্ঞান ইত্যাদি সর্বপ্রকার প্রাসঙ্গিক জ্ঞানের দ্বারাই তা সমর্থিত বা অনুমোদিত হয়।

কিন্তু কবিশেখর বলেছিলেন—'আমার এ-সব জিনিস বাঁশির মতো, বোঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে।'

কবিশেখরের এই কাব্যতত্ত্ব ব্যাখ্যানের প্রধান কথাটাই হোলো অহং-তত্ত্ব। তাঁর নিজের কথায়—'ও বলছে, আমি আছি। শিশু জন্মাবামাত্র চেঁচিয়ে ওঠে, সেই কান্নার মানে জানেন মহারাজ? শিশু হঠাৎ শুনতে পায় জল-স্থল আকাশ তাকে চারদিক থেকে বলে উঠেছে,—'আমি আছি'—তারই উত্তরে ওই প্রাণটুকু সাড়া পেয়ে বলে ওঠে—'আমি আছি'। আমার রচনা সেই সদ্যোজাত শিশুর কান্না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ডাকের উত্তরে প্রাণের সাড়া।'

দ্বিতীয় কথা, কাব্য-রচনায় সচেতন শিল্প-কর্মের অতিরেক বা বাড়াবাড়ি কখনোই কাম্য হতে পারে না। কবিশেখরের নিজের কথায়—'আমি অপ্রস্তুত হয়েই কাজ করতে চাই। বেশি বানাতে গেলেই সত্য ছাই-চাপা পড়ে।'

রবীন্দ্রনাথের নিজের মুখের ভাষা যে তাঁরই নিজস্ব রীতির নমুনা,—সে-কথা তাঁর খুবই কাছের প্রতিবেশী ছিলেন যাঁরা, সেইরকম একজনের কাছ থেকে শোনা গেছে। 'বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ' বইখানিতে মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন :

'যে-ভাষায় রবীন্দ্রনাথ সাধারণ দৈনন্দিন কথাবার্তা বলতেন সে ভাষায় আজ পর্যন্ত সাহিত্যিক ও জ্ঞানী-গুণী কাউকেই কথা বলতে শুনিনি। অথচ সে বাংলা ভাষাই, ঘরোয়া ভাষাই, বিচিত্র ব্যঞ্জনায় সুন্দর, সুকণ্ঠে মধুর। সূক্ষ্ম অনুভূতি আলো-ঝলমল কৌতুকোজ্জ্বল ভাষার দ্যুতিতে চারিদিক উল্লসিত করে তুলত। কারো সাধ্য নেই তার যথাযথ অনুলিখন বা স্মৃতিলেখন করে।'

শুধু তাই নয়—কেবলমাত্র তাঁর উপস্থিতিই কী কম বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল ? মৈত্রেয়ী দেবীই পুনরপি জানিয়েছেন :

'তিনি কি করেছেন, কি লিখেছেন, তাঁর মতামত যুক্তিসহ কি নয়, গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য, ভালো কি মন্দ কিছুই জানা না থাকলেও শুধু তাঁর উপস্থিতিই যে জ্যোতি বিকীর্ণ করতো, অতি প্রত্যক্ষ ছিল তার অনুভব। বস্তুত: আমরা অনেকেই যখন তাঁকে দেখে অভিভূত বোধ করেছি তখন তাঁর কাব্য পড়ে পারদর্শী হইনি। আলো যেমন সকল প্রশ্নের অতীতরূপে নিঃসংশয়ে চক্ষুষ্মানের চোখের সামনে উদ্‌ভাসিত, তেমনি তাঁর প্রতিভার ইন্দ্রিয়ানুভব সহজ ও নিঃসংশয় ছিল।'

সাহিত্যে গভীর বোধের সত্যই অনতিসচেতন এক-একরকম ভঙ্গি অবলম্বন করে ব্যক্ত হয়ে থাকে—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস। এই বিশেষ কথাই তিনি বিভিন্ন সময়ে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন রচনায় বলে গেছেন। 'আকাশ প্রদীপে'র একটি কবিতায় তাঁকে বলতে শোনা গেছে : 'যুক্তি নয়, বুদ্ধি নয়, শুধু সেথা কত কী যে হয়!' সেই দুনিরীক্ষ্য অন্তর্লোকের কথা তাঁর শেষ পর্বের কত কবিতাতেই না বলা হয়েছে! সেই অন্তরিন্দ্রিয় দিয়ে তিনি যখন বিশ্বজগৎকে দেখেছেন তখন সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে,—সারা বিশ্বের সঙ্গে তিনি তাঁর একাত্মতা অনুভব করেছেন। এ-কথা তাঁর 'প্রভাত সংগীতে'ও আছে, 'ছিন্নপত্রেও' আছে,—আবার, তাঁর শেষ পর্বের বই 'বীথিকার' অন্তর্ভুক্ত আদিতম' নামে একটি কবিতায় সেই একই কথা তাঁকে বলতে শোনা গেছে :

প্রাণের প্রথমতম কম্পন
অশথের মজ্জায় করিতেছে বিচরণ,
তারি সেই ঝংকার ধ্বনিহীন—
আকাশের বক্ষেতে কেঁপে ওঠে নিশিদিন ;

মোর শিরাতন্ত্রতে বাজে তাই ;
সুগভীর চেতনার মাঝে তাই
নর্তন জেগে ওঠে অদৃশ্য ভঙ্গিতে
অরণ্যমর্মর-সংগীতে।

এবং ১৩৪১ সালের সেই কবিতাটিরই শেষ ক'লাইনে তাঁর সারাজীবনের সত্য-বোধ তিনি আর-একভাবে, আর-একবার ব্যক্ত করেছিলেন :

ধরণীর ধূলি হতে তারার সীমার কাছে
কথাহারা যে ভুবন ব্যাপিয়াছে
তার মাঝে নিই স্থান,
চেয়ে-থাকা দুই চোখে বাজে ধ্বনিহীন গান।

এ উপলব্ধিও তাঁর সেই বিশেষ ইন্দ্রিয়ের দান! রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সম্পর্কিত নানান আলোচনা থেকে তাঁর এই ধরনের আত্মাবিষ্কারের অসংখ্য নমুনা তুলে দেখানো যেতে পারে। কিন্তু সামান্য একটি চামচে দিয়ে সমুদ্রের জল তুলে লাভ কি। তার চেয়ে বরং অবগাহনই বাঞ্ছিত!

রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠের এই বিচিত্র আনন্দে তাঁর সত্তার নানামুখিতার কথা মনে আসে। তাঁর সম্বন্ধে 'আদিকথা' তাই কেবলমাত্র বিশেষ একটা সময়বিস্তারের সীমাচিহ্নিত নয়। তাঁর শৈশব-বাল্য-নবযৌবনের পর্ব পেরিয়ে তাঁর শেষ বয়সের বিভিন্ন রচনার প্রসঙ্গও এসে পড়ে।

রবীন্দ্র-জীবনের কয়েকটি ব্যক্তিগত দিক

রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশি বছরের মর্ত্য জীবনে—তাঁর বিচিত্র সাহিত্য রচনার নানা পর্বে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র সঙ্গী পেয়েছিলেন! স্নেহে, মমতায়, প্রীতিতে যাঁরা তাঁর খুবই সন্নিহিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে পিতা দেবেন্দ্রনাথ,—অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর উৎসাহ এবং প্রেরণার কথা অবশ্যই স্মরণীয়। তরুণ বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের হাত থেকে তাঁর সম্মান লাভের কথাও বিবেচ্য। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে প্রিয়নাথ সেন এবং লোকেন পালিতের নাম চিরস্মরণীয়। 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁর 'সন্ধ্যাসংগীত' পর্বের কথা-প্রসঙ্গে তিনি লিখে গেছেন :

> 'সন্ধ্যাসংগীতের' জন্ম হইলে পর সূতিকাগৃহে উচ্চস্বরে শাঁখ বাজে নাই বটে কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যে তাহাকে আদর করিয়া লয় নাই তাহা নহে। আমার অন্য কোনো প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি—রমেশ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ-সভার দ্বারের কাছে বঙ্কিমবাবু দাঁড়াইয়াছিলেন ;—রমেশবাবু বঙ্কিমের গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন, 'এ মালা ইঁহারই প্রাপ্য—রমেশ, তুমি সন্ধ্যাসংগীত পড়িয়াছ?'

বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে রবীন্দ্রনাথ সে-সময়ে এই যে সম্মান লাভ করেছিলেন, এ-ছাড়া সেই পর্বেই প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। রবীন্দ্রনাথ সে-প্রসঙ্গও 'জীবনস্মৃতির ঠিক পরের পৃষ্ঠাতেই বিবৃত করেছেন। তাঁর নিজের কথায় :

> 'এই সন্ধ্যাসংগীত রচনার দ্বারাই আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম যাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মত আমাকে কাব্যরচনার বিকাশ-চেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। তৎপূর্বে ভগ্নহৃদয় পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাসংগীতে তাঁহার মন জিতিয়া লইলাম। তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায়

সকল ভাষার সকল সাহিত্যের বড়ো রাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সর্বদা আনাগোনা। তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূরদিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল।'

সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ধারণাটা তুচ্ছ নয়। তবে, সৎ পাঠক-মাত্রেরই একটি বিশেষ অধিকার থাকা দরকার। প্রিয়নাথ সেনের সেই বিশেষ অধিকার ছিল। তাঁর ভালো-লাগা মন্দ লাগা শুধু তাঁর নিজের ব্যক্তিগত রুচির কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ পুনরপি জানিয়ে গেছেন: 'একদিকে বিশ্বসাহিত্যের রস-ভাণ্ডারে প্রবেশ ও অন্যদিকে নিজের শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস—এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভকালেই যে কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত তাহা বলা শক্ত।

প্রিয়নাথ 'ভগ্নহৃদয়' পড়ে খুশি হননি, 'সন্ধ্যাসংগীত' পড়েই কিন্তু খুবই খুশি হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নিজেই তা জানিয়ে গেছেন।

তারপর, আঠারো-শ-আশির দশকের সেই সন্ধ্যাসংগীত-এর আমল থেকে বেরিয়ে, সুদূর ভবিষ্যতেরবীন্দ্রনাথের আয়ুষ্কালের শেষ দশকে এগিয়ে আসা যাক। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ। বাংলা হিসেবে ১৩৪০ সালের ২৯-এ আষাঢ় শান্তি-নিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেনের রচনা-সঙ্কলন—'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলির জন্যে 'মুখবন্ধ' লিখে দিয়েছিলেন। ১৩২৩ সালের ৮ই কার্তিক প্রিয়নাথ লোকান্তরিত হন। প্রিয়নাথের পুত্র প্রমোদনাথ সেন ঐ বইখানির 'নিবেদন' অংশে জানিয়েছিলেন: 'পিতৃদেব বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অপেক্ষা প্রায় ৫।৬বৎসরের বড় ছিলেন। উভয়ের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, প্রগাঢ় ভালবাসা এবং সহোদর-প্রীতি ছিল। উভয়ের মধ্যে চিঠির আদানপ্রদান সর্বদাই হইত। রবিবাবুর অধিকাংশ চিঠি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যতগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহা মুদ্রিত করিলে একখানি সুবৃহৎ পুস্তক হয়। তখনকার দিনে রবিবাবু প্রায় প্রত্যহ আমাদের বাড়িতে আসিতেন এবং সাহিত্যচর্চায় কখন

কখন সমস্ত দিনই অতিবাহিত করিতেন। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা যে কতদূর ছিল, তাহা রবিবাবুর 'জীবনস্মৃতি' এবং পত্রসমূহ পাঠে বেশ বোঝা যায়।' রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর ঐ 'মুখবন্ধে' লিখেছিলেন যে তিনি যখন তরুণ লেখক, নতুন নতুন কাব্যরূপের সন্ধানে নিজের পথ রচনার নিত্য-প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যখন তাঁকে চলতে হয়েছে, সেই সময়ে অকৃত্রিম অনুরাগের সঙ্গে প্রিয়নাথ তাঁকে নিত্যই উৎসাহিত করেছেন। দীর্ঘকাল পরে, ১৩৪০ সালে প্রিয়নাথের সেইসব রচনার আংশিক সংগ্রহ প্রকাশের আয়োজন দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের জীবনের সেই অতিক্রান্ত অধ্যায়ের কথা কিঞ্চিৎ আবেগের সঙ্গেই ভেবে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর নিজের কথায়—'সেদিনকার অপেক্ষাকৃত নির্জন সাহিত্যসমাজে শুধু আমার নয়, সমস্ত দেশের কিশোর-বয়স্ক মনের বিকাশ-স্মৃতি এই বইয়ের মধ্যে উপলব্ধি করছি। বৎসর গণনা করলে খুব বেশিদিনের কথা হবে না, কিন্তু কালের বেগ সর্বত্রই হঠাৎ অত্যন্ত দ্রুত হয়ে উঠেছে, তাই অদূরবর্তী সামনের জিনিষ পিছিয়ে পড়তে দেখতে দেখতে, নিজেরই জীবিতকালের মধ্যে যুগান্তরের স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে। বহুকালের বহুদেশের জ্ঞান ও ভাবের ভাণ্ডারে প্রিয়নাথ সেনের চিত্ত সমৃদ্ধি লাভ করেছিল তবু তিনি যে-কালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, এখনকার পাঠকদের কাছে সে দূরবর্তী। সেই কালকে বঙ্কিমের যুগ বলা যেতে পারে। সেই বঙ্কিমের যুগ এবং তার অব্যবহিত পরবর্তী যুগারম্ভ কালীন বৈদগ্ধ্যের আদর্শ এই বই থেকে পাওয়া যাবে এই আমার বিশ্বাস।'

প্রিয়নাথের এই বইখানিতে 'মানসী' এবং 'চিত্রাঙ্গদা' সম্পর্কে দুটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। তাঁর লেখার অভ্যাস সম্বন্ধে পুত্র প্রমোদনাথ জানিয়েছেন যে, নিজের রচনার পাণ্ডুলিপি রক্ষা সম্বন্ধে কোনরকম সযত্ন প্রয়াস ছিলনা তাঁর।—'যখন কোন বিষয়ে লিখিবার বাসনা হইত তখন তিনি হাতের কাছে যাহা কিছু পাইতেন…… তাহাতেই লিখিতেন।' রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি চিঠি এবং প্রিয়নাথেরও একখানি চিঠি এই বইয়ের 'পরিশিষ্ট' অংশে ছাপা হয়েছে। তাছাড়া দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একাধিক চিঠিও পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৩০২-৭ সালে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্লোকের আবহাওয়া কী রকম ছিল, প্রিয়নাথকে লেখা এইসব চিঠির মধ্যস্থতায় সে-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য খবর পাওয়া যায়। ১৩০৬ সালের ৭ই এবং ১০ই আষাঢ়ের পরপর দুখানি চিঠিতে

শিলাইদহ, কুমারখালি থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথকে 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সম্পর্কে এক 'অত্যন্ত কুৎসিত আক্রমণের' কথা জানিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ৭ই আষাঢ়ের চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'এসম্বন্ধে যদি তোমার কোন বন্ধুকৃত্য করিবার থাকে ত করিবে।' ১০ই আষাঢ়ের চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন : 'মন শান্ত না থাকিলে আমি কোন কাজ করিতে পারি না—সেইজন্য জীবনকে নিষ্ফলতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকল প্রকার ক্ষোভের কারণ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করি—কিন্তু সংসারে কাঁটার উপরে পা না ফেলিলেও কাঁটা আপনি আসিয়া পায়ে ফোঁটে ;—দুঃখ বেদনার পূর্ণ অংশ হইতে বঞ্চিত হইবার উপায় নাই—আছে নিজের মনে—তাহার সাধনা মাঝে মাঝে অবলম্বন করি, কিন্তু তাহার সিদ্ধি বহুদূরে। ডাক্তার জগদীশ বসু লেখকের কাপুরুষতার প্রতি ঘৃণা এবং আমার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া একখানি সুন্দর পত্র লিখিয়াছেন—তোমার এবং তাঁহার এই পত্রে আমি মনের মধ্যে বিশেষ বল লাভ করিয়াছি,—বন্ধুহৃদয়ের সমবেদনা আমার পক্ষে বৃষ্টি-ধারার মত—তাহা আমার সফলতা লাভের এক প্রধান সহায়।' ৩১শে শ্রাবণের চিঠিতে, রবীন্দ্রনাথ সেইদিনই চন্দ্রনাথ বসুর যে চিঠিখানি পেয়ে-ছিলেন, সেটি নকল করে পাঠিয়েছিলেন। চন্দ্রনাথ তাতে 'কণিকা', 'কথা', 'কল্পনা' এবং ক্ষণিকা'র প্রশংসা করে লিখেছিলেন, 'আমি ক্ষুদ্র—সুতরাং আমার গতি বড় ধীর—আমি তোমার সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছি না। পিছাইয়া পড়িতেছি—কিন্তু তোমার গতি দেখিয়া চমকৃত হইতেছি—ও গতি যথার্থ বিদ্যুতের গতি—যেমন দ্রুত তেমনি উজ্জ্বল তেমনি সুন্দর। ও গতি এখানকার নয়, উর্ধ্বদেশের, মহাকাশের। রবীন্দ্রনাথ, তোমার পরিমাণ করিতে পারি যথার্থই এমন শক্তি আমার নাই।'

সেই সময়ে 'প্রদীপ' পত্রিকায় প্রিয়নাথের 'রস্কিন্' [Ruskin] সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। তাতে তিনি বলেছিলেন যে রাস্কিন্ ইংরেজ সাধারণকে সৌন্দর্যের মন্ত্রে দীক্ষিত তো করেইছেন, তিনি সেদেশে ললিত-কলার চর্চায় নতুন প্রাণ সঞ্চারও করেছেন। ধর্ম এবং নীতির সৌন্দর্যসাধক হিসেবে রাস্কিন্ যে স্মরণীয়, সে-কথা প্রিয়নাথ বিশেষভাবেই ঘোষণা করেছিলেন। অক্সফোর্ডে রাস্কিন্ যখন ছাত্র হিসেবে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র আঠারো বছর। তখন সেখানে তরুণ ছাত্রদের মধ্যেও

'মদ্যপায়িতার সীমা ছিল না'। রাস্কিন্ সকলের সঙ্গে বসে মদ নিঃশেষ করতেন বটে, কিন্তু যথারীতি মদ খেয়ে নয়—নিজেরই ভেতরের জামার মধ্যে গেলাসের মদ ঢেলে দিয়ে! রাস্কিনের 'নৈতিক বা আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যে' বিশ্বাস এবং অন্য সম্প্রদায়ের যাতে আস্থা - সেই 'ভৌতিক বা শারীরিক সৌন্দর্য',—সৌন্দর্যের এই দুই স্তরই প্রিয়নাথ সমন্বিতভাবে মেনে নিয়েছিলেন।

১৩০৭ সালের ২৬-এ শ্রাবণের চিঠিতে শিলাইদহ থেকে প্রিয়নাথের কাছে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে চল্লিশ বছর বয়সের কর্মময় পূর্ণতার প্রসন্নতা ছিল,—প্রিয়নাথের সম্বন্ধে তাতে তাঁর আন্তরিক প্রীতির খবর আছে—আবার তাঁর তখনকার প্রিয় কবিতার বই 'ক্ষণিকা' সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের কথাও একাধিকবার উচ্চারিত হয়েছে। প্রিয়নাথের 'রস্কিন' সম্পর্কিত লেখাটি তখন 'প্রদীপ' পত্রিকায় ছাপা হচ্ছিল! রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা'র অনেক কবিতাই তখন বেরিয়ে গেছে। 'চোখের বালি' তখন লেখা শুরু হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সেই চিঠিতে প্রিয়নাথকে জানিয়েছিলেন—'রাস্কিন শেষ করে ফেল! এবং আমার ক্ষুদ্র ক্ষণিকাটিকেও ভুলো না। লেখা সম্বন্ধে নদীর উপমা খাটে না—যদি খাটত তা হলে আমার সেই বিনোদিনীর সুদীর্ঘ কাহিনীটি এতদিনে খাতার মধ্যে শেষ হয়ে থাকত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে না লিখলে লেখা অগ্রসর হয় না—জগতের এমন কঠোর নিয়ম। অতএব লিখে ফেল।'

'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি' বইখানির 'পরিশিষ্ট' অংশে এর পরে আর একখানি চিঠি ছাপা হয়েছে, যাতে প্রিয়নাথকে তিনি 'বিজয়ার' অভিবাদন জানিয়েছিলেন। সেই চিঠিতে তারিখ নেই, শুধু রবিবার - এই উল্লেখটুকু আছে। নিজের লেখার অভ্যাস সম্বন্ধে তাতে তাঁর আত্মকথাও দেখা যায়—'ঝড় বৃষ্টি চলচে। আমি চতুর্দিকে সার্সি বন্ধ করে গরম হয়ে বসে লেখবার চেষ্টায় আছি। এবারে যখন আসবে তোমাকে শোনাবার মত কিছু সংগ্রহ থাকবে। ...দেবী সরস্বতীর দ্বারে কিঞ্চিৎ মুষ্টিভিক্ষা করচি মাত্র—এবং তিনি তখন অনুগ্রহ করে যা দেন আমি সে সম্বন্ধে কোন প্রকার দ্বিরুক্তি মাত্র না করে ঝুলিটির মধ্যে পুরি। আর কিছু না হোক ঝুলিটি উত্তরোত্তর ভরে উঠচে। এত অধিক বোঝা নিয়ে অমরতার পথে অধিক দূর যাওয়া কি না সে একটা বিবেচ্য বিষয়। এক এক সময় নৌকা বাঁচাবার জন্যে মালের বস্তা ফুটো-

চাবটে, জলের মধ্যে টেনে ফেলে দিতে হয়—আমারো অনেক বস্তা ফেলা দরকার।'

'ক্ষণিকা'র 'কর্মফল' কবিতা সেই আমলের রচনা। 'ক্ষণিকা' বই হয়ে বেরিয়েছিল ১৩০৭ এর শীতকালে,—খ্রীষ্টাব্দের হিসেবে ১৯০০ সালে 'কর্মফল' কবিতায় তিনি লিখেছিলেন :

পরজন্ম সত্য হলে
কি ঘটে মোর সেটা জানি
আবার আমায় টানবে ধরে
বাংলা দেশের এ রাজধানী

এবং

অনেক লেখায় অনেক পাতক ;
সে মহাপাপ করব মোচন।
আমায় হয়ত করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন।

অতঃপর ১৩০৭ সালেরই শেষদিকে—১৯০১-এর ঈষ্টারের কয়েকদিন আগে লেখা তারিখহীন একখানি চিঠিতে প্রিয়নাথকে লোকেন পালিত এবং অতুলচন্দ্রের (ছদ্মনাম বীরেশ্বর গোস্বামী) কথা জানিয়ে নিজের তখনকার লেখা সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন—'বিনোদিনী লিখতে আরম্ভ করেছি—কিন্তু তার উপরে ভারতী এবং বঙ্গদর্শন উভয়েই দৃষ্টি দিয়েছেন, ভারতী প্রত্যহই তাঁর ভিক্ষাপাত্রটি আমার দ্বারে ফেরাচ্চেন। এমন করলে আমি ত আর বাঁচিনে।' তারপর ২৮-এ শ্রাবণের চিঠিতে 'চিরকুমার সভা'র উল্লেখ ছিল। 'চিরকুমার সভা' ১৩০৭-৮ সালে 'ভারতী'তে ছাপা হয়। প্রিয়নাথের কাছে লেখা এই চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন : 'আমি নানাপ্রকার ছুতোয় নানাপ্রকার কুঁড়েমি করে অবশেষে কাল বৈকালে চিরকুমার সভায় হস্তক্ষেপ করেছি—আজ বৈকালে সমাধা করার আশা করচি। অবশ্য চিরসমাধা নয় —কেবল আশ্বিনের কিস্তি।' এরপরে যে চিঠিখানি ছাপা হয়েছে তাতেও তারিখের উল্লেখ নেই। কিন্তু 'চিরকুমার সভা' এবং 'বিনোদিনী'র উল্লেখ আছে। 'চিরকুমার সভা'র শেষ দিকটা তিনি যে 'ক্রমাগত তাড়া খেয়ে বিরক্ত হয়ে' শেষ করেছিলেন, সে-কথা প্রকাশ করে, চিঠির শেষ দিকে 'বিনোদিনী' প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন : 'বিনোদিনী সম্বন্ধে একটা সুবিধা এই যে

অন্তত মাস তিনেকের মত লেখা সংশোধন করে ঠিক করে লিখে রেখেছি—সুতরাং কতকটা রয়ে বসে সমাধা করতে পারব। কিন্তু তবু খণ্ড খণ্ড করে এ রকম গল্প বেরোলে জিনিসটা অসমান হয়ে পড়ে। সব জায়গা ত সমান সরস ও কৌতুকাবহ হতেই পারে না—সুতরাং মাঝে মাঝে বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনে হতাশ হতোদ্যম হতে হবেই। এরকম বই সবটা একসঙ্গে না পড়লে উত্তরোত্তর বিকাশ এবং ঘনায়মান পরিমাণ পাঠকের মনে দৃঢ় করে বসে না। এ গল্পে ঘটনাবাহুল্য একেবারেই নেই, সেইজন্যে এটা ক্রমশঃ প্রকাশের যোগ্য নয়—কিন্তু মাসিক পত্রিকার করাল কবল থেকে একে যে বাঁচাতে পারব এমন আশা করিনে। সেকালের দৈত্যকে যেমন পালাক্রমে এক-একটি নর-খাদ্য দিতে হত—একালে মাসিক পত্রকেও সেইরকম এক-একটি সাধের রচনা পর্যায়ক্রমে দিয়ে শোক করতে হয়।'

১৩০৭ সালের চৈত্র মাসে লেখক হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে যে কী পরিমাণে তাঁর খ্যাতির খাজনা দিতে হয়েছে, তার বিবরণ পাওয়া যায় ১১ই চৈত্র, ১৩০৭ সালের চিঠিতে। তিনি সে চিঠিতে জানিয়েছিলেন: 'কাল চিরকুমার শেষ করিয়া ফেলিয়া হাড়ে বাতাস লাগাইতেছি—এমন সময় বঙ্গদর্শনের সম্পাদকী লইবার জন্য শ্রীশ, শৈলেশ দুই ভাইয়ের নিকট বন্দুকের দুই চোঙভরা অনুরোধ আমার মস্তকে বর্ষিত হইয়াছে—কিন্তু ধরাশায়ী হই নাই। তোমাকে সম্পাদক পাকড়াও করিবার জন্য শৈলেশকে উত্তেজিত করিয়া পত্র লিখিয়াছি। বেগার খাটুনির তাগিদে নানা লোক তোমার দ্বারে ধন্না দেয় আর একটা ধন্না বাড়িলে বোঝার উপর শাকের আঁটি পড়িবে। পরের অনুরোধে লক্ষ্মীর দলিলপত্র ফসাফস লেখ, আর সরস্বতীর মৌরসী দলিল কেন না লিখিবে?'

প্রিয়নাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যের কথা 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি তো বলেইছেন,—তা ছাড়া তাঁর ঐসব চিঠিপত্রেও সেকথা বার বার বলা হয়েছে। কিন্তু নিজের মনের প্রকৃতি এবং নিজের সেই প্রকৃতির সঙ্গে প্রিয়নাথের প্রকৃতির সাদৃশ্য খুবই তীব্রভাবে উপলব্ধির উল্লেখ আছে আর-একখানি তারিখহীন চিঠিতে। তাতে তিনি লিখেছিলেন: 'আমার বোধ হয় আমাদের এরকম গভীর চেনাশুনো হয়ে গেছে তাই জন্যে আমাদের বেশি

কথাবার্তার দরকার হয় না। আমরা বোধহয় দুজনে এক ঘরে চুপ করে বসে থাকতে পারি। জানিনে আমাকে তুমি কি রকম মনে কর—কিন্তু আমি তোমার কথা বেশ বুঝতে পারি—তোমাকে অত্যন্ত প্রতিবেশী বলে বোধ হয় দুজনের এক ভাষা।···তর্ক সকলেরই সঙ্গে করা যায়—কিন্তু সকলের সঙ্গে কল্পনা করা যায় না।' সেই চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথ আরো লিখেছিলেন—'নিজের লেখা নিয়ে ভারি খুঁৎখুঁৎ করচি কিছুতেই তৃপ্তি বোধ হচ্চে না। তোমাকে খুলে বলচি নিজের লেখার উপর আমার ভারী সন্দেহ জন্মায়—তাই যোগ্য ব্যক্তির কাছে আমার লেখার নিন্দে শুনলে আমি তবে সত্য সত্যই ভারি দমে যাই—আমার মনে হয় আমি তোমাদের ফাঁকি দিচ্ছি—দুই চারবার তোমাদের চোখে পড়লেই সমস্ত ধরা পড়বে। এক এক সময় মনে হয় কিছু না লেখা ভাল। অপমানিত হয়ে জগৎ থেকে বিদায় নিতে ভারি কষ্ট হয়। তাই জন্যে আমার মনে হয়, আমি যে ঠকাচ্ছি আমি তার মূল্য একদিন নিশ্চয় ফিরিয়ে দেব।'

রাস্কিনের সৌন্দর্য-ধারণার কথা-প্রসঙ্গে রাস্কিনের বিশ্বাসের কথা তিনি এইভাবে ব্যক্ত করেছিলেন: 'তাহাই সৌন্দর্য, যাহা কলা-উপভোগক্ষম বৃত্তিকে আনন্দ দেয় যাহা কোন উন্নত উদার ব্যক্তির দ্বারা উদ্ভাবিত বা সৃষ্ট এবং সমধর্মা অপর ব্যক্তির দ্বারা উপভুক্ত বা দৃষ্ট।' তারপর তিনি নিজে প্রশ্ন করেছিলেন: 'কিন্তু রাস্কিনের ঐ উক্তিগুলির ভিতর যে ধর্মভাব ও আস্তিকতার বীজ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা কি সত্য? এমন ভক্ত আস্তিক কি নাই, কলাপারদর্শিতা ত দূরের কথা, সৌন্দর্যজ্ঞানই যাহার নাই? আস্তিকতা, ভক্তি, বা ধর্মভাব কলাজ্ঞান বা কলা-রচনা শক্তি উদ্বোধিত করে না। কলা-রচনার পক্ষে সৌন্দর্য-জননী শক্তি আবশ্যক—এমন অনেক কলারসিক জগতে আছে এবং ছিল, সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে যাহাদের সমকক্ষ নাই, কিন্তু যাহারা ঘোরতর নাস্তিক এবং নীতি সম্বন্ধে যাহাদের জীবন জঘন্য।' এই যুক্তির ধারাতেই প্রিয়নাথ ফরাসী লেখক Taine-এর কথা স্মরণ করে, 'নীতিসম্বন্ধে ললিত-কলার উদাসীনতা' প্রসঙ্গে টেইনের বিশ্বাস, এবং কীট্‌সের এই উক্তি—'ইয়াগো (Iago) সৃষ্টিতে কলাকুশলী যে আনন্দ পান, আইমোজেন (Imogen) সৃষ্টিতেও সেই আনন্দ পান'—এসব তো উল্লেখ করেইছেন, তা ছাড়া রাস্কিনের নিজের মতের প্রতিবাদে রাস্কিনেরই এই বিশেষ ধারণাও স্মরণ করেছেন যে—'টিশিয়ান

(Titian) নামক খ্যাতনামা চিত্রকরের চিত্রসকলে ধর্মভাবের গন্ধ পর্যন্ত না থাকিলেও তাহারা কলাসৌষ্ঠবের পূর্ণ ও অদ্বিতীয় আদর্শ।' এইসব যুক্তি-তর্কের প্রবাহে প্রিয়নাথ এক জায়গায় তাঁর নিজের লেখা 'বিবসনা' নামে একটি চতুর্দশপদী কবিতা তুলে দেখিয়ে বলেছিলেন: 'রবীন্দ্রনাথের 'রাত্রে ও প্রভাতে' নামক মধুরার্থপূর্ণ সুন্দর কবিতায় যেমন একই নায়িকা নিশা ও উষা ভেদে ক্রোড়-লগ্না সোহাগ-চুম্বিতা প্রেয়সী ও মঙ্গলময়ী ভক্তি-পূজিতা দেবী, তেমনই প্রকৃত কলা-রসিকের নিকট সৌন্দর্য কখন শরীরী, কখন চিন্মাত্র,—কখন রতি, কখন বিশ্বলক্ষ্মী।' প্রিয়নাথের নিজের সৌন্দর্য-ধারণা ছিল কলাকৈবল্যবাদের অনুকূলে। তিনি বলেছিলেন, 'ফলকথা সৌন্দর্য —কেবলমাত্র সৌন্দর্য—প্রত্যেক কলা-ব্যবসায়ীর মূলমন্ত্র হওয়া চাই—তাহা হইলেই কলা-বিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হইবে।'—এবং তাঁর এই 'রস্কিন' প্রবন্ধে তিান সৌন্দর্য সম্বন্ধে শিল্পীর আদর্শের কথা পুনরায় এইভাবে ব্যক্ত করেছিলেন: 'উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহার সারমর্ম এই: কলা-বিদ্যার কার্য চিত্তরঞ্জন, সে চিত্তরঞ্জন সৌন্দর্য-সৃষ্টির দ্বারা সাধ্য। সৌন্দর্য বলিলে আমরা সকল সৌন্দর্যই বুঝিব—কেবলমাত্র রস্কিনের ন্যায় নৈতিক বা আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য বুঝিব না, বা অপর সম্প্রদায়ের ন্যায় কেবলমাত্র ভৌতিক বা শারীরিক সৌন্দর্য বুঝিব না। কারণ, ললিতকলার অধিকারের সীমা নাই। সমস্ত মানবজীবনই ইহার ক্ষেত্র। বিশ্বসংসারে যাহা কিছু আছে সকলই ললিতকলার বিষয়ীভূত হইতে পারে। যখনই যাহা তুমি সুন্দর করিয়া মানবের চক্ষে ধরিবে, তখনই তুমি ললিতকলার সৃষ্টি করিলে। সৌন্দর্যের জন্যই ললিত-কলা। ইহাই Art for Art কথার প্রকৃত অর্থ।'

প্রিয়নাথের এই লেখাটিতে সাহিত্য-সৌন্দর্যের কথায় সাহিত্যকে যতোটা অন্যনিরপেক্ষ শিল্পসত্যের শাসনাধীন বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল, সাহিত্যে নীতিরক্ষার দায়িত্ব মোটেই সে-ভাবে মানা হয়নি। যুক্তির দ্বারা সে মত স্বীকার্য কী স্বীকার্য নয়, সে-প্রসঙ্গ অল্প কথায় মিটবে না। কথায়-কথায় তিনি স্টাইলের কথায় এগিয়েছিলেন। ফরাসী সমালোচক সেণ্ট ব্যুভ এবং ফরাসী ঔপন্যাসিক ফ্লবেয়ারের কথাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর 'রস্কিন' প্রবন্ধে রাস্কিন তো আলোচিত হয়েইছেন, তাছাড়া আরো অনেকের নাম করা হয়েছিল। 'প্রদীপ' পত্রিকায় এই প্রবন্ধ পড়ে ৬ই আষাঢ়ের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ

তাঁকে জানিয়েছিলেন, 'প্রদীপে রাস্কিনের সমালোচনা উপলক্ষে কাব্য ও নীতি সম্বন্ধে যা লিখেছ আমি তার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। আকৃতির সৌন্দর্য এবং আচরণের সৌন্দর্য সবই ললিতকলাবিধির অধিকারভুক্ত, কিন্তু সৌন্দর্যের হিসাবে না গিয়ে কোনপ্রকার নৈতিক আবশ্যকতা, সামাজিক উপযোগিতার হিসাবে গেলেই আর্টের লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে হয়।'

রবীন্দ্রনাথের প্রিয়নাথ কথা সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন বলেছিলেন বটে,—কিন্তু প্রিয়নাথের অভিপ্রায় যা-ই থাক, প্রিয়নাথ খুব বিশদভাবে যা বলতে পারেন নি,—সে-সব কথা রবীন্দ্রনাথকেই বলতে হয়েছিল। প্রিয়নাথের যে-উক্তিগুলি এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে, তাতে 'সৌন্দর্যের হিসাবে' নীতি উপলব্ধি,—এবং সেই ভাবে দেখার ফলে ললিতকলার আস্বাদনে নীতিও যে অবাঞ্ছিত নয়, তাও যে ধর্তব্য,—সেই কথাটিও রবীন্দ্রনাথ এই একটিমাত্র বাক্যে অতি সুন্দরভাবে বলতে পেরেছিলেন। তিনি যখন এ চিঠি লেখেন, প্রিয়নাথের পুরো প্রবন্ধটি তখনো ছাপা হয় নি। কিন্তু সেটুকু পড়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই ৬ই আষাঢ়ের চিঠিতে লিখেছিলেন: 'ধর্মনীতির সৌন্দর্য যে সৌন্দর্য নয়, একথা যে বলে সে অন্ধ। গোলাপের সৌন্দর্য যেমন সুন্দর, সুন্দর হৃদয়ের সৌন্দর্য তেমনি সুন্দর...। গান কর্ণগোচর সুন্দর, রূপ চক্ষুগোচর সুন্দর, সাধু-হৃদয় মনোগোচর সুন্দর। তোমার প্রবন্ধের অপরাংশের জন্য উৎসুক আছি।'

'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি'তে এই চিঠির ঠিক পরেই যে-চিঠিখানি ছাপা হয়েছে, তাতে প্রিয়নাথ সেন, লোকেন পালিত এবং কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন—রবীন্দ্রনাথ একসঙ্গে তাঁর এই তিন প্রিয়জনের কথা স্মরণ করেছিলেন। তার আগের চিঠিতেই ১৭ই আষাঢ় রবীন্দ্রনাথের বড়দাদার কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহের কথা ছিল বলে জানানো হয়েছিল,—'ক্ষণিকা' ছাপার কাজে বড়ো বিলম্ব ঘটছিল বলে তিনি যে হতাশ্বাস হয়ে পড়ছিলেন, তাও জানিয়েছিলেন। তারপর সেই তিন প্রিয়জনের-স্মরণ-চিহ্নিত চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এই অনুযোগ করেছিলেন যে, প্রিয়নাথ নাকি সে-সময়ে চিঠি লিখতে কার্পণ্য করছিলেন! লোকেন পালিত বহুকাল পরে দেশে ফিরেছেন তখন, কিন্তু তাঁর কাছ থেকেও 'এক-লাইন খবর নাই'—আর, 'কবি দেবেন্দ্র সেন শিলাইদহে আসিবেন আশ্বাস

দিয়া পত্র লিখিলেন তারপরে আজ তিনদিন তাঁর আর কোন কোন সংবাদ নাই'।

'ক্ষণিকা'র উৎসর্গ-কবিতায় লোকেন পালিতের উদ্দেশ্যে লেখা হয়:

ক্ষণিকারে দেখেছিলেম
ক্ষণিক বেশে কাঁচা খাতায়
সাজিয়ে তারে এনে দিলেম
ছাপা বইয়ের বাঁধা পাতায়
আশা করি নিদেন-পক্ষে
ছ'টা মাস কি এক বছরই
হবে তোমার বিজন বাসে
সিগারেটের সহচরী।

প্রিয়নাথ সেন আর লোকেন পালিত—সে-পর্বে এঁরা দুজনেই ছিলেন তাঁর অত্যন্ত অনুরাগী,—খুবই পক্ষপাতী পাঠক।

চাষী, প্রজা, সাধারণ মানুষ:

প্রথম জীবনের সাহিত্যানুরাগী প্রিয় পার্শ্বচরদের মধ্যে অজিত চক্রবর্তী, সতীশ রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যেমন,—যেমন বলেন্দ্রনাথ,—তেমনি তাঁর জীবনের শেষ পর্বে ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। এঁরা ছাড়া আরো অনেকেই ছিলেন। শিল্পী, সাহিত্যিক ইত্যাদি নিকটবর্তী গুণগ্রাহী ব্যক্তিদের কথা তো বটেই, তাছাড়া তাঁর প্রথম জীবনের শিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য, রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য ব্রজবাবু,—নর্মাল স্কুলের শিক্ষক সাতকড়ি দত্ত এবং গোবিন্দবাবু,—গুণদাদা, শ্রীকণ্ঠ সিংহ এবং আরো অনেকের কথা স্মরণীয়।

সাহিত্যক্ষেত্রের বাইরেও অনেক ব্যক্তিগত প্রীতির জায়গা ছিল তাঁর। যেমন, শিলাইদহ থেকে কাটোয়া পর্যন্ত নতুন রাস্তা তৈরী হয়েছে। সেই রাস্তা দেখতে দেখতে রবীন্দ্রনাথ চলেছেন। কোথা থেকে এক পাগল এসে তাঁকে প্রণাম করে বলে, 'হুজুর, সেলাম।' নাম তার লালা পাগলা। শীতে তার খুবই কষ্ট হয়। লালার কথা শুনে সেই থেকে রবীন্দ্রনাথ তাকে তখনি একখানা কম্বল দেবার ব্যবস্থা করেন। অনেকবার অনেক ছড়া শুনিয়ে গেছে সেই লালা পাগলা। ছড়া বানাবার দক্ষতা ছিল তার। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ অধিকারী তাঁর 'সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ' বইখানিতে 'বাবু-মশাই'য়ের

(রবীন্দ্রনাথ) সম্বন্ধে লালা পাগলার গভীর অনুরাগের কথা লিখেছেন, আর তার নিজের তৈরী এই ছাড়াটিও তুলে দিয়েছেন :

'আমার দয়াল জমিদার
(হায়) নাই তুলনা তাঁর।
তাঁর মুখখানি হয় চাঁদের নাগাল্
হাত দুটি সোনার।'

'ছিন্নপত্রে' শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দরিদ্র প্রজাদের সম্বন্ধে তাঁর যে মমতার কথা লিখেছিলেন,—তারা যে তাঁর চোখে 'বিধাতার শিশুসন্তানের মতো নিরুপায়' মূর্তিতে দেখা দিয়েছিল, শচীন্দ্রনাথের বইয়ে 'নিমাই ঠ্যাটা'র কাহিনীই তার প্রমাণ। গ্রামের সম্পন্ন চাষী ছিল নিমাই। কিন্তু সে বড়ো মামলাবাজ মানুষ। বুড়ো নবীন মহাজনের কাছে নিজের যে বসতবাড়ি বাঁধা রেখে সে দুশো টাকা ধার নিয়েছিল, সে ধার শোধ করবার আগেই, সেই একই সম্পত্তি দেখিয়ে ঠাকুর-জমিদারদের কৃষিব্যাঙ্ক থেকেও সে তিনশো টাকা আবার ধার নেয়। তার দম্ভে দৌরাত্ম্যে গ্রামের লোক অস্থির হয়ে ওঠে। শেষে নালিশ হয়। নবীন মহাজনের চেষ্টায় ডিক্রীজারিতে নিমাইয়ের বাড়ি ক্রোকের পরোয়ানা বের হয়। ঠাকুর-জমিদারপক্ষও বাকি খাজনার এবং কৃষিব্যাঙ্কের খতের নালিশ করেছেন। সেই অবস্থায় এক অমাবস্যার গভীর রাত্রে নিমাই পদ্মায় রবীন্দ্রনাথের বোটে এসে হাজির! শচীন্দ্রনাথ লিখেছেন —'সে সাঁতরে বোটের পাশে এসে দেখল বাবু-মশাই যেন ধ্যানে নিমগ্ন। তাঁকে সচকিত করবার জন্যে সে বোটের সঙ্গে পিঠ লাগিয়ে ঠেলে বোটখানাকে বেশি জলে নেবার জন্যে প্রাণপণে ধাক্কা দিল। তার পরিশ্রমের ফল ফলল, কিন্তু সে হাঁপিয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেল।'

রবীন্দ্রনাথ চমকে উঠেছিলেন। নিমাইকে জিগেস করেছিলেন—'তোমার কি প্রাণের ভয় নেই?' তার দুঃখের কাহিনী শুনে রাত দুটোয় ম্যানেজার বাবুকে চিঠি লিখে পরদিন ভোরে তাঁকে কাগজপত্র নিয়ে আসতে বলেছিলেন। তারপর নিমাইকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। নিমাই তাঁর কথা শুনে 'লক্ষ্মীমন্ত চাষী' হয়ে উঠেছিল। শচীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'নিমাই বাবু-মশায়ের উপদেশে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। 'সে প্রায়ই বলত,—সে গুষ্টিশুদ্ধ মরে কবে ভূত হয়ে যেত। কিন্তু আকাশ থেকে দেবতা এসে তাকে বাঁচিয়েছেন।'

পদ্মার বোটে ঘুরতে ঘুরতেই মৃতপ্রায় ত্রিবেণী মাঝিকে ভেসে যেতে দেখে তিনি নিজের বোটে তুলে নিজেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করে তাকে সুস্থ করে তুলেছিলেন। তারপর হেড্ মাঝি তপসীর অধীনে তার কাজ শেখবার ব্যবস্থা করে দেন। ত্রিবেণী পরে হেড্ মাঝি হয়। শচীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'তপসী মরে গেলে ত্রিবেণী হল হেড্ মাঝি ; তবু তপসীর ছেলে-বৌ শিলাইদহে বাস করত—অনেকদিন মাসহারা পেত এস্টেট থেকে।' তিনি আরো লিখেছেন —'বোটের মাঝি ফুলচাঁদ, তপসী, রামগতি ত্রিবেণী—এরা যেন রবীন্দ্রনাথের সন্তান। রবীন্দ্রনাথের 'পদ্মা', 'চিত্রা', 'দুর্গা' 'সাত্রাই' বোটগুলো যেন এ: মহামূল্যে পৈতৃক সম্পত্তি বলে জ্ঞান করত।'

'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে (১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের রচনা), 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে (১৯০৪) তাঁর পদ্মাবাসের অভিজ্ঞতার প্রভাব আছে। শিলাইদহে গোপীনাথ ঠাকুরের রথযাত্রা, স্নানযাত্রার মেলায় ছেলেদের আনন্দের দৃশ্য ইত্যাদি দেখে তিনি কবিতা লিখেছেন, গল্প লিখেছেন। 'দুই বিঘা জমি'র 'রাখি হাটখোলা, নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে'—এও শিলাইদহের রাস্তার বর্ণনা। সেখানকার 'গুরুচরণ অধিকারী'ই যে সে-কবিতার 'রাজা' বা 'বাবু' এবং 'যদু দত্ত'ই যে 'উপেন'—এ অনুমান আছে শচীন্দ্রনাথের বইখানিতে। ১৩২১ সালের আষাঢ়ে লেখা 'বোষ্টমী' গল্পের 'আনন্দী বোষ্টমী' যে শিলাইদহের 'সর্বক্ষেপী'রই সাহিত্যিক রূপান্তর, সে-কথাও তিনি বলেছেন।

ঃ বাসগৃহ ঃ

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের চিত্তাকর্ষক নানা তথ্যের মধ্যে বাসস্থান সম্বন্ধে তাঁর নিত্য-নতুনত্বের আগ্রহ বা অভিনবত্ব-স্পৃহা স্মরণীয়! তাঁর ছেলেবেলার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কথা-প্রসঙ্গে তিনি সে-বাড়ির বিশেষ কয়েকটি জায়গার উল্লেখ করেছেন,—যেমন, সে-বাড়ির বারান্দার রেলিং, উত্তরের গোলাবাড়ি, দক্ষিণের বারান্দা, দক্ষিণের বাগান, কাছারিবাড়ি ইত্যাদি।

'জীবন-স্মৃতি'র মধ্যে 'ঘর ও বাহির' এবং 'বাড়ির আবহাওয়া' নামে যে দুটি অধ্যায় দেখা যায়,—দিন-রাত সাহিত্যের হাওয়ায় ভরপুর সেকালের সেই ঠাকুরবাড়ির কথা সেই দুটি অধ্যায়েই বিশেষভাবে বলা হয়েছে। তিনি যখন খুবই ছোটো ছিলেন, তখন এক একদিন সন্ধ্যার সময় বারান্দার রেলিং ধরে চুপ

করে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাঁর খুড়তুত ভাই 'গণেন্দ্রদাদা তখন রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়ে 'নবনাটক' লিখিয়ে বাড়িতে অভিনয় করাচ্ছিলেন। সেই গণেন্দ্রদাদার কনিষ্ঠ গুণদাদা তখন—'তাঁহার দক্ষিণের বারান্দায়, তাঁহার দক্ষিণের বাগানে, পুকুরের বাঁধা ঘাটে মাছ ধরিবার সভায় মূর্তিমান দাক্ষিণ্যের মতো বিগ্তমান! আর, বড়োদাদা তখন 'কী একটা কিম্ভূত কৌতুকনাট্য' লিখেছিলেন। প্রতিদিন দুপুরে গুণদাদার বড়ো বৈঠকখানার ঘরে তারই মহড়া চলতো, আর এ-বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে, খোলা জানলার ভেতর দিয়ে কিছু অট্টহাস্য আর কিছু গান শুনতে শুনতে, বালক রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর সেকালের সহচরদল অক্ষয় মজুমদার মশায়ের উদ্দাম নৃত্যের টুক্‌রো টুক্‌রো ছবি দেখতে পেতেন!

এসবই রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতির' স্মৃতিকথা। যাঁরা তাঁর খুবই কাছাকাছি ছিলেন, তাঁদের মধ্যেই কেউ কেউ জানিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথের বাড়ির শখ ছিল বিচিত্র রকম। দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে শান্তিনিকেতনে দেহলিভবন তৈরি হয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথের প্রায় পনেরো বছর কেটেছে। সে বাড়িটি খুবই ছোটো। তিনি নাকি বলেছিলেন যে, কেবল একখানি খাট আর একটি জলচৌকি থাকতে পারে এই রকম মাপের বাড়িই তাঁর বিশেষ ভালো লাগতো। 'খেয়া'র অনেক কবিতাই তিনি তাঁর 'দেহলি'র ওপরের ঘরে বসে লিখেছিলেন। বারবার বাসস্থান পরিবর্তন করা তাঁর স্বভাব ছিল। পর পর উত্তরায়ণ, কোনারক, শ্যামলী ইত্যাদি কুটীর তাঁরই বাসের জন্যে তৈরি হয়!

ঘরের বর্ণনা তাঁর গদ্য পদ্য অজস্র রচনায় দেখা দিয়েছে। কোনো এক সময়ে তিনি যে তাঁর ঘরের জানলার নাম রেখেছিলেন 'নেত্রকোণা', তাঁর শেষপর্বের কাব্যগ্রন্থ 'শ্যামলীর' 'উৎসর্গ' কবিতাটিতে সে-খবরও পাওয়া গেছে:

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে
আমের শাখায় আঁখি ধেয়ে যায় সোনার রসের আশে।
লিচু ভরে যায় ফলে,
বাদুড়ের সাথে দিনে আর রাতে অতিথির ভাগ চলে।
বেড়ার ওপারে মৈহুমি ফুলে রঙের স্বপ্ন বোনা
চেয়ে দেখে দেখে জানালার নাম রেখেছি—'নেত্রকোণা'

বিকেলের আলোয়,—সকালের রোদে,—দিনের নানা প্রহরে ঘরের নানা অংশ আলোকিত হয়ে উঠেছে তাঁর চেতনায় :

সাড়ে ছটা বাজে, সোজা হয়ে রোদ চলে আসে মোর ঘরে,
পথে দেখা দেয় খবরওয়ালা বাইক-রথের পরে।
পাঁচিল পেরিয়ে পুরোনো দোতালা বাড়ি,
আলসের ধারে এলোকেশিনীরা ঝোলায় সিক্ত শাড়ি।

'শ্যামলী'র শেষ কবিতায় নিজের নিত্যপথচারী, অনাসক্ত সত্তার ছায়া রেখে গেছেন তিনি। যাকে 'শ্যামলী' বলে আহ্বান করেছেন, তাকেই বলেছেন :

পথের ধারে গাছতলাতে তোমার বাসা, শ্যামলী,
তুমি দেবতাপাড়ার বেদের মেয়ে।
বাসা ভাঙ 'বারে বারে, খালি হাতে বেরিয়ে পড়' পথে,
এক নিমেষে তুমি নিঃশেষে গরিব, তুমি নির্ভাবনা।
তোমাকে যে ভালোবেসেছে
গাঁটছড়ার বাঁধন দাওনি তাকে ;
বাসরঘরের দরজা যখন খোলে রাতের শেষে
তখন আর কোনোদিন চায় না সে পিছন ফিরে।

: স্ত্রীর কথা :

১৩০৯ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী-বিয়োগ হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল একচল্লিশ বছর। তার আগে, ১৩০৭ সালে তাঁর বড় মেয়ে বেলার এবং ১৩০৮ সালে মেজো মেয়ে রেণুকার বিয়ে হয়ে গেছে। ছোটো মেয়ে মীরার বয়স তখন মাত্র দশ বছর ; আর ছোটো ছেলে শমীন্দ্র তখন মাত্র আট বছরের বালক। বড় ছেলে রথীন্দ্রের বয়স তখন পনেরো বছর। স্ত্রীর মৃত্যুর, অল্পকালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথকে আরো কিছু আঘাত পেতে হয়। সেই দুর্ঘটনার মাত্র ছ'মাস পরে, ১৩১০ সালের গ্রীষ্মকালে আলমোড়াতে রেণুকার মৃত্যু হয়। সেই বছরেই মাঘ মাসে রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন সতীশচন্দ্র রায় লোকান্তরিত হন। ১৩১১ সালের ৬ই মাঘ দেবেন্দ্রনাথের তিরোধান—এবং

১৩১৪ সালের মাঝামাঝি—পূজার সময়ে, মুঙ্গেরে শমীন্দ্রনাথের জীবনাবসান ঘটে। সে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা।

স্ত্রীর এবং কন্যার অসুখের সময়ে রবীন্দ্রনাথ খুবই মন দিয়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-শাস্ত্র পড়তে থাকেন। তখন থেকে শুরু ক'রে তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি বায়োকেমিক চিকিৎসাশাস্ত্রের অনুরাগী ছাত্র ছিলেন।

তাঁর স্ত্রী—শুকদেব রায় চৌধুরী গোষ্ঠীর বেণীমাধবের কন্যা মৃণালিনী দেবীর নাম ছিল ভবতারিণী। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রাহ্মমতে যখন তাঁর বিয়ে হয়, তাঁর বয়স তখন দশ পেরিয়ে এগারোতে পড়েছে। তাঁর জন্ম ১২৮০ সালে,—আর বিবাহ হয় ১২৯০ সালে ২৪-এ অগ্রহায়ণ। বিয়ের সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোতে ছিলেন না। নদীপথে ভ্রমণরত অবস্থায় তিনি তখন বাঁকিপুরে পৌঁছেছিলেন। সেখানে তিনি খবর পান যে, ঐ ২৪এ অগ্রহায়ণ তারিখেই শিলাইদহের জমিদারিতে তাঁর বড়ো জামাই সারদাপ্রসাদ মারা গেছেন।

বিয়ের দু'দিন আগে দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি পেয়েছিলেন, তাতে বক্সার থেকে পিতা দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে জানিয়েছিলেন—'এইক্ষণে তুমি জমিদারির কার্য পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও…'। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন বাইশ বছর। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'ভবতারিণী' নামটি বেমানান বলেই তাঁর নাম বদলে 'মৃণালিনী রাখা হয়। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: 'রবি-মৃণালিনীর প্রণয় সম্বন্ধ কবিকল্পিত চিরপ্রসিদ্ধ, তাই মনে হয়, এই নাম কবিকৃত কল্পনা-জাত। মতান্তরে, কবির প্রিয় 'নলিনী' নামের ইহা প্রতিশব্দ। স্বামী-স্ত্রীর সুখ-সম্পর্ক সম্বন্ধেও একটি মন্তব্য আছে একই রচনাতে—'বৈষ্ণব কবিতায়' কবি যে, ধরার সঙ্গিনী'র চিত্র-বর্ণনা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার কল্পনামাত্র নহে, ইহা বাস্তবিকের অনুভূতি-অনুস্যূত পরিণাম ; কবির সেই চিত্রগত বর্ণ কবিপত্নীর সাংসারিক জীবনে নানাবিষয়িণী শক্তিতে মূর্ত ও সার্থক হইয়া উঠিয়া ইহা সপ্রমাণ করিয়াছে।'

বিয়ের পরে ইংরেজি-শিক্ষার জন্যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বালিকা-বধূকে লোরেটো হাউসে ভর্তি করিয়ে দেন। তাছাড়া আদি-ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের কাছে তাঁর সংস্কৃত শেখবার ব্যবস্থা করেন। মৃণালিনীর সংস্কৃতচর্চার মধ্যে বাংলায় মূল রামায়ণ অনুবাদের দায়িত্ব ছিল।

বলেন্দ্রনাথও মাঝে মাঝে এই সংস্কৃত চর্চায় তাঁর কাকিমাকে সাহায্য করতেন। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তাঁর মায়ের এই সময়কার অনুবাদ-চর্চার একটু নমুনা পাওয়া গেছে। মৃণালিনীর নিজের হাতে পেন্সিলে লেখা একটি পাতা,—তাতে মহাভারত, মনুসংহিতা, ঈশোপনিষদ প্রভৃতির অনুবাদ আছে। রবীন্দ্র ভবনে সেই পৃষ্ঠাটি সংরক্ষিত আছে।

১২৯৪ সালের শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ সস্ত্রীক, সকন্যা [বেলা] গাজিপুরে গিয়েছিলেন। এই সূত্রে হরিচরণ বলেছেন: 'সপরিবারে গাজিপুরে বাস সাংসারিক কবিজীবনের প্রথম ও প্রধান পর্ব।'

মৃণালিনী সাজ-সজ্জা ভালোবাসতেন। রবীন্দ্রনাথ নাকি বলতেন—মুখে রঙ মেখে মেয়েরা কি অসভ্য দেশের মানুষ সাজতে চায়। একদিন মৃণালিনী কানে দুটি ফুল-ঝোলানো বীরবৌলি পরেছিলেন। হঠাৎ স্বামীকে দেখে তিনি কানে হাত চাপা দিয়ে কানের সেই গয়না লুকোতে চেষ্টা করেন!

এক সেট সোনার বোতাম গড়িয়ে তিনি স্বামীকে জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সোনার বোতামে আপত্তি জানালে তিনি আবার ওপাল-বসানো বোতাম গড়িয়ে দিয়েছিলেন। নানারকম রান্নাও ভালো-বাসতেন তিনি। শান্তিনিকেতনের অতিথিশালায় রবীন্দ্রনাথ তখন মাঝে মাঝে সপরিবারে বাস করতেন। হেমলতা দেবী এবং দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন মৃণালিনীর সহায়ক। রবীন্দ্রনাথ নাকি সে-সময়ে তাঁর স্ত্রীকে বলতেন, 'লিখতে লিখতে রোজ শুনি, চাই ঘি, চাই চিনি, চাই সুজি, চিঁড়ে, ময়দা. মিষ্টি তৈরি হবে; যত চাচ্ছ, তত পাচ্ছ, মজা হয়েছে খুব; দ্বিপু ত কখনো 'না' বলবে না, যত চাইবে ততই দেবে, তার মত কর্তা আর তোমার মত গিন্নী হলে, হয়েছে আর কি, দুদিনেই ফতুর।' মৃণালিনী বলতেন, 'দ্বিপু সংসার বোঝে, তার সঙ্গে কাজ করেও সুখ, তোমার এতে নজর দেওয়া কেন?' তাঁর রান্নার হাত খুব ভালো ছিল। চিঁড়ে পুলী, দইয়ের মালপো, আমের মিঠাই তৈরিতে তাঁর নাকি বিশেষ দক্ষতা ছিল। হরিচরণ লিখেছেন: 'রবীন্দ্রনাথ রন্ধনরত পত্নীর পার্শ্বে মোড়ায় বসিয়া...নূতন রকমের রান্নার পাকা ফরমাস করিতেন, মাল-মশলা দিয়া নূতন প্রণালীতে পত্নীকে রান্না শিখাইয়া শখ মিটাইতেন। এবং শিখানর জন্য গৌরব করিয়া বলিতেন—'দেখলে তোমাদেরই কাজ, তোমাদের কেমন এই একটা শিখাইয়া দিলুম।'

মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ নিজের আহার্যের পরিমাণ খুবই কমিয়ে দিতেন। কারো কথা শুনতেন না। মৃণালিনীকে বাড়ির বৌরা বলতেন, 'বলুন না কাকিমা কাকামশায়কে কিছু পুষ্টিকর খাদ্য খেতে।' তিনি বলতেন, 'তোমরা চেন না, বললে আরো জেদ বাড়বে। না খেয়ে দুর্বল হয়ে সিঁড়িতে উঠতে মাথা ঘুরে পড়ুন আগে, তারপরে নিজেই শিখবেন, কারো শেখান কথা শেখার মানুষ নন।'

'চিরকুমার সভা' লিখে রবীন্দ্রনাথ যখন কলকাতায় আসেন, তখন সত্যিই এই অল্পাহার-জনিত দুর্বলতার ফলে সিঁড়ি ভেঙে তেতলায় ওঠবার সময়ে একদিন মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সে কথা বলেছেন। অতিথির সংখ্যা তাঁদের বাড়িতে চিরকালই বেশি ছিল। মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করে তিনি নাকি ভুলেও যেতেন। একদিন প্রিয়নাথ সেনকে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করে এই রকম ভুলে গিয়েছিলেন। সকলের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে তখন। প্রিয়নাথ উপস্থিত হলেন। মৃণালিনী ব্যাপার বুঝে অল্প সময়ের মধ্যে রান্না ক'রে সেদিন কবির মান রক্ষা করেছিলেন।

চিত্তরঞ্জন দাস প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতেন এবং সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময়ে বলতেন, 'কাকিমা, বড়ো খিদে পেয়েছে।' কাকিমা উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পিছপা হননি কখনো।

মৃণালিনী অভিনয় করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পার্কস্ট্রীটের বাড়িতে 'রাজা রাণীর' অভিনয়ে তিনি 'নারায়ণীর' ভূমিকা নিয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় চালাবার জন্যে পুরীতে রবীন্দ্রনাথের বাড়িটি বিক্রি করতে হয়েছিল। হরিচরণ লিখেছেন: 'অলঙ্কার বিক্রি করিয়া মৃণালিনী দেবী বিদ্যালয়ের পরিচালনায় সহায়তা করেন।'

মৃত্যুর আগে মৃণালিনী প্রায় দু'মাস রোগ-শয্যায় ছিলেন। সেই প্রসঙ্গে হরিচরণ লিখেছেন, 'রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া কবি এই দীর্ঘকাল পীড়িত পত্নীর যেরূপ সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাহা কদাচিৎ কোন সৌভাগ্যবতী আয়ুষ্মতীর ভাগ্যে সম্ভব হয়। তখন বৈদ্যুতিক পাখা ছিল না, হাতপাখার বাতাসে দিনের পর দিন কবি রোগিনীর রোগজ্বালা প্রশমিত করিয়াছিলেন।' ...'১৩০৯ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ রবিবার নিশীথ সময়ে মৃণালিনীর মৃত্যু

হয়। 'পত্নীর জীবিতাবসানের পরে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া কবি একাকী ছাদে চলিয়া যান ; সমস্ত রাত্রি ছাদেই কাটিয়া যায়।'

'স্মরণ' বইখানি তাঁর পত্নীশোকের কাব্য। তাতে এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন :

'তখন নিশীথ রাত্রি ; গেলে ঘর হতে
যে পথে চলনি কভু সে আজানা পথে।
যাবার বেলায় কোনো কহিলে না কথা,
লইয়া গেলে না কারো বিদায়-বারতা।
সুপ্তিমগ্ন বিশ্বমাঝে বাহিরিলে একা,
অন্ধকারে খুঁজিলান, না পেলাম দেখা।
মঙ্গল মুরতি সেই চিরপরিচিত
অগণ্য তারার মাঝে কোথা অন্তর্হিত।'

রবীন্দ্রায়ণ

১৩৩৮ সালের পৌষে বেরিয়েছিল 'জয়ন্তী উৎসর্গ'। কবির সত্তর-পূর্তি উপলক্ষে তাঁর সেই সংবর্ধনা গ্রন্থে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'রবীন্দ্রায়ণ' নামে একটি কবিতা ছাপা হয়। সে লেখাটির শেষ কয়েক ছত্রে তিনি লিখেছিলেন :

আজি শুধু স্তব্ধ হয়ে ভাবি মনে, কী যে তুমি ধন
বিধাতার আশীর্বাদ,—তব স্পর্শে ধন্য এ জীবন।
কবির প্রেরণা তুমি চিত্তমাঝে, ভক্তের বিনতি
তব পদপ্রান্তে আজি জানাইনু প্রাণের প্রণতি।

রবীন্দ্রনাথ যে কতো বড় কবি ছিলেন, সে-কথা স্তব্ধ হয়ে ভাববার কথা! তাঁর স্পর্শে আমাদের জীবন যে ধন্য হয়েছে, সে-কথা একবাক্যে অনেকে বলেছেন। তিনি যে কেবলমাত্র কবি ছিলেন, তা নয়। সমাজচিন্তায় রাষ্ট্রচিন্তায়,—শিক্ষা-ব্যবস্থাপনায়, — শিল্পরুচি-সৃষ্টিতে, — গানে, — সাধারণ আলাপের ভাষায়,—অভিনয়ে, - অনুবাদে,—ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ এবং নানা শ্রেণীর বিজ্ঞান আলোচনাতেও তাঁর মৌলিকতা এবং কৃতিত্বের কথা সুপরিচিত। তাঁর অনেক দিনের বন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিজে একজন প্রসিদ্ধ সাংবাদিক আর সম্পাদক ছিলেন বলেই বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথের পত্রিকা সম্পাদনার প্রসঙ্গ তাঁর বিশেষ মনোযোগের বিষয় ছিল। সেই রামানন্দ বলে গেছেন: 'রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সব কাগজের মধ্যে 'সাধনা' শ্রেষ্ঠ সেকালে আমার এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল। তাহা পরিবর্তন করিবার কোন কারণ ঘটে নাই। 'সাধনার' শ্রেষ্ঠত্বের কারণ, তাঁহার লেখাতেই ইহার কলেবর অনেকখানি পূর্ণ হইত। তাছাড়া, অন্য যে-সব লেখা বাহির হইত, তাহার উপরও তাঁহারই ব্যক্তিত্বের ও লিখিবার সম্বন্ধে তাঁহার স্বকীয় ছাঁদের ছাপ অনুভব করিতাম। ইহার কারণ, বোধ হয়, এই যে, তিনি অন্য লেখকদের লেখা সুধরাইয়া দিতেন, হয়ত সেগুলি অনেকটা তাঁহার দ্বারা পুনর্লিখিত হইত। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মত লেখকের লেখাও তাঁহার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া তবে 'সাধনা'য় বাহির হইত। বলিতে গেলে, তিনি অনেক

লেখককে গড়িয়া পিটিয়া মানুষ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে রচনার উৎকৃষ্ট পথ দেখাইয়া দিয়াছেন।' এখানে রামানন্দের আরো একটি উক্তি উদ্ধৃত হওয়া দরকার। তিনি বলে গেছেন : 'কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর উৎকৃষ্ট লেখাই ছাপিব অথচ মাসিক পত্রটা ঠিক নির্দিষ্ট দিনে বাহির করিব, এরূপ প্রতিজ্ঞা সেই সম্পাদকই করিতে পারেন, যিনি স্বয়ং মাসিক পত্রের জন্য আবশ্যক সব রকম গদ্য ও পদ্য রচনা প্রচুর পরিমাণে জোগাইতে পারেন। এই যোগ্যতা বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথের যেমন দেখিয়াছি, আর কাহার সেরূপ দেখি নাই।'

সমবায় শিল্পোন্নয়নের পথও তিনি মেনেছেন,—শিক্ষা-ব্যবস্থায় উদার সর্বান্বয়ও তিনি স্বীকার করেছেন,—দেশে-দেশে বার-বার ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি,—শেষ বয়সে চিত্র-রচনাতেও উদ্যত হয়েছেন! গান্ধীজী তাঁকে 'গুরুদেব' বলতেন, জগদীশচন্দ্রের তিনি বন্ধু ছিলেন,—ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জবাহরলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসু—এবং জীবনের বিভিন্ন মহলের স্বনামধন্য আরো অনেকেই তাঁর স্নেহ-প্রীতি-মমতার নৈকট্যে বাস করে গেছেন। অসংখ্য মানুষের বাসভূমি অন্তহীন এই মর্তলোকে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় কবি! রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের তিনি ছিলেন বিশেষ গুণগ্রাহী। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর তিনি ছিলেন অকৃত্রিম অনুরাগী। বাংলা দেশ আর বিশাল ভারতবর্ষের বাইরে বিস্তীর্ণ সভ্য দুনিয়ার অজস্র নামকরা মানুষের সান্নিধ্যে এসেছিলেন তিনি। একটি কবিতায় তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল—'যেখানেই বন্ধু পাই, সেখানেই নবজন্ম ঘটে।'

তাঁর অজস্র গদ্য-পদ্য-নাট্য রচনার ধারায় যে-কথাটি প্রধান,—যা গভীর-ভাবে বেজেছে,—সে তাঁর সর্বদর্শী, সর্বত্রজাগর ঐক্যানুভূতির আনন্দ! তাঁর বন্ধু আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এই ঐক্যের তত্ত্বই আর এক পথে উপলব্ধি করেছিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিজের বিজ্ঞান-সাধক সত্তার আন্তরিক মিলনের সানন্দ স্বীকৃতি রেখে গেছেন তিনি!

যে-বছর রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন, সেই ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে—বোলপুরের সন্নিহিত রায়পুকুরের সিংহ-পরিবারে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে বোলপুর জায়গাটি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের খুব ভালো লেগে যায়। বাংলা হিসেবে সে ছিল ১২৬৮ সালের ঘটনা। তার পরের বছর—১২৬৯ সালে,—মাঠের মধ্যে

দুটি মাত্র ছাতিম গাছ-ঘেরা বেশ খানিকটা জায়গা নেওয়া হয় দেবেন্দ্রনাথের নির্জন সাধনার জন্যে। তারপর ধীরে ধীরে শান্তিনিকেতন গড়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পিতার উপনিষদ-অনুরাগী অন্তর্মুখী মনের গভীর সংযোগের কথা বলা হয়েছে। অথচ সংসারের স্থূল কর্তব্য বলতে যা বোঝায়, কম-বেশি সে-রকম যাবতীয় কর্তব্যই তাঁকে মানতে হয়েছে। তাঁর জীবনে—পিতা-মাতা-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ইত্যাদি সংসারের প্রিয় সম্পর্কে বার-বার শোকাগ্নি-নিক্ষেপে মৃত্যুর কোনো কার্পণ্য ছিল না! ঈর্ষাগ্রস্ত সম-সাময়িকদের সান্নিধ্য থেকে আত্মরক্ষা করবারও উপায় ছিল না তাঁর। তবু এই সব অসামর্থ্য সত্ত্বেও পরমাশ্চর্য অন্য এক সামর্থ্য ছিল তাঁর! তিনি লোকান্তরিত হবার পরে আচার্য যদুনাথ সরকার সে-কথা জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

'রবীন্দ্রনাথ কখনও জনতার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নেতৃত্ব-লোভে হুঙ্কার—অর্থাৎ বীণার সপ্তমে চড়া সুর বাদন করেন নাই; এরূপ ধস্তাধস্তি কাজের পক্ষে তাঁহার আন্তরিক অসামর্থ্য ছিল। যে দাঁড়িপাল্লায় মণে মণে কয়লা ওজন হয়, তাহার কাজ বৈজ্ঞানিক গবেষণাগৃহের ব্যাল্যান্সে করিতে পারে না। তিনি একবার স্বদেশপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া কিছু-দিন সংবাদপত্র চালাইবার ইচ্ছা করেন, তাহার ফল ও স্থায়িত্ব ঠিক সেই আত্রেয়ী গ্রামে পাটের ব্যবসার মতই। [এই লেখাটির আগের অংশে যদুনাথ বলেছিলেন—'ভুলি নাই যে, তিনি একবার আত্রেয়ী গ্রামের 'পাটের হাটে মথুর কুণ্ডু শিবু শা'-র গা ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া পাটের দোকান খোলেন, যদিও অবশেষে বহু অর্থক্ষতি দিয়া পলাইয়া বাঁচেন।'] ফলত যদি এই দেশে এবং এই যুগে সফল খবরের কাগজ চালাইতে চাও, তবে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ অথবা পাঁচকড়ি বাবুর মত সম্পাদক লাগাইয়া দাও, কারণ তাঁহাদের 'আকাশ ঘিরে জাল ফেলে তারা ধরাই ব্যবসা' নহে, এবং অভিজ্ঞতাও অন্যরূপ।'

অতঃপর যদুনাথ আরো লিখেছিলেন:

'এতক্ষণে বোধ হয় বুঝাইতে পারিয়াছি যে, বঙ্গ-সাহিত্যে এবং বাঙালীর আধুনিক চিন্তাজগতে রবীন্দ্রনাথের অদ্বিতীয় দানটি কি। যে মনোভাব হইতে এই দান সৃষ্টি হয়, তাহা তাঁহার একটি ছোটোগল্পে অল্প কথায় অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে:'

মৎস্যপুচ্ছের তাড়নায় জলের মধ্যে যে গূঢ় আন্দোলন চলিতে থাকে, সরোবরের পদ্ম যেমন তাহার প্রত্যেক আঘাত অনুভব করিতে পারে, শেখর তেমনি তাঁহার চতুর্দিকবর্তী সভাস্থ জনের মনের ভাব হৃদয়ের মধ্যে বুঝিতে পারিলেন।......

'শেখর প্রান্তভাগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কেবল এই ক-টি কথা বলিলেন—বীণাপাণি শ্বেতভুজা, তুমি যদি আমার কমলবন শূন্য করিয়া আজ মর্তভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইলে, তবে তোমার চরণাসক্ত যে ভক্তগণ অমৃতপিপাসী, তাহাদের কী গতি হইবে?' ['জয় পরাজয়' থেকে]

এই গল্পাংশ উদ্ধৃত করে যদুনাথ পুনরায় বলে গেছেন :

'আমি এই পার্থক্য কী উপমা দিয়া বুঝাইব? যেন এক দিকে বিশারদের কর্ণভেদী ঢকানিনাদ অথবা পাঁচকড়িবাবুর দৈনিক হ্রেষারব, আর অপর দিকে রবীন্দ্রনাথের সংযত মিহি স্বর। অথবা একদিকে হাতকাটা সার্ট, খাকী শর্ট এবং ফুটবল-বুট-পরা যুবক, আর অপর দিকে শান্তিপুরে মিহি ধুতি, ধোলাই মলমলের চুড়িদার পাঞ্জাবি এবং কারুকার্যমণ্ডিত গ্রীসিয়ান স্লিপার-পরা তরুণ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ই বলি, আহিরগ্রাম পত্রিকা আর জাহিরগ্রাম পত্রিকা।

'রবীন্দ্রনাথ যে গুণটি বঙ্গ-সাহিত্যে প্রথম আনিয়া দেন, এবং যাহার অনুশীলনে কেহই এ পর্যন্ত তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই, তাহার ইংরেজি নাম—refined delicacy, এবং তাহার বিপরীতটির নাম—vulgarity of taste। 'কোমলতা' বা 'মার্জিত রুচি' বলিলে এটিকে ঠিক বুঝাইবে না, কারণ 'কোমল' কথাটা প্রায়ই আমাদের মনে আনে—মেরুদণ্ডহীন দুর্বলতা বা অস্থিহীন মাংসপিণ্ডের ছবি, যেমন বৈষ্ণবসাহিত্যে 'প্রেম-রসবিগলিতং' বলিলে বুঝায়। আমি চাই এমন একটি কথা, যাহাতে কবিশেখর দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পুণ্ডরীকের মধ্যকার মানসিক পার্থক্য বুঝাইতে পারিবে। বঙ্গ-সাহিত্যের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের কবিশেখর।'

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে,—ঐ একই সময়ে অতুলচন্দ্র গুপ্ত জানিয়েছিলেন :

'আমরা যারা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী ও সমসাময়িক—অসম্ভব নয় যে দূর ভবিষ্যতে আমাদের একালের প্রধান পরিচয় হবে যে এটা রবীন্দ্রনাথের যুগ।

আজকার দিনের তুচ্ছ ঘটনা, ক্ষুদ্র চেষ্টা স্বল্প সাফল্য যখন সুদূরের দৃষ্টিতে অলক্ষ্য হবে, তখন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার দীপ্তিতেই ভাবী কাল আমাদের কালকে জানবে। আমাদের সুখ-দুঃখ, নিরাশা আনন্দ তাদের চিত্তকে স্পর্শ করবে তাঁরই কাব্য থেকে। আমাদের সম্বন্ধে তাদের ঔৎসুক্য হবে জানতে, আমরা কি ভাবে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেছিলাম, আমাদের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কতটা ব্যাপক ও গভীর ছিল আমাদের জীবনের পারিপার্শ্বিক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে কতটা প্রভাবান্বিত করেছে! তাঁর কাব্য ও সাহিত্যে আমাদের একাল অমর হয়ে থাকল। সব কালের ভাগ্যে এ সৌভাগ্য ঘটে না।'

'ভবিষ্যৎ কালের লোক-মানস-রবীন্দ্রনাথকে জানবে ইতিহাসের সমুজ্জ্বল পৃষ্ঠায়, কিন্তু কবি-রবীন্দ্রনাথের অন্তরতম স্পর্শ তারা পাবে তাঁর কাব্যে, যেমন আমরা পেয়েছি। আজ হতে বহু শত বর্ষ পরে তাদের বসন্ত দিনও রবীন্দ্রনাথের বসন্ত-গানে ধ্বনিত হবে, তাদের আষাঢ়ের সজল মেঘের উপর তাঁর বর্ষা-কাব্যের নীল অঞ্জন নেমে আসবে। প্রেয়সী নারীর নয়ন অধর তাঁর কাব্যের মধুতে মধুময় হবে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তারা নিরাশায় উৎসাহ, শোকে সান্ত্বনা পাবে। সেই অনাগত কালের সমসময়ীদের আমাদের অভিবাদন জানাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-পাঠে তাদের আনন্দই এর প্রত্যভিবাদন।'

'কিন্তু মহাকবির কাব্য চিরকালের হলেও বিশেষ করে তাঁর সমসাময়িকদের। যে চিরন্তন নর-নারীর হৃদয়-স্পন্দন তাঁর কাব্যে রূপ পায়, তাঁর সমকালের নর-নারীর হৃদয় তার উপকরণ। সেই বিশেষের মধ্যে বিশ্বমানব নিজেকে প্রতিফলিত দেখে। আর কবির সমকালিকেরা তাঁর কাব্যে নিজেদেরই পায় এমন পূর্ণ ও নিবিড় করে, যা ভিন্ন কালের মানুষের সম্ভব নয়। আমরা যারা আকৈশোর দিনের পর দিন রবীন্দ্রনাথের নূতন কাব্য পড়েছি, যার অদ্ভুত বৈচিত্র্য আমাদের মনের সামনে গড়ে উঠেছে ও আমাদের মনকে গড়েছে—চিরকালের রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করে আমাদের। বাংলার উদার আকাশ ও অবারিত মাঠে আমাদের চিত্তের প্রসার এসেছে তাঁর কাব্য থেকে। শুভ্র বালুচরের নীচে পদ্মার কালো জল তাঁর কাব্যের কথাই আমাদের কানে বলে। ভোরের প্রথম আলোতে

তাঁর কাব্যের মোহ, গোধূলির রক্তরাগে তাঁরই কাব্যের রং। বাংলার নর-নারী আমাদের অন্তরতর তাঁর কাব্যের বন্ধনে। সকল যুগের লোকের এ সৌভাগ্য ঘটে না। মহাকবির যারা সমসাময়িক এ দুর্লভ সৌভাগ্য তাদেরই। রবীন্দ্রনাথের সমকালে জন্মে আমরা ধন্য হয়েছি।'

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে জগদ্ব্যাপী শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যেই নলিনীকান্ত ভট্টশালীর এই কথাগুলি উচ্চারিত হয়েছিল :

'১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' এবং উহার ইংরেজি অনুবাদ The Master's Will প্রকাশিত হয়। আমাদের শাসকসম্প্রদায় দেশের সাহিত্য ও কর্ষণাধারার অনেক সংবাদই রাখেন না, দেশে জাতীয়তার উদ্বোধনে রবীন্দ্র-সাহিত্য কতখানি কাজ করিয়াছে, সেই খবরও তাঁহারা রাখিতেন না। The Master's Will পড়িয়া তাঁহার যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। যাঁহাকে এতকাল নিছক কবি ভাবিয়াই তাঁহারা এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাঁহার মুখে আবার এ কেমনধারা কথা শুনা যায়। ইঙ্গভারতীয় কাগজগুলিতে রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া ঠাট্টা শুরু হইল। 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' বলিলেন, কদলীবৃক্ষ ও ফলের বিকাশ সম্বন্ধে আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিত্বপূর্ণ গান শুনিতে রাজি আছি কিন্তু রাজনীতি তো কবিত্ব নহে। রবীন্দ্রনিন্দা বা তাঁহার মহিমা খর্ব করিবার চেষ্টা প্রত্যেক রবীন্দ্রভক্তেরই অসহ, পূর্ববঙ্গবাসীর অসহিষ্ণুতা আবার সর্বদাই একটু সক্রিয় ও প্রবল আকার ধারণ থাকে। আমি নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট রাজনৈতিক রচনার নমুনাস্বরূপ তাঁহার স্বদেশী আন্দোলনের যুগের একটি চমৎকার লেখা অংশত অনুবাদ করিয়া, এবং রবীন্দ্রনাথকে রাজনীতির ক্ষেত্রে আনাড়ী বলিয়া ধরা যে কত বড় মূঢ়তা এই সম্বন্ধে নিজস্ব লম্বা ভূমিকা দিয়া Sir Rabindranath and Politics নাম দিয়া একটা লেখা পত্রের আকারে স্টেট্‌স্‌ম্যান-এ প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া দিলাম। 'স্টেট্‌স্‌ম্যানের' সম্পাদক উহা মহা সমাদরে সম্পাদকীয় মন্তব্যের সংলগ্ন করিয়া ৭ই অক্টোবর রবিবার ১৯১৭ তারিখের কাগজে প্রায় পুরা দুই কলমে ছাপিলেন।...সম্পাদকীয়ের পার্শ্বে মুদ্রিত এই দীর্ঘ এবং বেশ গরম প্রবন্ধে ইঙ্গভারতীয় কাগজগুলির রবীন্দ্র-পরিহাসের সুর থামাইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া অনুমান

করি। কারণ, ইহার পরে আর ঐ রকম রবীন্দ্র-তাচ্ছিল্যের সুর নজরে পড়ে নাই। A well-wisher of the Empire ছদ্মনামীয় লেখাটি খবরের কাগজে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। এক দৈনিক কাগজে সম্পাদকীভাবে লেখা হইল, রবীন্দ্রনাথের কোন শত্রু তাঁহার লেখা ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া ইংরেজ সরকারের নিকট তাঁহাকে ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই প্রবন্ধ বাহির হওয়ার কয়েকদিন পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় ঢাকা-সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে ঢাকায় আসেন। লক্ষ্মীবাজারে তাঁহার এক আত্মীয়ের বাসায় তিনি উঠিয়াছিলেন। অপরাহ্নে তথায় তাঁহাকে ঘিরিয়া বেশ এক মজলিস বসিল, তথায় কথাপ্রসঙ্গে এই প্রবন্ধের কথা উঠিল। দেশবন্ধু বলিলেন, এমন জোরদার লেখা জাষ্টিস্ উডরফের বলিয়াই বোধ হয়। নানা জনে নানা মন্তব্য করিলেন। মজলিস ভাঙিলে সকলে উঠিয়া পড়িলাম, দেশবন্ধুর জামাতা সুধীরবাবুকে কানে কানে বলিয়া আসিলাম দাশ মহাশয়কে বলিবেন লেখাটি এই অধমের। পরের দিন দেখা হইলে দেশবন্ধু সম্ভবতঃ অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন, কিন্তু স্পষ্ট কিছু মনে নাই।'

এতো গেল রাজনীতির কথা। রবীন্দ্রনাথ কেবল কবিও ছিলেন না, কেবল রাজনীতির পণ্ডিত, নেতা বা কর্মী মাত্রও ছিলেন না। শাস্ত্রচর্চার অন্যান্য অঞ্চলে তাঁর কী রকম নেতৃত্ব ছিল, সে খবর আছে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনায়। 'শব্দকথা'র ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর লিখে গেছেন :

'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত এবং সপ্তম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যক পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত বাঙ্গলা ধ্বন্যাত্মক শব্দের আলোচনা পড়িয়া কয়েকটা কথা আমার মনে আসে। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন তোলেন, টুকটুকে শব্দটি নিশ্চয় ধ্বন্যাত্মক শব্দ। যাহা টুকটুক ধ্বনি করে, তাহাই টুকটুকে। কিন্তু যে দ্রব্য রাঙা টুকটুকে, তাহা ত কোনরূপ টুকটুক শব্দ করে না ;— তবে তাহাকে টুকটুকে বিশেষণ দিই কেন? রবীন্দ্রনাথ ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'টক টক শব্দ কাঠের ন্যায় কঠিন পদার্থের শব্দ। যে লাল

অত্যন্ত কড়া লাল, সে যখন চক্ষুতে আঘাত করে, তখন সেই আঘাত ক্রিয়ার সহিত টকটক শব্দ আমাদের মনে উহ্য হইয়া থাকিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের এই স্পষ্ট ইঙ্গিতের নিকট আমি ঋণী—আর কাহারই বা কাছে এমন ইঙ্গিত পাইতে পারি? এই ইঙ্গিত না পাইলে বোধ করি 'ধ্বনি-বিচার' প্রবন্ধের উৎপত্তি হইত না।'...

রমেন্দ্রসুন্দরই বলেছিলেন :

'বাঙ্গালা ভাষাকে বিশ্লেষণ করিলে যে সকল নিয়ম বাহির হইতে পারে, তাহা আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সেই সেই নিয়মের আবিষ্কারের জন্য সুধীমণ্ডলীকে আহ্বান করা হইয়াছে মাত্র। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-সভার মুখপাত্র স্বরূপে সুধীজনকে এই কার্যে অগ্রসর হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন মাত্র......ব্যাকরণশাস্ত্র নির্মাণের এখনও সময়ও হয় নাই, কিন্তু উপাদান সংগ্রহের সময় হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ এখনই সম্পূর্ণ ব্যাকরণ রচনা করিতে পারিবেন, এরূপ কেহ আশা করেন না; সাহিত্য-পরিষদের কোন বর্তমান বা ভাবী সদস্য যদি নক্সাটা প্রস্তুত করিতে পারেন বা অট্টালিকার ভগ্নাংশ গড়িয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার কৃতিত্ব ধন্য হইবে। উপাদান-সংগ্রহ সাহিত্য-পরিষদের সাধ্য। কেন না, উপাদান-সংগ্রহ মজুরের কাজ; ইহাতে কেবল পরিশ্রম আবশ্যক। সংগৃহীত উপাদানগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া গোছাইয়া রাখিবার বুদ্ধিটুকু দরকার, তাহা থাকিলেই যথেষ্ট। ভবিষ্যতে যিনি ব্যাকরণ রচনা-কর্মে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাকে যেন মশলা খুঁজিয়া লইতেই দিনক্ষেপ না করিতে হয়।......

''রবীন্দ্রনাথ সেই মশলা সংগ্রহের জন্য সকলকে আহ্বান করিয়াছেন, এবং মজুরের কাজে যদি কেহ অপমান বোধ করেন, এই কর্মকে হেয় কার্য জ্ঞান করেন, সেই আশঙ্কায় স্বয়ং মজুরের কাজ গ্রহণ করিয়া অন্যের অনুকরণীয় হইয়াছেন মাত্র। তজ্জন্য তিনি কৃতজ্ঞতার ভাজন; তজ্জন্য সাহিত্য-সমাজ তাঁহার নিকট ঋণবদ্ধ।......'

তাঁর 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' প্রবন্ধের এই কথাগুলির সঙ্গে 'শব্দকথা' বইখানিরই আর-একটি প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে। 'বাঙ্গলার প্রথম রসায়নগ্রন্থ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন:

'কিছুদিন হইল, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয় হইতে একখানি রসায়নগ্রন্থ আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন! গ্রন্থখানির সহিত বাঙ্গলার বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের সম্বন্ধ আছে দেখিয়া উহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ কর্তব্য বোধ করিলাম...।'

আবার, সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর, ভিন্ন জাতের লেখার খবর দিয়েছেন ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য:

'ডাক্তারি পাস করবার পরে কিছুকালের জন্য আমার কাজের অবসর ঘটল। তাই শুনে রবীন্দ্রনাথ বললেন, বোলপুরে আমার কাছে এখন থাকবে চল, তোমার গান শেখবার স্থবিধা হবে। প্রায় দু'মাস তাঁর কাছে গিয়ে থাকলাম, এই দু'মাস তিনি আমাকে আনন্দে ভরিয়ে রাখলেন। দীনুবাবুকে আমায় গান শেখাতে বলে দিলেন, প্রত্যহ নতুন নতুন গান শিখতাম। আর প্রত্যহ দুবেলা যেতাম রবীন্দ্রনাথের কাছে, কত রকমের হাস্য-পরিহাস এবং আলাপ আলোচনা তিনি করতেন আমার সঙ্গে।......

'একদিন কথায় কথায় বললেন, ডাক্তারী বিদ্যায় যা তুমি শিখলে, বাংলায় সেসব কথা লেখনা কেন? দেশের তাতে উপকার হবে। আমি বললাম, তা কি কখনও হয়? ডাক্তারী বিজ্ঞানের শক্ত শক্ত কথা কি আমাদের বাংলা কথায় লেখা যায়?..... রবীন্দ্রনাথ বললেন, নিশ্চয়ই লেখা যায় এবং লেখা উচিত।'

জীবনের নানা দিকে অনুসন্ধানে ক্লান্তি ছিল না তাঁর। অসীম উৎসাহ, অশেষ অধ্যবসায়, পরমাশ্চর্য আশাবাদ এবং পরমার্থে প্রগাঢ় প্রত্যয়—এই ছিল

রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের প্রধান উপাদান। তাঁর ভ্রমণ দেশে দেশে, দিকে দিকে,—অতীতে বর্তমানে, ভবিষ্যতে! তাঁর গানে সংসারের সব কথাই আছে, আবার আকুল হয়ে গানের ছত্রে-ছত্রে তাঁকে বলতে শোনা গেছে :

আমি সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি আপনি সে-মন নিয়েছ
আমি সুখ বলে দুখ চেয়েছিনু তুমি দুখ বলে সুখ দিয়েছ॥

বোধ হয়, গানেতেই সর্বাধিক নিশ্চিতভাবে তাঁকে পাওয়া যায়। মনে পড়ে তাঁর সেই আত্মোদ্ঘাটনের ভাষা আর ছন্দ :

যে-ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে
মিলাব তাই জীবনগানে।
গগনে তব বিমল নীল, হৃদয়ে লব তাহারি মিল,
শান্তিময়ী গভীর বাণী নীরব প্রাণে॥

তাঁর সকল কর্মে, সকল রচনায় সেই ধ্রুবপদের ঝংকার ছিল সুনিশ্চিত। 'তপোবন' থেকেই ভারতবর্ষের সভ্যতা নেমে এসেছে—এ তাঁরই দৃষ্টি,—ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিবাক্য তিনি বার বার স্মরণ করেছেন :

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

'যে লোক অনন্তকে বাদ দিয়ে অন্তের উপাসনা করে সে অন্ধকারে ডোবে। আর, যে অন্তকে বাদ দিয়ে অনন্তের উপাসনা করে সে আরো বেশি অন্ধকারে ডোবে।'

এ তাঁরই আপন-কথা। তিনি বলে গেছেন : 'আমি নিজের প্রকৃতির ভিতর থেকেই জানি দূরও সত্য, নিকটও সত্য, স্থিতিও সত্য, গতিও সত্য।... রূপই আমার কাছে আশ্চর্য, রসই আমার কাছে মনোহর। সকলের চেয়ে আশ্চর্য এই যে আকারের ফোয়ারা নিরাকারের হৃদয় থেকে নিত্যকাল উৎসারিত হয়ে কিছুতেই ফুরোতে চাচ্ছে না।'

আকাশ ও রঙমহাল

কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তার লক্ষণ কি কেবল শব্দে, ছন্দে, বিষয় নির্বাচনে? মানব-জীবনের সকল ব্যাপারে তাঁর সজাগ দৃষ্টির পরিব্যাপ্তি বিস্ময়কর! অথচ মূলত: তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক মানুষ। উপনিষদের আনন্দ-দর্শনে, বৈষ্ণব সাধনার লীলাবাদে, সহজ সাধনার তত্ত্বমুক্ত সর্বাস্তিবাদেই তাঁর আধ্যাত্মিক বোধের আশ্রয়—একথা সংক্ষেপে জানিয়ে ডক্টর সুকুমার সেন লিখেছেন: 'রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্ম ভাবনা তাঁহার নিজস্ব। তবে এ ভাবনা ভারতীয় অধ্যাত্ম-ঐতিহ্যের মূলাশ্রয়ী।' ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গেই তাঁর গভীর যোগ। সুকুমারবাবুই লিখেছেন: 'রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ভারতীয় সাহিত্যে মৌলিক মূল্য বিচারে তিনটি দিগদর্শনী পাই। ঋগ্‌বেদ-সংহিতা, কালিদাসের কাব্য-নাটক ও বৈষ্ণব পদাবলী রবীন্দ্রপূর্ব ভারতীয় সাহিত্যের সমুচ্ছ্রিত ত্রিকূট নিঃসৃত। কাব্য প্রেরণার সঙ্গে—কালের গতিকে যতটা সম্ভব—রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ভাবনার অন্তর্বাহী যোগ আছে।' বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের যোগসূত্র দুর্লক্ষ্য, এবং সেই কারণে কালিদাসের কাব্যে এবং বৈষ্ণব পদাবলীতে তাঁর প্রবেশ যতো অবারিত ছিল, একমাত্র উপনিষদ্‌ ব্যতিরেকে বৈদিক সাহিত্যে সে-রকম অবাধ ছিলনা। একথাও সুকুমারবাবুর কথা। তিনি এও দেখিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে উষা বর্ণনায়, বর্ষা ঋতু উপলব্ধিতে অংশতঃ বৈদিক কল্পনার প্রতিষ্ঠাও অনুভব করা যায়। আবার, কালিদাসও রবীন্দ্রনাথের প্রিয় কবি। ভূমাবোধে তাঁর আগ্রহের কথা তিনি নানাভাবে জানিয়ে গেছেন। 'আদিকথা' অধ্যায়ে তারই কিছু কিছু স্মরণ করা হয়েছে। ডক্টর বিমলকান্তি সমাদ্দার দেখিয়েছেন যে, বাংলায় বিহারীলাল চক্রবর্তী কালিদাসের মুগ্ধ অনুসরণ করেছিলেন তাঁর 'প্রেম-প্রবাহিনী' কাব্যের চতুর্থ সর্গে এবং আরো কোনো কোনো অংশে। তাঁর অনুমান এই যে—'বিহারীলালের কবিতার পথে'ই রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের প্রতি অনুরক্ত হন। ছেলেবেলায় ভৃত্যশাসনের গণ্ডীবদ্ধ অবস্থায় তিনি যে ছেলে-ভুলানো ছড়ায়, রূপকথায়, চাণক্য-শ্লোকে, কৃত্তিবাসী রামায়ণে মুগ্ধ ছিলেন এবং পিতার

সঙ্গে গঙ্গায় বোটে বেড়াতে বেড়াতে প্রথম জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সংস্করণ-খানি পেয়ে 'বড় আনন্দের' কাব্য বলে চিনেছিলেন, সেকথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলে গেছেন। তাঁর ভাষা-চেতনার গভীরে ছিল জয়দেবের ঝংকার! তারপর দ্বিজেন্দ্রনাথের মুখে 'মেঘদূত' কাব্যের আবৃত্তি শুনেছিলেন। অতঃপর বৈষ্ণব পদাবলী পড়তে গিয়ে সেই কিশোর মনে জয়দেব কালিদাসের আনুষঙ্গিক অনুরঞ্জন তো ছিলই। কৈলাস মুখুজ্যে, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, কিশোরী চাটুজ্জেও স্থায়ী আসন পেয়েছিলেন সেই কিশোর কবির চিত্তগহনে। স্বদেশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং তাঁর বন্ধু অক্ষয় চৌধুরীর বৈঠকী গান, বিলেতে বিলিতী গানের চর্চা,—তারপর দেশে ফিরে বাউল গানের পরিচয়-লাভ—রবীন্দ্রনাথের কবি পুরুষের বিশিষ্টতার কথা-প্রসঙ্গে এসব ব্যাপার স্বভাবতই স্মরণীয়। আনন্দ, ভূমা-চেতনা,—বৃহৎ, বিপুল বিরাটের পিপাসা তাঁর কবিসত্তার মর্মে-মর্মে অনুপ্রবিষ্ট। 'রাত্রি জাগে জগৎ লয়ে কোলে', 'কালের রাখাল তুমি', 'দিন-ধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহ মাঝে'—রবীন্দ্র-কাব্যের এইসববিশেষ প্রতিমান-চিন্তার কথাও অধ্যাপক সেন উল্লেখ করেছেন। তাঁর কাব্যে, নাটকে—সূর্যোদয় আর প্রভাত যে নবজীবনের প্রতীকরূপে বার বার দেখা দিয়েছে, সে-কথা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'রবীন্দ্র-বিচিত্রা'র একটি আলোচনায় দেখিয়েছেন। উপস্থিত আলোচনার 'আদি-কথা' অধ্যায়ে 'সত্য বোধ', 'সত্যকে দেখা', সত্য হওয়া' অংশে গায়ত্রী মন্ত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের গভীর আগ্রহের উল্লেখ করা হয়েছে। বৃহতের পরিব্যাপ্তি সম্বন্ধে তাঁর বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। আত্মা যে পরমাত্মার মধ্যে চিরসত্যে বিধৃত—এই উপলব্ধির কবি তিনি! এ-কথা পরিস্ফুট করবার জন্যেই 'মানসী'র 'ধ্যানে' 'তুমি আমি একাকার' উক্তিটির উল্লেখ করা হয়েছে। 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় 'কালো দেখে ভুলিনে আর, আলো দেখে ভুলেছে মন,' এবং 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান'—পর পর এই দুটি বর্ণ-ভাবনার মধ্যে তাঁর সত্যানুসন্ধানের একরকম গতিচিহ্ন অনুভব করা যে অসংগত নয়, বিশী মহাশয় সে-কথার আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্র-কাব্যের আলো, কালো, রাত্রি, প্রভাত, বিতান, বিপিন, বর্ষা, শীত, গ্রীষ্ম, ঘাট, বাট, পথ, ঘর, জানলা, দরজা ইত্যাদি প্রতীক-রূপক-প্রতিমানের প্রাচুর্য স্বীকার্য। সে-চিন্তা অনুসরণ করে তাঁর কাব্যলোকে দৃষ্টিক্ষেপ করলে

যা আমাদের সর্বাধিক চোখে পড়ে, সে এক সুবিশাল মহাকাশ! তাঁর রচনার আদি-স্তরেও আকাশ—শেষ পর্বে—একেবারে শেষ বছরেও ১৯৪১-এর ১৩ই ফেব্রুয়ারি সকালে লেখা 'আরোগ্য' বইয়ের তের সংখ্যক কবিতাতেও সেই সুবিস্তীর্ণ আকাশ দেখা দিয়েছে!

অলস সময় ধারা বেয়ে
মন চলে শূন্য পানে চেয়ে
সে মহাশূন্যের পথে ছায়া আঁকা ছবি পড়ে চোখে।

কবিতায়, প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে,—বিশুদ্ধ সৌন্দর্য-কল্পনায়, প্রেমের তত্ত্ববিচারে,—আবার রাজনীতির কথায়, সমাজতত্ত্বের বিশ্লেষণে তিনি বার বার এই মহাশূন্যের প্রতিমান ব্যবহার করেছেন। 'বনফুল'-এর চতুর্থ সর্গে কমলা আর নীরদ নিভৃত যমুনা-তীরে বসে চন্দ্রালোকিত গভীর রাত্রে আকাশ আর জলের বিস্তার দেখে মুগ্ধ হয়েছে :

বসিয়া গণিল বালা, কত ঢেউ করে খেলা
কত ঢেউ দিগন্তের আকাশে মিলায়
কত ফেন করি খেলা লুটায়ে চুম্বিছে বেলা
আবার তরঙ্গে চড়ি সুদূরে পালায়।

আবার 'শেষের কবিতা'র অমিত যেদিন কেটির হাতে আংটি পরিয়ে দিয়েছিল, সে-রাত্রেও 'জুন মাসের জ্যোৎস্নায় সমস্ত আকাশ যেন কথা বলে উঠেছিল, মাঠে ফুলের প্রচুর বৈচিত্র্যে ধরণী তার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে।' আংটি পরিয়ে দিয়ে কেটির কানে কানে অমিত বলেছিল :

'Tender is the night
And haply the queen moon is on her throne.

এই আকাশ-স্বপ্ন বা আকাশ-ভাবনাতেই তাঁর স্থায়ী অভিনিবেশ!

: রবীন্দ্রনাথের চোখে আকাশ থেকে মর্তলোক :

১৯৩২ সালে তিনি পারস্য-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ১৩ই এপ্রিল সকাল সাড়ে আটটায় তাঁর বিমানতরী বুশেয়ারে পৌঁছোয়। দমদম থেকে এলাহাবাদ, যোধপুর, করাচী, জাস্ক হয়ে,—বুশেয়ারের মাটি ছুঁয়ে তাঁর যাত্রা। বুশেয়ারের কথা-প্রসঙ্গে আকাশের জীব সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এবং তৎসূত্রে এরোপ্লেন সম্বন্ধে তাঁর এই উক্তি দেখা যায় : 'ছেলেবেলা থেকে আকাশে যে-সব জীবকে দেখেছি তার প্রধান লক্ষণ গতির অবলীলতা।

তাদের ডানার সঙ্গে বাতাসের মৈত্রীর মাধুর্য। মনে পড়ে ছাদের ঘর থেকে দুপুর রৌদ্রে চিলের ওড়া চেয়ে দেখতেম, মনে হত দরকার আছে বলে উড়ছে না, বাতাসে যেন তার অবাধ গতির অধিকার আনন্দ বিস্তার করে চলেছে। সেই আনন্দের প্রকাশ কেবল যে পাখার গতিসৌন্দর্যে তা নয়, তার রূপসৌন্দর্যে।' সেই ভারহীন আনন্দরূপের স্বাদ এক রকম। আর এরোপ্লেনের রূপ অন্য রকম। প্রসঙ্গটি আরো পরিস্ফুট করে তিনি বলেছিলেন: 'এতদিন পরে মানুষ পৃথিবী থেকে ভারটাকে নিয়ে গেল আকাশে। তাই তার ওড়ার যে চেহারা বেরুল সে জোরের চেহারা। তার চলা বাতাসের সঙ্গে মিল করে নয়, বাতাসকে পীড়িত করে; এই পীড়া ভূলোক থেকে আজ গেল দ্যুলোকে। এই পীড়ায় পাখির গান নেই, জন্তুর গর্জন আছে। ভূমিতল আকাশকে জয় করে আজ চীৎকার করছে।'

এই মন্তব্যের সঙ্গে 'নবজাতক'-এর 'পক্ষীমানব' কবিতাটির সাদৃশ্য আছে। বাংলা ১৩৩৮ সালের ২৫এ ফাল্গুন 'পক্ষীমানব' কবিতাটি লেখা হয়। তাঁর ভ্রমণকাহিনী 'পারস্য-ভ্রমণ' এবং তাঁর এই 'পক্ষীমানব' কবিতা—এই দুটি রচনাতে একই অভিজ্ঞতার ছায়া পড়েছিল। কবিতার পাত্রে তিনি তাঁর একই মর্মবাণী পরিবেষিত হতে দিয়েছিলেন:

বিধাতার দান পাখিদের ডানা দুটি
রঙের রেখায় চিত্রলেখায়
আনন্দ উঠে ফুটি;
তারা যে রঙিন পান্থ মেঘের সাথি।
নীল গগনের মহাপবনের
যেন তারা এক জাতি।

সেই পাখির রাজ্যে দেখা দেয় মানুষের তৈরী যন্ত্রদানব। কবি বলেন:

আজি একি হল, অর্থ কে তার জানে।
স্পর্ধা পতাকা মেলিয়াছে পাখা
শক্তির অভিমানে।
তারে প্রাণদেব করেনি আশীর্বাদ।
তাহারে আপন করেনি তপন,
মানেনি তাহারে চাঁদ।

তার মানে এ নয় যে, আধুনিক যন্ত্র-যুগের বিজ্ঞান-মানসিকতার তিনি ছিলেন পুরোপুরি বিরোধী। করাচী থেকে জাস্কে পৌছে,—সেখানকার সামান্য মাটির ঘর-বাড়ি আর রিক্ত প্রকৃতির মধ্যেও তিনি অনুভব করেছিলেন—'প্রাচ্য জাতির মধ্যে যেখানে জাগরণের চাঞ্চল্য সেখানে এই একই ভাব। অতীতের আবর্জনামুক্ত সমাজ, সংস্কারমুক্ত চিত্ত, বাধামুক্ত মানব-সম্বন্ধের ব্যাপ্তি, বাস্তব জগতের প্রতি মোহমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, এই তাদের সাধনার প্রধান লক্ষ্য। তারা জানে, হয় বর্তমান কালের শিক্ষা, নয় তার সাংঘাতিক আঘাত আমাদের গ্রহণ করতে হবে। অতীত কালের সঙ্গে যাদের দুশ্ছেদ্য গ্রন্থিবন্ধনের জটিলতা, মৃত যুগের সঙ্গে আজ তাদের সহমরণের আয়োজন।' আকাশের দূরত্বের সঙ্গে মাটির নিকট বাস্তবতা তাঁর কবি-মননে এইভাবে খুবই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছে।

ইরাকে 'বায়ু ফৌজের ধর্মযাজক তাঁদের 'বায়ু অভিযানে'র তরফ থেকে রবীন্দ্রনাথের কাছে বাণী চেয়েছিলেন। তার উত্তরে ইংরেজিতে তিনি যা বলেছিলেন বাংলায় সে-কথার মর্মানুবাদ এইরকম দাঁড়াবে:

মানব-অভ্যুদয়ের আদিকাল থেকে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান কল্পিত হয়েছে সেই ঊর্ধ্ববর্তী শূন্যলোকে যেখান থেকে নিঃসৃত হয় সকল প্রাণীর প্রাণধারণের উপযুক্ত আলো-বাতাসের প্রবাহ। প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র স্বার্থের কলুষ-মুক্ত সেই ঊর্ধ্বলোকে প্রতিদিন প্রভাত-সন্ধ্যার অপরিসীম শান্তি ও সমারোহ এবং তারকা-খচিত মহাকাশে অনন্তকালের স্তব্ধতা মানুষের মনে মনে অনপনেয় এক অশেষের ধারণা জাগিয়ে তুলছে! মাটির সংসারে বাস করেও মানুষ তার সর্বব্যাপী সেই আকাশের সঙ্গে তার শ্রেয়ের এবং পরমের ভাবনাকে জড়িত করে দেখেছে। দুর্যোগের দৌরাত্ম্যে মানুষের হিংসা এবং ভ্রাতৃহত্যার স্বার্থান্ধ লোলুপতা যদি কখনো সেই শূন্যে উঠে সেই মহাকাশের শুচিতা হরণ করে, তাহলে ভগবানের অভিশাপ নেমে আসতে দেরি হবে না,—মানবজীবনের চরম অবসান তখন অনিবার্য হয়ে উঠবে।

এই মন্তব্যই আরো পরিস্ফুট হয়েছিল পারস্য-ভ্রমণলিপির পরের অধ্যায়ে। পশ্চিমদেশে 'মহামানবের উজ্জ্বল পরিচয়' সম্বন্ধে কথা তুলে তিনি

বলেছিলেন : 'আমরা অনেক সময় তাকে জড়বাদ-প্রধান বলে খর্ব করার চেষ্টা করি। কিন্তু কোন জাত মহত্ত্বে পৌছতেই পারে না একমাত্র জড়বাদের ভেলায় চড়ে। বিশুদ্ধ জড়বাদী হচ্ছে বিশুদ্ধ বর্বর। সেই মানুষেই বৈজ্ঞানিক সত্যকে লাভ করবার অধিকারী, সত্যকে যে শ্রদ্ধা ক'রে পূর্ণ মূল্য দিতে পারে। এই শ্রদ্ধা আধ্যাত্মিক, প্রাণপণ নিষ্ঠায় সত্য সাধনার শক্তি আধ্যাত্মিক। পাশ্চাত্ত্য জাতি সেই মোহমুক্ত আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারাই সত্যকে জয় করেছে এবং সেই শক্তিই জয়ী করছে তাদের।'

সত্য কখনোই জাতি বা ব্যক্তিবিশেষের প্রয়াসহীন চিরস্থায়ী সঞ্চয়ের সামগ্রী নয়। প্রতিটি কর্মের মধ্য দিয়ে নিরন্তর তার প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় করে তোলা দরকার। পশ্চিমের মনুষ্যজাতিও নিরঙ্কুশ নয়। রবীন্দ্রনাথ তাই জানিয়েছিলেন : 'বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও শক্তি তাকে প্রভাবশালী করেছে, এই প্রভাব সত্যের বরদান। কিন্তু সত্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কলুষিত হলেই সত্য তাকে ফিরে মারে। বিজ্ঞানকে দিনে দিনে য়ুরোপ আপন লোভের বাহন করে বাঁধছে। তাতে ক'রে লোভের শক্তি হয়ে উঠেছে প্রচণ্ড, তার আকার হয়ে উঠেছে বিরাট।...প্রবৃত্তির প্রাবল্যও মানুষের জড়ত্বের লক্ষণ। তার বুদ্ধি তার ইচ্ছা তখন কলের পুতুলের মতো চালিত হয়। এতেই মনুষ্যত্বের বিনাশ। এর কারণ যন্ত্র নয়, এর কারণ আন্তরিক তামসিকতা, লোভ হিংসা পশুবৃত্তি।'

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন য়ুরোপে গিয়েছিলেন, তখন সে দেশে মহৎ এবং জাগ্রত মানুষকে দেখবার আশা নিয়েই তিনি যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আশাভঙ্গ ঘটেছিল। সেবারের সেই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তাঁর 'পারস্যে'র মধ্যে তিনি লিখেছিলেন: 'য়ুরোপে এসে একটা কথা আমি প্রথম আবিষ্কার করলুম যে, সহজ মানুষ আর নেশন এক জাতের লোক নয়। যেন সহজ শরীর এবং বর্ম-পরা শরীরের ধর্মই স্বতন্ত্র। একটাতে প্রাণের স্বভাব প্রকাশ পায় আর-একটাতে দেহটা যন্ত্রের অনুকরণ করে।'

আকাশ এবং মাটির প্রসঙ্গ থেকে সেই লেখাটিতে এইভাবে তিনি মানুষের নিচু-স্তরের প্রবৃত্তি আর উঁচু-মনের মুক্তির কথায় এসে পড়েছিলেন।

কথায়-কথায় 'সহজ মানুষ' এবং রাষ্ট্রনীতির অধিকার-কবলিত ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের প্রসঙ্গ দেখা দিয়েছিল। সে-সব চিন্তা তাঁর আরো অনেক রচনায় আরো অনেকবার দেখা গেছে। 'কালান্তরে'র ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের লেখাগুলির কথাও মনে পড়া স্বাভাবিক। পারস্য-যাত্রায় আকাশ-যাত্রী রবীন্দ্রনাথের সেই একই মানব-সত্যবোধের অভিব্যক্তি আছে নিচের এই উদ্ধৃতিটিতে :

'বায়ুতরী যতই উপরে উঠল ততই ধরণীর সঙ্গে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যোগ সংকীর্ণ হয়ে একটা মাত্র ইন্দ্রিয়ে এসে ঠেকল, দর্শন-ইন্দ্রিয়ে, তাও ঘনিষ্ঠভাবে নয়। নানা সাক্ষ্য মিলিয়ে যে-পৃথিবীকে বিচিত্র ও নিশ্চিত করে জেনেছিলুম সে ক্রমে এল ক্ষীণ হয়ে, যা ছিল তিন-আয়তনের বাস্তব, তা হয়ে এল এক-আয়তনের ছবি। সংহত দেশকালের বিশেষ বিশেষ কাঠামোর মধ্যেই সৃষ্টির বিশেষ রূপ। তার সীমানা যতই অনির্দিষ্ট হতে থাকে সৃষ্টি ততই চলে বিলীনতার দিকে। সেই বিলয়ের ভূমিকার মধ্যে দেখা গেল পৃথিবীকে, তার সত্তা হল অস্পষ্ট, মনের উপর তার অস্তিত্বের দাবী এল কমে।'

উর্ধ্বলোক থেকে 'তালি দেওয়া চাদরে ঢাকা,' 'জীব-বিধাতার পরিত্যক্ত' পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দ্রুতগামী বিমানপোতের যাত্রী রবীন্দ্রনাথের সেদিন মনে হয়েছিল : 'এমন অবস্থায় আকাশ-যানের থেকে মানুষ যখন শতঘ্নী বর্ষণ করতে বেরোয় তখন সে নির্মমভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে ; যাদের মারে তাদের অপরাধের হিসাববোধ উদ্যত বাহুকে দ্বিধাগ্রস্ত করেনা, কেননা, হিসাবের অঙ্কটা অদৃশ্য হয়ে যায়। যে বাস্তবের পরে মানুষের স্বাভাবিক মমতা, সে যখন ঝাপসা হয়ে আসে তখন মমতারও আধার যায় লুপ্ত হয়ে। গীতায় প্রচারিত তত্ত্বোপদেশও এই রকমের উড়ো জাহাজ, অর্জুনের কৃপাকাতর মনকে সে এমন দূরলোকে নিয়ে গেল, সেখান থেকে দেখলে মারেই-বা কে, মরেই-বা কে, কেই-বা আপন, কেই-বা পর। বাস্তবকে আবৃত করবার এমন এমন অনেক তত্ত্বনির্মিত উড়োজাহাজ মানুষের অস্ত্রশালায় আছে, মানুষের সাম্রাজ্যনীতিতে, সমাজনীতিতে ধর্মনীতিতে।'

দূরের আকাশে নির্নিমেষ নজর থাকলেও কাছের মাটিকে তিনি কখনোই তুচ্ছ মনে করেননি। একই সঙ্গে তিনি আধ্যাত্মিক এবং বাস্তব-সচেতন।

শেষ বয়সে; আকাশ-বাসনায় আর-মর্ত-চেতনায় কঠোর সংঘর্ষ অনুভব করেই তাঁকে লিখতে হয়েছিল ঃ

ভোরবেলা জানালায় পাখিগুলো জাগালে
ভাবিতাম, আছি যেন স্বর্গের নাগালে।
মনে হ'ত পাকা ধানে বাঁশি যেন বাজানো,
মায়ের আঁচল-ভরা দান যেন সাজানো।

আদি পর্বের এই অবস্থার সঙ্গে শেষ পর্বের এই অবস্থান্তরের কথা তুলনা ক'রে বেদনা বোধ করেছিলেন তিনি—

সভ্যতা কারে বলে ভেবেছিনু জানি তা—
আজ দেখি কী অশুচি কী যে অপমানিতা।
কলবল সম্বল সিভিলাইজেশনের,
তার সবচেয়ে কাজ মানুষকে পেষণের।[১]

ঃ শেষ পর্বের কাব্যলোকেও সেই আকাশ, সাগর, জানলা ঃ

'বনবাণীতে' নানা ফুল, নানা লতার কথা বলা হয়েছে। তারই মধ্যে 'মধুমঞ্জরী' নামে একটি কবিতা আছে। মধুমঞ্জরী যে একটি বিদেশী লতা, সে-কথা তিনি নিজেই বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু দেশের মন্দিরের বাইরে মুক্ত স্বরূপে যে-দেবতা আছে, তাকেই বন্দনা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই লতাটিকে এ-দেশের আপন সামগ্রী করে নিয়েছিলেন। তাঁর নিজের কথায়—'কাব্য-সরস্বতী কোনো মন্দিরের বন্দিনী দেবতা নন, তাঁর ব্যবহারে এই ফুলকে লাগাব ঠিক করেছি, তাই নতুন করে নাম দিতে হল। রূপে রসে এর মধ্যে বিদেশী কিছুই নেই, এদেশের হাওয়ায় মাটিতে একটুও বিতৃষ্ণা দেখা যায় না, তাই দিশি নামে একে আপন করে নিলেম।' 'চামেলিবিতান' নামে 'বন-বাণীর' অন্য একটি কবিতায় একটি ময়ূরকে সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন যে, ময়ূরটি তাঁকে একটুও ভয় করেনি,—তিনি যখন তাঁর মোটা খাতায় আপন মনে লিখে যেতেন, ময়ূর তখন তাঁর খুব কাছে এসে তাঁকে অণুমাত্রও ভয় না ক'রে, বেশ ঘোরাফেরা করতো। ময়ূর যে সুন্দরের দূত, এই

১। গল্পসল্প ঃ 'ধ্বংস'

কবিতাটিতে সে-কথাও বলা হয়েছিল। আর, সেই সুন্দরের দূতের সঙ্গে নিজের আত্মীয়তা স্মরণ করেই তিনি লিখেছিলেন :

আকাশেরে বাসি ভালো,
সকাল সন্ধ্যার আলো
আমার প্রাণের বর্ণে ভরি।
ধরায় যেখানে তাই
তোমার গৌরব-ঠাঁই
সেথায় আমারো ঠাঁই হয়।

পিয়ার্সন একবার কয়েক জোড়া সবুজ রঙের বিদেশী পাখি এনে শান্তিনিকেতন আশ্রমে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তারা অনেকদিন সেখানে বাসা বেঁধেছিল। তাদের সঙ্গে আমাদের এ-দেশী পাখির মর্মগত কোনো গরমিল যে ছিল না, রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই 'বনবাণী' গ্রন্থের 'পরদেশী' কবিতায় সেই কথাটাই বিশেষভাবে বলে গেছেন :

এনেছে কবে বিদেশী সখা
বিদেশী পাখি আমার বনে,
সকাল-সাঁঝে কুঞ্জ-মাঝে
উঠিছে ডাকি সহজ মনে।
অজানা এই সাগরপারে
হল না তার গানের ক্ষতি।
সবুজ তার ডানার আভা,
চপল তার নাচের গতি।
আমার দেশে যে-মেঘ এসে
নীপবনের মরমে মেশে
বিদেশী পাখি গীতালি দিয়ে
মিতালি করে তাহার সনে।

বিশ্বের বহুবিচিত্র প্রাণরূপ, অশেষ ভাবস্তর এবং বিভিন্ন রূপ-প্রবাহের সঙ্গে এই ধরনের আত্মীয়তা প্রকাশের নিদর্শন রবীন্দ্র-সাহিত্যের সব পর্বেই ছড়িয়ে আছে। তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল আগে ১৯৪১-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে জন্মদিন-সম্পর্কিত যে কয়েকটি কবিতা তিনি লিখেছিলেন, সেগুলি তাঁর

'জন্মদিনে' কাব্যসংগ্রহে সংকলিত হয়েছে। সেই বইয়েরই প্রথম কবিতায় তিনি লিখেছিলেন :

আজি এই জন্মদিনে
দূরত্বের অনুভব অন্তরে নিবিড় হয়ে এল।
যেমন সুদূর ঐ নক্ষত্রের পথ
নীহারিকা-জ্যোতির্বাষ্প-মাঝে
রহস্যে আবৃত,
আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি দুর্গমে—
অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অজানা তাহার পরিণাম।
আজি এই জন্মদিনে
দূরের পথিক সেই তাহারি শুনিনু পদক্ষেপ
নির্জন সমুদ্রতীর হতে॥

এ কবিতা লেখা হয় ২১এ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১, সকালে। সেই সকালেই 'উদয়ন' বাসগৃহে ব'সে আর-একটি কবিতায় তিনি লিখেছিলেন :

যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে।
আনে সে প্রাণের অপূর্বতা।
বিদেশী ফুলের বনে অজানা কুসুম ফুটে থাকে—
বিদেশী তাহার নাম, বিদেশে তাহার জন্মভূমি,
আত্মার আনন্দক্ষেত্রে তার আত্মীয়তা
অবারিত পায় অভ্যর্থনা॥

'বনবাণী', 'জন্মদিনে' ইত্যাদি তাঁর শেষ পর্বের রচনাতে তো বটেই,—তাঁর প্রথম দিকের অনেক লেখাতেই তাঁর গভীর মনের সেই একই আনন্দক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছিল। 'কড়ি ও কোমল'-এর 'সত্য' কবিতাটিতে দেখা গেছে :

যে গৃহে জানালা নাই সে তো কারাগার—
ভেঙে ফেলো, আসিবেক স্বরগের আলো।
হায় হায়, কোথা সেই অখিলের জ্যোতি।
চলিব সরল পথে অশঙ্কিত গতি।

'সিন্ধুতীরে' নামে সে-বইয়ের আর-একটি কবিতায় তিনি বলেছিলেন—'সবারে আনিতে বুকে বুক বেড়ে যায়।' 'আত্ম অপমান' নামে অন্য একটি কবিতায় লিখেছিলেন :

মোছো তবে অশ্রুজল, চাও হাসিমুখে
বিচিত্র এ জগতের সকলের পানে।
মানে আর অপমানে সুখে আর দুখে
নিখিলেরে ডেকে লও প্রসন্ন পরাণে।

: আদি পর্বেও সেই আকাশ :

এই সর্বব্যাপী আত্মীয়তাবোধ আর জীবনাসক্তিই 'কড়ি ও কোমল'-এর প্রথম কবিতাটির মূল কথা। তাঁর সেই প্রসিদ্ধ 'প্রাণ' কবিতায় বলা হয় :

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।

'কড়ি ও কোমল'-এর এই জীবনাসক্তির কথা তাঁর বিভিন্ন সময়ের অনেক লেখাতেই ছড়িয়ে আছে। যাকে তিনি 'ক্ষুদ্র অহং' বা 'ছোটো আমি' বলেছেন, সেই 'আমি'র অহংকার সম্বন্ধে তাঁর সতর্কতার কথাও স্মরণীয়। 'কড়ি ও কোমল'-এর 'ক্ষুদ্র আমি' কবিতাটির শেষ দু' ছত্রে তিনি বলেন :

ক্ষুদ্র আমি করিতেছি বড়ো অহংকার—
ভাঙো নাথ, ভাঙো নাথ অভিমান তার।

এই মনোভঙ্গি অর্জনের পরে, 'মানসী'-তে নিজের সাহিত্য-জীবন সম্বন্ধে তিনি বলতে পেরেছিলেন :

দাঁড়ায়ে বিশাল ধরণীর তলে
ঘুচে গেল ভয় লাজ ;
বুঝিতে পারিনু এ জগৎ-মাঝে
আমারো রয়েছে কাজ।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠশেষের 'পরিত্যক্ত' কবিতাটিতে এই ঘটনাই প্রতিফলিত। সেই জ্যৈষ্ঠশেষেই 'মানসী'র 'কবির প্রতি নিবেদন' কবিতাটি লেখা হয়েছিল। তাতেও ক্লান্তিহীন, চিরপ্রবহমান জীবন-স্রোতের সঙ্গে কবিমানসের সম্পর্কের কথা ভাবা হয়েছে। এই 'মানসী' সম্বন্ধেই—প্রমথ চৌধুরীকে লেখা ১৮৯৮ সালের ২৯এ জানুয়ারি তারিখের এক চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন :

'এখন এক একবার মনে হয় আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে।

একটা আমাকে সর্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করছে, আর একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্ছে না। আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করছে—সেইজন্যে একদিকে বেদনা, আর একদিকে বৈরাগ্য। একদিকে কবিতা, আর একদিকে ফিলজফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালোবাসা, আর একদিকে দেশ-হিতৈষিতার প্রতি উপহাস। একদিকে কর্মের প্রতি আসক্তি, আর একদিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ।'

'মানসী' সম্বন্ধে অন্যান্য কথা এর আগেই 'আদিকথা' অধ্যায়ে বলা হয়েছে। পরে আবার উঠবে।

অহং-নির্মুক্ত জীবনাসক্তির জোরেই 'ক্ষণিকা'-তে পৌছে তিনি বলতে পেরেছিলেন ঃ

সবাই মোরে করেন ডাকাডাকি,
কখন শুনি পরকালের ডাক।
সবার আমি সমান-বয়সী যে
চুলে আমার যত ধরুক পাক।

'ক্ষণিকার' এই আবেগই তাঁর জীবনের শেষ পর্বে বনবাণীর 'মুক্তিতত্ত্ব', 'উদ্বোধন' প্রভৃতি 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা' অধ্যায়ের গানে-গানে ধ্বনিত হয়েছিল। সেখানে তাঁর চিরজীবনের প্রিয় কথাই তিনি আর-একবার

মুক্তিতত্ত্ব শুনতে ফিরিস
তত্ত্বশিরোমণির পিছে ?
হায় রে মিছে, হায় রে মিছে।
মুক্ত যিনি দেখ্-না তাঁরে,
আয় চলে তাঁর আপন দ্বারে,
তাঁর বাণী কি শুকনো পাতায়
হলদে রঙে লেখেন তিনি

২। পৃ ৭২-৭৫

এবং

আমি নটরাজের চেলা,
চিত্তাকাশে দেখছি খেলা,
বাঁধন-খোলার শিখছি সাধন
মহাকালের বিপুল নাচে।
দেখছি, ও যার অসীম বিত্ত
সুন্দর তার ত্যাগের নৃত্য,
আপনাকে তার হারিয়ে প্রকাশ
আপনাতে যার আপনি আছে।

ঃ রঙমহালের ইশারা ঃ

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন সত্তর পেরিয়েছে, সেই সময়ে তিনি এক রঙমহলের রাজার কথা লিখেছিলেন! বিশ্বপ্রকৃতিতে তিনি দেখে গেছেন পরমাশ্চর্য রঙমশালীর দল! তারা জলে-স্থলে, অজানা দেশে, পথ চিনে-চিনে, দুঃসাহসে রাতদিন এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলেছে কোন্ এক মহারাজের রথ। তাঁকে ভালো করে দেখা যায় না। তবুও পাখিরা আকাশে রঙ কুড়িয়ে বেড়ায়, মাছেরা গভীর জলে রঙ খেলিয়ে চলে। 'রঙ জেগেছে বনসভায় গোলাপ চাঁপা রঙিন জবায়',—'মেঘেরা রঙ ফোটায় পলে পলে'। ধরণীর জলে-স্থলে, আকাশে-বাতাসে সর্বত্রই এই আনন্দের স্বীকৃতি। গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি সেই রঙমশালীদের দেখেছিলেন ঃ

তাদের আসর বাহির-ভুবনেতে,
ফেরে সেথায় রঙের নেশায় মেতে।

আর, নিজের মনের গহনে তাকিয়ে, তাঁর সেই প্রৌঢ় পর্বের 'রঙিন' কবিতাটিরই শেষের ক'টি ছত্রে তিনি লিখে গেছেন :

আমার এ রঙ গোপন প্রাণে,
আমার এ রঙ গভীর গানে,
রঙের আসন সেখানে দিই পেতে।

এবং—

আমার মশাল সামনে ধরি না সে,
তাই তো আলো চক্ষে নাহি বাজে।

অন্তরে মোর রঙের শিখা
চিত্তকে দেয় আপন টীকা,
রঙিনকে তাই দেখি মনের মাঝে।

তাঁর কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে—সব পর্বের কবিতাতেই এই অন্তর্মুখিতা দেখা গেছে। 'পূরবী'তেই তাঁর যৌবনের শেষ প্রান্তের বিলম্বিত শেষ সন্ধি! তখন তাঁর বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। সাধারণ মানুষ যাঁরা, তাঁরা সাধারণতঃ সে-বয়স পর্যন্ত ইহলোকে সজাগ ইন্দ্রিয়চেতনা নিয়ে বেঁচে থাকেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথা স্বতন্ত্র।

উনিশ শ' পঁচিশে তাঁর 'পূরবী' প্রকাশিত হবার চার বছর পরে, তাঁর 'মহুয়া' বেরিয়েছিল উনিশ শ' উনত্রিশ খ্রীষ্টাব্দে। 'মহুয়া' থেকে 'বনবাণী' ঠিক দু'বছরের ব্যবধান। বই প্রকাশের তারিখ অনুসারে এই দু'বছরের দূরত্বের কথাটা ভাবা যায় বটে। কিন্তু এ ব্যবধান সত্যিই ব্যবধান কী না,—অর্থাৎ কবির মনে, তাঁর নিজের সৃষ্টি-রহস্যের দিক থেকে,—তাঁর সৃষ্টিকর্মের দিক থেকে 'মহুয়া'তে-'বনবাণী'তে সত্যিই কোনো ব্যবধান অনুভব করা যায় কী না, সে কথা ভেবে দেখা দরকার।

'মহুয়া' আর 'বনবাণী' তাঁর কলমে যেন একই সঙ্গে ধরা দিয়েছিল। তেরশ ছত্রিশ সালের আশ্বিনে প্রকাশিত হয় 'মহুয়া',—আর, তেরশ আটত্রিশের আশ্বিনে 'বনবাণী'। 'মহুয়া'র ভূমিকায় তিনি নিজে জানিয়েছিলেন :

'পূরবী ও মহুয়া'র মাঝখানে আর একদল কবিতা আছে,—সেগুলি অন্য জাতের। তাদের মধ্যে নটরাজ ও ঋতুরঙ্গই প্রধান। নৃত্যাভিনয়ের উপলক্ষ্য নিয়ে এগুলি রচিত হয়েছিল কিন্তু এরাও স্বভাবতই উপলক্ষ্যকে অতিক্রম করেছে। আর কোনোখানেই শান্তিনিকেতনের মতো ঋতুর লীলারঙ্গ দেখিনি—তারই সঙ্গে মানব-ভাষায় উত্তর-প্রত্যুত্তর কিছুকাল থেকে আমার চলছে। তার রীতিমতো শুরু হয়েছে 'শারদোৎসবে'—তার পরে ঋতুগীতির প্রবাহ বেয়ে এসে পড়েছিল 'ঋতুরঙ্গে'। বিষয় এক, তবু প্রভেদ যথেষ্ট।'

'বনবাণী'র পরে উনিশ শ' বত্রিশ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'পরিশেষ' আর 'পুনশ্চ' প্রকাশিত হয়। তারপর উনিশ শ' তেত্রিশে 'বিচিত্রিতা',—পঁয়ত্রিশে 'শেষ সপ্তক' এবং 'বীথিকা',—ছত্রিশে 'পত্রপুট' আর 'শ্যামলী',—আটত্রিশে

'প্রান্তিক' এবং 'সেঁজুতি',—উনচল্লিশে 'প্রহাসিনী' এবং 'আকাশ-প্রদীপ',—চল্লিশে 'নবজাতক' আর 'সানাই',—এবং তাঁর জীবনের শেষ বছরে উনিশ শ' একচল্লিশে 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' এবং 'শেষ লেখা' ছাপা হয়। তাঁর শেষ-পর্বের কবিতার বইগুলির—বিশেষ ভাবে 'পূরবী' থেকে 'শেষলেখা' পর্যন্ত বইগুলির নামাবলী এখানে এক নিশ্বাসে বলে নেওয়া গেল।

তাঁর রচনার অপরিমেয়তার জন্যেই তাঁর সৃষ্টি-কর্মের সম্পূর্ণ ক্ষেত্রটি এক নজরে, এক লহমায় দেখা সম্ভব নয়। বোধ হয়, সেই কারণেই রবীন্দ্রকাব্য অংশে অংশে দেখাই সুবিবেচনা। এসব লেখার কথা পৃথকভাবে এই আলোচনার পরের অংশে পুনরায় উত্থাপিত হবে। এখানে তাঁর আকাশ-চেতনার কথাসূত্রেই শেষপর্বের এই রচনাতালিকা স্মরণ করা গেল।

জীবনের সকল পর্বেই—জগতের মধ্যে পরমাশ্চর্য এক রঙমহলের উপলব্ধি তিনি খুবই সত্য করে পেয়েছিলেন—এবং খুবই সত্য করে তিনি তা প্রকাশ করে গেছেন। বাইরের প্রকৃতি থেকেই তাঁর মনের গহনে এই রঙ ছড়াবার সরাসরি একটা পথ ছিল! সেই পথের কথা তিনি কখনো গদ্যে বলেছেন, কখনো বা পদ্যে,—কখনো নাটকে—এবং সর্বদাই তাঁর অসংখ্য গানে গানে! 'জীবনস্মৃতি'তে আর 'ছেলেবেলায়' তিনি তাঁর ছেলেবেলার প্রকৃতি উপভোগের বিষয়ে যে-কথা বলে গেছেন, সেই কথাই তাঁর 'সোনার তরী'তে, 'চিত্রা'য়, এমনকি তাঁর অজস্র ছড়াতে,—আবার তাঁরই উত্তর-পর্বের কাব্য 'পরিশেষে' ব্যক্ত হয়েছে।

উদাহরণ উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ অনুভব করা দরকার।

'সোনার তরী'র 'বসুন্ধরা' কবিতায় তিনি বলেছিলেন :

তাই আজি কোনো দিন, শরৎ-কিরণ
পড়ে যবে পক্বশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র পরে,
নারিকেলদলগুলি কাঁপে বায়ুভরে
আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহা ব্যাকুলতা,
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলেস্থলে, অরণ্যের পল্লবনিলয়ে,
আকাশের নীলিমায়।

এখানেও তাঁর অনুভূতিতে তিনি সেই রঙমহলেরই ইশারা অনুভব করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র-সমাজ-ধর্মচিন্তা

রাষ্ট্র আর সমাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কী কী ভেবেছেন, সে-বিষয়ে অনুসন্ধানে এগিয়ে গেলে তাঁর ধর্মচিন্তার কথা স্বভাবতই দেখা দেয়।

আঠারো শ আশির দশকের প্রথম দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' প্রভৃতি উপন্যাসে এবং তাঁর 'বিবিধপ্রবন্ধ', 'লোকরহস্য', 'কমলাকান্ত' প্রভৃতি প্রবন্ধে-নিবন্ধে প্রচারিত দেশপ্রীতি, সমাজ-সমালোচনা, জাতীয়তাবোধ ইত্যাদি চিন্তাধারার প্রভাবের যুগেই নব্য হিন্দুধর্মের গুণগান করে শশধর তর্কচূড়ামণি আবির্ভূত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন নবযুবক। তাঁর প্রৌঢ় বয়সে—১৩৩৪ সালের শ্রাবণে লেখা 'বৃহত্তর ভারত' প্রবন্ধে তিনি যবদ্বীপ যাত্রার পূর্বাহ্নে প্রাপ্ত অভিনন্দনের জবাব দিতে উঠে, সেই সুদূর অতীতেরও আগেকার যুগের কথা স্মরণ করেছিলেন। তর্কচূড়ামণির নব্য হিন্দুবাদ তাঁর ভালো লাগেনি বটে, কিন্তু সে-সব প্রসঙ্গের উল্লেখ ছিল না তাঁর সে-প্রবন্ধে। ছেলেবেলার স্বদেশ-ভাবনার পরিচয় দিতে গিয়ে, সেখানে তিনি তাঁর আট-ন বছর বয়সে পেনেটির বাগানবাড়িতে গঙ্গাতীরে বাস করবার অভিজ্ঞতা স্মরণ করে গেছেন। তাঁর নিজের কথায়—'গঙ্গানদী ভারতের একটি বৃহৎ পরিচয়কে বহন করে। ভারতের বহু দেশ, বহু কাল ও বহু চিত্তের ঐক্যধারা তার স্রোতের মধ্যে বহমান। এই নদীর মধ্যে ভারতের একটি পরিচয়-বাণী আছে। হিমাদ্রির স্কন্ধ থেকে পূর্বসমুদ্র পর্যন্ত লম্বমান এই গঙ্গানদী। সে যেন ভারতের যজ্ঞোপবীতের মতো। ভারতের বহুকালক্রমাগত জ্ঞান ধর্ম তপস্যার স্মৃতি-যোগসূত্র।'

সেকালের হাওয়ায় সেই নব্য হিন্দুবাদ,—আর তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সেই গঙ্গাদর্শন আর গঙ্গা-সূত্রের উপলব্ধি,—এই দুটি ব্যাপারের সঙ্গে তৃতীয়ত তাঁর নানা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা,—এবং চতুর্থত তাঁর ইতিহাস পাঠের ফল—এই ক'টি কারণের সমবায়ে তাঁর রাষ্ট্র-সমাজ-ধর্ম সম্পর্কিত মতামতের পরিণতি ঘটেছিল।

তারপর আঠারো শ' নব্বই-এর দশকে 'সাধনা' সম্পাদনায় আমলেই রাজনীতি আর সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর প্রথম লেখাগুলি দেখা দেয়। অতঃপর উনিশ শ পাঁচের আন্দোলন গেছে,—'গীতাঞ্জলি'র কাছাকাছি সময়েও

আবার তাঁকে সে-বিষয়ে ভাবতে হয়েছে.—উনিশ শ একুশের আন্দোলনে এবং তার আগে জালিয়ানওয়ালাবাগের দুর্যোগ-লগ্নেও তিনি দেশের কথা, সমাজের কথা নতুন করে ভেবেছেন,—আবার তাঁর জীবনের শেষ পর্বেও 'সভ্যতার সংকট'-এর মতন লেখা দেখা দিয়েছে। তখন তাঁর আশি বছর বয়স।

'কালান্তর' বইখানির প্রথম সংস্করণ বেরিয়েছিল ১৩৪৪ সালের বৈশাখ মাসে। তাতে মোট পনেরোটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়। ১৩২১ থেকে ১৩৭৩ সালের মধ্যে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে সেগুলি ছাপা হয়েছিল। সবচেয়ে আগে 'সবুজপত্রে' বেরিয়েছিল 'বিবেচনা ও অবিবেচনা', 'লোকহিত' এবং লড়াইয়ের মূল'; প্রথমটি ১৩২১ সালের [১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ] বৈশাখে, দ্বিতীয়টি ভাদ্র-সংখ্যায়, তৃতীয়টি পৌষে।

তাঁর নোবেল-পুরস্কারলাভ তার অল্প আগেকার ঘটনা। নোবেল পুরস্কারের আগেই ১৩১৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে,—১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪এ মে তিনি কলকাতা থেকে বিলেতের পথে বোম্বাই যাত্রা করেছিলেন; ২৭এ মে বোম্বাই থেকে তাঁর জাহাজ ছেড়েছিল। 'পথের সঞ্চয়' সেই ভ্রমণকাহিনী। তাঁর সেবারের ভ্রমণের সময়-বিস্তার ১৩১৯ সালের জ্যৈষ্ঠ থেকে ১৩২০র আশ্বিন পর্যন্ত। লণ্ডনে অনেক মনীষীর সঙ্গে অনেক আলোচনায় সময় কাটিয়ে,— ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭এ অক্টোবর তিনি ন্যুয়র্কে পৌঁছেছিলেন। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র আর্বানায় সেবার তিনি বেশ কিছুদিন বাস করেন। ১৯১৩র জানুয়ারিতে আর্বানা থেকে শিকাগো রওনা হন।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল—Ideals of the Ancient Civilization of India। ৩০এ জানুয়ারি রচেষ্টারে Race-Conflict সম্বন্ধে তিনি আর-একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই দ্বিতীয় বক্তৃতার আগে শিকাগোতেই তিনি The Problem of Evil বিষয়ে অন্য-এক ভাষণ দেন। অতঃপর বষ্টন ও হার্ভার্ড-বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁকে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। সেই শিকাগো এবং হার্ভার্ড-বক্তৃতামালাই পরে তাঁর ইংরেজি *Sadhana* গ্রন্থে সংকলিত হয়।

'কালান্তর'-এর প্রথম দিকের প্রবন্ধগুলি তাঁর সেই পর্বের চিন্তাধারার সঙ্গে জড়িত। প্রবাসে তিনি তখন ভারতের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের কথা প্রচার করছিলেন। এদিকে, তাঁর স্বদেশে বিপিনচন্দ্র পাল তখন রবীন্দ্র-সাহিত্যের বস্তুসত্যবিমুখতা সম্বন্ধে সাময়িক পত্র-পত্রিকায় আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৩১৯-এর আষাঢ় সংখ্যার 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্র-শিষ্য অজিতকুমার চক্রবর্তী সেই অভিযোগের জবাব লিখেছিলেন ; তাঁর সে-প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল— 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্যা কি বস্তুতন্ত্রহীন ?'

কিন্তু 'কালান্তর'-এর সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতির কথা-প্রসঙ্গে আরো কিছু আগেকার কথাও মনে পড়ে। প্রবাস-যাত্রার পূর্বে ১৩১৮ সালের প্রথম দিকেই তিনি আদি-ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন। সেবার মাঘোৎসবের সময়ে 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি লেখা হয়। সেই সময়ে পূর্ববঙ্গ এবং আসামের গোপন সরকারী ইস্তাহারে শান্তিনিকেতন আশ্রমের বিদ্যালয়টি রাজ-রোষে চিহ্নিত হয়। কর্তৃপক্ষ বলেন যে, সে-বিদ্যালয় সরকারী কর্মচারীদের পুত্র-কন্যার পক্ষে অনুপযুক্ত। ফলে, সে সময়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা কমে যায়। তারপর, ১৯১১-র আদম সুমারী থেকেই হিন্দু ও ব্রাহ্ম ধর্মভেদ সম্বন্ধে দেশে যে প্রশ্ন উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়েও চিন্তা করেন। ১৩১৯ সালের বৈশাখ সংখ্যার 'তত্ত্ববোধিনী'তে 'আত্মপরিচয়' নামে তাঁর যে লেখাটি বেরিয়েছিল, তাতে ব্রাহ্মরা যে হিন্দু, তিনি সেই কথাই সমর্থন করেন। তারই কাছাকাছি সময়ে, ১৩১৮ সালের ৪ঠা চৈত্র কলকাতার ওভারটুন হলে 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' সম্বন্ধে তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ বক্তৃতা দেন।

'কালান্তর'-এর কথা-প্রসঙ্গে ১৯১০ থেকে ১৯১৪-১৫ পর্যন্ত রবীন্দ্র-জীবনের এইসব গুরু চিন্তা এবং ব্যাপক আন্দোলনের কথা স্মরণীয়। ১৩২১ সালের 'বিবেচনা ও অবিবেচনা'-র মধ্যে তিনি জানিয়েছিলেন—'চলার পদ্ধতির মধ্যে অবিবেচনার বেগও দরকার, বিবেচনার সংযমও আবশ্যক ; কিন্তু অবিবেচনার বেগ বন্ধ করিব, আবার বিবেচনা করিতেও অধিকার দিব না,—মানুষকে বলিব, তুমি শক্তিও চালাইও না, বুদ্ধিও চালাইও না, তুমি কেবলমাত্র ঘানি চালাও, এ বিধান কখনই চিরদিন চলিবে না।'

তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক মতামত সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই কথাই বলা যেতে পারে যে, তিনি সে ক্ষেত্রেও আধ্যাত্মিক চরিতার্থতার আদর্শ মানতেন। 'কালান্তর' প্রবন্ধাবলীতে তো বটেই, তাছাড়া তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' সম্পর্কিত লেখাগুলির মধ্যে এবং শেষ পর্বেরও বহু লেখাতে এ-আদর্শের সমর্থন আছে। এদিক থেকে তাঁকে জনতার মধ্যে নিঃসঙ্গ মনে হয়! মনে পড়ে তাঁরই রচনায়—১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ সেপ্টেম্বর 'প্রান্তিক'-এর একটি কবিতায় তিনি লিখেছিলেন :

অকস্মাৎ মহা-একা
ডাক দিল একাকীরে প্রলয় তোরণ চূড়া হতে।
অসংখ্য অপরিচিত জ্যোতিষ্কের নিঃশব্দতা মাঝে
মেলিনু নয়ন ; জানিলাম একাকীর নাই ভয়,
ভয় জনতার মাঝে ; একাকীর কোন লজ্জা নাই,
লজ্জা শুধু যেথা-সেথা যার তার চক্ষুর ইঙ্গিতে।
বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা একা, সৃষ্টিকাজে আমার আহ্বান
বিরাট নেপথ্যলোকে তাঁর আসনের ছায়াতলে!

অন্ধ প্রথার এবং যুক্তিহীন আচারের তীব্র বিরোধিতা প্রকাশ করে, সামাজিক এবং রাষ্ট্রগত কল্যাণের আদর্শ সম্বন্ধে তিনি নানা জায়গায় তাঁর নিজের বিশ্বাসের কথা বলে গেছেন। জীবনের বিভিন্ন পর্বে, তিনি যা যা বলে গেছেন, সে-সব মন্তব্য ঠিকভাবে,—অর্থাৎ তাদের যথার্থ প্রসঙ্গধারার সীমা বিচার করে দেখা দরকার।

ডক্টর শচীন সেনের একখানি ইংরেজি বই বেরিয়েছিল। তাতে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা ছিল। সে-বইখানি পড়ে, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে তিনি কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত মতামতের মূলে তাঁর নিজস্ব যে যে বিশেষ অনুভূতি বা উপলব্ধির প্রেরণা ছিল, অনুসন্ধিৎসু-পক্ষকে সেই সব প্রেরণা সম্বন্ধেই তিনি সজাগ হবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

'সাম্রাজ্যিক ঐক্য' অপেক্ষা 'সামাজিক ঐক্য'—রাষ্ট্রগত স্বরাজের তুলনায় 'সামাজিক স্বরাজ'কেই তিনি বেশি কাম্য মনে করতেন! শেষ বয়সে পারস্য-ভ্রমণে বেরিয়ে তিনি লিখেছিলেন, 'পারস্য বার বার পর-জাতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপন পারসিক ঐক্যকে দৃঢ় করবার ও জয়ী করবার চেষ্টা করেছে।

গুপ্ত রাজাদের আমলে ভারতবর্ষ একবার আপন সাম্রাজ্যিক একসত্তা অনুভব করবার সুযোগ পেয়েছিল কিন্তু তার প্রভাব গভীর ও স্থায়ী হয়নি। তার প্রধান কারণ ভারতবর্ষ অন্তরে অন্তরে আর্যে অনার্যে বিভক্ত, সাম্রাজ্যিক ঐক্য সামাজিক ঐক্যের উপর ভিত পাততে পারেনি।'

'পারস্যে'র মধ্যে তিনি আরো লিখেছিলেন, 'সাম্প্রদায়িক ধর্ম জিনিষটাই সাবেককালের জিনিষ। পুরাকালের কোনো একটা বাঁধা মত ও অনুষ্ঠানকে সকল কালেই সকলে মিলে মানতে হবে এই হচ্ছে সম্প্রদায়ের শাসন।' এই সূত্রে তাঁর মনে জেগে উঠেছিল আরো একটা দিক—এবং কয়েক লাইন পরেই তিনি লিখেছিলেন, 'অভ্যাসে যে মনকে পেয়ে বসে সে মনের মতগুলো মনন থেকে বিযুক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ চিত্তধারার সঙ্গে চিন্তিত বিষয়ের সম্বন্ধ শিথিল হয়।' 'কালান্তরের' প্রথম প্রবন্ধের মধ্যেই ('কালান্তর' শ্রাবণ ১৩৪০) এ কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তাঁর বক্তব্য এই যে, প্রাচীনকালে আমাদের জীবনযাত্রার সংস্কার জমে উঠেছিল আমাদেরই বিশেষ নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি অভ্যাসের আশ্রয়ে। প্রথা আর শাস্ত্র-বচনের প্রতি আনুগত্যের ফলে এক রকম স্থাবরতা সূচিত হয়, অথচ আমাদের এই ব্যবহারিক সংসারের বাইরে মানব-ব্রহ্মাণ্ডের দিগ্‌দিগন্তে বিরাট ইতিহাসের নিরন্তর অভিব্যক্তি চলেছে। সে দিকে আমাদের উপেক্ষা দীর্ঘকালের। বাইরে থেকে প্রথম বিরুদ্ধ আঘাত লাগল মুসলমানের। তাঁর নিজের ভাষায়—'সে মুসলমানও প্রাচীন প্রাচ্য, সেও আধুনিক নয়।' তার রুচি আলাদা। তার চিত্তের সৃষ্টি-বৈচিত্র্য ছিল না। তার সঙ্গে আমাদের যে সংঘর্ষ, সেটা ছিল 'এক চির-প্রথার সঙ্গে আর এক চির-প্রথার সংঘর্ষ।'

তিনি বলেছেন, মুসলমান আমলের বাংলা সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আমাদের বৈষ্ণব কাব্যে কিংবা মঙ্গল কাব্যে মুসলমান প্রভাব ছিল যৎসামান্য। 'মঙ্গল-কাব্যে মাঝে মাঝে মুসলমান রাজ্য শাসনের বিবরণ আছে, কিন্তু তার বিষয়বস্তুতে কিংবা মনস্তত্ত্বে মুসলমান সাহিত্যের কোনো ছাপ দেখিনে, বৈষ্ণব গীতিকাব্যে তো কথাই নেই।' তাই তাঁকে বলতে হয়েছিল—মুসলমান শাসনের আমলেও 'পল্লীর চণ্ডীমণ্ডপেই রয়ে গেল আমাদের প্রধান আসর'!

তারপর মুসলমান গেছে, ইংরেজ এসেছে। আমাদের ইতিহাসের সেই

যুগ-সন্ধি সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, ইংরেজ এদেশে দেখা দিয়েছিল 'নব্য য়ুরোপের চিত্তপ্রতীকরূপে।' শুধু তাই নয়—'য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল।' যেমন—'একদা রেনেসাঁসের চিত্তবেগ ইটালি থেকে উদ্‌বেল হয়ে সমস্ত য়ুরোপের মনে প্রতিহত হয়েছিল।' এদেশে মুসলমান যুগের পরে ইংরেজের মধ্য দিয়ে যে য়ুরোপীয় মনের সান্নিধ্য অনুভব করা গিয়েছিল, তার প্রকৃতি বর্ণনা করে তিনি বলে গেছেন—'প্রতিদিন জয় করেছে সে জ্ঞানের জগৎকে, কেননা তার বুদ্ধির সাধনা বিশুদ্ধ,—'ব্যক্তিগত মোহ থেকে নির্মুক্ত।' 'মানুষের বুদ্ধির সর্বব্যাপী ঔৎসুক্য',—'জ্ঞানের বিশ্বরূপ' দেখা দিয়েছিল ইংরেজের এদেশে প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে! এদেশে মুসলমান আমলে প্রবলের শক্তি ছিল অপ্রতিহত। স্বেচ্ছাচারী শাসক ছিলেন উচ্চাসনে। 'নীতিবন্ধন-অসহিষ্ণু অধর্মসাহসিকতা'র ঔদ্ধত্যকে একদিন ঈশ্বরত্বের লক্ষণ বলে মানুষ স্বীকার করেছে। 'ন্যায় আদর্শের সর্বভূমিনতা' স্বীকার করে ইংরেজ রাজের প্রভূত শক্তি আপনাকে অশক্তের সমান ভূমিতেই দাঁড় করিয়েছিল। ইংরেজের সেই প্রথম ভারত-আগমনের লগ্নে ভারতবর্ষ নতুন উদ্দীপনা লাভ করেছিল। মানুষের অধিকার, মানুষের মর্যাদা এবং বিজ্ঞানের সার্বভৌমিক কারণ-বিধির প্রতি আস্থা—এইগুলিই ছিল যুরোপের বিশিষ্ট দান।

ভিক্‌টোরিয় যুগে ইংরেজ ছিল রাষ্ট্রীয় প্রতাপের উচ্চতম শিখরে। আমাদের মধ্যে তখন একদিকে ছিল ইংরেজের প্রতি বিরুদ্ধতা, আর একদিকে ইংরেজ চরিত্রের প্রতি অসাধারণ আস্থা। ইতিহাসের আরো দূরকালে দৃষ্টিক্ষেপ করে তিনি বলেছিলেন যে, Reformation-যুগে, ফরাসী-বিদ্রোহের যুগে য়ুরোপে যে মতস্বাতন্ত্র্যের জন্যে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জন্যে লড়েছিল, সেদিন তার সেই আদর্শে বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয়নি। সেদিন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভাইয়ে-ভাইয়ে যুদ্ধ বেধেছিল দাসপ্রথার বিরুদ্ধে। ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডির বাণীতে-কীর্তিতে সেই যুগ ছিল গৌরবান্বিত। 'সেদিন তুর্কির সুলতানের অত্যাচারকে নিন্দিত করে মন্দ্রিত হয়েছিল গ্ল্যাডস্টোনের বজ্রস্বর।' সেই সব কীর্তির কথা তাঁর মনে বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে রেখেছিল। তাই এ-দেশেও ইংরেজ সমাগমের প্রথম পর্ব সম্বন্ধে তাঁর নিজের কথা তিনি নিজেই বিশেষভাবে বলে গেছেন: 'এই যুগ য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের গভীর সহযোগিতারই যুগ।'

ইতিমধ্যে ইতিহাস এগিয়ে চলেছে। পাশ্চাত্ত্য সংশ্রবের ফলে বহুকালের ঘুমন্ত এশিয়ায়—জাপান জেগে উঠেছে। প্রাচ্য জাতির এই জাগরণ আনন্দজনক। সেই আনন্দের কথা জানিয়ে—তিনি বলেছিলেন, 'আশা ছিল 'আমাদেরও রাষ্ট্রজাতিক রথ চলবে সামনের দিকে এবং এও মনে ছিল যে, এই চলার পথে টান দেবে স্বয়ং ইংরেজও।' কিন্তু—'আজ ইংরেজ শাসনের প্রধান গর্ব ল এবং অর্ডার, বিধি এবং ব্যবস্থা নিয়ে। এই সুবৃহৎ দেশে শিক্ষার বিধান, স্বাস্থ্যের বিধান অতি অকিঞ্চিৎকর; দেশের লোকের দ্বারা নব নব পথে ধন উৎপাদনের সুযোগ সাধন কিছুই নেই।' 'কালান্তর'এর এই খেদোক্তির সঙ্গে তাঁর 'সভ্যতার সংকট'-এর মন্তব্য স্বভাবতই মনে পড়ে। দীর্ঘকাল তিনি একই ভাবনা ভেবে গেছেন।

বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের কয়েক বছর পরে ১৯১০ থেকে ১৯১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর কয়েকটি লেখাতে আমাদের তৎকালীন জাতীয় অবসাদ সম্বন্ধে কিছু কিছু মন্তব্য দেখা গিয়েছিল। তখন একদিকে আমাদের অভ্যস্ত আচারের মাধ্যাকর্ষণ, অন্যদিকে পশ্চিম-পৃথিবীর নিরলস কর্মব্যস্ততা,—এই দুই বিপরীত প্রকৃতির বিশ্লেষণ—এবং তৎসূত্রে আমাদের স্বীকার্য কর্মাদর্শ সম্বন্ধে বিশেষ সন্ধিৎসা তাঁর গদ্য-পদ্য উভয় শ্রেণীর লেখাতেই বার-বার আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৯০৫-এর উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনার অল্পকাল পরেই একদল প্রবীণের মধ্যে—একটু বেশি পরিমাণে—অতীতের প্রতি অন্ধ আনুগত্য লক্ষ্য করে তিনি জানিয়েছিলেন:

'সেই বন্যার বেগ কমিয়া আসিয়াছে। সমাজের মধ্যে যে চলার ঝোঁক আসিয়াছিল, সেটা কাটিয়া গিয়া আজ আবার বাঁধিবোলের বেড়া বাঁধিবার দিন আসিয়াছে।

'আজ আবার সমাজকে বাহবা দিবার পালা আরম্ভ হইল। জগতের মধ্যে কেবলমাত্র ভারতেরই জলবাতাসে এমন একটি অদ্ভুত জাদু আছে যে এখানে রীতি আপনিই নীতিকে বরণ করিয়া লয়, আচারের পক্ষে বিচারের কোনো প্রয়োজনই হয় না।'

যারা কাজের মধ্যে নিজেদের নিরন্তর ডুবিয়ে রাখতে ভালোবাসে,—এবং বিপরীত পক্ষে,—কর্মবর্জনেই যাদের বিশেষ আগ্রহ, সেই দুই ধাতের মানুষের

প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে তিনি প্রাণশক্তির তারতম্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন। মানুষের বাইরের আচরণের মূলে প্রাণধর্মের এই-যে প্রকৃতিভেদ, তারই ব্যাখ্যাসূত্রে অন্যান্য কথার মধ্যে এক জায়গায় তিনি তাঁর এই বিশেষ অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছিলেন: 'সেদিন একটি কুকুরছানাকে দেখা গেল, মাটির উপর দিয়া একটি কীট চলিতেছে দেখিয়া তাহার ভারি কৌতূহল। সে তাহাকে শুঁকিতে শুঁকিতে তাহার অনুসরণ করিয়া চলিল। যেমনি পোকাটা একটু ধড়ফড় করিয়া উঠিতেছে অমনি কুকুর-শাবক চমকিয়া পিছাইয়া আসিতেছে।'…'দেখা গেল তাহার মধ্যে নিষেধ এবং তাগিদ দুটা জিনিষই আছে। প্রাণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই যে, সমস্তকেই সে পরখ করিয়া দেখে। নূতন নূতন অভিজ্ঞতার পথ ধরিয়া সে আপনার অধিকার বিস্তার করিয়া চলিতে চায়।'

যুক্তিতর্কময় প্রবন্ধের মধ্যেও যোগ্য সাদৃশ্য আর দৃষ্টান্ত পরিবেশন করতে তাঁর কোনদিন কার্পণ্য ছিল না। প্রাণের প্রসঙ্গ তুলে তাই তিনি প্রাচীন ও আধুনিক মিশরের দুটি বিপরীত ছবির কথা ভেবেছিলেন। পুরানো মিশরের 'মমি' একদিকে,—আধুনিক মিশরের নীল-নদীর পলিপড়া মাঠে চাষ-করা কৃষক অন্যদিকে—এই দুয়ের মধ্যে বিশেষ ভাবে দ্বিতীয়টিতেই যথার্থ সনাতন প্রাণস্বভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করে তিনি লিখেছিলেন:

'যাহা থামিয়া বসিয়াছে তাহার সঙ্গে সনাতন প্রাণের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। আজ ক্ষুদ্র ভারতের প্রাণ একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া স্থির হইয়া গেছে, তাহার মধ্যে সাহস নাই, সৃষ্টির কোনো উদ্যম নাই, এই জন্যই মহাভারতের সনাতন প্রাণের সঙ্গে তাহার যোগই নাই।'

সনাতন সত্যের প্রতি ভ্রান্ত আসক্তিবশে যাঁরা রক্ষণশীলতার বাড়াবাড়ি করছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি পশ্চিমের দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন। আমাদের স্বদেশেও যে তাদেরই মতন 'জন্ম-লক্ষ্মীছাড়া'র অভাব নেই, সে ভরসাও তিনি বেশ জোর গলায় প্রকাশ করেছিলেন,—এবং আমাদের প্রাণস্বভাবের ওপর সমাজের রক্ষণশীল সনাতনীদের শাসন প্রয়োগের অস্বাভাবিকতার কথাটি তিনি এই উপমা দিয়ে বিশদভাবে বুঝিয়েছিলেন: 'ইহারা কুন্তীসুত কর্ণের মতো। পাণ্ডবের দলে কর্ণের যথার্থ স্থান ছিল

কিন্তু সেখানে অদৃষ্টক্রমে কোনো অধিকার না পাওয়াতে পাণ্ডবদিগকে উচ্ছেদ করাই তাহার জীবনের ব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা যাঁহাদের কথা বলিতেছি তাঁহারা স্বভাবতই চলিষ্ণু কিন্তু এদেশে জন্মিয়া সে কথাটা তাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া বসিয়াছেন—এইজন্যই যাঁহারা ঠিক তাঁহাদের একদলের লোক, তাঁহাদের সঙ্গেই অহরহ হাতাহাতি করিতে পারিলে ইঁহারা আর কিছু চান না।'

১৩২১ সালে লেখা তাঁর এই প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে তাই খুবই জোরের সঙ্গে প্রাণের নিত্য-সচলতার কথা বলা হয়েছিল।

তাঁর এসব ভাবনার সঙ্গে আমাদের দেশের তখনকার সমাজ ও রাষ্ট্রঘটনার প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। ঐ লেখাটির মাস তিনেক পরে প্রকাশিত তাঁর আর-একটি প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক পার্থক্যের রূঢ় আতিশয্য সম্বন্ধে দেশের তথাকথিত হিতার্থীদের অবহিত হবার পরামর্শ দিয়ে, নিকট-অতীতের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রসঙ্গই তিনি পুনরায় উত্থাপন করেছিলেন :

'বঙ্গবিচ্ছেদ ব্যাপারটা আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। সেই হৃদয়টা যতদূর পর্যন্ত অখণ্ড ততদূর পর্যন্ত তাহার বেদনা অপরিচ্ছিন্ন ছিল। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।'

সে-প্রবন্ধের প্রথম দিকেই তাঁর এই সতর্ক-বাণী উচ্চারিত হয়েছিল :

'আমরা লোকহিতের জন্য যখন মাতি তখন অনেক স্থলে সেই মত্ততার মূলে একটি আত্মাভিমানের মদ থাকে। আমরা লোকসাধারণের চেয়ে সকল বিষয়ে বড়ো এই কথাটাই রাজকীয় চালে সম্ভোগ করিবার উপায় উহাদের হিত করিবার আয়োজন। এমন স্থলে উহাদেরও অহিত করি, নিজেদেরও হিত করি না।'

এই মন্তব্যের পরের বাক্যেই ততোধিক স্পষ্টভাবে তিনি জানিয়েছিলেন :

'হিত করিবার একটিমাত্র ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে সেটি প্রীতি। প্রীতির দানে কোনো অপমান নাই কিন্তু হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়।'

বঙ্গবিচ্ছেদের তুমুল উত্তেজনার মধ্যেও যথার্থ প্রীতির বশে 'ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ' যে জনসাধারণের ভারতবর্ষের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পায়নি,

রবীন্দ্রনাথ সেই কথাই স্পষ্টভাবে জানিয়ে গেছেন। ১৯০৫-এর প্রায় ন'বছর পরে আলোচ্য প্রবন্ধের মধ্যে তাই তিনি বলেছিলেন :

'যদি নিজেদের হৃদয়ের দিকে তাকাই তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ভারতবর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি। বাংলা দেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা যে বাড়িয়া গিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ হিন্দুভদ্রসমাজে এই শ্রেণীয়দিগকে হৃদয়ের সহিত আপন বলিয়া টানিয়া রাখে নাই।'

বিশ শতকের প্রথম দু'দশকের মধ্যে 'ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ' এবং জনসাধারণের ভারতবর্ষ, এই দুই বিভাগে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ বিভেদের বৃত্তান্তটি তাঁর নানা রচনার মধ্যে আলোচিত হয়েছে। বৃহত্তর মানব-সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আমাদের তখনকার এই স্থানীয় ঘটনার সমাবেশ দেখিয়ে,—এবং তা ঠিক ভাবে বোঝবার চেষ্টা করে বিশ্বভাবনাশীল রবীন্দ্রনাথ আমাদের ইতহাসের অতিক্রান্ত অধ্যায়ের দিকে চোখ ফিরিয়েছিলেন। লোকহিতের বুলি-তোলা, অভিমানসর্বস্ব রাষ্ট্রনায়কত্বের কথাসূত্রে তিনি য়ুরোপের সঙ্গে আধুনিক ভারতবর্ষের তুলনা করেছিলেন :

'একদিন যখন আমরা দেশহিতের ধ্বজা লইয়া বাহির হইয়াছিলাম তখন তাহার মধ্যে দেশের অংশটা প্রায় কিছুই ছিল না হিতের অভিমানটাই বড়ো ছিল। সেদিন আমরা য়ুরোপের নকলে দেশহিত শুরু করিয়াছিলাম, অন্তরের একান্ত তাগিদে নয়। আজও আমরা লোকহিতের জন্য যে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছি তাহার মধ্যে অনেকটা নকল আছে।'

অথচ য়ুরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে আগেকার রেওয়াজ বদলে তখন নতুন আমল দেখা দিয়েছে। অন্তত কিছু পরিমাণে একাদশ-দ্বাদশ শতকের প্রসিদ্ধ ধর্ম-সংগ্রাম ছিল য়ুরোপের দেশব্যাপী খ্রীস্টান সংহতিবোধেরই প্রত্যক্ষ ফল আর প্রেরণা, দুইয়েরই সূচক। সেই সঙ্গে মধ্যযুগের সামন্ত রাজন্যবর্গের পারস্পরিক সংঘর্ষের কথাও স্মরণীয়। সে সব পুরাকথার ইশারা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন :

'য়ুরোপে যাহারা একদিন বিশিষ্ট-সাধারণ বলিয়া গণ্য হইত তাহারা সেখানকার ক্ষত্রিয় ছিল। তখন কাটাকাটি মারামারির অন্ত ছিল না। তখন য়ুরোপের প্রবল বহিঃশত্রু ছিল মুসলমান; আর ভিতরে ছোটো

ছোটো রাজ্যগুলা পরস্পরের গায়ের উপর পড়িয়া কেবলই মাথা ঠোকাঠুকি ক'রত। তখন দুঃসাহসিকের দল চারদিকে আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া বেড়াইত—কোথাও শান্তি ছিল না।'

মধ্যযুগে য়ুরোপের সেই 'ক্ষত্রিয়দল' যে প্রাধান্য পেয়েছিল, সেটা স্বাভাবিক। কারণ,—'তখন লোক-সাধারণের সঙ্গে তাহাদের যে সম্বন্ধ ছিল সেটা কৃত্রিম নহে। তাহারা ছিল রক্ষাকর্তা এবং শাসনকর্তা। লোক-সাধারণ তাহাদিগকে স্বভাবতই আপনাদের উপরিবর্তী বলিয়া মানিয়া লইত।' য়ুরোপের মধ্যযুগের 'নাইট'দের শৌর্য-বীর্যের আদর্শ মনে রেখেই তিনি বোধ হয় 'ক্ষত্রিয়দল' কথাটা ব্যবহার করেছিলেন। প্রামাণ্য ইতিহাসের ঘটনাধারার সঙ্গে প্রসঙ্গটি মিলিয়ে দেখা দরকার।

পশ্চিম ভূমধ্যপ্রদেশে,—স্পেনে তৃতীয় আব্দার রহমান [খ্রীষ্টীয় ৯২৯-৯৬১ অব্দ] লোকান্তরিত হবার পরে, খ্রীষ্টানরা যখন ইসলাম-শক্তির প্রতিরোধকল্পে সংঘবদ্ধ হন, তখন থেকেই আলোচ্য ধর্মসংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে। অবিশ্যি পূর্বাঞ্চলে সে-সংগ্রাম শুরু হয়েছিল আরো কিছুকাল আগে। দুর্বল বাইজ্যানটাইন সাম্রাজ্যের বিশেষ ত্রাসের কারণ হয়ে উঠেছিল সেলজাক তুর্কীদের অভ্যুদয়। এদিকে কাইরোতে সুন্নী সম্প্রদায়ের তুর্কীদের সঙ্গে শিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত খলীফাদের কলহের ফলে ইসলামের ঐক্যে ভাঙন ধরে। সে-সময়ে খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীরা বিধর্মী আরব ও তুর্কীদের হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছেন বলে রব তুলে দেওয়া হয়। ফলে, খ্রীষ্টান সামন্ত-রাজশক্তি এই বুলি ধরেই, বিধর্মীদের কবল থেকে জেরুজালেম উদ্ধারের সংকল্প গ্রহণ করেন। ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় আর্বান এই ধর্মযুদ্ধ-সংকল্পের নেতৃত্ব নিয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাতে তিনি বিশেষভাবে এই কটি বিষয়ের ওপর জোর দেন: ১। খ্রীষ্টানদের ওপর তুর্কীদের অত্যাচার; ২। সিরিয়া এবং জেরুজালেম খ্রীষ্টানশক্তির অধিকারভুক্ত করবার আবশ্যিকতা; ৩। এই সুযোগে খ্রীষ্টানদের সমৃদ্ধি-বিস্তারের সম্ভাবনা;—এবং ৪। এই নতুন সংকল্পের ফলে, গৃহযুদ্ধের উন্মত্ততা হ্রাসের সুযোগ ঘটে। আর, তিনি একথাও বলেছিলেন যে, খ্রীষ্টানদের রক্তক্ষয় ঘটিয়ে, 'নাইট'রা নিজেদের এলাকায় যে-সব সামন্তযুদ্ধের উত্তেজনা ছড়িয়ে রেখেছেন, তা থেকে নিবৃত্ত হওয়া দরকার। ঐতিহাসিক সে বক্তৃতার বিবরণ উদ্ধার করেছেন—'If, forsooth, you wish to be

mindful of your souls, either lay down the girdle of such knighthood or advance boldly, as knights of Christ, and rush as quickly as you can to the defence of the Eastern Church.'

মধ্যযুগের এই ধর্মসংগ্রামের মূলে যে প্রেরণা কাজ করেছিল, একটু তলিয়ে দেখলেই তার ভেতরকার 'অধার্মিকতা' চোখে পড়বে। ব্যাপক প্রচারের ফলে, খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে ইসলামী শক্তির লুঠতরাজ ও অন্যান্য অত্যাচারের কাহিনী খুবই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছিল। 'নাইট'দের শৌর্য-বীর্যের দোহাই দিয়ে, আরব ও তুর্কী বিধর্মীদের বিরুদ্ধে তাদের উত্তেজিত করা হয়। ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত য়ুরোপের এই ধর্মসংগ্রামের বিস্তারকাল। এই সময়ের মধ্যে য়ুরোপের 'নাইট' সম্প্রদায়ের যে রণশক্তি ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে, তার মূলে খ্রীষ্টধর্মের সংরক্ষণ এবং বিধর্মীদের দলন যে একটি প্রধান অভিপ্রায় হিসেবে গণ্য, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে 'ক্ষত্রিয়দল' কথাটি ব্যবহার করে গেছেন, ইতিহাসের এই ভূমিকায় সে-কথার যৌক্তিকতা বোঝা সহজ হয়।

অতঃপর য়ুরোপের নানা পরিবর্তনের ধারায় ক্রমশঃ সেই ক্ষত্রিয়-সমাজের নিষ্ক্রমণ ঘটেছে; রবীন্দ্রনাথের কথায়—'রাজার জায়গাটা রাষ্ট্রতন্ত্র দখল করিতেছে।' তিনি ঐ প্রবন্ধের মধ্যেই লিখে গেছেন:

> 'শক্তির ধারাটা এখন ক্ষত্রিয়কে ছাড়িয়া বৈশ্যের কূলে বহিতেছে। লোকসাধারণের কাঁধের উপরে তাহারা চাপিয়া বসিয়াছে। মানুষকে লইয়া তাহারা আপনার ব্যবসায়ের যন্ত্র বানাইতেছে। মানুষের পেটের জ্বালাই তাহাদের কলের স্টীম উৎপন্ন করে।'

সেই বৈশ্য-শক্তির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে তিনি লিখেছিলেন:

> 'এখন বৈশ্য-মহাজনদের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ। যান্ত্রিক কর্মপ্রণালী নামক প্রকাণ্ড একটা জাঁতা মানুষের আর সমস্তই গুঁড়া করিয়া দিয়া কেবল মজুরটুকু মাত্র বাকি রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।'

ক্ষত্রিয়-শাসনে মানবসমাজে মানবসম্বন্ধ বজায় ছিল। বৈশ্য-শাসনে সে

জায়গায় ধনোৎপাদন ও ধনোৎপাদক, এই দুটি মাত্র কর্ম ও কর্তার প্রাধান্য দেখা দেয়। সেই সংকীর্ণতার ব্যাখ্যাসূত্রে তিনি জানান :

'ধনের ধর্মই অসাম্য। জ্ঞান ধর্ম কলা-সৌন্দর্য পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করিলে বাড়ে বই কমে না,—কিন্তু ধন জিনিসটাকে পাঁচজনের কাছ হইতে শোষণ করিয়া লইয়া পাঁচজনের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা না করিলে সে টেঁকে না। এইজন্য ধনকামী নিজের গরজে দারিদ্র্য-সৃষ্টি করিয়া থাকে।

তাই ধনের বৈষম্য লইয়া যখন সমাজে পার্থক্য ঘটে তখন ধনীর দল সেই পার্থক্যকে সমূলে ঘুচাইতে ইচ্ছা করে না, অথচ সেই পার্থক্যটা যখন বিপজ্জনক হইয়া উঠে তখন বিপদটাকে কোনোমতে ঠেকো দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে চায়।'[১]

এই মন্তব্যের সমর্থনে তিনি পশ্চিমদেশের তৎকালীন ধনবৈষম্যের প্রতিবাদের দৃষ্টান্ত তুলে বলেছিলেন যে, আমরা আমাদের দেশে যদি ঠিক পশ্চিমী বাদ-প্রতিবাদের নকল করতে চাই, তাহলে সে আচরণ সঙ্গত হবে না।

'আমাদের দেশে লোক-সাধারণ এখনো নিজেকে লোক বলিয়া জানে না, সেইজন্য জানান দিতেও পারে না।'

আর,

'তাহাদের নিজের অভাব ও বেদনা তাহাদের নিজের কাছে বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত। তাহাদের একলার দুঃখ যে একটি বিরাট দুঃখের অন্তর্গত এইটি জানিতে পারিলে তবে তাহাদের দুঃখ সমস্ত সমাজের পক্ষে একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইত। তখন সমাজ দয়া করিয়া নহে, নিজের গরজে সেই সমস্যার মীমাংসায় লাগিয়া যাইত।'

সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে তিনি যে ভূয়োদর্শী অগ্রগামীদেরই অগ্রগণ্য, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঐতিহ্যে তাঁর শ্রদ্ধাও যেমন আন্তরিক, প্রগতিতে তাঁর বিশ্বাসও তেমনি অকৃত্রিম। 'লোকহিত' প্রবন্ধের মধ্যেই তিনি জানিয়েছিলেন :

'আমাদের ভদ্রসমাজ আরামে আছে কেন না আমাদের লোক-সাধারণ

১। লোকহিত—ঐ

নিজেকে বোঝে নাই। এইজন্যই জমিদার তাহাকে মারিতেছে, মহাজন তাহাদিগকে ধরিতেছে, মনিব তাহাদিগকে গালি দিতেছে, পুলিস তাহাদিগকে শুষিতেছে, গুরুঠাকুর তাহাদের মাথায় হাত বুলাইতেছে, মোক্তার তাহাদের গাঁট কাটিতেছে, আর তাহারা কেবল সেই অদৃষ্টের নামে, নালিশ করিতেছে যাহার নামে সমন-জারি করিবার জো নাই। আমরা বড়ো জোর ধর্মের দোহাই দিয়া জমিদারকে বলি তোমার কর্তব্য করো, মহাজনকে বলি তোমার সুদ কমাও, পুলিশকে বলি তুমি অন্যায় করিও না—এমন করিয়া নিতান্ত দুর্বলভাবে কতদিন ঠেকাইব! চালুনিতে করিয়া জল আনাইব আর বাহককে বলিব যতটা পারো তোমার হাত দিয়া ছিদ্র সামলাও—সে হয় না।'

এই কঠোর সমালোচনার মর্জিতেই, 'আধ্যাত্মযোগ'-এর অনুপাতে বৃহৎ লৌকিক যোগ'-এর আবশ্যিকতার কথা তাঁর মনে এসেছিল। 'জ্ঞান শিক্ষা' নয়,—'উচ্চ শিক্ষা' নয়,—আমাদের লোক-সাধারণের জন্যে,—১৩২১ সালের এই প্রবন্ধে তিনি চেয়েছিলেন—'কেবলমাত্র লিখিতে পড়িতে শেখা।' কারণ, 'মনের চলাচল যতখানি, মানুষ ততখানি বড়ো!' লিখতে পড়তে শিখে, মানুষ অন্তত নিজের-নিজের কথা লিখবে এবং পরের লেখা পড়বে, এই সম্ভাবনাটুকু অনিবার্য ;—এবং সেটুকু ঘট'ল শিক্ষার পরবর্তী বিস্তার যে অবশ্যম্ভাবী, তাতে তাঁর সন্দেহ ছিল না।

এসব চিন্তা কেবলমাত্র একটি দুটি প্রবন্ধের মধ্যেই যে তিনি সম্পূর্ণভাবে বলে ফেলেছিলেন, তা নয়। নানান্ লেখার মধ্যে তাঁর এই লোকশক্তি-বন্দনার ভাবটি ধরা পড়েছিল। দেশকে যথার্থ শক্তিমান করে তুলতে হলে, শাসক ও শাসিতের মধ্যে সমভাবে শক্তি-সঞ্চারের আনুকূল্য করা দরকার।' য়ুরোপের কথা-প্রসঙ্গে তাই তিনি বলেছিলেন, "য়ুরোপে শ্রমজীবীরা যেমনি বলিষ্ঠ হইয়াছে অমনি সেখানকার বণিকরা জবাবদিহির দায়ে পড়িয়াছে।' আর, আমাদের নিজেদের লোকাচার সম্বন্ধে তিনি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, 'স্ত্রীলোককে সাধ্বী রাখিবার জন্য পুরুষ সমস্ত সামাজিক শক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে খাড়া করিয়া রাখিয়াছে—তাই স্ত্রীলোকের কাছে পুরুষের কোনো জবাবদিহি নাই—ইহাতেই স্ত্রীলোকের সহিত সম্বন্ধে পুরুষ

সম্পূর্ণ কাপুরুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; স্ত্রীলোকের চেয়ে ইহাতে পুরুষের ক্ষতি অনেক বেশি।'

১৩২১-এর 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' এবং 'লোকহিত' প্রবন্ধ-দুটির সঙ্গে এইসূত্রে তাঁর সেই সময়েরই 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধটিও স্মরণীয়। তাতে ঐ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত সম্পাদকীয় রচনার জের ধরে, রবীন্দ্রনাথের নিজের দৃষ্টিতে—য়ুরোপের চতুর্বর্ণের দুরবস্থার বিশ্লেষণ লক্ষণীয়। মধ্যযুগের পোপের প্রতাপ তখন অতীতের কথা; 'নাইট'দের প্রভুত্বও কল্পকাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে; ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের তো এবম্বিধ দুর্দশা! বৈশ্যই তখন প্রধান! তাঁর নিজের কথায়—ক্ষত্রিয়দল তখন 'শেঠজির মালখানার দ্বারে দারোয়ানগিরি করিতেছে মাত্র।' আমাদের শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধের কথাটাই যদিও সে-প্রবন্ধের আপাতপ্রধান কথা, তবু তারই মধ্যে ভবিষ্যতের গূঢ়তর সংকেত ছিল। পুরাকালে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধে,—রাজার সঙ্গে খ্রীষ্টসংঘের,—তথা, পোপের যে বিরোধ, তাতে দেখা গেছে প্রভুত্বের প্রতি দুরপনেয় আগ্রহ! সে-বিরোধের বিষ দেশের অন্যান্য স্তরে খুব বেশি ছড়াতে পারে নি। কিন্তু বৈশ্যরাজক যুগে দেখা গেল 'বাণিজ্য এখন আর বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গেছে।' য়ুরোপের বণিকরাজের 'সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এসিয়া ও আফ্রিকা।'

তাঁর এই তৃতীয় প্রবন্ধটি আয়তনে প্রথম দুটির চেয়ে ছোটো,—শেষ দিকে তিনি তদানীন্তন জার্মানির মনোভাবের কথা তুলেছিলেন,—তাতে জার্মানির মদমত্ততার নিন্দাই প্রাধান্য পেয়েছিল। সে-সব কথা কতকটা প্রাসঙ্গিক মাত্র। ভবিষ্যৎ পৃথিবীর দিকে তর্জনী নির্দেশ করে, সেই ১৩২১ সালে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন:

> 'ইহার পরে আর একটা লড়াই সামনে রহিল সে বৈশ্যে শূদ্রে মহাজনে মজুরে—কিছুদিন হইতে তার আয়োজন চলিতেছে। সেইটে চুকিলেই বর্তমান মন্বন্তর পালা শেষ হইয়া নূতন মন্বন্তর পড়িবে।'[২]

২। 'লড়াইয়ের মূল'—ঐ

ঃ রবীন্দ্রনাথ ও এনি বেসাণ্ট ঃ

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা অক্টোবর তারিখে শ্রীমতী বেসাণ্ট সম্বন্ধে 'New India' পত্রিকার স্যর সুব্রহ্মণ্য আয়ার যা লেখেন, তার একাংশের বঙ্গানুবাদে এই দাঁড়ায়—'খ্রীষ্টান দেশগুলিতে তিনি যখন বক্তৃতা দিয়েছেন তখন সেসব অঞ্চলে খ্রীষ্টধর্মের একজন বিশেষজ্ঞ ব্যাখ্যাতার সম্মানই তিনি পেয়েছেন; আবার, ভারতবর্ষে তাঁকে আমরা আমাদেরই ধর্মশাস্ত্রের পণ্ডিত বলে জানি; বৌদ্ধ অথবা মুসলমান ধর্মাবলম্বী শ্রোতাদের কাছে তিনি যখন বক্তৃতা দেন, তখন সেক্ষেত্রেও অনুরূপ ধারণা হয়। ভারতীয়-আর্য সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের সমাবেশ থেকে সুন্দর এক সমন্বয় ঘটিয়ে তোলবার ক্ষমতা আছে তাঁর।'

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সংগ্রামের গঠনমূলক কর্মসূচীর মধ্যে তাঁর নাম উজ্জ্বল। কিন্তু ভারতে পদার্পণ করবার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি যে রাষ্ট্রচিন্তায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তা নয়। বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে সাদৃশ্য আর সমন্বয় খুঁজেছিলেন তিনি। হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক কলহের উত্তেজনা দেখে, ভারতের এই দুই প্রধান ধর্মের গভীরতলে কোনো মানবিক আদর্শের মিল আছে কিনা, সেটা খুঁজে দেখাই;ছিল তাঁর লক্ষ্যের বিষয়। কাশীর হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূলে তাঁর নিজের আগ্রহ আর সাধনার কথা স্মরণীয়। শিক্ষার ভিত্তি যে সম্পূর্ণভাবে মানুষের ব্যাপক কল্যাণের আদর্শেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার, সে-বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস ছিল দৃঢ়মূল। রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে সেকালের জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থীদের সঙ্গে নরমপন্থীদের মিলন ঘটিয়ে তিনি তাঁর সর্বজনীন মৈত্রীবোধেরই উদাহরণ স্থাপন করে গেছেন। তাছাড়া ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগ বজায় রেখে, ভারতের স্বাধীনতা সন্ধানের আদর্শও ছিল তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। হিংসাত্মক পথে কোনোমতেই যে রাষ্ট্রকল্যাণ অর্জনীয় নয়, সে-বিষয়ে তিনি ছিলেন দৃঢ়বিশ্বাসী। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-কে সত্য করে তোলবার অন্য কোনো উপায় না পেয়ে, এই শতকের প্রথম দিকে যাঁরা হিংসাত্মক পথে এগিয়েছিলেন, তাঁদের সাধনপন্থা সম্বন্ধে তাঁর ছিল অকৃত্রিম বেদনা।

১৯১৭-১৮ সালে তাঁর এই মনোবলের প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ভারতের অনেক মনীষী তাঁকে বন্দনা জানান। সেই সময়ের একখানি

চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'In this crisis the only European who has shared our sorrow, incurring the anger and derision of her countrymen is Mrs. Annie Besant. This was what led me to express my grateful admiration for her noble courage'। ১৯১৭ সালের ২৫এ সেপ্টেম্বর এই পত্রাংশ প্রকাশিত হয়। তার প্রায় বছর দশেক পরে—১৯২৮ সালের ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধী 'New India'-তে লেখেন: 'Religion is interwoven in Dr. Besant's life and she has built a bridge between politics and religion.'

১৯১৭-১৮ সালে ভারতীয় কংগ্রেসের এবং নিখিল ভারতীয় হোম-রুল লীগের সভানেত্রী হিসেবে তিনি 'হোম-রুল' সম্বন্ধে যে ঘোষণা জানান, তাতে বলা হয়:

> 'Home Rule means the right of the people to send their representatives to make laws for the people, and to levy taxes on the people. Subjection to laws not made by the representatives of the people is tyranny. The levying of taxes not made by the representatives of people is robbery. Thus has England proclaimed, and she has enforced these principles in her own Government, so that no one now denies them. Home Rule in England has carried out these principles. Home Rule in India will also carry them out'.

এই হোম-রুল আন্দোলনের অনেকদিন আগে, ১৯০৭-র জুন মাসের এক লেখাতে তিনি জানান যে, রাজনীতিক অধিকারবোধের জোরেই বিশেষ কোনো একটি ধর্মের যখন একচ্ছত্র বিস্তার ঘটে, এবং তা যখন অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে বিদ্বেষী হয়ে ওঠে, তখনই ধর্মের নামে আত্ম-বিভ্রান্তির দুর্ঘটনা ঘটছে বলতে হবে! ভারতবর্ষের তদানীন্তন সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে তিনি জানিয়েছিলেন—বিশ্ব-খ্রীষ্টানী বা বিশ্ব-ইসলামী আদর্শের দ্বারা

আকৃষ্ট হয়ে, ভারতের জনসাধারণ যদি প্রকৃত ভারতীয় জাতীয়তার আদর্শ বিস্মৃত হয়, তাহলে সে অবস্থাটা হবে শোচনীয়। সেজন্যে ধর্মবোধ দায়ী নয়—'It is the exclusiveness that is the enemy, and not Religion'।

সমাজ ও স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার সঙ্গে শ্রীমতী বেসান্টের আধ্যাত্মিক সাধনার মিল ছিল। ইংলণ্ডের সঙ্গে যোগ রক্ষার দিকে তাঁর মনোযোগ হয়তো একটু বেশি ছিল, কিন্তু সেকালের বিশেষ পরিস্থিতিতে সে-আগ্রহের বিশেষ উপযোগিতাও ছিল। সেটা তাঁর বিশ্বাসের গৌণ দিক। মূলতঃ উভয়েই ছিলেন অধ্যাত্মবাদী এবং মানব-প্রেমিক। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য সম্বন্ধে বেসান্টের ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা।

: বাংলার মাটি, বাংলার ভাষা ও রবীন্দ্রনাথ :

১৩৩৩-এর বৈশাখের 'ভারতী'তে প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের মতামত প্রকাশ করেন। প্রমথ চৌধুরীর সেই লেখা সম্বন্ধে এটি বিশেষ তারিফ! কিন্তু তারই মধ্যে, আমাদের দেশের রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর নিজের মতামতও উচ্চারিত হয়েছিল। সে-সব কথা তিনি খুবই সহজ করে বলেছিলেন,—যেমন, 'আমাদের আধুনিক পলিটিক্সের শুরু থেকেই আমরা নির্গুণ দেশ-প্রেমের চর্চা করেছি দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে। এই নিরুপাধিক প্রেমচর্চার অর্থ যাঁরা জোগান, তাঁদের কারো বা আছে জমিদারী, কারো বা আছে কারখানা; আর শব্দ যাঁরা জোগান তাঁরা আইন-ব্যবসায়ী। এর মধ্যে পল্লীবাসী কোন জায়গাতেই নেই...।' এই কারণে, 'রায়তের কথা' তাঁর কাছে প্রমথ চৌধুরীর যথার্থ সত্যদৃষ্টির ফল বলে মনে হয়েছিল এবং আমাদের অনুকরণসর্বস্ব রাজনীতি চর্চার ধারায় সে দৃষ্টি কতকটা আকস্মিক বলেই তিনি মেনেছিলেন। রায়ত-প্রসঙ্গ-চিন্তার মূল তিনি সমুচিত সতর্কতার সঙ্গে খুঁজে দেখবার পরামর্শ দিয়ে গেছেন। তিনি বলেন :

> 'কিন্তু ভাববার কথা এই যে বর্তমান কালে একদল জোয়ান মানুষ রায়তের দিকে মন দিতে শুরু করেচেন। সব আগে তাঁরা হাতের গুলি পাকাচ্চেন। বোঝা যাচ্ছে তাঁরা বিদেশে কোথাও একটা নজীর পেয়েছেন। আমাদের মন যখন অত্যন্ত আড়ম্বরে স্বাদেশিক

হয়ে ওঠে, তখনো দেখা যায় সেই আড়ম্বরের সমস্ত মাল মসলার গায়ে ছাপ মারা আছে Made in Europe।'

বেশ জোর দিয়ে তিনি এই কথাই বলেন যে, 'য়ুরোপে প্রকৃতিগত ও অবস্থাগত কারণের স্বাভাবিক বেগে মানুষ সোস্যালিজম্, কম্যুনিজম্, সিণ্ডিক্যালিজম্ প্রভৃতি নানাপ্রকার সামাজিক পরিবর্তনের পরখ করচে। কিন্তু আমরা যখন বলি রায়তের ভালো করব তখন য়ুরোপের বাঁধি বুলি ছাড়া আমাদের মুখে বুলি বেরোয় না।' তখনকার য়ুরোপের নবোদ্ভাবিত বলশেভিজম্ এবং ফ্যাসিজিম্,—এবং আমাদের দেশে সে সব মতের ব্যাপক মোহানুগত্যের উল্লেখ করে, তিনি আরো জানান:

'অমনি আমাদের নকল-নিপুণ মন গুণ্ডামিটাকেই সব চেয়ে বড় করে দেখতে বসেচে। বরাহ-অবতার পঙ্ক-নিমগ্ন ধরাতলকে দাঁতের ঠেলায় উপরে তুলেছিলেন, এরা তুলতে চায় লাঠির ঠেলায়। একথা ভাববার অবকাশও নেই, সাহসও নেই যে গোঁয়ার্তমির দ্বারা উপর ও নিচের অসামঞ্জস্য ঘোচে না। অসামঞ্জস্যের কারণ মানুষের চিত্তবৃত্তির মধ্যে। সেইজন্য আজকের দিনের নিচের থাকটাকে উপরে তুলে দিলে কালকের দিনের উপরের থাকটা নিচের দিকে পূর্বের মতোই চাপ লাগাবে। রাশিয়ার জার-তন্ত্র ও বলশেভিক-তন্ত্র একই দানবের পাশ-মোড়া দেওয়া।'

অর্থাৎ উদ্দেশ্য আর উপায়,—অভিজ্ঞতা আর অভিপ্রায়,—মত ও পথ, দু'দিকেই সতর্কতা রক্ষা করা,—এবং মানুষের অন্তরের স্বরূপ বুঝে কল্যাণের দিকে তাকে চালিত করাই যে আমাদের প্রধান কর্তব্য, তাই ছিল রবীন্দ্রনাথের আপন বক্তব্য।

দেশের রাজনীতি-চিন্তার এই ভূমিকায়, আত্মবোধহীন অনুকরণের তাড়নায় সে-সময়ে বাংলা সাহিত্যে, নিপীড়িতের প্রতি কৃত্রিম সহানুভূতি বা মমতার বুলি দেখা দিয়েছিল। তাঁর এই লেখাটিতে তারও উল্লেখ আছে:

'এবার পূর্ববঙ্গে গিয়ে দেখে এলুম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুশাঙ্কুরের মতো ক্ষণভঙ্গুর সাহিত্য গজিয়ে উঠেছে। তারা সব ছোটো ছোটো এক-একটি রক্তপাতের ধ্বজা। বলচে, পিষে ফেলো, দলে ফেলো, অর্থাৎ ধরণী

নির্জমিদার, নির্মহাজন হোক। যেন জবরদস্তির দ্বারা পাপ যায়, যেন অন্ধকারকে লাঠি মারলে সে মরে।'

এই একই প্রসঙ্গে আরো তীব্র ভাষায় বলা হয়:

'এই লালমুখো বুলির উৎপত্তি এদের নিজেদের রক্তের থেকে নয়। এ হচ্ছে বাঙালীর অসাধারণ নকল-নৈপুণ্যের নাট্য, ম্যাজেণ্টা রঙে ছোবানো। এর আছে উপরে হাত পা ছোড়া, ভিতরে চিত্তহীনতা।'

স্বদেশের অবস্থা ঠিকমতো বুঝে নিয়ে সমুচিত ব্যবস্থা করা চাই, এ-কথা তিনি অনেক প্রসঙ্গে অনেকবার বলে গেছেন। সে-সময়ে প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' দেখে, সেই কথাই তিনি আর-একবার ভেবেছিলেন। নিজের জীবনে জমিদারি-অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে তিনি জানান:

'প্রমথ বলছে, জমি চাষ করে যে, জমি তারই হওয়া উচিত। কেমন করে তা হবে জমি যদি পণ্যদ্রব্য হয়, যদি তার হস্তান্তরে বাধা না থাকে ?... জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়ই, তা হলে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে, তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই, যে লোক চাষ করেনা কিন্তু যার আছে টাকা, অধিকাংশ বিক্রয়-যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই।'

অর্থাৎ সে-ব্যবস্থায় জমিদারকে তাড়িয়ে মহাজনকে কায়েম করা হবে! তাই তিনি লেখেন:

'একা জমিদারের আমলে জমিতে রায়তের যেটুকু অধিকার, জমিদার মহাজনের দ্বন্দ্ব-সমাসে তা আর টেঁকে না। আমার অনেক রায়ৎ-কে এই চরম অকিঞ্চনতা থেকে আমি নিজে রক্ষা করেছি জমি হস্তান্তরের বাধার উপর জোর দিয়ে। মহাজনকে বঞ্চিত করিনি কিন্তু তাকে রক্ষা করতে বাধ্য করেছি।'

শুধু তাঁরই ব্যক্তিগত দাক্ষিণ্যের কথা নয়,—নীলকরদের আমলে প্রজার দুর্দশার কথাও পাঠককে বিশেষভাবে মনে করিয়ে দিয়ে, তিনি জানান যে, নীল চাষের আমলে নীলকর যখন ঋণের ফাঁসে ফেলে প্রজার জমি আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় ছিল, তখন জমিদার রায়তকে বাঁচিয়েছে। 'নিষেধ-আইনের বাঁধ যদি সেদিন না থাকত, তাহলে নীলের বন্যায় রায়তী জমি ডুবে একাকার

হোতো।' এইসব সতর্কবাণীর উপসংহারে তিনি পুনরপি জানিয়ে গেছেন :

'একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রতিকূল আইনটাকেই নিজের করে নেওয়া মকদ্দমার জুজুৎসু খেলা। আইনের যে আঘাত মারতে আসে, সেই আঘাতের দ্বারাই উল্টিয়ে মার ওকালতী কুস্তির মারাত্মক প্যাঁচ। এই কাজে বড় বড় পালোয়ান নিযুক্ত আছে। অতএব রায়ত যতদিন বুদ্ধি ও অর্থের তহবিলে সম্পন্ন হয়ে না ওঠে, ততদিন 'উচল' আইনও তার পক্ষে 'অগাধ জলে' পড়বার উপায় হবে।'

দেশে, বহুধা দুর্বল রায়তের সাবালক অবস্থা যতক্ষণ না ঘটে, ততক্ষণ আর তাকে বাঁচাবার অন্য কোনো উপায় নেই! এই ছিল রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বক্তব্য।

জমির মালিকানা সম্বন্ধে তাঁর এই ভাবনার পাশাপাশি সে-সময়ের অন্য এক সাময়িক প্রসঙ্গে তাঁর আর-এক মন্তব্যও স্মরণীয়। সেকালে বাংলার ভাষা-সমস্যা বাংলার রাজনীতি-চিন্তার আবশ্যিক ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। মুসলমান-বাঙালী উর্দুর পক্ষপাতী,—হিন্দু-বাঙালী উর্দু-বিরোধী,—এঁদের মতান্তর এবং মনান্তর দূর করবার কোনো আশু সম্ভাবনা ছিল না। সেই দুরবস্থার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ান তাঁর শুভবুদ্ধি নিয়ে। দেশের নিজস্ব ঐতিহ্য, স্বাভাবিক সংস্কার এবং আন্তরিক মৈত্রীর বিরুদ্ধে তিনি রাজনীতির হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করতে রাজী ছিলেন না। এখানে, সেই বিশেষ ঘটনাটিতে এগিয়ে যাবার আগে,—রায়তের কথা-সূত্রে তিনি যে আমাদের ভাষাগত 'চিত্তহীনতা' দূর করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, সে তথ্যটি দেখা দরকার। ভাষা-প্রসঙ্গে তাঁর তৎকালীন মন্তব্য :

'সম্প্রতি হিন্দুর প্রতি আড়ি করিয়া বাংলা দেশের কয়েকজন মুসলমান বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছেন। এ যেন ভায়ের প্রতি রাগ করিয়া মাতাকে তাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব। বাংলাদেশে শতকরা নিরানব্বুইয়ের অধিক

সংখ্যক মুসলমানের ভাষা বাংলা। সেই ভাষাটা.ক কোণঠাসা করিয়া তাহাদের উপর যদি উর্দু চাপানো হয়, তাহা হইলে তাহাদের জিহ্বার আধখানা কাটিয়া দেওয়ার মতো হইবে না কি ?'

এই লেখাটির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছিলেন :

'বাঙালীকে তাহার সাহিত্যই যথার্থভাবে ভিতরের দিক হইতে মানুষ করিয়া তুলিতেছে। যেখানে তাহার সমাজের আর-সমস্তই স্বাধীন পন্থার বিরোধী, যেখানে তাহার লোকাচার তাহাকে নির্বিচার অভ্যাসের দাসত্ব-পাশে অচল করিয়া বাঁধিয়াছে, সেখানে তাহার সাহিত্যই তাহার মনকে মুক্তি দিবার একমাত্র শক্তি।'

১৯২০ থেকে যে-দশকের সূত্রপাত, সেই দশকে,—এবং তখন থেকে আরো পরবর্তীকালে, বাঙালী মুসলমানকে বাংলাভাষার বিরোধী করে তোলবার যে রাজনীতিক দুর্বুদ্ধি দেখা দিয়েছিল, তার নিন্দা করে তিনি লেখেন :

'চীনদেশে মুসলমানের সংখ্যা অল্প নহে, সেখানে আজ পর্যন্ত এমন অদ্ভুত কথা কেহ বলে না যে, চীনভাষা ত্যাগ না করিলে তাহাদের মুসলমানির খর্বতা ঘটিবে।...বাংলা যদি বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা হয় তবে সেই ভাষার মধ্য দিয়াই তাহাদের মুসলমানিও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হইতে পারে।'

এই সূত্রে, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সম্বন্ধে তাঁর অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকাশিত মন্তব্যেরই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন : 'বাংলা দেশেও হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ আছে।...মিলনের অন্য প্রশস্ত ক্ষেত্র আজো প্রস্তুত হয় নাই। পলিটিক্‌সকে কেহ কেহ এইরূপ ক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন, সেটা ভুল। আগে মিলনটা সত্য হওয়া চাই, তারপরে পলিটিক্‌স সত্য হইতে পারে। বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র উপাদান-উপকরণ, রূপ-রীতি, মনন-কল্পনা ইত্যাদি বহুলত্বের মধ্যে তিনি এই মিলনের উপায় লক্ষ্য করে, ১৩৩৩-এর বৈশাখ সংখ্যার 'প্রবাসী'র সেই লেখাটিতেই জানান : 'সাহিত্য পুরীর জগন্নাথক্ষেত্রের মতো, সেখানকার ভোজে কাহারো জাতি নষ্ট হয় না।' যথার্থ আত্মাদরবোধ এবং আত্মরক্ষার তাগিদ যতক্ষণ না জাগে, ততক্ষণ বাইরের কোনো তাড়নাতেই হিন্দু-মুসলমানের বহু-বাঞ্ছিত সেই মিলনের সুবুদ্ধি

দেখা দিতে পারে না। সাহিত্য সেই সুবুদ্ধি জাগাবার উপায়! তাঁর এই মন্তব্যে, দেশব্যাপী বিভেদের মধ্যে প্রধানতঃ সাহিত্যচর্চাগত সম্মিলন-সম্ভাবনাতেই তাঁর আস্থা দেখা গিয়েছিল।

তখনকার 'বঙ্গবাণী' [বৈশাখ, ১৩৩৩] পত্রিকায় 'হিন্দু মোসলেম প্যাক্ট' নামে একটি প্রবন্ধের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আরো সরস ভাবে, কিঞ্চিৎ পরিহাসের ভঙ্গিতে সেই আত্মরক্ষার তত্ত্বই অন্যতর কৌশলে বিবৃত করেছিলেন। অহিংস পন্থার তুলনায় তার বিপরীত পন্থার ব্যবহারিক সামর্থ্য যে বেশি, উপেন্দ্রনাথ সেই কথাটাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ইংরেজের উস্কানিতে এক পক্ষ যদি অন্য পক্ষকে কাবু করবার জন্যে ছুরিতে শাণ দিতে থাকে,—এবং 'প্যাক্ট' বা চুক্তির শর্তই যদি এই হয় যে, তাতে একপক্ষ বেশি পাবে, অন্য পক্ষ কম পাবে,—তাহলে নির্বিরোধী, শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষের ভয়ের আর অন্ত থাকে না। কিন্তু উপেন্দ্রনাথের সেই লেখাটির মধ্যে শক্ত-সমর্থ যে 'পল্টু' চরিত্রের রূপায়ণ দেখা গিয়েছিল, সেই পল্টুর কাছে সেটা কোনো সমস্যাই নয়! 'হাতে একগাছি খেঁটে লাঠি, পরনে খাকির হাফ প্যাণ্ট' পল্টুকে তিনি বস্তির মধ্যে ঢুকতে দিয়েছেন। পল্টু তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, আসল প্যাক্টটা হচ্ছে সর্বতোমুখী। সর্ব বিষয়েই ওদের বেশি ভাগ দিতে হবে। আমাদের মন্দির যদি কুড়িটা ভাঙে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আশিটা মসজিদ ভেঙে পড়া চাই, আমাদের যদি কুড়িটা জখম হয় তাহলে ওদের জখম হওয়া চাই আশিটা!' আধ ঘণ্টা পরে বস্তি থেকে ফিরে এসে সে বলেছে—'আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পারেন। আমি করিম মিঞাকে বুঝিয়ে দিয়েছি যে বস্তি ছেড়ে লাঠালাঠি করতে বের হলে, ফিরে এসে বস্তি দেখতে পাবে না। করিম বুদ্ধিমান লোক, ইঙ্গিতেই বুঝে নিয়েছে যে আমরা প্যাক্ট-পন্থী।'

: আত্ম-কর্তৃত্ববাদী রবীন্দ্রনাথ :

১৩২৪ সালে রচিত দুটি প্রবন্ধের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্বদেশের রাষ্ট্রচিন্তা আর সমাজ-চিন্তার কথাসূত্রে বিশ্বের বৃহত্তর মানব-সমাজের আদর্শ এবং আচরণের কথা তুলেছিলেন। এই ধরনের আলোচনা তাঁর অনেক লেখাতেই, দেখা গেছে। সামাজিক বিশৃঙ্খলার কথা ভাবলে এই দুটি প্রবন্ধের

কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। বাংলা দেশের ভাষাও যেমন আজকাল দ্রুত পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছে, আমাদের ভাবের ঘরেও তেমনি অনিবার্য এক পরিবর্তনের হাওয়া উঠেছে। দৃঢ় পারমার্থিক বিশ্বাসের অভাব,—আদর্শের ক্ষেত্রে নৈরাজ্য,—'বিষয়-বিষ বিকারের' প্রাবল্য ইত্যাদি ভাঙনের লক্ষণে আমাদের জনসাধারণের প্রতিদিনের জীবন,—এবং বিশেষভাবে শিক্ষিত জনসাধারণের জীবন যে এ-যুগে খুবই ব্যাপকভাবে বিকারগ্রস্ত, তাতে সন্দেহ নেই। এই দুর্যোগের প্রহরে রবীন্দ্রনাথের সেই প্রবন্ধ-দুটি স্মরণীয়।

উপনিষদের ঋষি-বাক্যের ওপর তাঁর শ্রদ্ধার ইতিহাস সর্ববিদিত; বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানব-প্রকৃতির সতর্ক বীক্ষণে-ব্যাখ্যানে তাঁর অনুরাগের অন্ত ছিল না; তিনি আধুনিক এবং চিরন্তন। মানুষের আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক, উভয় ক্ষেত্রের সন্ধান সম্বন্ধেই তাঁর আগ্রহ ছিল ব্যাপক, অক্লান্ত এবং তাৎপর্যজিজ্ঞাসু! 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' এবং 'ছোটো ও বড়ো',—দুটি প্রবন্ধই লেখা হয় ১৩২৪ সালে। দুটিই 'প্রবাসী'-তে বেরিয়েছিল,—প্রথমটি ভাদ্র সংখ্যায়, দ্বিতীয়টি অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। তার মাস-কয়েক আগে, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি আমেরিকা ঘুরে, জাপান হয়ে দেশে ফেরেন। ১৯১৬-র ডিসেম্বর থেকে কংগ্রেসের মধ্যে নতুন কর্মপন্থা গ্রহণের উৎসাহ দেখা যায়,—তিলক এবং শ্রীমতী এনি বেসান্টের 'হোমরুল লীগের' গঠনমূলক আন্দোলনই তখন দেশের রাজনৈতিক প্রবাহের সাম্প্রতিকতম তরঙ্গোচ্ছ্বাস। ভারতবর্ষের জাতীয় অভ্যুদয় প্রতিরোধ করবার পণ নিয়ে,—তীব্র, কঠোর প্রতিব্যবস্থা ঘটিয়ে তুলতেই দেশের ব্রিটিশ-সম্প্রদায়ের তখন সত্যিকার মনোযোগ। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র-জীবনী'-র মধ্যে সেই সময়ের কথা-প্রসঙ্গে লিখেছেন—'বহুকাল পূর্বে স্বদেশী যুগে তিনি যেমন করিয়া রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখিয়া সুপ্ত বাঙালীর মনকে চেতাইয়া তুলিয়াছিলেন, এবারে লেখনী গ্রহণ করিয়া লিখিলেন 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'; এত বড় রাজনৈতিক indictment বহুকাল লেখেন নাই। কিন্তু ইহাকে কেবল রাজনৈতিক বলিলে ভুল হইবে। রাজনীতিক ক্ষেত্রে আমরা যে স্বাধীনতা দাবি করিতেছি এবং যেটা পাওয়া ন্যায্য অধিকার বলিয়া মনে করি, সামাজিক ব্যাপারে সেই স্বাধীনতা আমরা লইতেও চাই না, দিতেও চাই না,—এটাও ছিল কবির

অভিযোগ। তিনি বলিলেন, 'মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় কথাটা এই যে, কর্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার।' দ্বিতীয় প্রবন্ধটির রচনাকাল সম্বন্ধে প্রভাতকুমার জানিয়েছেন: 'রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া দেশের মধ্যে খুবই আলোচনা চলিতেছে—মণ্টেগু আসিতেছেন, তিনি কি দিবেন তাহা লইয়া জল্পনা-কল্পনার অন্ত নাই। সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠানসমূহ মেমোরিয়াল ও অভিনন্দনপত্রের খসড়া করিতে ব্যস্ত। রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর এই অবস্থা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। 'ছোট ও বড়' নামে এক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিলেন কার্তিকের মাঝামাঝি সময়ে। এই প্রবন্ধে ভারতের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা আলোচিত হয়; দেশের মধ্যে যে একদল লোক ভারত-সচিবের 'ঘোষণা' পাঠ করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহাদিগকে সাবধান করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন যে, উল্লসিত হইবার বিশেষ কারণ নাই; কারণ ভারতের শাসন-কার্যটা চালাইতেছে যে ইংরেজ, তারা বণিক বা আমলাজাতীয়।'

আমাদের দেশের সে-অধ্যায় এখন অতিক্রান্ত। সেই খণ্ডকালের বিশেষ উত্তাপ বা বিশেষ সাম্প্রতিকতার উত্তেজনা থেকে নির্ভরযোগ্য দূরে সরে আসবার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া গেছে ইতিমধ্যে। একদিকে ব্রিটিশ শাসক, অন্যদিক দেশীয় জাতীয়তাবোধ,—এই দুই পক্ষ-প্রতিপক্ষের বাদ-প্রতিবাদের সম্পর্ক ব্যতিরেকেও রবীন্দ্রনাথের সে-সব কথার স্থায়ী মূল্য আছে। ভৌগোলিক সীমা-নিরপেক্ষভাবে, বিশ্বের মানব-সমাজের রাষ্ট্র-সমাজ-সংস্কৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের গভীর চিন্তার কয়েকটি সূত্র ধরা পড়েছিল সেই দুটি প্রবন্ধে। ভারতবর্ষের তদানীন্তন অবস্থার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, তিনি বার বার বিদেশের অন্যান্য জাতির কথা তুলেছিলেন; স্বদেশের বিশেষ দায়-দুর্গতির দুর্ভাবনা তাতে ছায়া ফেলেছিল বটে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর আসল কথাটা ছিল সর্বজাতির কল্যাণ-চিন্তার সঙ্গে জড়িত। রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধ,—এবং আন্তর্জাতিকতায় তাঁর নিষ্ঠা,—দুটি যে পরস্পরের পরিপূরক,— উভয়ের ঘনিষ্ঠতা যে অবিচ্ছেদ্য,—সে-বিশ্বাসের বিশেষ সমর্থন পাওয়া যায় সেই দুটি প্রবন্ধের মধ্যে। তাঁর রাজনীতিক মত তাঁর আধ্যাত্ম-

বিশ্বাসেরই আর-এক দিক; তাঁর সামাজিক আদর্শ অথবা ধর্মবিশ্বাস তাঁর রাজনীতি-চিন্তারই অন্য পিঠ! রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম ইত্যাদি যাবতীয় সংঘগত ও ব্যক্তিগত সাধনার মধ্য দিয়ে চিরন্তন যে লক্ষ্যের অভিপ্রায়ী রূপে মানুষ আত্মপ্রকাশ করছে, রবীন্দ্রনাথ বিশদভাবে তারই ব্যাখ্যা করে গেছেন বিশেষ একটি কথার সাহায্যে। মানুষের সাধনাকে তিনি বলেছেন, 'আত্মকর্তৃত্ব'-লাভের সাধনা!

'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ 'The Master's Will পড়ে সেকালের 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' বড়োই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সে-মন্তব্যের অব্যবহিত পরে নলিনীকান্ত ভট্টশালী যা লিখেছিলেন, সেকথা আগেই বলা হয়েছে।[৩]

মানুষের স্থূল সংসারের প্রাত্যহিক ক্ষুধা-তৃষ্ণা সম্বন্ধে তিনি আদৌ উদাসীন ছিলেন না। আবার, এই জগতের অদৃশ্যচারী বিধাতা সম্বন্ধেও তাঁর মনে সংশয় ছিল না। 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধের প্রথম দিকেই তাই তিনি লিখেছিলেন—'উপনিষদে বিধাতার কথা বলা হইয়াছিল, যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।—অর্থাৎ তাঁর বিধান যথাতথ, এলোমেলো নয়,—এবং সে বিধান শাশ্বত কালের।'

এই শাশ্বত, যথাতথ বিশ্ববিধাতার ধ্যানের সঙ্গেই তাঁর সত্যবোধ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সত্য আর অসত্য, দু'য়ের ভেদ সম্বন্ধে বিশ্লেষণসূত্রে তিনি জানিয়ে গেছেন—'নিজেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া জানাই অসত্য। সর্বভূতের সঙ্গে আত্মার মিল জানিয়া পরমাত্মার সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগটিকে জানাই সত্য জানা।' আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ভারতের মুক্তি-সাধনার মূল কথার সঙ্গে আধিভৌতিক ক্ষেত্রে ইউরোপের বিজ্ঞানসাধনাগত মুক্তি-বোধের ঐক্যই তাঁর চোখে পড়েছিল। তিনি দেখেছিলেন পৃথিবীর এই দুই অঞ্চলে অপরিবর্তন এক বিশ্বাসেরই একক নেতৃত্ব—মানুষ বিশ্বাস করে যে 'অবিদ্যাই বন্ধন, সত্যকে পাওয়াতেই আমাদের পরিত্রাণ'।

তবু ভারতে-ইউরোপে, ইতিহাসের সুদীর্ঘ ধারা-প্রবাহের মধ্যে তিনি যে বৈষম্য লক্ষ্য করেছিলেন, সেই প্রভেদের কারণ তিনি এইভাবে দেখিয়ে

৩। এই গ্রন্থের ১৪৭-১৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গেছেন—'ভারতে ক্রমে ঋষিদের যুগ অর্থাৎ গৃহস্থ তাপসদের যুগ গেল, ক্রমে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর যুগ আসিল। ভারতবর্ষ যে মহাসত্য পাইয়াছিল তাহাকে জীবনের ব্যবহারের পথ হইতে তফাৎ করিয়া দিল।'

জ্ঞানের সঙ্গে ব্যবহারের—আদর্শের সঙ্গে আচরণের,-লক্ষ্যের সঙ্গে উপায়ের কোনো বিরোধ মেনে নেবার মর্জি ছিল না তাঁর। ভারতবর্ষের সন্ন্যাসী যখন থেকে গৃহত্যাগী ও গৃহবিমুখ,—অথবা গৃহকর্তব্য ও অধ্যাত্ম-সাধনার মধ্যে সমন্বয়ের আদর্শে ভারতবর্ষ যখন থেকে বিমুখতা দেখিয়েছে,—রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধটির মধ্যে আমাদের সেই অতীতের অন্ধকার অধ্যায়টিকে আমাদের দুর্গতির সূচনা বলে চিহ্নিত করে গেছেন। ইউরোপ যদি-ই বা জড়বাদী বলে নিন্দিত হয়, তবু ইউরোপের ব্যাপক জীবনপ্রবাহে তিনি সে-রকম কোনো দুর্দশা লক্ষ্য করেন নি; তিনি বরং এই কথাই বলেছিলেন যে,—'ইউরোপ ঠিক ইহার উল্টো। ইউরোপের সত্য সাধনার ক্ষেত্র কেবল জ্ঞানে নহে, ব্যবহারে।'

ভারতবর্ষের ধর্মতন্ত্র dogma। ভারতবর্ষের প্রতিদিনের জীবনে মনুষ্যত্বের প্রতি বিশ্বাসের অভাব! এই সব শুচিবায়ু এবং দীনতার দুর্যোগ সম্বন্ধেই তিনি আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তাই তিনি লিখে গেছেন:

'ধর্ম বলে, জীবনকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয়, সে আত্মাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, যত অসহ্যই হোক, বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ-মা বিশেষ তিথিতে অন্নজল তুলিয়া দেয় সে পাপকে লালন করে।'

আচারের প্রশংসাসূত্রে যাঁরা পঞ্চমুখে নিষ্ঠার কথা বলে থাকেন, তাঁদের উদ্দেশে তাঁর মন্তব্য:

'একলব্য পরম নিষ্ঠুর দ্রোণাচার্যকে তার বুড়া আঙুল কাটিয়া দিল, কিন্তু এই অন্ধ নিষ্ঠার দ্বারা সে নিজের চিরজীবনের তপস্যাফল হইতে তার সমস্ত আপন জনকে বঞ্চিত করিয়াছে। এই যে মূঢ় নিষ্ঠার নিরতিশয় নিষ্ফলতা, বিধাতা ইহাকে সমাদর করেন না—কেননা ইহা তাঁর দানের অবমাননা।'

শাসক এবং শাসিত, এই দুই শ্রেণীর পারস্পরিকতা বিশ্লেষণ করে সে-কালের ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের সামনে তিনি এই আদর্শ তুলে

ধরেছিলেন, যে—'আমরা যদি ভীতু হই, তবে ইংরেজ গভর্নমেণ্টের নীতিকে খাটো করিয়া তার রিপুটাকেই প্রবল করিব। যেখানে দুই পক্ষ লইয়া কারবার সেখানে দুই পক্ষের শক্তিযোগেই শক্তির উৎকর্ষ, দুই পক্ষের দুর্বলতার যোগে চরম দুর্বলতা। সবল দুর্বলের পক্ষে যতবড় শত্রু, দুর্বল সবলের পক্ষে তার চেয়ে কম বড় শত্রু নয়।'

'ছোটো ও বড়ো' নামে আর-একটি লেখার মধ্যে তিনি ইংরেজ জাতির মহত্বের প্রশংসা করেও যথার্থ বিচারকের নিরপেক্ষতা হারান নি। ইংরেজের সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিষ্টতা ইত্যাদি সমৃদ্ধির কথা বলে নিয়ে, তিনি প্রকৃত পরিস্থিতির দিকেই তর্জনী নির্দেশ করেন—'ইংরেজ বলিয়া একটি মহৎ জাতি আছে'। ভারতবর্ষের শাসক-ইংরেজের শাসন-যন্ত্রের মধ্যে যারা কেবলমাত্র সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহত্বেরই নিদর্শন-প্রত্যাশী হয়ে থাকতে ভালোবাসেন, তাঁদের সাবধান করে দিয়ে, তিনি জানান: 'প্রকৃতপক্ষে সে ভারত শাসন করিতেছে না—ভারত-দফতরখানায় বহুকাল-ক্রমাগত সংস্কারের এসিডে কাঁচা বয়স হইতে জীর্ণ হইয়া সে একটি আমলা-সম্প্রদায়, আমাদের পক্ষে কৃত্রিম মানুষ হইয়া আছে, আমরা তাহারই প্রজা। ...বড়ো ইংরেজ অব্যবহিতভাবে ভারতবর্ষকে স্পর্শ করে না—সে মাঝখানে রাখিয়াছে ছোটো ইংরেজকে।'

বলা বাহুল্য, ইংরেজকেও সাধনা করতে হয়েছিল। রোম্যান-ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টানদের সাম্প্রদায়িক বিরোধ,—ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের সংঘর্ষ,—আয়ারল্যাণ্ডের সঙ্গে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় অধিকারগত বৈষম্য ইত্যাদি কলঙ্কের পথ পেরিয়ে, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষাদ্বেষ উজিয়ে,—তবে ইংলণ্ড তার রাষ্ট্রশক্তি এবং সমাজশক্তির বিপুলতার গৌরব অর্জন করেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমলাতন্ত্রের বিষ যায় নি। তবে, নিজের দেশে ইংরেজ তার নীতিবোধের লাঞ্ছনা ঘটতে দেয় না,—দিতে পারে না। সেখানে তার জ্ঞানের সত্যের সঙ্গে ব্যবহারিক সত্যের মিল রেখে চলাটাই নিয়ম,—যদিও উপনিবেশের মধ্যে তার অন্য পরিচয়,—ভিন্ন আচরণ! তবু, ইংরেজের সম্যক চরিত্র-বিচার করে, ইতিহাস-সচেতন রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয়েছিল:

'জগতের সকল বড়ো জাতিই যে-ধর্মের বলে বড়ো হইয়াছে, ইংরেজও সেই বলে বড়ো; অত্যন্ত রাগ করিয়াও একথা বলা চলিবে না

যে, সে কেবল তলোয়ারের ডগায় ভর করিয়া উঁচু হইয়াছে কিংবা টাকার থলির উপর চড়িয়া। কোনো জাতিই টাকা করিতে কিম্বা লড়াই করিতে পারে বলিয়াই ইতিহাসে গৌরব লাভ করিয়াছে, একথা অশ্রদ্ধেয়। মনুষ্যত্বে বড়ো না হইয়াও কোনো জাতি বড়ো হইয়াছে, এ-কথাটাকে বিনা সাক্ষ্যপ্রমাণে গোড়াতেই ডিস্‌মিস্‌ করা যাইতে পারে।'

আত্মকর্তৃত্বের দায়িত্ব অপরিসীম! জনসাধারণের বৃহৎ স্বার্থের কথা কোনোমতেই তুচ্ছ করা চলে না। আগেকার দিনে, সেই স্বার্থরক্ষার ভার ছিল সমাজের ওপর। তখন আমাদের দৃষ্টি ছিল ছোটো ছোটো পল্লীসীমার মধ্যে আবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'তখন আমাদের জন্ম-গ্রামকেই আমরা জন্মভূমি বলিয়া জানিতাম।' তবু, তারই মধ্যে সমাজ আপনার দায়িত্ব পালন করে গেছে। কালক্রমে আমাদের সেই দায়িত্ব সমাজ থেকে সমাজের বাইরে সরে গেছে। মনে রাখা দরকার, য়ুরোপের রাষ্ট্র-বিশ্বাস য়ুরোপেরই নিজস্ব অর্জন। সে-দেশের জনসাধারণের সঙ্গে রাষ্ট্রনীতির যোগ অকৃত্রিম। অপর পক্ষে, আমরা না পারি আমাদের সমাজের বহুকালের প্রতিষ্ঠা ভুলতে,—না পারি ধর্মের বিশেষ-বিশেষ আচার অস্বীকার করতে,—না পারি সত্যিকার আধুনিক রাষ্ট্র-ভাবনা জাগিয়ে তুলতে! জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে তাই তিনি 'পোলিটিক্যাল' মুক্তির চেয়ে 'সত্যিকার মুক্তি' সাধনার দায়িত্বের কথা উত্থাপন করে গেছেন। আত্মকর্তৃত্বের সাধনাই ছিল তাঁর রাজনীতিচিন্তার সিদ্ধান্ত!

বিচ্ছিন্ন ভাবে, বিশেষ শ্রেণী, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা সমাজের হিত সাধন নয়,—তিনি চেয়েছিলেন প্রত্যেকটি মানুষের হিত-সংঘটন,—প্রত্যেকটি ব্যক্তির শুভবুদ্ধির উদয়! খুবই সংকীর্ণ ক্ষেত্রে 'ক্যামেরা'-চক্ষুর অতি-সংহত দৃষ্টিক্ষমতা নয়,—তাঁর আদর্শ ছিল পরিপূর্ণ নিরীক্ষা! তিনি বলতেন 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'—অর্থাৎ কেন্দ্রস্থলে যদি 'স্বল্পমাত্রও ধর্ম থাকে তবে পরিধির দিকে রাশি রাশি ভয়কেও ভয় করিবার দরকার নাই।' ইতিহাসের ধারায় পরিবর্তন যে খুবই স্বাভাবিক,—তা তিনি স্বীকার করেছেন, কিন্তু উগ্র চরমপন্থার উত্তেজনায় তিনি কখনোই আত্মসমর্পণ করেন নি। সে-কালের রাজনীতি-ক্ষেত্রে আমাদের 'চরম'-

ভাবনার সূত্রে তিনি বলেছিলেন : 'বাংলাদেশের একদল বালক ও যুবক স্বদেশের সঙ্গে স্বদেশীর সত্য যোগসাধনের বাধা-অতিক্রমের যে পথ অবলম্বন করিয়াছে, তাহার জন্য আমরা লজ্জিত আছি। · আরো লজ্জিত এই জন্য যে, দেশের প্রতি কর্তব্যনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির বিচ্ছেদ সাধন করায় অকর্তব্য নাই, একথা আমরা পশ্চিমের কাছ হইতেই শিখিয়াছি।' সেই সময়ে, তিনি খুবই সহজ ভাষায় আর-একটি কথা প্রায় একই নিশ্বাসে বলেছিলেন। সে কথা তাঁর আত্মকর্তৃত্ববাদের শর্তও বটে,—ব্যাখ্যাও বটে! তাঁর সে মন্তব্য :

'চোরের পথ আর বীরের পথ কোনো চৌ-মাথায় একত্র আসিয়া মিলিবে না।'

এই সত্যে যাঁদের অনাস্থা নেই, তাঁরাই বলতে পারেন :

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে ;
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।
আমরা যা খুশি তাই করি
তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি স্বত্বে॥

তাঁর 'ধর্ম' বইয়ের অন্তর্ভুক্ত 'ধর্মের সরল আদর্শ', 'ধর্মপ্রচার' ইত্যাদি রচনার কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে [পৃষ্ঠা ১-২ দ্রষ্টব্য] ; 'শান্তিনিকেতন'-এর 'তপোবন' প্রবন্ধের কথাও উল্লেখ করা গেছে [পৃষ্ঠা ৩-৫ দ্রষ্টব্য] ; 'সত্যবোধ', 'সত্যকে দেখা', 'সত্য হওয়া' ইত্যাদি প্রবন্ধের বিস্তৃত আলোচনায় [পৃষ্ঠা ৫০-৫৯ দ্রষ্টব্য] তাঁর সমগ্রতাবোধ, সামঞ্জস্যচিন্তা—তথা ধর্মচিন্তার মূল কথাগুলিও দেখা গেছে। স্বদেশী-যুগের আগেই তাঁর 'ব্যঙ্গ-কৌতুক' বেরিয়েছিল। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা আর সমাজচিন্তার কথা ভাবতে গেলে এসব কথা একই সঙ্গে বার বার মনে পড়ে,—সেইসঙ্গে তাঁর ঐক্যানুভূতির কথাও। মনে পড়ে, 'লেখন'-এর সেই দুটি ছত্র—যা আগেই [পৃষ্ঠা ১৫ দ্রষ্টব্য] স্মরণ করা গেছে :

আকর্ষণগুণে প্রেম এক করে তোলে
শক্তি শুধু বেঁধে রাখে শিকলে শিকলে।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম— তিন প্রসঙ্গ এইভাবে একে এসে মিলেছে!

শৃঙ্গার ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছাপা বই 'কবিকাহিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর। এই বইখানির মূল্য ঐতিহাসিক কারণেই গণনীয়,—রস-পরিণতির বিচারে এর দাম নগণ্য। ভালোবাসার প্রসঙ্গে এই রচনার এক জায়গায় বলা হয়:

'স্বাধীন বিহঙ্গ সম কবিদের তরে দেবি
পৃথিবীর কারাগার যোগ্য নহে কভু।
অমন সমুদ্র সম, আছে যাহাদের মন
তাহাদের তরে দেবি নহে এ পৃথিবী।
তাদের উদার মন, আকাশে উড়িতে যায়
পিঞ্জরে ঠেকিয়া পক্ষ নিম্নে পড়ে পুনঃ
নিরাশায় অবশেষে ভেঙ্গে চুরে যায় মন,
জগৎ পুরায় তার আকুল বিলাপে।'

এই উদ্ধৃতির প্রথম চরণের 'কবিদের' কথাটি তাঁর ঐ বিশেষ কাব্যের বিষয়বস্তুর প্রভাবেই ব্যবহৃত হয়। তার বদলে 'প্রেমিকের' শব্দ প্রয়োগ করলেও তাঁর বক্তব্য বিষয়ের মর্যাদাহানি ঘটতো না। কারণ, প্রণয়ের বিশেষ এক উৎকর্ষ সম্বন্ধে সংকেত করাই এই অংশের লক্ষ্য—তা' সে প্রণয় কোনো কবির হৃদয়েই আবির্ভূত হোক, আর অ-কবির চিত্তেই উদ্গত হোক! 'কবিকাহিনী'র কবি বলেছেন:

ওই হৃদয়ের সাথে, মিশাতে চাই এ হৃদি
দেহের আড়াল তবে রহিল গো কেন?

'কবিকাহিনী'র পরে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে 'বনফুল',—১৮৮১-তে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' 'ভগ্নহৃদয়', 'রুদ্রচণ্ড', 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র',—১৮৮২-তে 'সন্ধ্যা-সংগীত", 'কাল-মৃগয়া',—এবং ১৮৮৩-তে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট',—কবিতার বই 'প্রভাত-সংগীত'—আর প্রবন্ধের বই 'বিবিধ প্রসঙ্গ' প্রকাশিত হয়। শেষের বইখানি রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ-সংগ্রহ। রবীন্দ্র-রচনাবলীর অচলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে এই বইখানি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। নানা কারণে এ-বইয়ের অন্তর্ভুক্ত রচনাবলী, সতর্ক পাঠকের মনোযোগ দাবি

করে। অচলিত-সংগ্রহে প্রকাশিত রচনাবলী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের মনে সলজ্জ একটি প্রতিবাদ শেষ পর্যন্ত অনির্বাপিত ছিল। তিনি এই সব রচনা সম্পর্কে গদ্যে জানিয়েছিলেন :

'অতীতের ঘষে-যাওয়া-তামার ফলকে তার বাণী যে অক্ষরে চিহ্নিত, তাকে গুপ্ত-যুগের লিপি বলা যেতে পারে। সেই লিপির অস্পষ্টতা থেকে উদ্ধার করবে বলে বিজ্ঞানী, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা তাকে স্বীকার করতে চায় না।'

পদ্যে বলেছিলেন :

'বিপদ ঘটাতে শুধু নেই ছাপাখানা।
বিদ্যানুরাগী বন্ধু রয়েছে নানা ;—
আবর্জনারে বর্জন করি যদি
চারিদিক হতে গর্জন করি উঠে
ঐতিহাসিক সূত্র দিবে কি টুটে
যা ঘটেছে তারে রাখা চাই নিরবধি।'

রবীন্দ্রনাথের শৃঙ্গার-চেতনার ক্রমপরিণতির ধারাটি অনুসরণ করে যেতে-যেতে ১৮৮৩-খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত তাঁর এই 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র ঘাটে এসে তরী বাঁধতে হয়। ইতিমধ্যে, কবি-মানসের নির্ঝর হয়েছে বেগবতী স্রোতস্বিনী! উপল-বন্ধুরতার পরে দেখা দিয়েছে সাবলীল মসৃণতা। 'সন্ধ্যা-সংগীতে'র বিষণ্ণতার পরে 'প্রভাত-সংগীতে'র অকুণ্ঠ উন্মেষ! তাঁর প্রথম য়ুরোপ-ভ্রমণ তার আগেই ঘটে গেছে,—প্রকাশ্য অভিনয়ে তাঁর প্রথম যোগদান,—প্রথম উপন্যাস-রচনা,—বৃহৎ মানব-সংসার সম্পর্কে কবিচেতনার প্রথম উন্মেষ,—তাঁর জীবনে এ-সব অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে ১৮৮৩-র আগেই।

১৮৮৩-র ৯ই ডিসেম্বর তারিখে যশোহরের বেণী রায়চৌধুরীর কন্যা মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়,—এবং বিবাহের মাস-তিনেক আগে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ছাপা হয়। তখন তিনি বাইশ বছরের নব-যুবক। এই নব-যুবকের বিবিধ মন্তব্য পড়তে-পড়তে Plato-র Dialogue-এর কথা মনে পড়া অস্বাভাবিক নয়। 'কবিকাহিনী'র ভাবালুতা থেকে বেরিয়ে এসে আশ্চর্য ভাবঘন এক স্ফটিকদ্যুতি-তে পাঠকের যেন চমক লেগে যায়!

পরবর্তী জীবনের নানা রচনায় রবীন্দ্রনাথ আদি-রসের আলাপ জমিয়েছেন। ভালোবাসার উদ্‌গতি, অধোগতি, অধিকার, অত্যাচার, শাসন, ব্যসন, প্রসাধন, সন্ন্যাস—নানা অবস্থার কথা তাঁর লেখায়-লেখায় ছড়িয়ে আছে। কিন্তু পরবর্তী রচনায় যা শুধু বিচিত্র প্রয়োগ,—'বিবিধ প্রসঙ্গে' দেখা যায় তারই সংহততম উৎসমূর্তি! প্রথমে ধ্যান, পরে মূর্তি,—আদিতে সন্ধান, অন্তে ঘোষণা। 'বিবিধ প্রসঙ্গে' রবীন্দ্রনাথের শৃঙ্গার-চেতনার বীজ,—পরবর্তী রচনাবলীতে সেই বীজেরই পরিণতি। 'বিবিধ প্রসঙ্গে, তাঁর মন্তব্য :

'ভালবাসা অর্থে আত্মসমর্পণ নহে। ভালবাসা অর্থে, নিজের যাহা কিছু ভাল তাহাই সমর্পণ করা। ..

...প্রেম হৃদয়ের সারভাগ মাত্র। হৃদয় মন্থন করিয়া যে অমৃতটুকু উঠে তাহাই। ইহা দেবতাদিগের ভোগ্য। অসুর আসিয়া খায়, কিন্তু তাহাকে দেবতার ছদ্মবেশে খাইতে হয়।

.. একে ত যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে ভাল জিনিষ দিতে ইচ্ছা করে, দ্বিতীয়তঃ তাহাকে মন্দ-জিনিষ দিলে মন্দ জিনিসের দর অত্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া বিষ দেওয়া, রোগ দেওয়া প্রহার দেওয়াকে কি দাতাবৃত্তি বলে?...

সত্যকার আদর্শ লোক পাওয়া দুঃসাধ্য। ভালবাসার একটি মহান্ গুণ এই যে, সে প্রত্যেককে নিদেন একজনের নিকটেও আদর্শ করিয়া তুলে। এইরূপে সংসারে আদর্শ ভাবের চর্চা হইতে থাকে।... ভালবাসা অর্থে ভাল-বাসা অর্থাৎ অন্যকে ভাল বাসস্থান দেওয়া, অন্যকে মনের সর্বাপেক্ষা ভাল জায়গায় স্থাপন করা।'[১]

এই উক্তির অনেকদিন পরে 'কুমারসম্ভব' আর 'শকুন্তলা'র তুলনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন :

'দুটিরই কাব্যবিষয় নিগূঢ়ভাবে এক। দুই কাব্যেই মদন যে মিলন সংসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহাতে দৈবশাপ লাগিয়াছে; সে মিলন অসম্পন্ন অসম্পূর্ণ হইয়া আপনার বিচিত্রকারুখচিত পরমসুন্দর বাসর-শয্যার মধ্যে দৈবাহত হইয়া মরিয়াছে। তাহার পরে কঠিন দুঃখ ও দুঃসহ বিরহব্রত দ্বারা যে মিলন সম্পন্ন হইয়াছে তাহার প্রকৃতি

১। 'মনের বাগান বাড়ি'

অনুরূপ, তাহা সৌন্দর্যের সমস্ত বাহ্যাবরণ পরিত্যাগ করিয়া বিরল-নির্মল বেশে কল্যাণের শুভ দীপ্তিতে কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে।'[২]

রচনাকালের হিসেবে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' থেকে 'প্রাচীন সাহিত্য' নিঃসন্দেহে সুদূর-ব্যবহিত। 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৩-তে তাঁর প্রথমোক্ত বইখানির মধ্যে যে-কথা বলেছিলেন,—১৯০৭-এ প্রকাশিত তাঁর শেষোক্ত গ্রন্থের যে-অংশটুকু ওপরে তুলে দেওয়া হয়েছে,—সেখানেও তাঁর সেই মূল বিশ্বাস অপরিবর্তিত। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' থেকেই আরো দু'একটি উদ্ধৃতি এই সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। কিন্তু সে-কাজে এগিয়ে যাবার আ.গ বৈষ্ণব-কাব্যের রীতি-উপলব্ধির বিষয়ে তাঁর বহুশ্রুত, বহু-আলোচিত মন্তব্যটি একবার ভেবে দেখা দরকার। অর্থাৎ, প্রেমের 'কঠিন দুঃখ ও দুঃসহ বিরহব্রত' সম্বন্ধে বৈষ্ণব সাধকদের ধারণা কী রকম ছিল,—রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের আদর্শ সম্পর্কেই বা রবীন্দ্রনাথ কী ধারণা পোষণ করতেন, সে-সব তথ্য স্মর্তব্য। তাঁর জীবনস্মৃতিতে দেখা যায়:

'শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ সে সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল।... বিদ্যাপতির দুর্বোধ্য বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত।'

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত' গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কবিরাজ গোস্বামী লিখে গেছেন:

হ্লাদিনীর সার—প্রেম, প্রেম-সার ভাব,
ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম—মহাভাব।
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী
সর্বগুণখনি, কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি।

রক্ত-মাংসের যোগ থেকে সরিয়ে,—রাধা-কৃষ্ণতত্ত্বকথাটিকে পবিত্র স্বাতন্ত্র্যে অধিষ্ঠিত রাখবার আদর্শ স্বীকার করে নিয়ে, কবিরাজ গোস্বামী আরো স্পষ্ট করে বলে গেছেন:

রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণ শক্তিমান;
দুই বস্তু ভেদ নাহি—শাস্ত্র পরমাণ॥

২। 'প্রাচীন সাহিত্য'

বৈষ্ণব মহাজনরা এই তত্ত্বের উপলব্ধি বরণ করে নিয়ে, রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার কাব্য লিখে গেছেন। এই হোলো ভক্তমণ্ডলীর কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সোনার তরী'-র 'বৈষ্ণব-কবিতা'য় লিখলেন :

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?
পূর্বরাগ অনুরাগ মান অভিমান,
অভিসার প্রেমলীলা বিরহ মিলন,
বৃন্দাবন গাথা ; ..
এ সংগীত-রসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেম-তৃষা ?

এ প্রশ্নের জবাবে ঐ কবিতাতেই বলা হয় :

এই প্রেম-গীতি হার
গাঁথা হয় নরনারী-মিলন মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দেবতারে ; আর পাব কোথা
দেবতারে প্রিয় করি' প্রিয়েরে দেবতা ..

বৈষ্ণব-শাস্ত্রে রাধাকৃষ্ণের দৈবীমহিমা পবিত্র এক তত্ত্বজ্ঞান! বৈষ্ণব কবিদের রচনায় সেই জ্ঞানই হয়েছে রসের সামগ্রী।'[৩] জ্ঞানের সঙ্গে রসের এই সেতুবন্ধনের আর একটি দৃষ্টান্ত আছে প্রাচীন গ্রীকদের শৃঙ্গার-জিজ্ঞাসায়।

প্লেটোর Symposium-এ প্রণয়দেবী আফ্রোদিতির দ্বিমূর্তির কথা স্বীকৃত। অযোনিসম্ভূতা Uranian হলেন আফ্রোদিতির স্বর্গীয় সংস্করণ, আর, Zeus ও Dione-র কন্যা Pandemus হলেন আফ্রোদিতির পার্থিব প্রতিমা। প্রথমার অধিষ্ঠান মানুষের আত্মায়,—দ্বিতীয়ার অধিষ্ঠান মানুষের

৩। 'প্রাণবান কাব্যে তত্ত্ব থাকিতে পারে কিন্তু সেই তত্ত্ব, বিশেষভাবে কাব্যেরই তত্ত্ব কারণ কাব্য কাহারও দাসত্ব করে না।'—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত 'রবীন্দ্রনাথ'।

ইন্দ্রিয়-বাসনায়! প্রণয় সম্বন্ধে বিচিত্র উক্তি-প্রত্যুক্তির ধারায় সক্রেটিসের সঙ্গে ডিওটিমার এই সংলাপ রবীন্দ্রনাথের 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যের নিকটতম সাদৃশ্যের স্মারক। Diotima বলেছিলেন :

> '...wisdom is concerned with the loveliest of things ; and love is the love of what is lovely...'

ডিওটিমাকে সক্রেটিস বলেছিলেন, ভালোবাসার মধ্য দিয়ে মানুষ কল্যাণের অধিকারী হয়, সৌন্দর্যের অধিকার পায়! তাইতেই তার সুখ। আর, ডিওটিমা নিজেই সক্রেটিসকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, ভালোবাসায় কল্যাণ ও সৌন্দর্যের অমৃতলোকে জীবনের উজ্জীবন ঘটে থাকে। সুতরাং প্রেম মানুষের অমরত্ব সন্ধানেরই নামান্তর। জৈব-সাধারণ্যে কামকলার অনুষ্ঠান জীবমাত্রের এই অস্ফুট অমরত্ব-কামনারই স্বতঃস্ফূর্ত আঙ্গিক।

বস্তুলোকে দেখা যায় নিত্য পরিবর্তন, নিত্য নব নব সৃজন-গঠন,—মুহূর্তে-মুহূর্তে ধ্বংস,—বিচিত্র ধ্বংসের অনুবর্তী বিচিত্র নব বোধন! জন্ম-মৃত্যুর এই প্রবাহ অনন্ত। আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে : 'শস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ।' অর্থাৎ, মর পদার্থ শস্যের মতো জীর্ণ হয়, আবার শস্যের মতো জন্মগ্রহণ করে।[৪]

ডিওটিমা সক্রেটিসকে বলেছিলেন :

> '...the mortal does all it can to put on immortality ; and how can it do that except by breeding, and thus ensuring that there will always be a younger generation to take the place of the old ?'

সাধারণ অমার্জিত মানুষ সহজ প্রবৃত্তির তাগিদে সন্তান-সন্ততির মধ্য দিয়ে অমরত্ব পেতে চেষ্টা করে, অর্থাৎ দুধের স্বাদ ঘোলে মেটায়। অপেক্ষাকৃত উঁচু দরের লোকে শৃঙ্গারের উর্ধ্বর্তনসূত্রে (sublimation) সুকৃতির সাধনায় অমরত্ব খুঁজে থাকে। কিন্তু সকলের মনেই সৌন্দর্যের প্রতি সহজাত এক আগ্রহ জেগে থাকে। বিকৃত কামুকতার কথা আলাদা। কিন্তু শারীর আকর্ষণের সুস্থ অভিব্যক্তিতে, সুন্দর দেহের প্রতিই আগ্রহ দেখা যায়—অসুন্দরের প্রতি বিমুখতাই স্বাভাবিক। সাধারণ দেহরাগের মধ্যেও সৌন্দর্যস্পৃহা এবং অমরত্ব-

৪। কঠোপনিষৎ

কামনা অল্পবিস্তর হলেও অচ্ছেদ্য সূত্রে জড়িয়ে আছে। কামুক ব্যক্তি বিশেষ একটি সুন্দর শরীর ভালোবাসে, তারপর আর-একটি, পুনরায় অন্য-একটি! এমনিভাবে বিচ্ছিন্ন পৃথক পৃথক শরীরগত সৌন্দর্যের আস্বাদন থেকে, বস্তুর অতিশায়ী সূক্ষ্মতর সৌন্দর্যের দিকে চেতনার উন্মেষ ঘটতেও পারে! ডিওটিমা সেই সূক্ষ্ম ভাব-সৌন্দর্যকে বলেছিলেন, spiritul loveliness। সেখানে পৌঁছলে স্থূল বস্তুগত সৌন্দর্যের প্রতি লালসা নিশ্চিহ্ন হয়! তখন কেবল একটি মাত্র পরম উপলব্ধি :

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালা—
স্তে মৃত্যোর্যান্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে।[৫]

Diotima বলেছিলেন :

'It is an everlasing loveliness which neither comes nor goes, which neither fllowers nor fades....'

Pandemus-এর সম্রাজ্য পেরিয়ে Uranian-এর উপলব্ধিতে পৌঁছোলেই সেই ভালোবাসার স্বাদ পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের বাইশ বছর বয়সের রচনায় এই মৃত্যুহীন, মোহহীন, চিরন্তন ভালোবাসার উপলব্ধিটি দেখা দিয়েছিল।

ডিওটিমা-সক্রেটিস ঘটিত প্রশ্নোত্তরিকায় possession বা অধিকারের কথা একাধিকবার এসে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথও অধিকারের কথা বলে গেছেন :

'প্রকৃত ভালবাসা দাস নহে, সে ভক্ত; সে ভিক্ষুক নহে, সে ক্রেতা। আদর্শ প্রণয়ী প্রকৃত সৌন্দর্যকে ভালবাসেন, মহত্ত্বকে ভালবাসেন; তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে যে আদর্শ ভাব জাগিতেছে, তাহারই প্রতিমাকে ভালবাসেন। প্রণয়ের পাত্র যেমনই হউক, অন্ধভাবে তাহার চরণ আশ্রয় করিয়া থাকা তাঁহার কর্ম নহে। তাহাকে ত ভালবাসা বলে

৫। 'অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা বাহিরের কাম্যবস্তুর অনুসরণ করে, এইজন্যই তাহারা সর্বতঃ ব্যাপ্ত মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হয়। কিন্তু জ্ঞানীরা নিত্য অমৃতত্বকে জানিয়া সংসারে অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না।'—কঠোপনিষৎ : সীতানাথ তত্ত্বভূষণকৃত অনুবাদ।

না, তাহাকে কর্দম-বৃত্তি বলে। কর্দম একবার পা জড়াইলে আর ছাড়িতে চায় না, তা সে যাহারই পা হউক না কেন, দেবতারই হউক আর নরাধমেরই হউক! প্রকৃত ভালবাসা যোগ্যপাত্র দেখিলেই আপনাকে তাহার চরণধূলি করিয়া ফেলে। এই নিমিত্ত ধূলিবৃত্তি করাকেই অনেকে ভালবাসা বলিয়া ভুল করেন। তাঁহারা জানেন না যে, দাসের সহিত ভক্তের বাহ্য আচরণে অনেক সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু একটি প্রধান প্রভেদ আছে, ভক্তের দাসত্বে স্বাধীনতা আছে, ভক্তের স্বাধীন দাসত্ব। তেমনি প্রকৃত প্রণয় স্বাধীন প্রণয়। সে দাসত্ব করে কেন না দাসত্ব বিশেষের মহত্ত্ব সে বুঝিয়াছে। যেখানে দাসত্ব করিয়া গৌরব আছে, সেইখানেই সে দাস, যেখানে হীনতা স্বীকার করাই মর্যাদা, সেইখানেই সে হীন। ভালবাসিবার জন্যই ভালবাসা নহে, ভাল ভালবাসিবার জন্যই ভালবাসা। তা যদি না হয়, যদি ভালবাসা হীন হইতে শিক্ষা দেয়, যদি অসৌন্দর্যের কাছে রুচিকে বদ্ধ করিয়া রাখে তবে ভালবাসা নিপাত যাক্।[৬]

এই মন্তব্যের অধোরেখ অংশটি এই আলোচনার ২০২ পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত Diotima-র উক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে মনে প্রশ্ন জাগে যে, রবীন্দ্রনাথ কি এই সময়ে Plato-র রচনায় আবিষ্ট ছিলেন?

উপনিষদের প্রভাব তাঁর রচনার বহু ক্ষেত্রে বিদ্যমান। প্রণয়তত্ত্ব ব্যাখ্যানের মধ্যেও ভূমাবোধ এবং ত্যাগ সাধনার উপনিষদ-বাহিত আদর্শ তিনি পুনঃ পুনঃ স্মরণ করেছেন। সেই সঙ্গে, ওপরের উদ্ধৃতিটিতে Symposium-এর অন্তর্ভুক্ত Diotima-র মন্তব্যের অতি স্পষ্ট প্রতিধ্বনিও যে শোনা যাচ্ছে, তাতেও সন্দেহ নেই। তবে সে-প্রতিধ্বনি রবীন্দ্রনাথের সজ্ঞান স্বীকৃতিজনিত কী না, সে-বিষয়ে রবীন্দ্র-জীবনীর তথ্যাধিকারী প্রাজ্ঞজনেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র-জীবনী'র প্রথম খণ্ডে 'সন্ধ্যা-সংগীতের যুগ' ও 'প্রভাত-সংগীতের যুগ' নামে অব্যবহিত দুটি অধ্যায়ে রবীন্দ্র-নাথের কুড়ি থেকে বাইশ বছর অবধি বয়সের কথা লিখেছেন। সেই আলোচনা

৬। আদর্শ প্রেম।

থেকে তাঁর জীবনের এই পর্বের অবস্থা কতকটা অনুমান করা যায়। ১৮৮১-খ্রীষ্টাব্দে [১২৮৮ সালের প্রথম দিকে] বিলাত যাত্রা ক'রে,—রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ দু'জনেই মাদ্রাজ থেকে ফিরে আসেন; ফিরে এসে মুসুরি পাহাড়ে মহর্ষির সঙ্গে তিনি দেখা করেন এবং সেখান থেকে ফিরে আসেন চন্দননগরে জ্যোতিরিন্দ্রিনাথের কাছে। চন্দননগরের এই বাড়িতেই তাঁর সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলি লেখা শুরু হয়। তারপর, ১৮৮২-র মাঝামাঝি সময়ে রমেশচন্দ্র দত্তের বাড়িতে এক বিবাহ-সভায় বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গলায় মালা পরিয়ে দেন। এ-সব কথা তিনি নিজেই তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে বলে গেছেন। তার কিছু আগে, বাংলা ১২৮৮-র জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁর 'সঙ্গীত ও ভাব,' 'যথার্থ দোসর,' 'জুতা ব্যবস্থা' ইত্যাদি প্রবন্ধ বেরিয়ে গেছে। একদিকে সন্ধ্যাসংগীতের আত্ম-অবরুদ্ধ অন্ধকার,—অন্যদিকে, এই সব প্রবন্ধে তাঁর সর্বতোমুখী সতর্কতার পরিচয় একই সঙ্গে বিদ্যমান থাকতে দেখে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠকদের সমুচিত সাবধান হবার পরামর্শ দিয়ে প্রভাতকুমার লিখেছেন:

> 'রবীন্দ্রনাথের সেই জটিল মন আমাদিগকে বার বার পরিভ্রান্ত করে,—আমরা তাঁহাকে খণ্ডভাবে আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহাকে অসংবদ্ধভাবে পাই।'

'যথার্থ দোসর' প্রবন্ধে Shelley, Christiania Rossetti প্রভৃতি কবির বিষয়ে উল্লেখ-আলোচনা আছে। 'সঙ্গীত ও ভাব' প্রবন্ধটি লেখবার পরে, Herbert Spencer-এর The Origin and Function of Music নামক প্রবন্ধের গুণপনায় তিনি খুবই আকৃষ্ট হন। ১২৮৮-তে আরো কয়েকটি প্রবন্ধ ছাড়া 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র বিখ্যাত 'মরণ-রে তুঁহু মম শ্যাম সমান' কবিতাটিও প্রকাশিত হয়। বিদ্যাপতির কাব্য উপলক্ষ ক'রে শ্রাবণের 'ভারতী'তে তাঁর আলোচনা ছাপা হয়। আশ্বিনে তিনি টেনিসনের De Profundis-এ পর্যালোচনা করেন। কার্তিকে তাঁর উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট' শুরু হয়। চন্দননগর থেকে দশ নম্বর সদর স্ট্রীটের বাড়িতে উঠে আসার পরে, একদিন লেখা হয়:

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি,—

এই দুই ছত্রের উল্লেখ ক'রে, পরে তিনি নিজে ব'লে গেছেন :

'ইহা কবিকল্পনার অত্যুক্তি নহে। বস্তুত যাহা অনুভব করিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার ছিল না।'

এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাংলাভাষার উন্নতির জন্যে 'কলিকাতা সারস্বত সম্মিলনী' নামে এক সভা স্থাপনের উদ্যোগ করেন,—এবং এই উপলক্ষে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও অন্যান্য কয়েকজনের সান্নিধ্য পেয়ে, রবীন্দ্রনাথের মনে অল্পবয়সের অন্তর্মুখিতা বহু পরিমাণে অন্তর্হিত হয়। সেই সময়ে, ১২৮৯-এর আষাঢ়-শ্রাবণের 'ভারতী'তে তিনি 'দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি' নামে যে প্রবন্ধ লেখেন, সেই প্রবন্ধটিতে বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন শৃঙ্গারাতিশয্যের বিরুদ্ধে তাঁর তিরস্কার আছে। বিরক্তিবশে তিনি লিখেছিলেন —'সকল নাটক, কাব্যে ও উপন্যাসে ভালবাসাবাসির ছড়াছড়ি দেখিতে পাইবই পাইব।'

এই প্রবন্ধের ছ'মাস আগে ১২৮৮-র ফাল্গুনের 'ভারতীতে' তাঁর 'আদর্শ প্রেম'-প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

এই কয়েক বছরের যে ঘটনাবলী এখানে উল্লেখ করা হোলো, তা থেকে অনুমান করা অসংগত হবে না যে, তাঁর ব্যক্তিগত অধ্যয়ন-সূত্রে,—ব্যাপক ভাবে তাঁর জীবনোপলব্ধির অভিজ্ঞতায়—এবং বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন শৃঙ্গারাতিরেক-প্রভাবে, 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র ভালোবাসা-সম্পর্কিত রচনাগুলি তিনি লিখতে প্রবৃত্ত হন। তাঁর হৃদয়ে এই সময়ে—'জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি'। ক্রমব্যপমান আত্মীয়তাবোধের আকর্ষণে সমস্ত পৃথিবী তাঁর আত্মীয় হয়ে উঠেছে। স্বার্থপরতা তাঁর ধাতে সয় না। মানুষ মানুষকে সম্পত্তির মতো অধিকার করবে অথবা ভোগ করবে,—এ ধারণা তাঁর কল্পনাতীত। উত্তর-জীবনে শৃঙ্গার-সম্পর্কিত তাঁর যাবতীয় রচনায়—এই স্থূল অধিকার-বিশ্বাসী প্রণয়ের বিরুদ্ধে অভিযানই প্রধান হয়ে উঠেছে। 'শান্তি-নিকেতন'-প্রবন্ধাবলীর মধ্যে এ-সিদ্ধান্তের অজস্র নজির আছে। তাছাড়া

এই আলোচনায় ইতিপূর্বে 'আদর্শ প্রেম' থেকে যে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হ'য়েছে, সেটিও স্মরণীয় —এবং সেই সঙ্গে তাঁর এই নিচের উক্তিটিও দ্রষ্টব্য :

'আমরা ষষ্ঠীকে যে সম্বন্ধ কারক বলি, তাহা অতি যথার্থ, কিন্তু ইংরাজেরা যে তাহাকে Possessive case বলে তাহা অতি ভুল। মানুষের ব্যাকরণে সম্বন্ধ কারক আছে কিন্তু Possessive case নাই। একটি পরমাণুও আমরা সম্পূর্ণ ভোগ করিতে পারি না, সম্পূর্ণ জানিতে পারি না, ধ্বংস করিতে পারি না, নিয়মিত কালের অধিক রাখিতে পারি না।'[৭]

এও 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র উক্তি। ১২৮৮-৮৯ [১৮৮২-৮৩]-র এই মন্তব্যের সঙ্গে প্রেমের বিশ্লেষণমূলক পরবর্তী যাবতীয় রচনার সিদ্ধান্তগত ঐক্য সত্যিই চমকপ্রদ। চিত্রাঙ্গদা [১৮৯২], ঘরে বাইরে [১৯১৬], চতুরঙ্গ [১৯১৬], যোগাযোগ [১৯২৯], শেষের কবিতা [১৯২৯], মহুয়া [১৯২৯]—এই সমস্ত রচনাতেই ভালোবাসার এই 'অনধিকার'-তত্ত্বটি ফুটে উঠেছে। 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র—'বেশি দেখা ও কম দেখা'র—'প্রেমের চক্ষে দেখার অর্থই সর্বাপেক্ষা অধিক করিয়া দেখা।'—এই উক্তিটিই 'মহুয়া'-র অধুনালভ্য সংস্করণের সূচনা রূপে ব্যবহৃত চিঠিখানিতে সবিস্তারে পুনরালোচিত হয়েছে :

'প্রেমের মধ্যে সৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া প্রবল। প্রেম সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে রচনা করে, নিজের ভিতরকার বর্ণে রসে রূপে। তার সঙ্গে যোগ দেয় বাইরের প্রকৃতি থেকে নানা গান, গন্ধ, নানা আভাস। এমনি করে অন্তরে বাহিরের মিলনে চিত্তের নিভৃত লোকে প্রেমের অপরূপ প্রসাধন নির্মিত হতে থাকে...।'

'ঘরে-বাইরে'র অন্তর্দাহে Ibsen-এর প্রভাব অনেকেই লক্ষ্য করেছেন নিখিলেশ আর সন্দীপের মধ্যে বিমলার স্বত্ব-স্বামিত্ব নিয়ে এই উপন্যাসে যে ঘূর্ণি ঘুলিয়ে উঠেছিল, সেই দুর্যোগের ছবিতে স্থায়ী ভাব হয়ে ফুটেছে—'রতি' আর 'উৎসাহ' ;—নানা সঞ্চারীর মধ্যে প্রণয়-জনিত ঈর্ষা্যা হয়েছে মুখ্য ভাব। ঈর্ষা্যা সন্দীপের মনে। নিখিলের বীরত্বের প্রশান্তির মধ্যেও দু'এক জায়গায়

৭। 'অনধিকার' দ্রষ্টব্য।

সেই ঢেউ এসে ছুঁয়ে গেছে। এমনি একটি তীব্র ভাব-সন্ধিতে মথিত অবস্থায় নিখিলেশ তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন :

'এমন সময়ে হঠাৎ পিছন থেকে বিমল ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শেলফের দিকে যেতে যেতে বললুম, 'Amiel's Journal বইখানা নিতে এসেছি।'

রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রেম বা শৃঙ্গার চেতনা বিশ্লেষণের পক্ষে এই উল্লেখটিও তুচ্ছ নয়। উপনিষদ, বৈষ্ণব-কাব্য, মধ্যযুগের ভারতীয় মরমীয়া সাহিত্য, Plato-র রচনা—ইত্যাদির রসধারায় তাঁর মন যেমন পুষ্ট হয়েছে,—এমিয়েলের এই স্মৃতিপঞ্জীর দ্বারাও তেমনি। এমিয়েলের এই স্মৃতিপঞ্জী লেখকের মৃত্যুর পরে ১৮৮২-র ডিসেম্বর মাসে জেনেভায় প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪-তে এ-বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড বেরোয়। ১৮৮০-র ডিসেম্বর মাসে এই রোজনামচায় এমিয়েল লিখেছিলেন :

'Jealousy is a terrible thing. It resembles love, only it is precisely love's contrary. Instead of wishing for the welfare of the object loved, it desires the dependence of that object upon itself, and its own triumph. Love is the forgetfulness of self; jealousy is the most passionate form of egotism, the glorification of a despotic, exacting and vain ego, which can neither forget nor subordinate itself. The contrast is perfect.[৮]

'ঘরে বাইরে' থেকে যে অংশটুকু ওপরে তুলে দেওয়া হয়েছে, তার কয়েক লাইন পরেই নিখিলেশের আরো মন্তব্য ছিল :

'Amiel's Journal পড়ে আজ আমার কোন ফল হোত না।—কিন্তু পঞ্চুর এই এক-কথায় আমার মন খোলসা হয়ে গেল। একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলন-বিচ্ছেদের সুখদুঃখ ছাড়িয়ে এ পৃথিবী অনেক

৮। ১৮৮০-র ডিসেম্বরে এমিয়েলের এই মন্তব্য।

দূর বিস্তৃত। বিপুল মানুষের জীবন; তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে তবেই যেন নিজের হাসি কান্নার পরিমাপ করি।'

আবার অন্য এক মন্তব্য :

'বাস্তবকে যত একান্ত ক'রে দেখি ততই সে আমাদের পেয়ে বসে— আভাসমাত্রে সত্যকে যখন দেখি তখনই মুক্তির হাওয়া গায়ে লাগে। বিমল আজ আমার জীবনে সেই বাস্তবকেই এত বেশি তীব্র করে তুলেছে যে সত্য আমার পক্ষে আজ আচ্ছন্ন হবার জো হয়েছে।'

এইসব মন্তব্যের সঙ্গে এমিয়েলের পূর্বোদ্ধৃত উক্তিটি মিলিয়ে দেখা উচিত। 'ঘরে'-বাইরের নিখিলেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে ভাবটিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, সে হোলো আত্মবিলোপী প্রেমের সন্ন্যাস; বিমলার জন্যেও যেমন, দেশের জন্যেও তেমনি, এই সর্বদাতা ভালোবাসা স্বার্থের সংকীর্ণ অবরোধকে ভয় করে, ঘৃণা করে, পরিহার করে। কিন্তু, সন্দীপ এর বিপরীত পথের পথিক। তার চোখে অন্য দৃষ্টি, তার কণ্ঠে অন্য গান :

এসো পাপ, এসো সুন্দরী
তব চুম্বন-অগ্নি-মদিরা রক্তে ফিরুক সঞ্চরি!
অকল্যাণের বাজুক শঙ্খ
ললাটে লেপিয়া দাও কলঙ্ক,
নির্লাজ কালো কলুষ পঙ্ক
বুকে দাও প্রলয়ঙ্করী!

'ঘরে-বাইরে' এবং 'চতুরঙ্গ' ছাপা হয় একই সালে [১৯১৬]। 'চতুরঙ্গে' শচীশের ডায়ারিতে এক জায়গায় আছে :

'ননীবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি;—অপবিত্রের কলঙ্ক যে নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছে, পাপিষ্ঠের জন্য যে নারী মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিল। দামিনীর মধ্যে নারীর আর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি; সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবনরসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলি ভরপুর হইয়া উঠিতেছে; সে কিছুই ফেলিতে চায় না, সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ, সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি-পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে।'

নারীর এই দ্বি-মূর্তির ধ্যান রবীন্দ্রনাথের গদ্যে-পদ্যে বহু জায়গায় ছড়িয়ে আছে,—আছে উর্বশী ও লক্ষ্মীর বিভেদে,—'দুই নারী', 'উর্বশী', প্রভৃতি কবিতায়,—'শেষের কবিতা', 'দুই বোন' প্রভৃতি শেষ পর্বের নব্য-রোম্যান্সে,—'চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাইরে' প্রভৃতি মধ্য-পর্বের উপন্যাসে,—এবং, তারও আগে ভ্রূণরূপে দেখা দিয়েছিল 'কড়ি ও কোমলে'র কয়েকটি কবিতায়। নারীর এই যুগল সত্তা উপলব্ধির সংকেত এ ব ক্ষেত্রে বিরল নয়।

'বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থাকারে ছাপা হবার অনেক কাল পরে,—পরিণত জীবনের খ্যাতি-প্রত্যয়-অভিজ্ঞতায় সমাসীন রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪-এর ১১ই নভেম্বর বুয়েনোস এয়ারিসে 'কিশোর প্রেম' নামে যে কবিতাটি লিখেছিলেন [বর্তমানে পূরবী-তে সংকলিত], তাতে তিনি পুরোনো 'সেই কিশোর-প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা' স্মরণ করে, অতীতের দিকে তাকিয়ে বলে গেছেন,—'এই জীবনে সেই তো আমার প্রথম ফাগুন মাস'। সেই দূরবিলীন ফাল্গুনের জন্যে তাঁর যেন বেদনার অন্ত ছিল না।

'ঝরে-পড়া সেই মুকুলের শেষ-না-করা কথা
আজকে আমার সুরে গানে
পায় খুঁজে তার গোপন মানে,
আজ বেদনায় উঠল ফুটে তার সেদিনের ব্যথা।'

ভালোবাসা সম্পর্কে 'বিবিধ-প্রসঙ্গে'-র এই 'শেষ-না-করা কথা' তাঁর পরিণত জীবনের পরিণত কাব্য-কথায় পূর্ণ অভিব্যক্তি পেয়েছে। বর্তমান আলোচনার ধারায় 'বিবিধ-প্রসঙ্গের' পরে 'কড়ি ও কোমলে' [১৮৮৬] পৌঁছে, আর-একবার তরী বাঁধা দরকার। 'কড়ি ও কোমলের' আগে তাঁর যে বইগুলি ছাপা হয়, সেগুলির মধ্যে 'রুদ্রচণ্ড' [প্রথম নাটক], 'য়ুরোপ-প্রবাসীর-পত্র', 'সন্ধ্যা-সংগীত', 'বৌঠাকুরাণীর হাট' [প্রথম গ্রন্থভুক্ত উপন্যাস], প্রভাত-সংগীত', বিবিধ প্রসঙ্গ', 'ছবি ও গান', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'নলিনী', 'শৈশব সংগীত', 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' এবং 'রামমোহন রায়' নামে ছোটো একখানি পুস্তিকা স্মরণীয়। এই বইগুলির মধ্যে এ-প্রসঙ্গে দু'একখানির সম্পর্কে সামান্য মাত্র কথা উঠতে পারে,—রবীন্দ্র-সাহিত্যে শৃঙ্গারের ধ্যান 'কড়ি ও কোমল' থেকেই পরিণত প্রকাশ

পেয়েছে। এ-বিষয়ে তাঁর আত্মানুসন্ধানের প্রথম অধ্যায় শেষ হয়েছে 'কবি-কাহিনী' থেকে শুরু ক'রে তাঁর 'আলোচনা'র [১৮৮৫] মধ্যে। তারপর দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা।

'আত্মপরিচয়ে' [১৩৫০] তিনি বলেছেন :

'প্রকৃতি তাহার রূপরসবর্ণগন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধি-মন তাহার স্নেহ-প্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে; তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে।'

আত্মপরিচয়' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার বেশ কিছু আগে ১৩৩৩-এর জানুয়ারি মাসে কমলা-বক্তৃতায় বলা হয় :

'মানুষের সাধনাও এক স্বভাব থেকে স্বভাবান্তরের সাধনা।...অহংকারকে ভোগাসক্তিকে উত্তীর্ণ হবে তার প্রেম, তবেই বিশ্বগত আত্মীয়তায় মানুষ হবে মহাত্মা। মানুষের একটা স্বভাবে আবরণ, অন্য স্বভাবে মুক্তি।'

প্রবীণ রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায় 'কড়ি ও কোমলে'র অনেক রচনায়। সেই কথাটাই এখানে স্পষ্ট করা দরকার। এই বইয়ের কয়েকটি কবিতায় কয়েক চরণ তুলে দেখলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট বোঝা যাবে :

'দাও খুলে দাও সখি, ওই বাহুপাশ।
চুম্বনমদিরা আর করায়ো না পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস,
ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরাণ!' —বন্দী

'বিজন বিশ্বের মাঝে, মিলন শ্মশানে,
নির্বাপিত সূর্যালোক লুপ্ত চরাচর—
লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্ন প্রাণে
তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর।
এ কী দুরাশার স্বপ্ন, হায় গো, ঈশ্বর—
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌খানে!' —পূর্ণমিলন

'আমি গাঁথি আপনার চারিদিক ঘিরে
সূক্ষ্ম রেশমের জাল কীটের মতন।
মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে,
দেখি না এ জগতের প্রকাণ্ড জীবন।
কেন আমি আপনার অন্তরালে থাকি!
মুদ্রিত পাতার মাঝে কাঁদে অন্ধ আঁখি।' —স্বপ্নরুদ্ধ

'ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতি প্রাণ।
জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।
অসীমে উঠিছে প্রেম শুধিবারে অসীমের ঋণ—
যত দেয় তত পায়, কিছুতে না হয় অবসান।' —চিরদিন

'কড়ি ও কোমলে'র আগে থেকেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের স্থায়ী প্রবণতা দেখা দিয়েছে ভোগাসক্তির ঊর্ধ্বায়ন বা উদ্বর্তনের দিকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথিতযশা, সুপ্রতিষ্ঠিত কোনো কোনো আলোচক কখনো কখনো বলেছেন যে, 'বাসনার ফাঁদ'-কে তিনি তখনো নাকি নিঃসংশয়ে উপেক্ষা করতে পারেন নি। এই ধারণার সমর্থনে কবির নিজেরই অনেক কবিতার নজির তুলে দেখানো হয়েছে। কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, সেই সুদূর অতীতেই 'বিজন বিশ্বের মাঝে' প্রণয়ী-প্রণয়িনীর একান্ত মিলনকে তিনি নিজেই বলেছেন 'মিলন শ্মশান'; তিনি নিজেই বুঝেছেন—'এ মোহ ক'দিন থাকে! এ মায়া মিলায়।'—তাঁর বেদনার্ত হৃদয় বলেছে:

'আমারে ঢেকেছে তব মুক্ত কেশপাশ—
তোমার মাঝারে আমি নাহি দেখি ত্রাণ...

শারীর মিলনের তুচ্ছতা বা বৈফল্যবোধের স্বীকৃতি সত্ত্বেও 'কড়ি ও কোমলে'রই কয়েকটি কবিতায় কবির অন্য এক স্তরের বাসনার অভিব্যক্তি আছে:

'ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব, বালা—
পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালা।' —তনু

'আমার এ দেহ মন চিররাত্রি দিন
তোমার সর্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।' —দেহের মিলন

'লতায়ে থাকুক বুকে চির-আলিঙ্গন—
ছিঁড়ো না, ছিঁড়ো না দুটি বাহুর বন্ধন।' —বাহু

'ব্যাকুল বাসনা দুটি চাহে পরস্পরে,
দেহের সীমায় আসি দুজনের দেখা।' —চুম্বন

একদিকে মর্ত্য প্রেমের এই ঊর্ধ্বায়নের সাধনা,—অন্যদিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেহসৌন্দর্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি,—এই দুই আকর্ষণের সন্ধিতে দাঁড়িয়ে কবি বলেছেন :

'বাসনার বোঝা নিয়ে ডোবে ডোবে তরী—
ফেলিতে সরে না মন, উপায় কী করি !' —বাসনার ফাঁদ

কিন্তু, আর একটু তলিয়ে দেখলে 'কড়ি ও কোমলে'র তথাকথিত সম্ভোগাত্মক কবিতাগুলির অন্তর্নিহিত বিপরীত সুরটিরই প্রাধান্য হৃদয়ঙ্গম হবে। সমঝদারেরা যাই বলুন না কেন, রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখাগুলিই রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রামাণ্যতম টীকা। ধূর্জটিপ্রসাদ ঠিকই বলেছেন—'Tagore is the indispensable and the surest guide to himself.'[১]

শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় 'কড়ি ও কোমলে'র এই সংশয়োদ্বেল কবিতাগুলির আলোচনায় সমগ্রভাবে কবির মানস-প্রকৃতির রোমান্টিক প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন। প্রভাতকুমার তাঁর সামগ্রিক মনোবিবর্তন লক্ষ্য করবার পরামর্শ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের জটিল মনটিকে খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখা যে উচিত নয়, সে কথা অবশ্যই স্বীকার্য,—কিন্তু কবিমানসের বিশেষ বিশেষ আস্থা ও অনুভূতি, আগ্রহ ও এষণার সমন্বয়েই তো তার সমগ্রতার সত্য! রবীন্দ্রনাথের শৃঙ্গার-চেতনা, দেশাত্মবোধ, নিসর্গ-প্রীতি, অধ্যাত্ম-সন্ধান—ইত্যাদি মানস-প্রকৃতির বিভিন্ন গতি ও লক্ষ্যের সমন্বয়েই তো রবীন্দ্র-মানসের সমগ্রতা! তাই যদি হয়, তাহলে সমগ্রভাবে তাঁর বিশিষ্ট মানসিকতাই যে পর্যবেক্ষণীয়, সে-লক্ষ্য বিস্মৃত না হয়েও, সেই সমগ্রের অন্তর্ভুক্ত কবির খণ্ড ও আংশিক বিচিত্র চিৎ-প্রকৃতি বিশ্লেষণের চেষ্টা নিন্দাভাজন হবে না! অতএব 'কড়ি ও কোমলে'র ভোগবাসনাত্মক কবিতাগুলির বিষয়ে নীহাররঞ্জনের নিচের মন্তব্যটি মোটামুটি সংগত বলতে আপত্তি না থাকলেও —সে-মন্তব্যের পুনর্বিচার অযৌক্তিক হবে না। নীহাররঞ্জন বলেছেন : 'কিন্তু এটিও লক্ষ্য করিবার যে এই ভোগাকাঙ্ক্ষাও কতকটা রোমান্টিক, যৌনাকর্ষণ হইতে ভাবগত আকর্ষণই প্রবল।'

এ মন্তব্য অবশ্যই গ্রাহ্য। তারপর, পূর্বোক্ত সংশয়োদ্বেল কবিতাগুলির সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য : 'এই রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিরই আর-একটা দিক 'কড়ি ও

১। Tagore—A Study.

কোমলের' অন্য কয়েকটি কবিতাতেই দেখা যায়। কবির চিরবিরহী চিত্ত বাহুলতার বন্ধনে পূর্ণমিলনের মধ্যেও যেন অতৃপ্ত থাকিয়া যায়, একটা ঔদাস্য যেন কবিচিত্তকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখে, দেহ-সম্ভোগের মধ্যে যেন তৃপ্তি নাই, বাসনার ফাঁদ হইতে কবিচিত্ত মুক্তি পাইতে চায়।'

কিন্তু এ দুটি-কে পৃথক দুই দিক মনে করবার অনিবার্য কোনো হেতু আছে কি? 'বিবসনা,' 'স্তন', 'দেহের মিলন' প্রভৃতি কবিতায় আছে নৈকট্যের তৃপ্তি; 'পূর্ণ মিলন', 'বন্দী' প্রভৃতি কবিতায় প্রেমের উর্ধ্বতর লোকে ভোগের বৈফল্যবোধই উচ্চারিত; নীহাররঞ্জন এই দুই স্বর উল্লেখ করে এই দুটি দিকের মূলে দেখেছেন একই রোমান্টিক প্রকৃতির অদ্বৈত শাসন। কিন্তু 'কড়ি ও কোমলে'র ভোগবাসনামূলক কোনো কবিতাতেই দেহ-মদিরার প্রতি অবিমিশ্র আসক্তি যে ফোটে নি, সে-কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। দেহের মাধুর্যে কবি যদি সর্বতোভাবে আত্মাহুতি না দিয়েই থাকেন,—দেহের পূর্ণ আলিঙ্গনেও যদি তাঁর অন্তর বোধ-প্রত্যাশী আত্মার তৃপ্তি না ঘটে থাকে, তাহলে—সম্ভোগতৃপ্তি এবং ভোগবৈফল্য—এই দুই ভাবের পার্থক্য কল্পনা করে, পৃথক দুই নামে 'কড়ি ও কোমলে'র শৃঙ্গারাত্মক কবিতাগুলির দ্বি-শাখা-বিভাগের যুক্তি কোথায়? 'বিবিধ-প্রসঙ্গ' রচনার সময়ে, অথবা তার কিছু আগেই, প্রণয়বোধের উর্ধ্বগামিতা তাঁর ধ্যানধারণার মধ্যে এক অবধারিত সত্যে পরিণত হয়েছিল। 'কড়ি ও কোমলে' কোনো কোনো অংশে সংশয় ফুটে উঠেছে বটে,—কিন্তু সংশয় ভেদ করে কবির সমগ্র চিৎ-প্রকৃতি যে কোন্ লক্ষ্যের সন্ধানী হবে, এই কাব্যে তারও অবধারিত ইঙ্গিত আছে। তিনি যে সম্ভোগের কবি ন'ন,—বিপ্রলম্ভের কবি তিনি,—তাঁর আগ্রহ যে 'ঋতুসংহারের' মিলনে নয়,—'মেঘদূতের' বিরহে,—সে-কথা 'কড়ি ও কোমলে'র পাঠক অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারেন। কালিদাসের এই দুই কাব্যই রোমান্টিক। রবীন্দ্রনাথও রোমান্টিক কবি। কিন্তু 'ঋতুসংহার' এবং 'মেঘদূতে'র মধ্যে সেতুবন্ধনের প্রেরণায় তিনি 'কড়ি ও কোমল' রচনা করেছেন, একথা মনে করা কোনো মতেই সমীচীন হবে না। তিনি 'মেঘদূতে'রই ভক্ত। এ সম্পর্কে 'কড়ি ও কোমলের' আগেই তিনি বলেছিলেন:

"বর্ষাকালে বিরহিণীর সমস্ত 'আমি' একত্র হয়, ধর্মের 'আমি' জাগিয়া উঠে,

দেখে যে বিচ্ছিন্ন 'আমি' একক 'আমি' অসম্পূর্ণ।...বসন্তকালে বিরহিণীর জগৎ অসম্পূর্ণ, বর্ষাকালে বিরহিণীর 'স্বয়ং' অসম্পূর্ণ। বর্ষাকালে আমি আত্মা চাই, বসন্তকালে আমি সুখ চাই। ...ঋতুসংহারে কালিদাসের কাঁচা হাত বলিয়া বোধ হয়, তথাপি তিনি এই কাব্যে বর্ষা ও বসন্তের যে প্রভেদ দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে কালিদাস বলিয়া চিনা যায়।'১০

আবার 'কড়ি ও কোমলে'র অনেক পরে ১৩৩২-এ রচিত 'শেষ বর্ষণ' গীতিনাট্যে তাঁর বক্তব্য ছিল :

'বসন্ত পূর্ণিমাই ত অপূর্ণ। তাতে চোখের জল নেই কেবলমাত্র হাসি। শ্রাবণের শুক্লরাতে হাসি বলচে আমার জিৎ, কান্না বলচে আমার।'

ভালোবাসার সাধনায় 'কঠিন দুঃখ ও দুঃসহ বিরহব্রত' উদ্‌যাপনের আবশ্যিকতা তিনি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করেছেন। 'কুমারসম্ভব' ও 'শকুন্তলা'র আলোচনায় তিনি যে-কথা বলেছিলেন, 'বিবিধ প্রসঙ্গে'ও তাই বলেছিলেন,—'শেষ বর্ষণে' ও তাই বলেছেন,—এবং এ-সম্পর্কে তাঁর সমস্ত রচনার প্রধান লক্ষ্য ঐ একই বাণী,—ত্যাগের স্বীকৃতি,—দুঃখের বন্দনা। প্রণয়ের শারীর, সংকীর্ণ, ক্ষুদ্র, স্থূল সম্ভোগে তিনি ছিলেন চিরবিমুখ! 'কড়ি ও কোমলে'র বছর-দুয়েক আগে প্রকাশিত 'ছবি ও গান' [১৮৮৪] কবিতা-সংগ্রহে তাঁর 'রাহুর প্রেম' কবিতাটি সংকলিত হয়। তাতে ছিল :

'যেথায় আলোক সেই খানে ছায়া
এই তো নিয়ম ভবে,
ও রূপের কাছে চিরদিন তাই
এ ক্ষুধা জাগিয়া রবে।'

'ছবি ও গানের' আর একটি কবিতায়,—'জাগ্রত স্বপ্নে' স্বপ্নদর্শক বলেছেন :

'কেহ কি আমারে চাহিবে না?
আমার যৌবন-কুসুম-কাননে
ললিত চরণে বেড়াবে না?
আমার প্রাণের লতিকা-বাঁধন
চরণে তাঁহার জড়াবে না?'

১০। বসন্ত ও বর্ষা : বিবিধ প্রসঙ্গ।

'প্রাণের লতিকা-বাঁধন' চিরপথিক মানবাত্মার চরণে জড়ালে ক্ষতি নেই—যদি তাতে প্রাণ-মন-আত্মার চলচ্ছক্তি না ক্ষুণ্ণ হয়! কিন্তু সংকীর্ণতা এবং স্বার্থপরতার প্রশ্রয়ে সংসারে লতিকা-বাঁধন ক্রমশঃ হয়ে ওঠে লৌহরজ্জুপাশ ;—স্থূল রূপাসক্তি আত্মাকে করে বঞ্চনা,—ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-অতৃপ্তি-চাঞ্চল্য হয়ে দাঁড়ায় অসীমের অন্তরাল! রাহুর ক্ষুধায় বিশ্বের স্বচ্ছতা হয় তিমিরান্ধ। রবীন্দ্রনাথ এই সত্যে সংশয়ী নন—কোনোদিনই ছিলেন না। তাই সম্ভোগের মনোময় আস্বাদনই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট—সেই মনোময়তার জন্যেই শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রথমদিকের একটি লেখাতে, রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যথেষ্ট আবেগ এবং উষ্ণতা দেখতে পাননি ['জয়ন্তী-উৎসর্গ' দ্রষ্টব্য]। ধূর্জটিপ্রসাদ সেই একই কারণে বলেছেন যে, তাঁর প্রেমের কবিতা 'বিশুদ্ধ' প্রেম নয়, কেবলমাত্র দেহরাগ নয়![১১]

'বিবিধ প্রসঙ্গ' আর 'কড়ি ও কোমলের' মধ্যবর্তী প্রবন্ধের বই 'আলোচনা'তে (১৫ই এপ্রিল, ১৮৮৫) রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> 'যেমন শরীরের দ্বারা শরীরকেই আয়ত্ত করা যায় তেমনি জ্ঞানের দ্বারা বাহ্যবস্তুর উপরেই ক্ষমতা জন্মে, মর্মের মধ্যে তাহার প্রবেশ নিষেধ।
>
> একজন ইংরাজ স্ত্রীকবি এই সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহার মর্ম এই যে, যদি অংশ চাও তবে জ্ঞান বা শরীরের দ্বারা পাইবে, তাও ভাল করিয়া পাইবে না ; যদি সমস্ত চাও তবে মন বা প্রেমের দ্বারা পাইবে।'

—এই বলে তিনি শ্রীমতী এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং-এর Inclusions কবিতাটি তুলে দেন। এখানে সে-কবিতার সবটুকু না তুলে কেবল অন্ত্য স্তবকটি দেখা যেতে পারে :

Oh, must thou have my soul, Dear,
    commingled with thy soul ?—
Red grows the cheek, and warm the
    hand,...the part is in the whole !...
Nor hands nor cheeks keep separate,
    when soul is joined to soul.

১১। 'Truth to tell, Tagore's love-poems were seldon 'pure'. It may have been his decency or his idealism, but the fact has to be admitted that his love-poems usually suffered from the double entendre, one to the glow of the body and the other to the spirit divine'. (Tagore—A study দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৪, পৃ: ২৫)।

'প্রেমের অধিকার' উক্তিটির অর্থ তো কোনো রকম সম্পত্তির দখল বোঝায় না। প্রেমে সৌন্দর্য, প্রেমে ব্যাপ্তি, প্রেমে সামঞ্জস্য! 'আলোচনা'র 'ধর্ম'-প্রবন্ধে ভালোবাসার অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য সাধনের শক্তির বিষয়ে বলা হয়েছে :

'একেবারেই প্রেমের যোগ্য নহে এমন জীব কোথায়! যত বড়ই পাপী অসাধু কুশ্রী সে হউক না কেন, তাহার মা ত তাহাকে ভালবাসে। অতএব দেখিতেছি, তাহাকেও ভালবাসা যায়, তবে আমি ভালবাসিতে না পারি সে আমার অসম্পূর্ণতা।'

আবার 'সৌন্দর্য ও প্রেমে' বলা হয়েছে :

'যে সুন্দর, কেবল যে তাহার নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে তাহা নয়—সৌন্দর্যের সামঞ্জস্য সমস্ত জগতের সঙ্গে। সৌন্দর্য জগতের অনুকূল। কদর্যতা সয়তানের দলভুক্ত।'

* * *

'যথার্থ যে সুন্দর সে প্রেমের আদর্শ। সে প্রেমের প্রভাবেই সুন্দর হইয়াছে ; তাহার আদ্যন্তমধ্য প্রেমের সূত্রে গাঁথা ; তাহার কোনখানে বিরোধ বিদ্বেষ নাই।'[১২]

'কড়ি ও কোমল' প্রকাশিত হবার আগেই 'বিবিধ প্রসঙ্গ' এবং 'আলোচনা'র লেখাগুলির মধ্যে প্রেম ও সৌন্দর্যের অবিচ্ছেদ্য সংযোগের সত্য তিনি এইভাবে স্বীকার করেছিলেন,—এবং প্রেমের সর্বব্যাপকতার প্রেরণায় তাঁর ধর্মবোধের সঙ্গে দেশাত্মবোধ, দেশাত্মবোধের সঙ্গে বিশ্বানুভূতি, বিশ্বানুভূতির সঙ্গে শিল্পিচেতনা এবং শিল্পিচেতনার সঙ্গে সমাজচেতনা একই পুটপাকে পাক হয়ে পরস্পর-সংশ্লিষ্ট, পরস্পর-অবিচ্ছেদ্য, অখণ্ড একটি সত্যবোধে পরিণত হয়েছিল! রবীন্দ্র-মানসের এই বিশিষ্ট প্রকৃতিটি পর্যালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অবিমিশ্র 'প্রেমের কবিতা' বলতে কেউ কেউ যে দেহমনস্কতার দিকটি বুঝে থাকেন, সে-অভিমুখিতা রবীন্দ্র-সাহিত্যে সত্যিই বিরল। তাঁর অনুভূতিতে প্রেম যেন একটি ধাতুসঙ্কর [alloy]! দেশ, সমাজ, বিশ্ব, ঈশ্বর—ইত্যাদি বিষয়ের চিন্তা তাঁর শৃঙ্গারচেতনার চৌহদ্দীর বাইরে অবান্তর-বোধে বহিষ্কৃত হয়নি। 'কড়ি ও

১২। সৌন্দর্য ও প্রেম।

কোমলে'র পূর্বে রবীন্দ্রনাথের মনে প্রেমের ধারণার সঙ্গে এইসব ধারণার—যাকে বলা যায় পরমাণবিক অন্তরঙ্গতার (affinity) প্রমাণ স্বরূপ নিচে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' এবং 'আলোচনা' থেকে কয়েকটি উক্তি তুলে দেওয়া হোলো :

'জগতের একটি প্রধান ধর্ম পরার্থপরতা। স্বার্থপরতা জগতের ধর্ম-বিরুদ্ধ।...জগতের প্রত্যেক পরমাণু তাহার পরবর্তী ও তাহার নিকটবর্তীর জন্য। তাহার নিজের মধ্যে তাহার বিরাম নাই।' —ধর্ম : . আলোচনা।

প্রকৃত কথা এই যে প্রেম একটি সাধনা ।...স্বদেশের শরীর ক্ষুদ্র, স্বদেশের হৃদয় বৃহৎ। স্বদেশের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছি। স্বদেশের প্রত্যেক গাছপালা আমাদের চোখে ঠেকে না, আমরা একেবারেই তাহার ভিতরকার ভাব তাহার হৃদয়পূর্ণ মাধুরী দেখিতে পাই! এই সৌন্দর্য এই স্বাধীনতা সকল দেশের সকল লোকই সমান উপভোগ করিতে পারেন।

—'ডুব দেওয়া'—কেন : 'আলোচনা'।

'বিশ্ব সর্ব্বত্রই অসীম গভীর এবং অসীম প্রশস্ত। অতএব বিশ্বের এক কাঠা জমিকে যথার্থ ভালবাসিতে গেলে বিশ্বজনীনতা থাকা চাই। —ঐ—এক কাঠা জমি : 'আলোচনা'।

সৌন্দর্য উদ্রেক করার অর্থ আর কিছু নয়—হৃদয়ের অসাড়তা অবচেতনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, হৃদয়ের স্বাধীনতাক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দেওয়া।

অতএব কবিদিগকে আর কিছুই করিতে হইবে না, তাঁহারা কেবল সৌন্দর্য ফুটাইতে থাকুন—জগতের সর্বত্র যে সৌন্দর্য আছে, তাহা তাঁহাদের হৃদয়ের আলোকে পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল হইয়া আমাদের চোখে পড়িতে থাকুক, তবে আমাদের প্রেম জাগিয়া উঠিবে, প্রেম বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়িবে।' —'সৌন্দর্য ও প্রেম' ; কবির কাজ : 'আলোচনা'।

বিজ্ঞানবিৎ কি কেবল দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণের সাহায্যেই বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কার করেন, তাঁহার কাছে যে অনুরাগবীক্ষণ আছে, তাহা কি কেহ হিসাবের মধ্যে আনিবেন না?'

—'বেশী দেখা ও কম দেখা' : 'বিবিধ প্রসঙ্গ'।

'অনন্ত জ্ঞানের ক্ষুধা লইয়া যে রহস্য দন্তস্ফুট করিতে পারিব না তাহাকেই অনবরত আক্রমণ করা, অনন্ত আসঙ্গের ক্ষুধা লইয়া যে সহচর মিলিবে না তাহাকেই অবিরত অন্বেষণ করা, অনন্ত সৌন্দর্যের ক্ষুধা লইয়া যে সৌন্দর্য ধরিয়া রাখিতে পারিবে না তাহাকেই চির উপভোগ করিতে চেষ্টা করা, এক কথায় অনন্ত মন অর্থাৎ, সমষ্টিবদ্ধ কতকগুলি অনন্ত ক্ষুধা লইয়া জগতের পশ্চাতে অনন্ত ধাবমান হওয়াই মনুষ্যজীবন।' —'আত্ম সংসর্গ' : ঐ

এই সব উক্তির সারার্থ এই যে, প্রেমেই মনুষ্যত্বের সার্থকতা। কবির কাব্যের প্রেরণায়, বৈজ্ঞানিকের সত্যানুসন্ধানে, ধার্মিকের ধর্মবোধে, দেশ-সেবকের লক্ষ্যে—সর্বত্রই প্রেমের অনির্বাণ দীপ্তি ছড়িয়ে আছে! ভালোবাসার সার্থকতা লোভে নয়, ভূমায় ;—অধিকারে নয়, অনধিকারে। এই হোলো

রবীন্দ্রনাথের শৃঙ্গার-চেতনার আবাল্যলালিত বিশেষত্ব। তাঁর ধ্যানে ভালোবাসার দেবতা হয়েছেন স্বভাব-সন্ন্যাসী। রবীন্দ্র-মানসের চিরলালিত ভূমাবোধেই তাঁর শৃঙ্গার-চেতনার রহস্যটি নিহিত।

'বিবিধ প্রসঙ্গ' যখন ছাপা হয়, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল মাত্র বাইশ বছর। তার আগে তাঁর জীবনে অনেক অভিজ্ঞতাই ঘটেছিলো বটে, কিন্তু একটি বড়ো অভিজ্ঞতার অভাব ছিল তখনো। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে— 'নলিনী' আর 'শৈশব সংগীত' এই দুই গ্রন্থ প্রকাশের সন্ধিকালে সে অভাবের পূরণ হয়। তাঁর জীবনে প্রিয়জন-বিয়োগের সুতীব্র বেদনার কোনো নজির নেই ইতিপূর্বে। ১২৮১-র ফাল্গুন মাসে যখন তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে, তখন তাঁর বয়স ছিলো তের বছর দশ মাস। তার কিছু আগে তিনি মহর্ষির সঙ্গে প্রথমে শান্তিনিকেতন,—পরে, উত্তর-ভারতে ভ্রমণ করে এসেছেন। মাতৃবিয়োগের আঘাত তাঁর অন্তর্লোকে পৌঁছেছিল বটে, কিন্তু তাতে কবির হৃদয়তন্ত্রীতে কতো তীব্র স্পন্দন উঠেছিল, সে-কথা বোঝবার উপায় নেই। 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁর নিজের লেখা একটি বিবৃতি আছে, কিন্তু 'জীবনস্মৃতি' লেখা হয় এ-ঘটনার দীর্ঘকাল পরে,—ছাপা হয় ১৩১৯ সালে [২৫শে জুলাই, ১৯১২]। সুতরাং সে-বিবৃতি সদ্য-মাতৃবিয়োগে শোকগ্রস্ত কিশোরের উক্তি নয়,—সে শুধু প্রৌঢ়-রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা! তবে, মাতৃবিয়োগের ফলে, তাঁর মনে গভীর কোনো আলোড়ন—তীব্র কোনো বিদারণ যে ঘটেনি,—তার ইঙ্গিত 'জীবনস্মৃতি'র ঐ বিবৃতিটির মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে :

> 'প্রভাতে উঠিয়া যখন মার মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম তখনো সে-কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপর শয়ান। কিন্তু মৃত্যু যে ভয়ঙ্কর, সে-দেহে তাহার কোন প্রমাণ ছিল না; সে-দিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে রূপ দেখিলাম তাহা সুখতৃপ্তির মতই প্রশান্ত ও মনোহর; জীবন হইতে জীবনান্তের বিচ্ছেদ স্পষ্ট করিয়া চোখে পড়িল না।

'নলিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৮৪-র ১০ই মে ; 'শৈশব সংগীতে'র তারিখ—২৯এ মে। এই দুই তারিখের মাঝে ২০এ মে, আকস্মিক ভাবে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-চর্চার নিত্যসঙ্গিনী বৌঠাকুরাণী-র [জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী] মৃত্যু ঘটে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে বৌঠাকুরাণী কতো গভীর শ্রদ্ধার, —কতো প্রীতিনিষ্ঠা-সৌহার্দ্যের আসনে যে অধিষ্ঠিতা ছিলেন, 'জীবনস্মৃতি'র পাঠক মাত্রেই সে কথা জানেন। বৌঠাকুরাণীর মৃত্যুর আগে প্রকাশিত 'শৈশব সংগীত' এবং পরে ছাপা 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' [১লা জুলাই ১৮৮৪]—দুখানি বই-ই তাঁর নামে উৎসর্গ করা হয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

'এই মৃত্যুর পর কবির মনে যে চিন্তাগুলি আসিয়াছিল, যেগুলি 'পুষ্পাঞ্জলি' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার পর চল্লিশ বৎসর পরে কবির একষট্টি বৎসর বয়সের সময় লিখিত 'লিপিকা'র কয়েকটি রচনার ভাষা ও ভাবের সহিত ইহাদের আশ্চর্য্য মিল রহিয়াছে ; বোধ হয় পুরাতন পাণ্ডুলিপি হাতে পাইয়া কবি তাঁহার নূতন ভঙ্গীতে কয়েকটি পুরাতন ভাবকে ব্যক্ত করেন।'

'কড়ি ও কোমলের অন্তর্গত 'কোথায়' কবিতাটিতে প্রিয়-বিয়োগ-বেদনাহত রবীন্দ্রনাথের ব্যাকুলতা স্পষ্ট অনুভব করা যায়। অন্যান্য আরো কয়েকটি কবিতায় ['যোগিয়া, 'ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি, শান্তি, 'পাষাণী মা ইত্যাদি] এই বিচ্ছেদ-বেদনার স্পর্শ আছে। তা'ছাড়া এই সময়েই তত্ত্ববোধিনী'-পত্রিকায় এবং অন্যান্য পত্রে তাঁর 'ব্রহ্ম সংগীতে'র স্রোত শুরু হয়।

১৩৪৬-এর রচনাবলী' সংস্করণে 'কড়ি ও কোমলের' মন্তব্য-অংশে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বৌঠাকুরাণীর মৃত্যুর ঘটনাটি স্মরণ করে লিখেছিলেন :

'কড়ি ও কোমলে যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আর একটি প্রবল প্রবর্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব।'

'কড়ি ও কোমলে'র অন্তর্ভুক্ত 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ' নামে অনুবাদ-কবিতাগুলির মধ্যেও অবসানবোধের সুরটিই প্রধান হয়ে উঠেছে। তা'ছাড়া

মৌলিক কবিতাগুলির মধ্যে অন্ততঃ একটিতে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-দর্শনের একটি সুস্পষ্ট সূত্র পাওয়া গেল :

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসী'-র [১৮৯০, বাংলা ১২৯৭, পৌষ] মাঝে প্রকাশিত হয় তাঁর 'রাজর্ষি', 'চিঠিপত্র' [১৮৮৭],—'সমালোচনা', মায়ার খেলা' [১৮৮৮],—'রাজা ও রানী' [১৮৮৯],—'বিসর্জন' [১৮৯০]। 'চিঠিপত্র' এবং 'সমালোচনা'-বাদে বাকি চারটির মধ্যে তিনটিতেই কোনো-না কোনো প্রধান ভূমিকায় মৃত্যুকে কাব্যের দৃশ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করানো হয়েছে। 'রাজর্ষি' এবং 'বিসর্জন' অবশ্য একই তরুর দুই শাখার মতো সন্নিহিত। 'বিসর্জন'-নাটক লেখা হয় 'রাজর্ষি' উপন্যাসেরই প্রথমাংশ ভেঙ্গে নিয়ে। ১৩৬৬-এ 'তপতী' নামে 'রাজা ও রানী' পুনর্লিখিত হয়। 'রাজর্ষিতে', 'বিসর্জনে' এবং 'রাজা ও রানীতে' মৃত্যুর অন্ধকার পটে দেখা দিয়েছে প্রেমের মৃত্যুঞ্জয়ী শিখা! এই পর্বের অন্যতম রচনা 'মায়ার খেলা'য় ['নলিনী'র পরিবর্তিত রূপ] রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর পুনঃপ্রবেশ না ঘটিয়েই প্রেমের দ্বন্দ্ব-সংশয়-বেদনার দৃশ্য দেখাতে পেরেছেন।

মৃত্যু, প্রেম, সৌন্দর্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ যে তাঁর সারা জীবনের চিন্তা, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। এখানে তা' পুনরায় স্মরণীয়। কোনো বিশেষ পর্বে এসব চিন্তার কোনো একটি যে বিশেষভাবে স্ফুরিত হয়েছে, সে-কথা হয়তো কতকটা ধরা যেতে পারে। কিন্তু সে-রকম সিদ্ধান্তও তর্কের অতীত নয়।

'কড়ি ও কোমলে'র মন্তব্য-অংশে তিনি স্বীকার করেছেন যে, এই সময়ে তাঁর জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব ঘটেছিল। কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী রচনাবলী যে মৃত্যুর ছায়ালেশহীন ছিল, তা নয়। তাঁর প্রথম ছাপা-বই 'কবি-কাহিনী'তে,—তারও আগে লেখা 'বনফুল'-এ, [১২৮২-৮৩র 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব'-পত্রে ছাপা হয়] ১৮৮১-তে ছাপা 'ভগ্নহৃদয়'-গীতিকাব্যে এবং 'রুদ্রচণ্ড'-নাটিকায়—পরবর্তী নাট্যরচনা 'নলিনী'-তে [১৮৮৪ ; বাংলা ১২৯১] মৃত্যুর যবনিকা বারে বারে নেমে এসে জীবনের রঙ্গমঞ্চ স্তব্ধ করে দিয়ে গেছে।

উপস্থিত প্রবন্ধের সুদীর্ঘ 'আদি কথা' অধ্যায়ে বনফুল, কবিকাহিনী প্রভৃতি লেখাগুলির কথা বলা হয়েছে। 'বনফুল' কাব্যে নায়িকা কমলার শৈশবে মাতৃবিয়োগ, কৈশোরে পিতৃবিয়োগ এবং কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে ঈর্ষ্যান্বিত পতির ছুরিকাঘাতে বাঞ্ছিত-বিয়োগ ঘটেছে। 'কবিকাহিনী'র কবি-নায়ক এ-কাব্যের নায়িকা নলিনীকে ভালোবেসেছিলেন, কিন্তু পরিতৃপ্ত হন নি। অতএব, তাঁকে দেশ-ভ্রমণে যেতে হয়,—তবু নলিনীকে ভোলা সম্ভব হয়নি, —ফিরতে হয়েছে তাঁর পরিচিত প্রিয়-সন্নিধ্যের লোভে। ফিরে এসে, নলিনীর দেখা পেয়েছেন বটে, কিন্তু তখন—'না নড়ে হৃদয় তার, না পড়ে নিশ্বাস!' শোক-সন্তপ্ত কবি-নায়ক চলে গেলেন দূরদেশে। তারপর,

একদিন হিমাদ্রির নিশীথ বায়ুতে
কবির অন্তিম শ্বাস গেল মিশাইয়া।

'বনফুল' এবং 'কবিকাহিনীর' মতো 'ভগ্নহৃদয়'-ও বেদনান্ত কাব্য। মুরলার অন্তিম শয্যায় পৌঁছে 'ভগ্নহৃদয়' কাব্য যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। 'রুদ্রচণ্ডে' পৃথ্বীরাজ এবং রুদ্রচণ্ড উভয়েই মৃত্যু বরণ করেছেন। 'নলিনী'-নাট্যে নীরজা নীরদ-নলিনীর মিলন ঘটিয়ে দিয়ে পরলোকের পথে পা বাড়িয়েছেন।

এই সব দৃষ্টান্ত থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যায় যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রীর পরলোক-প্রাপ্তির পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে পৌনঃপুনিক মৃত্যুর আবির্ভাব ঘটে গেছে, কিন্তু মৃত্যুবোধের তীব্রতা আরো পরবর্তী সঞ্চার। 'কড়ি ও কোমলে'র পূর্ববর্তী পর্বটিকেই বলা যায়, মৃত্যুভূয়িষ্ঠ পর্ব। কিন্তু কবির অন্তর্লোকের স্পর্শকাতর সৃজনী-ক্ষেত্রে মৃত্যুর আবির্ভাব এই প্রথম। মৃত্যুর সঙ্গে স্রষ্টা-রবীন্দ্রনাথের এবার অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎ ঘটলো। ভানুসিংহ ঠাকুরের 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান' অভিবাদনে মৃত্যুবোধ ছিল গীতি-কবিতার একতানে সুখস্বপ্নের নিবিড়তায় বিলীন! 'কড়িও কোমলে'র 'প্রাণ', 'পুরাতন' 'যোগিয়া', 'ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি', 'নূতন', 'কোথায়' ইত্যাদি কবিতায় কবিকিশোরের সুখস্বপ্নের অবরোধ থেকে মুক্তি পেয়ে, মৃত্যু দেখা দিয়েছে সংশয়ে-সন্দেহে-প্রত্যয়ে-বেদনায় অপরূপ হয়ে! এখন থেকে মৃত্যু আর সর্ববিপত্তির সুশান্ত পরিত্রাতা নয়,—ভাবপ্রবণের প্রিয় সুহৃৎ নয়,—নিরাপদ কৈশোরের স্বপ্নাচ্ছন্ন মেঘলোক থেকে দেখা সূর্যাস্তের দূর দিগ্‌বলয় মাত্র নয়!

'রাজা ও রানী'তে দেখা দিয়েছে 'মৃত্যুর অমর রশ্মিরেখা'। 'বিসর্জনে' জয়সিংহের মৃত্যু রঘুপতি-গুণবতীর চিরপোষিত মোহান্ধতা ঘুচিয়ে দিয়ে গেছে। গোবিন্দমাণিক্য সেখানে বলতে পেরেছেন :

গেছে পাপ। দেবী আজ এসেছে ফিরিয়া
আমার দেবীর মাঝে।

রঘুপতি ব'লেন,

পাষাণ ভাঙিয়া গেল,— জননী আমার
এবারে দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা।
জননী অমৃতময়ী

প্রিয়-বিয়োগের গভীর বেদনায় মূর্ছিত হ'য়ে অপর্ণা লাভ করে প্রেমের দেহাতীত অধিকার! এতোদিন পরে রঘুপতিকে সে প্রথম পিতৃসম্বোধন করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের প্রণয়-বোধের উপাদান বিশ্লেষণের এই প্রয়াসে 'কড়ি ও কোমলে'র আগের পর্বে দেশাত্মবোধ, বিশ্বানুভূতি, শিল্পিচেতনা, সমাজ-চেতনার আর শৃঙ্গারচেতনার ওতপ্রোত ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করা গেছে। 'কড়ি ও কোমলে'র পরের পর্বে মৃত্যু-শোকের প্রত্যক্ষ ভূমিকায় ভালোবাসার সত্যকে তিনি নতুন চোখে দেখেছিলেন।

ভালোবাসার ব্যাখ্যানে গ্রীক দার্শনিকের 'everlasting loveliness',—
জ্ঞানের ব্যাখ্যানে উপনিষদবিশ্রুত নিত্য অমৃতত্ব,—বৈষ্ণব কবির
'পিরীতি'-উপলব্ধিতে প্রেমের অমরত্ব,—চণ্ডীদাসের পদে—

পরাণ সমান পিরীতি রতন
জুকিলুঁ হৃদয়-তুলে
পিরীতি রতন অধিক হইল,
পরাণ উঠিল চুলে।[১৩]

—প্রেমের অবিনশ্বরতা, পরার্থপরতা, সূক্ষ্ম ধ্যানলোকে প্রেমের অমৃতময় উর্ধ্বায়নের তত্ত্বকথা রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই অনুভব করেছেন। মৃত্যু সম্পর্কে কিশোর বয়সের সেই অর্ধস্বপ্নময় তথ্যজ্ঞান এবার গভীরতর অনুভূতির সত্যে পরিণত! 'জীবনস্মৃতি'-তে এই সত্যেরই স্বীকৃতি আছে :

১৩। 'সমালোচনা' [চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি] : রবীন্দ্রনাথ।

'জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে দূরত্বের প্রয়োজন, মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘুচাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড়ো মনোহর।'

মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'কাব্য-গ্রন্থে'র প্রথম ভাগের 'ক' অংশে 'যাত্রা', 'হৃদয়-অরণ্য', 'নিষ্ক্রমণ' ও 'বিশ্ব'—এই চারটি শাখা-বিভাগে কবিতাগুলি সাজানো হয়েছিল। বর্তমান আলোচনায়, রবীন্দ্রনাথের শৃঙ্গারচেতনার ক্রমাভিব্যক্তির চারটি অধ্যায়ের শিরোনাম হিসেবে সেই নামগুলিই ব্যবহার করা যেতে পারে। 'বনফুল', 'কবিকাহিনী' প্রভৃতি কৈশোরের কাব্যমালায় এই চেতনার অর্ধস্ফুট সঞ্চার,—প্রথম যাত্রারম্ভ; তারপর, তাঁর গদ্য-রচনা 'বিবিধ প্রসঙ্গে' এবং 'আলোচনা'য় হৃদয়ারণ্যের বিচিত্র মর্মর অনুভূত হয়। কিশোর রবীন্দ্রনাথ তখন ভালোবাসার তত্ত্বকথায় অভিনিবিষ্ট,—তিনি পড়লেন পূর্ববর্তী নানা ভাবুকের বাণী,—নানা কবির শৃঙ্গারোপলব্ধির কাব্য—কালিদাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, বসন্ত রায়, শেলি, বার্ডস্বার্থ, এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং, টেনিসন্, ম্যাথ্যু আর্নল্ড ইত্যাদি। তারপর, তাঁর জীবনে দেখা দিয়েছে প্রিয়বিয়োগের শোক,—মৃত্যুর গভীর উপলব্ধি! অর্জিত বিদ্যার সঙ্গে নিজের জীবনাভিজ্ঞতার সমবায়ে, জ্ঞানের সঙ্গে ধ্যানের যোগে এইবার তিনি আবিষ্কার করেছেন নিজস্ব শৃঙ্গার-দর্শন! 'কড়ি ও কোমল' বইখানিতেই রবীন্দ্রনাথের শৃঙ্গার-দর্শনের,—ভালোবাসার তত্ত্বসূত্রের প্রথম সুনিশ্চিত ঘোষণা। বহুমান্য পর্যালোচকেরা এই কাব্যে যে সংশয়োদ্বেলতা লক্ষ্য করেছেন, সেইটিই এ-কাব্যের প্রধান বস্তু নয়। এ কাব্যে প্রেমের সত্য সম্বন্ধে তাঁর সংশয়ের অবসান,—প্রত্যয়ের সূচনা। তিনি যেমন স্পষ্ট করে বলেছেন: 'মরিতে চাহি না আমি',—তেমনি স্পষ্ট করে বলেছেন:

ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতি প্রাণ।
জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।
অসীমে উঠিছে প্রেম শুধিবারে অসীমের ঋণ
যত দেয় তত পায়, কিছুতে না হয় অবসান।[১৪]

১৪। 'চিরদিন' দ্রষ্টব্য।

'কড়ি ও কোমলে' রবীন্দ্রনাথের শৃঙ্গারচেতনার ক্রমাভিব্যক্তির একটি অধ্যায় শেষ হয়। সংশয়ের কুহেলিকা কাটিয়ে, গভীর প্রত্যয় নিয়ে, অসীম বিশ্বানুভূতির দিকে, প্রেমের সর্বব্যাপকতায় কবিচিত্তের 'নিষ্ক্রমণ' ঘটে।

রবীন্দ্র-কাব্যে প্রেমের অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শ সম্পর্কে হ্রস্ব-দীর্ঘ সর্বশ্রেণীর আলোচনায় ব্যবহৃত এই 'বিশ্বানুভূতি' কথাটি ইতিপূর্বে ভেবে দেখা গেছে। উপনিষদের 'ভূমা'-তত্ত্বের উল্লেখ রবীন্দ্র-রচনাবলির নানা অংশে ছড়িয়ে আছে। প্রথম দিকের রচনাবলীর মধ্যে 'বিবিধ প্রসঙ্গে', 'আলোচনায়', 'সমালোচনা'য় এবং নানান্ চিঠিপত্রে 'অখণ্ডতা', 'পূর্ণতা,' 'ব্যাপ্তি,' প্রভৃতি বিস্তার-বাচক শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে। 'অনন্ত জ্ঞান,' 'অনন্ত আনন্দ,' 'অনন্ত সৌন্দর্য' ইত্যাদি শব্দ-প্রয়োগের দৃষ্টান্তও এ-আলোচনার আগের অংশে উদ্ধৃত হয়েছে। 'প্রেম বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়িবে',—'বিশ্ব সর্বত্রই অসীম গভীর এবং অসীম প্রশস্ত'—'সৌন্দর্য জগতের অনুকূল',—'আদর্শ প্রণয়ী প্রকৃত সৌন্দর্যকে ভালবাসেন',—ইত্যাদি খণ্ড-বচনগুলি একসূত্রে পর-পর গ্রথিত করলে শৃঙ্গারবিষয়ে রবীন্দ্র-মানসের বিশ্বমুখিতার ধারণা সমর্থিত হয়। 'কড়ি ও কোমলে'র অনেকগুলি কবিতায় এই বিশ্বমুখিতার নিদর্শন যে পাওয়া যাচ্ছে—সে-কথাও আগেই বলা হয়েছে। 'মানসী' [১৮৯০] থেকে আরম্ভ করে তাঁর পরবর্তী কাব্যরচনাবলীর ক্ষেত্রে 'বিশ্ব' শব্দটির ব্যবহার উত্তরোত্তর বেড়েই গেছে! গদ্যরচনাবলীর কালানুক্রমিক আলোচনা করলেও এই ব্যাপারের সমর্থনই চোখে পড়ে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধসংগ্রহ 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-তে বার বার 'বিশ্ব'-কথাটির ব্যবহার দেখা যায় বটে,—কিন্তু 'হিতবাদী'-'সাধনা'-পর্বে[১৫] লেখা 'ছিন্নপত্রে'র [১৮৮৫-র ৩০-এ অক্টোবর থেকে ১৮৯৫-এর ১৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে লেখা পত্রসংগ্রহ] চিঠিতে,—'সাধনা'র 'নিত্য-নৈমিত্তিক' লেখাগুলির মধ্যে,—চন্দ্রনাথ বসুর প্রবন্ধের প্রতিবাদসূত্রে,—১৮৯৩-এ 'সাধনায়' প্রথম সূচিত এবং পরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'পঞ্চভূতের ডায়ারী'তে 'বিশ্ব' শব্দটি কতো যে ঘন ঘন ব্যবহৃত হয়েছে, তার হিসেব রাখলে এ-শব্দের দিকে তাঁর

১৫। ১২৯৮ (১৮৯১) এ 'হিতবাদী' এবং 'সাধনা' প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রভাতকুমার লিখেছেন, 'হিতবাদী'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ মাস দেড়েকের অধিক ছিল না।' 'সাধনা' সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় ১৮৯১-এর অগ্রহায়ণে প্রথম প্রকাশিত হয়।

ক্রমবর্ধমান ঝোঁক সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। অবশ্য, 'বিশ্ব' শব্দের প্রয়োগ ছাড়া ব্যাপ্তিসূচক অন্যান্য প্রতিশব্দও চোখে পড়ে। এইসব গদ্য-রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর বিশ্বানুভূতি বা বিশ্ববোধের স্বরূপ নির্দেশ করে গেছেন। 'পঞ্চভূত' [১৮৯৭] বইখানির 'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ' নামক আলোচনায় সমীর বলেছেন :

> 'আহারে বিহারে আদানে প্রদানে আত্মা আপনার সৌন্দর্যবিভা বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। সে আপনার আবশ্যকের সহিত আপনার মহত্ত্বের সুন্দর সামঞ্জস্য সাধনা করিয়া লইতে চায়!'

ঐ একই আলোচনায় দার্শনিক ব্যোম বলেছেন :

> 'মাকড়সা যেমন মাঝখানে থাকিয়া চারিদিকে জাল প্রসারিত করিতে থাকে, আমাদের কেন্দ্রবাসী আত্মা সেইরূপ চারিদিকের সহিত আত্মীয়তা বন্ধন স্থাপনের জন্য ব্যস্ত আছে, সে ক্রমাগতই বিসদৃশকে সদৃশ, দূরকে নিকট, পরকে আপনার করিতেছে।'[১৬]

এই জাতীয় উক্তি-প্রত্যুক্তিমালার মধ্যেই —পঞ্চভূতের ভূতনাথ বলেছেন :

> 'আত্মা অন্য আত্মার সংঘর্ষে তবেই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারে, তবেই সে মিলনের আধ্যাত্মিকতা পরিপূর্ণ মাত্রায় মণ্ডিত হইয়া উঠে। একাকার হইয়া থাকা কিছু না থাকার ঠিক পরেই।...... ঐক্য অপেক্ষা মিলনেই আধ্যাত্মিকতা অধিক।'

'পঞ্চভূতে'র 'কাব্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে ব্যোম মহাভারতের কচ ও দেবযানীর আখ্যান স্মরণ করে ঐ কাহিনীর প্রতীক-ব্যাখ্যানে দেহ এবং আত্মার সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কচ আত্মার প্রতীক,—দেবযানী দেহের প্রতীক। শুক্রাচার্যের কাছে সঞ্জীবনী বিদ্যা শেখবার জন্যে দেবতারা বৃহস্পতির পুত্র কচকে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে হাজার বছর ধরে নাচ-গানে দেবযানীকে মুগ্ধ ক'রে, কচ সঞ্জীবনী বিদ্যা আয়ত্ত করেন। বিদায়ের সময় প্রণয়াসক্তা দেবযানীর নিষেধ উপেক্ষা ক'রে, কচ দেবলোকে ফিরে যান। এই কাহিনী স্মরণ ক'রে ব্যোম ব'লেছেন :

১৬। ১৪ই চৈত্র ১৩১৫ তারিখের প্রবন্ধ 'ভূমা,'—'বিশ্ববোধ',—ফাল্গুন, ১৩১৭ সালে রচিত 'আত্মবোধ',—অগ্রহায়ণ, ১৩১৯-এ রচিত 'বিশেষত্ব ও বিশ্ব' [শান্তিনিকেতন] ইত্যাদি পরবর্তী লেখাগুলি এই সূত্রে স্মরণীয়।

'জীব স্বর্গ হইতে এই সংসারাশ্রমে আসিয়াছে। সে এখানকার সুখ, দুঃখ, বিপদ-সম্পদ হইতে শিক্ষালাভ করে। যতদিন ছাত্র অবস্থায় থাকে, ততদিন তাহাকে এই আশ্রম-কন্যা দেহটার মন জোগাইয়া চলিতে হয়। মন জোগাইবার অপূর্ব বিদ্যা সে জানে।'

ব্যোম তাঁর শ্রোতাদের বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন :

'যদি এমনভাবে দেখো, তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা অনন্তকালীন প্রেমাভিনয় দেখিতে পাইবে। জীব তাহার মূঢ় অবোধ নির্ভরপরায়ণা সঙ্গিনীকে কেমন করিয়া পাগল করিতেছে দেখো। দেহের প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে এমন একটি আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করিয়া দিতেছে, দেহ-ধর্মের দ্বারা যে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি নাই। তাহার চক্ষে যে সৌন্দর্য আনিয়া দিতেছে, দৃষ্টিশক্তির দ্বারা তাহার সীমা পাওয়া যায় না—তাই সে বলিতেছে, 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল,'—তাহার কর্ণে যে সংগীত আনিয়া দিতেছে, শ্রবণশক্তির দ্বারা তাহা আয়ত্ত হইতে পারে না, তাই সে ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে,—'সেই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ শ্রুতিপথে পরশ না গেল'!......এত ভালোবাসার পরে তবু একদিন জীব এই চিরানুগতা অনন্যাসক্তা দেহলতাকে ধূলিশায়িনী করিয়া দিয়া চলিয়া যায়!...প্রেম নামক এক অনির্বচনীয়, আনন্দময়, বেদনাময় ইচ্ছাশক্তি পঙ্কের মধ্য হইতে পঙ্কজবন জাগ্রত করিয়া তুলিতেছেন।'

ব্যোমের এই কচ-দেবযানী কাহিনীর প্রতীক ব্যাখ্যার সূত্রে মানব-জগতের কামনা ও আসক্তির ঊর্ধ্বায়ন-তত্ত্বটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই ক্রমগতির মধ্য দিয়েই স্বার্থকেন্দ্রিক কামনা যথাকালে বিশ্বময় প্রেমে উন্নীত হয়।

'পঞ্চভূতের' 'অখণ্ডতা' প্রবন্ধে ব্যোম আবার জানিয়েছেন :

'[আত্মার] ধর্মই এই, সে পাঁচটা বস্তুকে আপনার চারিদিকে টানিয়া আনিয়া একটা গঠন দিয়া গড়িয়া তোলে; আর......মন...... পাঁচটা বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আপনাকে এবং তাহাদিগকে ভাঙিয়া

ভাঙ্গিয়া ফেলে। সেইজন্য আত্মযোগের প্রধান সোপান হইতেছে মনটাকে অবরুদ্ধ করা।'

মনের আহরণী-শক্তি এবং আত্মার সৃজনী-শক্তি—এই দুই তত্ত্বের ব্যাখ্যাসূত্রে[১৭] ব্যোম যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ ক'রেছেন, সেটিও এখানে স্মরণ করা যেতে পারে:

'প্রকৃতিতে যাহা সৌন্দর্য, মহৎ ও গুণী লোকে তাহাই প্রতিভা এবং নারীতে তাহাই শ্রী, তাহাই নারীত্ব। ইহা কেবল পাত্রভেদে ভিন্ন বিকাশ।'

নারীর এই 'শ্রী'র উৎস কোথায়?—উপাদান কি কি? 'পঞ্চভূতে'র পূর্বোক্ত প্রবন্ধে ব্যোম বলেছেন:

'ইহা তো বুদ্ধির কাজ নহে, অনির্দেশ্য প্রতিভার কাজ, মনের শক্তি নহে, আত্মার অভ্রান্ত নিগূঢ় শক্তি। ইহা একটি মহারহস্যময় নিখিল জগৎকেন্দ্রভূমি হইতে স্বাভাবিক স্ফটিকধারার ন্যায় উচ্ছ্বসিত উৎস। সেই কেন্দ্রভূমিটিকে অচেতন না বলিয়া অতিচেতন নাম দেওয়া উচিত।'

১৮৯৭-এর ১২ই মে 'পঞ্চভূত' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই ঘটনার প্রায় বত্রিশ বছর পরে, ১৯২৯-এ 'মহুয়া' [আশ্বিন, ১৩৩৬] প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর 'মহুয়ার' কবিতাগুলির বিষয়ভেদ ও শ্রেণী-ভেদ বিষয়ে লেখেন:

'আমি নিজে মহুয়ার কবিতার মধ্যে দুটো দল দেখতে পাই। একটি হচ্ছে নিছক গীতিকাব্য—ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গীতেই তার লীলা। তাতে প্রণয়ের প্রসাধনকলা মুখ্য! আর একটিতে ভাবের আবেগ প্রধান স্থান নিয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধন-বেগই প্রবল।'

'মহুয়ার' 'মায়া'-কবিতাটিতে প্রণয়ের এই দুই ধারার পরিচয় ফুটে উঠেছে। প্রসাধনের বৈচিত্র্য এবং উপলব্ধির নিবিড়তা—এই দুইয়ের পরম সমন্বয়ে 'মহুয়া'তে যে মায়ালোক সৃষ্ট হয়েছে, সেখানকার সেই বিশেষ মর্মবাণী নতুন নয়,—'কড়ি ও কোমল'-এ, এবং তারও আগেকার লেখাতে

১৭। 'শান্তিনিকেতন'-এর 'সংহরণ', 'বিশ্বাস' 'নিষ্ঠা', 'আত্মবোধ' ইত্যাদি স্মরণীয়।

রবীন্দ্র-মানসের যে উপলব্ধি উচ্চারিত হয়েছিল, 'মহুয়া'তে তারই পুনরুল্লেখ উজ্জ্বল! রবীন্দ্রনাথের শৃঙ্গার-বিষয়ক পরবর্তী রচনাবলাতে সেই একই কথা পুনরায় দেখা দিয়েছিল, যেমন :

বস্তু হতে সেই মায়া তো
সত্যতর
তুমি আমায় আপনি রচে
আপন করো।

বস্তুর চেয়ে সত্যতর এই মায়ালোকই তাঁর শৃঙ্গারধ্যানের প্রকৃত লক্ষ্য।

'মহুয়া'র অনেক কাল পরে, 'ল্যাবরেটারি' প্রভৃতি শেষ পর্বের গল্প রচনায় কবির মনের পুনর্জিজ্ঞাসা কিছু চাঞ্চল্য সঞ্চার করেছে বটে,—কিন্তু তাতে গূঢ় অন্তর্লোকের গভীর কোনো আলোড়নের চিহ্ন নেই। সে তাঁর নতুন কালের নতুন উৎসাহের ঘোষণা! তবে, তাঁর শেষ পর্বের কবিতার ধারায় তাঁর এই ধ্যানের সত্য আরো নানা রচনায় পুনরুচ্চারিত।

নাট্যকাব্য চিত্রাঙ্গদা

১২৯৯ সালের ২৮এ ভাদ্র 'চিত্রাঙ্গদা' প্রথম প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ সে হোলো খ্রীষ্টাব্দের ১৮৯২ সালের কথা। তার দু'বছর পরে ১৩০১ সালের [১৮৯৪ খ্রীঃ] শ্রাবণ মাসের নতুন সংস্করণে একই সঙ্গে 'বিদায়-অভিশাপ' সংকলিত হয়। 'বিদায়-অভিশাপ' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৩০০ সালের 'সাধনা' পত্রিকায়। দু'খানি কাব্যের মধ্যে ভাবগত যোগ আছে।

'চিত্রাঙ্গদা'র নতুনতম সংস্করণে [রবীন্দ্র-রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত, ১৩৪৭] রবীন্দ্রনাথ নিজে যে 'সূচনা'টি যোগ করে গেছেন, তাতে এই রচনা সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত ভূমিকা বা প্রাক্-কথা দেওয়া হয়েছে। তা থেকে জানা যায় যে, অনেক বছর আগে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার দিকে ট্রেনে যেতে-যেতে, রেল-লাইনের ধারে-ধারে চৈত্রমাসের আগাছার জঙ্গলে নানা রঙের অজস্র ফুল দেখে তাঁর মনে হয়েছিল—'আর কিছুকাল পরেই রৌদ্র হবে প্রখর, ফুলগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে; তখন পল্লীপ্রাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরুপ্রকৃতি তার অন্তরের নিগূঢ় রসসঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্‌ভ ফলসম্ভারে।' সেই সঙ্গে তাঁর আরো মনে হয়েছিল—'সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তাহলে সে তার স্বরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহবিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চারিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ যুগলজীবনের জয়যাত্রার সহায়।'

তিনি সেই চারিত্রশক্তিকেই মানব-জীবনের ধ্রুব সম্বল বলেছেন, এবং এই কথাই বিশেষভাবে জানিয়েছেন যে, এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।

এই ভাবটি নাট্যাকারে প্রকাশ করবার সংকল্প জেগে ওঠবার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মনে পড়েছিল—মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী! তিনি নিজে বলে

গেছেন—'এই কাহিনীটির কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেকদিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। অবশেষে লেখবার আনন্দিত অবকাশ পাওয়া গেল, উড়িষ্যায়, পাণ্ডুয়া বলে একটি নিভৃত পল্লীতে গিয়ে।'

পুরী থেকে খণ্ডগিরি ভুবনেশ্বর হয়ে বালিয়া, তীরন প্রভৃতি অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে জমিদারি-পরিদর্শনে যান। 'সোনার তরী'-র 'ঝুলন' [১৫ ইচৈত্র ১২৯৯], সমুদ্রের প্রতি [১৭ই চৈত্র, ১২৯৯] ইত্যাদি প্রসিদ্ধ কবিতা এই উড়িষ্যা ভ্রমণের মধ্যে লেখা হয়। তাঁর চিত্রাঙ্গদাও এই লেখাগুলির সমকালীন সৃষ্টি।

'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যে চিত্রাঙ্গদা কিশোর যোদ্ধার বেশধারিণী; তাঁর মন অর্জুনের শৌর্য-বীর্যের খ্যাতির বৃত্তান্তে মুগ্ধ ছিল। তাঁর রূপ ছিল না, কিন্তু অর্জুনের চিত্তজয়ের উদ্দেশ্যে তিনি রূপসাধনার বলে অর্জুনকে বশীভূত করেছিলেন। তার আগে অনঙ্গ-আশ্রমে চিত্রাঙ্গদা, মদন ও বসন্ত, এই তিন পাত্র-পাত্রীর সমাবেশ দেখানো হয়েছে। আত্মপরিচয় দিয়ে মদন বলেছেন:

আমি সেই মনসিজ,
টেনে আনি নিখিলের নরনারীহিয়া
বেদনাবন্ধনে।

অনুরূপভাবে বসন্ত জানিয়েছেন:

আমি ঋতুরাজ।
জরা মৃত্যু দুই দৈত্য নিমেষে নিমেষে
বাহির করিতে চাহে বিশ্বের কঙ্কাল;
আমি পিছে পিছে ফিরে পদে পদে তারে
করি আক্রমণ; রাত্রিদিন সে সংগ্রাম।
আমি অখিলের সেই অনন্ত যৌবন।

অতঃপর চিত্রাঙ্গদা আত্মপরিচয় দিয়েছেন এইভাবে—

আমি চিত্রাঙ্গদা। মণিপুররাজকন্যা।
মোর পিতৃবংশে পুত্রী জন্মিবে না—
দিয়াছিল হেন বর দেব উমাপতি
তপে তুষ্ট হয়ে। আমি সেই মহাবর
ব্যর্থ করিয়াছি। অমোঘ দেবতাবাক্য

মাতৃগর্ভে পশি, দুর্বল প্রারম্ভ মোর
পারিল না পুরুষ করিতে শৈবতেজে
এমনি কঠিন নারী আমি।

তাই তাঁর পিতা তাঁকে ধনুর্বিদ্যা প্রভৃতি পুরুষসাধ্য বিদ্যা শিখিয়েছেন। পূর্ণা নদীতীরের ঘন অরণ্যপথে একদিন হরিণ-শিকারে উদ্যত হয়ে তিনি চীরধারী এক পুরুষের সাক্ষাৎ পান। সেই পুরুষ তাঁর পথ রোধ ক'রে মাটিতে শুয়েছিল। তাকে সরে যেতে বলা হয়; কিন্তু সে নিজের অধিকৃত জায়গা ছেড়ে দিতে নারাজ! তাই ধনুকের আঘাত দিয়ে শাসন করতে হয় তাকে। তখন—

সরল সুদীর্ঘ দেহ
মুহূর্তেই তীরবেগে উঠিল দাঁড়ায়ে
সম্মুখে আমার, ভস্মসুপ্ত অগ্নি যথা
ঘৃতাহুতি পেয়ে, শিখারূপে উঠে ঊর্ধ্বে
চক্ষের নিমেষে।

কিন্তু রাগ নয়, প্রতিশোধ-কামনা নয়, হিংসা নয়,—সেই অগ্নিশিখার মুখে ফুটে ওঠে 'স্নিগ্ধ গুপ্ত কৌতুকের মৃদুহাস্যরেখা'। নেপথ্যচারী মদনের শাসনে চিত্রাঙ্গদাকে জীবনে সেই প্রথম আত্মসচেতন হতে হয়! অতঃপর তাঁর নিজের মন্তব্য:

সেই মুহূর্তেই জানিলাম মনে, নারী
আমি। সেই মুহূর্তেই প্রথম দেখিনু
সম্মুখে পুরুষ মোর।

কিন্তু অর্জুন তাঁর মনের শ্রদ্ধাঞ্জলি পেয়েছিলেন আগে থেকেই। সাক্ষাৎ না ঘটলেও তিনি চিত্রাঙ্গদার স্মৃতিপথে বিদ্যমান ছিলেন। তাই এবার তাঁর পরিচয় পেয়ে—

রহিনু দাঁড়ায়ে
চিত্রপ্রায়, ভুলে গেনু প্রণাম করিতে।
শুনেছিনু বটে, সত্যপালনের তরে,
দ্বাদশ বৎসর বনে বনে ব্রহ্মচর্য
পালিছে অর্জুন।

বাল্যকালে চিত্রাঙ্গদা মনে মনে কতো ভেবেছিলেন যে, একদিন তিনি নিজের ভুজবলে অর্জুনের কীর্তি নিষ্প্রভ করতে পারবেন। কিন্তু কোথায় গেল সে স্পর্ধা! পূর্ণানদীতটবর্তী গহন অরণ্যপথে অপ্রত্যাশিত ভাবে সেই পার্থবীরের দেখা পেয়ে তাঁর মনে হোলো:

যে ভূমিতে আছেন দাঁড়ায়ে
সে ভূমির তৃণদল হইতাম যদি
শৌর্যবীর্য যাহা কিছু ধূলায় মিলায়ে
লভিতাম দুর্লভ মরণ সেই তাঁর
চরণের তলে।

এইসব অজ্ঞাতপূর্ব ভাবনায় তিনি যখন বিভোর, ঠিক সেই অবকাশে অর্জুন অন্তরালে সরে গেছেন। জ্ঞান ফিরে পেয়ে অতঃপর তাই চিত্রাঙ্গদাকে আত্মধিক্কার দিতে হয়েছে। এবং

পরদিন প্রাতে, দূরে ফেলে দিনু
পুরুষের বেশ। পরিলাম রক্তাম্বর,
কঙ্কণ কিঙ্কিনী কাঞ্চি। অনভ্যস্ত সাজ
লজ্জায় জড়ায়ে অঙ্গ রহিল একান্ত
সসংকোচে।

গোপনে গেলাম সেই বনে
অরণ্যের শিবালয়ে দেখিলাম তাঁরে।

কিন্তু পার্থ বললেন:

ব্রহ্মচারীব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে।

চিত্রাঙ্গদার অন্তরবর্তিনী নারী-প্রকৃতি তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। মদনকে আহ্বান করে তিনি বলেছেন:

হে অনঙ্গদেব, সব দম্ভ মোর
এক দণ্ডে লয়েছ ছিনিয়া—সব বিদ্যা
সব বল, করেছ তোমার পদানত।

এখন তোমার বিদ্যা শিখাও আমায়
দাও মোরে অবলার বল, নিরস্ত্রের
অস্ত্র যত।

মদনের কাছে তাঁকে ভিক্ষার্থিনী হতে হয়েছে বটে, কিন্তু নিজের কুরূপ ঢেকে অকস্মাৎ বাঞ্ছিতকে নিজের অধিকারভুক্ত করবার লোভটাই চিত্রাঙ্গদার একমাত্র পরিচয় নয়। তিলে তিলে হৃদয় অধিকার করাই যে সত্যিকার অধিকার, সে সত্য তাঁর অজানা নয়। তিনি জানতেন—

আপনার পরিচয় দেওয়া বহু ধৈর্যে
বহুদিনে ঘটে, চিরজীবনের কাজ,
জন্মজন্মান্তের ব্রত।

তবু ঋতুরাজ বসন্তের কাছে,—মদনের কাছেও, তিনি মাত্র একটি দিনের জন্যে তাঁর রূপহীনতার গ্লানি দূর করবার প্রার্থনা জানিয়েছেন। সেই দেবতারা প্রার্থনা মঞ্জুর তো করলেনই, উপরন্তু চিত্রাঙ্গদাকে এক দিনের বদলে এক বছরের রূপৈশ্বর্য ভিক্ষা দিলেন।

এইখানেই 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের প্রথম অংশের শেষ। অতঃপর অর্জুনের বিস্মিত হবার পালা।

নিবিড়, নির্জন বনে তৃণাচ্ছন্ন এক সরোবরের তীরে শুয়ে শুয়ে অর্জুন ভাবছিলেন নিজের জীবনের কথা:

জীবনের অসন্তোষ, অসম্পূর্ণ আশা,
অনন্ত দারিদ্র্য এই মর্তমানবের।

হঠাৎ কে-এক নারী বনভূমির অন্ধকার থেকে বেরিয়ে সরোবর-সোপানে এসে দাঁড়ান। সরোবর তাঁর দর্পণ! সেই দর্পণে নিজের অঙ্গশ্রী দেখে দেখে নিজেই মুগ্ধ হন তিনি!

সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে।
শ্বেত শতদল যেন কোরকবয়স
যাপিল নয়ন মুদি; যেদিন প্রভাতে
প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, সেইদিন
হেলাইয়া গ্রীবা, নীল সরোবরজলে

প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন
রহিল চাহিয়া সবিস্ময়ে।

তারপর, সেই অপরূপ সুন্দরী নারীর প্রসন্ন মুখের ওপর বিষাদের ছায়া। নেমে আসে। তিনি যখন চলে যান, তখন একটি মাত্র উপমাই অর্জুনের মনের মধ্যে ধ্বনিত হতে থাকে—

সোনার সায়াহ্ন যথা ম্লান মুখ করি
আঁধার রজনী-পানে ধায় মৃদু পদে।

জগতের সমস্ত কোলাহলের নশ্বরতার কথা মনে আসে!

যেমন 'কাহিনীর' কাব্যনাট্যমালায়, সেই রকম এই 'চিত্রাঙ্গদা'তেও রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্যচিন্তার অভিনবত্ব দেখা দিয়েছে ছত্রে ছত্রে। অর্জুনের মুখে, রবীন্দ্রনাথ এই সূত্রে একটি চমৎকার উপমা দিয়েছেন—

ভাবিলাম
কত যুদ্ধ, কত হিংসা কত আড়ম্বর,
পুরুষের পৌরুষ গৌরব, বীরত্বের
নিত্য কীর্তিতৃষা, শান্ত হয়ে লুটাইয়া
পড়ে ভূমে, ওই পূর্ণ সৌন্দর্যের কাছে
পশুরাজ সিংহ যথা সিংহবাহিনীর
ভুবনবাঞ্ছিত অরুণচরণতলে।

মণিপুরের আরণ্য ভূমিতে এক শিবালয়ে দাঁড়িয়ে, অর্জুন এই স্বগতোক্তি প্রকাশ করেছেন। তাঁর নিজের নিভৃত এইসব উক্তির মধ্য দিয়েই চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধে তাঁর মনের আন্দোলন জানবার সুযোগ পাওয়া যায়। ধীরে ধীরে চিত্রাঙ্গদা সম্পর্কে এ পক্ষের মন যখন আবেগে, প্রতীক্ষায় ক্রমশ প্রস্তুত হয়ে উঠেছে, ঠিক সেইসময়ে মন্দিরের দরজায় করাঘাত শোনা গেছে। দরজা খুলে অর্জুন যাঁকে দেখেছেন, তিনিই চিত্রাঙ্গদা! নিজের হৃদয়কে শান্ত হতে বলে অর্জুন তাঁকে অভয় দিয়েছেন!

সে শিবমন্দির চিত্রাঙ্গদারই। সুতরাং অর্জুন তাঁরই অতিথি। দুজনের নিভৃত সংলাপের ধারায় অর্জুনের স্তুতি এবং চিত্রাঙ্গদার বন্দনা দুই-ই ধরা পড়েছে। অর্জুন প্রশ্ন করেছেন—

শুচিস্মিতে, কোন্ সুকঠোর ব্রত লাগি
জনহীন দেবালয়ে হেন রূপরাশি
হেলায় দিতেছ বিসর্জন, হতভাগ্য
মর্তজনে করিয়া বঞ্চিত ?

চিত্রাঙ্গদা জবাব দিয়েছেন :

গুপ্ত এক
কামনা সাধনা-তরে একমনে করি
শিবপূজা।

অবস্থাটি উৎকণ্ঠিত ! অর্জুন তখন চিত্রাঙ্গদাকে চিনেছেন, কিন্তু চিত্রাঙ্গদা তখনো অর্জুনকে চেনেননি। অর্জুন ভাবছেন, যে-নারী নিজেই জগতের কামনার ধন, সে আবার কাকে কামনা করছে !

অর্জুনের কৌতূহল বাড়তে থাকে। প্রশ্নের পরে প্রশ্ন দেখা দেয়। চিত্রাঙ্গদা যখন বলেন 'জন্ম তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতিকুলে',—যখন 'সর্বশ্রেষ্ঠ বীর' কথাটাও তাঁরই মুখ থেকে শোনা যায়, তখন সেই কৌতূহলবশেই অর্জুনকে বলতে হয়েছে—

মিথ্যা খ্যাতি বেড়ে ওঠে
মুখে মুখে কথায় কথায়, ক্ষণস্থায়ী
বাষ্প যথা উষারে ছলনা করে ঢাকে
যতক্ষণ সূর্য নাহি ওঠে। হে সরলে,
মিথ্যারে কোরে না উপাসনা, এ দুর্লভ
সৌন্দর্যসম্পদে। কহ শুনি, সর্বশ্রেষ্ঠ
কোন্ বীর ধরণীর সর্বশ্রেষ্ঠ কুলে !

আরো কয়েকটি কথার পরে, সে-প্রশ্নের জবাব দিয়ে চিত্রাঙ্গদা বলেছেন—'অর্জুন, গাণ্ডীবধনু ভুবনবিজয়ী' ! অতঃপর আত্মপরিচয় না দিয়ে অর্জুনের আর উপায়ান্তর কি ? অতঃপর অর্জুনের আত্মসমর্পণের আবেগ-বাণী :

অয়ি বরাঙ্গনে,
সেই অর্জুন, সে পাণ্ডব, সে গাণ্ডীবধনু,
চরণে শরণাগত সেই ভাগ্যবান !

বিস্মিত হলেও চিত্রাঙ্গদা তাতে বিমূঢ় বোধ করেননি। তাঁর অন্তরে দেখা দিয়েছে আর-এক জিজ্ঞাসা—

শুনেছিনু, ব্রহ্মচর্য
পালিছে অর্জুন দ্বাদশবরষব্যাপী।
সেই বীর কামিনীরে করিছে কামনা
ব্রত ভঙ্গ করি! হে সন্ন্যাসী, তুমি পার্থ!

উচ্ছ্বসিত উত্তর এসেছে অন্য পক্ষ থেকে—

তুমি ভাঙিয়াছ ব্রত মোর। চন্দ্র উঠি
যেমন নিমেষে ভাঙি দেয়, নিশীথের
যোগনিদ্রা অন্ধকার।

রবীন্দ্রনাথের প্রণয়-বিশ্বাসের নিত্যসত্যের অভিব্যক্তি অনুভব করা যায় তাঁর এই চিত্রাঙ্গদার মধ্যে। অর্জুনের রূপানুরাগকে ধিক্কৃত ক'রে চিত্রাঙ্গদা বলেছেন :

হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা—
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ
ক্ষণস্থায়ী। এতক্ষণে পারিনু জানিতে,
মিথ্যা খ্যাতি, বীরত্ব তোমার।

নশ্বর দেহের মদিরায় সত্যব্রত পৌরুষের আসক্তি যে দুঃসহ! কেন অর্জুনের এ চিত্তবিকার? চিত্রাঙ্গদা কাতর হয়ে প্রশ্ন করেছেন :

মুহূর্তেকে সত্য ভঙ্গ
করি, অর্জুনেরে করিতেছে অনর্জুন
কার তরে?

এদিকে অর্জুন অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দে বিভোর। প্রেমের অব্যবহিত সত্যদৃষ্টির বলে জীবনের অনন্ত মাধুর্য এবং অশেষ নির্বাপণ দুই-ই তাঁর উপলব্ধির গোচর হয়েছে। তাঁর নিজের কথা হোলো—

আর সকলেরে
পলে পলে তিলে তিলে তবে জানা যায়
বহু দিনে ; তোমা-পানে যেমনি চেয়েছি

অমনি সমস্ত তব পেয়েছি দেখিতে,
তবু পাই নাই শেষ।

একদিন কৈলাসগিরিশিখরে মানসসরোবরের তীরে তিনি দেখেছিলেন বিচিত্র কুসুমের সমারোহ। জলাশয়ের ফুলও চোখে পড়েছিল, স্বচ্ছ অতলতাও তিনি অনুভব করেছিলেন। সেখানে জলের হিল্লোলে পদ্মের মৃণাল কেঁপে কেঁপে অতলে নেমে গেছে। সেই এক মধ্যাহ্ন-অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে বলেন :

মনে হল, ভগবান
সূর্যদেব সহস্র অঙ্গুলি নির্দেশিয়া
দিলেন দেখায়ে, জন্মশ্রান্ত কর্মক্লান্ত
মর্তজনে—কোথা আছে সুন্দর মরণ
অনন্ত শীতল। সেই স্বচ্ছ অতলতা
দেখেছি তোমার মাঝে। চারিদিক হতে
দেবের অঙ্গুলি যেন দেখায়ে দিতেছে
মোরে, ওই তব অলোক আলোক-মাঝে
কীর্তিক্লিষ্ট জীবনের পূর্ণ নির্বাপণ।

চিত্রাঙ্গদার অন্তরে তখন তীব্র ব্যাকুলতা, কিন্তু তৎসত্ত্বেও অর্জুনকে তিনি বলেন :

আমি নহি, আমি নহি, হায় পার্থ, হায়
কোন্ দেবের ছলনা!

আরো স্পষ্ট করে জানিয়েছেন :

মিথ্যারে কোরো না
উপাসনা। শৌর্য বীর্য মহত্ত্ব তোমার
দিয়ো না মিথ্যার পদে। যাও, ফিরে যাও।

এইখানেই চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্যের দ্বিতীয় দৃশ্যের পরিসমাপ্তি।

চিত্রাঙ্গদার এই আবেদনের সূত্রেই মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা ১৩৩৬ সালের 'উজ্জীবন' কবিতার কয়েকটি ছত্র—

যাহা মরণীয় যাক মরে
জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধরে।
যাহা রূঢ়, যাহা মূঢ় তব,
যাহা স্থূল, দগ্ধ হোক ; হও নিত্য নব।
মৃত্যু হতে জাগো, পুষ্পধনু—
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু ॥

এটি 'মহুয়ার' প্রথম কবিতা। এর অনেক আগে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের অগ্রহায়ণে তিনি লিখেছিলেন :

নাই, নাই—কিছু নাই শুধু অন্বেষণ।
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে—শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিন মুখে ফিরে যাই গেহে,
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে ?

'মানসী'র এই 'হৃদয়ের ধন'-এরও আগে, অনুরূপ কথা শোনা গিয়েছিল তাঁর আরো কোনো কোনো রচনায়। কিন্তু এখানে আর উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই।

'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'চিত্রাঙ্গদা'—এই বইগুলির কথাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের প্রেমাবেগ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর প্রেমের কবিতা বিশেষভাবে তাঁরই ; তাতে সাধারণ মানুষের উত্তাপও নেই, আসক্তিও নেই। এমন কি, 'কড়ি ও কোমল'-এর মধ্যে যেটুকু দেহরাগ, তাতেও যেন যথেষ্ট শারীরিক স্পর্শ নেই। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় দেহ-মনের আকুতি থাকলেও তাতে আধ্যাত্মিকতার মাত্রাই বেশি। 'চিত্রাঙ্গদা'-তে তাঁর প্রণয়-ভাবনার সেই বিশেষ লক্ষণের পরাকাষ্ঠা ঘটেছিল। কথাটি ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একবার খুবই স্পষ্টভাবে জানান। তাঁর সে-কথা এর আগের প্রবন্ধে স্মরণ করা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন যে, 'চিত্রাঙ্গদার' মতন গভীর ইন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বিতীয় কোনো কাব্য রবীন্দ্রনাথ এর আগেও লেখেননি, পরেও লেখেননি। 'চিত্রাঙ্গদা'-র চিত্র ও রূপকের প্রাচুর্য সেদিক থেকে লক্ষ্য করবার বিষয়। ধূর্জটিপ্রসাদ ঠিকই বলেছেন, এগুলির অনুবাদ সত্যিই দুঃসাধ্য।

যাই হোক, দ্বিতীয় অংশের শেষে অর্জুনকে ফিরিয়ে দিয়ে তৃতীয় দৃশ্যে চিত্রাঙ্গদা যখন বীরহৃদয়ের 'থরথর ব্যাকুলতা'র কথা ভাবছিলেন, সেই সময় বসন্ত আর মদনের প্রবেশ ঘটে। মদনের উদ্দেশ্যে তাঁর অনুযোগের কথাগুলি স্মরণীয় :

হে অনঙ্গদেব, এ কী রূপহুতাশনে
ঘিরেছ আমারে—দগ্ধ হই, দগ্ধ করে
মারি।

অনঙ্গদেব তাঁর 'মুক্ত পুষ্পশর'-এর কীর্তিকথা আরো বিস্তৃতভাবে শুনতে চেয়েছেন; আর, সেই সূত্রে তাঁর পূর্বসন্ধ্যার হৃদয়-ভাবনার কথা ব্যক্ত হয়েছে। তারই আগের দিন অর্জুন এসে স্তুতি নিবেদন করেন। সেদিনের কথা ভেবে চিত্রাঙ্গদার মনে হয়েছিল :

যেন আমি রাজকন্যা নহি; যেন মোর
নাই পূর্বপর। যেন আমি ধরাতলে
একদিনে উঠেছি ফুটিয়া, অরণ্যের
পিতৃমাতৃহীন ফুল; শুধু এক বেলা
পরমায়ু—

সেই ক্ষণজীবনের মধ্যেই যেন তাঁর সমস্ত বাসনার স্ফুরণ ও পরিসমাপ্তি,—তাঁর সমস্ত তৃষ্ণার দাহ এবং নিবৃত্তি!

তারি মাঝে শুনে নিতে হবে
ভ্রমরগুঞ্জনগীতি, বনবনান্তের
আনন্দমর্মর, পরে নীলাম্বর হতে
ধীরে নামাইয়া আঁখি, নুয়াইয়া গ্রীবা
টুটিয়া লুটিয়া যাব বায়ুস্পর্শভরে
ক্রন্দনবিহীন, মাঝখানে ফুরাইবে
কুসুমকাহিনীখানি আদি-অন্ত-হারা।

চিত্রাঙ্গদার মনে এই ক্ষণ-সৌভাগ্যের বেদনাই প্রধান! বসন্ত এবং মদন তাঁকে কিন্তু বোঝাতে চেয়েছেন যে, ক্ষণের ক্ষণিকতা অসীমের ব্যঞ্জনাতেই সমৃদ্ধ! চিত্রাঙ্গদার উক্তি এখানে সুদীর্ঘ, উচ্ছ্বাসময়, আবেগস্পন্দিত। সন্ধ্যার বাতাসে সপ্তপর্ণশাখার মালতীলতা যখন দুলে দুলে উঠেছিল,—আর তাঁর

সর্বাঙ্গে ঝরে পড়ছিল অজস্র ফুলের চুম্বন, তখন ঘুমের আমেজ থেকে হঠাৎ জেগে উঠে, শুক্লা-দ্বাদশীর জ্যোৎস্নালোকে তিনি দেখেছিলেন—

দাঁড়াইয়া দীর্ঘকায় বনস্পতি-সম
দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী ছায়াসহচর···

সে যেন অকস্মাৎ মর্ত্য সংস্কারের সমস্ত সীমার পরপারে উত্তরণ! বীরের কণ্ঠে প্রিয়-সম্ভাষণের সেই ব্যাকুলতা উপলব্ধি করে তিনি বলেন—

লহ, লহ, যাহা কিছু আছে
সব লহ জীবনবল্লভ।

এবং সেদিন,—জীবনের সেই পরমাশ্চর্য লগ্নে—

চন্দ্র অস্ত গেল বনে,
অন্ধকারে ঝাঁপিল মেদিনী। স্বর্গমর্ত
দেশকাল দুঃখসুখ জীবন মরণ
অচেতন হয়ে গেল অসহ্য পুলকে।

সেদিনের সমস্ত জগৎ যেন এক অশেষ মগ্নতায় ঢেকে গিয়েছিল! তারপর, সকালের প্রথম পাখির ডাকে, সেই সুখনিদ্রার অবসান-ক্ষণেও মনে জেগেছিল স্নিগ্ধ বোধ আর সুখকর স্বপ্ন!

সুখসুপ্ত বীরবর ;
শ্রান্ত হাস্য লেগে আছে ওষ্ঠপ্রান্তে তাঁর
প্রভাতের চন্দ্রকলা-সম, রজনীর
আনন্দের শীর্ণ অবশেষ ; নিপতিত
উন্নত ললাটপটে অরুণের আভা,
মর্তলোকে যেন নব উদয় পর্বতে
নবকীর্তি সূর্যোদয় পাইবে প্রকাশ।

কিন্তু এই সুখানুভূতির পরমুহূর্তেই নায়িকার চোখে পড়ে 'সেই পূর্বপরিচিত প্রাচীন পৃথিবী'। তখন—

আপনারে আরবার মনে পড়ে গেল ;
ছুটিয়া পলায়ে এনু নবপ্রভাতের
শেফালিবিকীর্ণতৃণ বনস্থলী দিয়ে
আপনার ছায়াত্রস্তা হরিণীর মতো।

বিজন বিতানতলে বসি, করপুটে
মুখ আবরিয়া, কাঁদিবারে চাহিলাম,
এল না ক্রন্দন।

একথা শুনে মদন বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন—

শচীর প্রসাদসুধা, রতির চুম্বিত,
নন্দনবনের গন্ধে মোদিত মধুর
তোমারে করানু পান, তবু এ ক্রন্দন!

'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যের তৃতীয় অংশের শেষদিকে এইভাবে মানুষের চিরকালের গভীর প্রশ্নটি দেখা দিয়েছে। মদনের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি আবার প্রশ্ন করেছেন:

কারে, দেব করাইলে পান! কার তৃষ্ণা
মিটাইলে! সে চুম্বন, সে প্রেমসংগম
এখনো উঠিছে কাঁপি যে অঙ্গ ব্যাপিয়া
বীণার ঝংকার-সম সে তো মোর নহে!
বহুকাল সাধনায় একদণ্ড শুধু
পাওয়া যায় প্রথম মিলন ; সে মিলন
কে লইল লুটি, আমারে বঞ্চিত করি!

এই ভোগাকাংক্ষাময় 'আমি',—ভোগী 'আমি',—এবং ভোগসত্বেও বঞ্চিত 'আমি'-র বোধ—এই তিনের অবিচ্ছেদ্যতা মানুষেরই জীবন-সত্য! এ-তত্ত্ব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করবার ব্যাপার নয় ; যাঁর অনুভূতি আছে তিনিই এ-সত্য অনুভব করবেন! 'চিত্রাঙ্গদা'-র মধ্যে আমাদের অহংবোধের সেই নৈরাশ্যের কথাটি ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এক জায়গায় সুন্দরভাবে বলে গেছেন।[১]

১। "The element of lust is the element of particularity, the element of matter, which cannot be swallowed up or dissolved by the spiritual element of love, By his own experiences he discovered that the lustful element was unspiritual and must be given up, if one has to he loyal to the infinitude of craving that is essential to true love."

—'Rabindranath Tagore' by Dr. Surendranath Dasgupta. [১৯৪৮] পৃ. ৬৯।

শারীরতত্ত্ব থেকে দৃষ্টান্ত ব্যবহার করে তিনি বলেছিলেন—সকলেই জানেন যে আমাদের বেশির ভাগ খাদ্যই যতক্ষণ না শর্করায় পরিণত হয়, ততক্ষণ আত্তীকরণের (assimilation) সুবিধা হয় না ; তেমনি আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যাকে জায়গা দিতে হবে, তাকে তার স্থূল বস্তুবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ রাখলে চলবেনা। ১৯২৬ সালের ২৪এ সেপ্টেম্বর কল্যোন-এ বসে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার মধ্যে অনুরূপ কথাই বলা হয়েছিল :

চাহিয়া দেখ রসের স্রোতে স্রোতে রঙের খেলাখানি।
চেয়োনা তারে মায়ার ছায়া হতে নিকটে নিতে টানি।
রাখিতে চাহ, বাঁধিতে চাহ যারে
আঁধারে তাহা মিলায় বারে বারে
বাজিল যাহা প্রাণের বীণাতারে
সে তো কেবলি গান, কেবলি বাণী।

তাঁর এই নিত্যবিশ্বাসের কথা তিনি 'চিত্রাঙ্গদা'তেও বলে গেছেন! এ-কাব্যে আরো কথা আছে। মদন এবং বসন্তের বরে চিত্রাঙ্গদা কেলবমাত্র এক বছরের জন্যে পরম রূপৈশ্বর্য লাভ করেছিলেন ; এই ক্ষণস্থায়ী সৌভাগ্যের চিন্তাসূত্রে তাঁর খেদোক্তি খুবই স্বাভাবিক। তাঁকে বলতে শোনা গেছে—

সে চিরদুর্লভ মিলনের সুখস্মৃতি
সঙ্গে করে ঝরে পড়ে যাবে, অতিস্ফুট
পুষ্পদল-সম, এ মায়ালাবণ্য মোর ;
অন্তরের দরিদ্র রমণী, রিক্তদেহে
বসে রবে চির দিনরাত।

কিন্তু এই 'মায়ালাবণ্য',—এই ক্ষণদেহরূপ শুধু চিত্রাঙ্গদারই বিশেষ দুর্ভাগ্য নয় ; সংসারের সমস্ত দেহগত পিপাসার প্রধান ব্যর্থতার কারণ এই মায়াতে, মোহেতে, এই স্থূলত্বে, অহমিকায় নিহিত! 'চিত্রাঙ্গদা'র 'সূচনা'তে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন, সেই কথাগুলি এই সূত্রে আবার মনে পড়ে—'সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে, তাহলে সে তার স্বরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিষ, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহবিস্তারের দ্বারা

জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে।' প্রেমের ব্যাকুল আলিঙ্গনে বহুবাঞ্ছিত 'আত্মবিস্মরণসুখ' হয়তো ক্ষণকালের জন্যে ধরা দেয়, কিন্তু, অনতিকাল পরেই দেখা দেয় নৈরাশ্য, ধিক্কার। তখন মনে পড়ে নিজের রূপ-যৌবনের নশ্বরতা! তাই চিত্রাঙ্গদা বলেছেন:

এই ছদ্মরূপিনীর চেয়ে
শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে। সেই আপনারে
করিব প্রকাশ;

বসন্ত তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন—

ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ
তখন প্রকাশ পায় ফল।

ক্ষণিকের মোহ, এবং চিরকালের সত্য,—এই দুই ভাবনার সংঘর্ষ তীব্র হয়েছে এ-রচনার তৃতীয় বিভাগ থেকে; এবং চতুর্থ অংশে তারই জের চলেছে। সে-দৃশ্যে অর্জুন আর চিত্রাঙ্গদার সংলাপের শুরুতেই অর্জুন বলেছেন যে, তাঁর প্রবাসের এই আনন্দময় অভিজ্ঞতার স্মৃতি নিয়ে তিনি ঘরে ফিরবেন। উত্তরে চিত্রাঙ্গদা বলেন:

বোলোনা গৃহের কথা।
গৃহ চিরবরষের। নিত্য যাহা তাই
গৃহে নিয়ে যেয়ো। অরণ্যের ফুল যবে
শুকাইবে, গৃহে কোথা ফেলে দিবে তারে
অনাদরে পাষাণের মাঝে।

এবং—

কামনার প্রাতঃকালে
যতটুকু চেয়েছিলে, তৃপ্তির সন্ধ্যায়
তার বেশি আশা করিয়ো না।

দিনশেষে চিত্রাঙ্গদা বলেছেন—

......বাহু বন্ধে।
এসো, বন্দী করি দোঁহে দোঁহা প্রণয়ের
সুধাময় চিরপরাজয়ে।

অর্জুনের কানে তখন বনান্তের দূর লোকালয়ের ধ্বনি। সেখানে—'আরতির শান্তিশঙ্খ উঠিল বাজিয়া।' 'চিত্রাঙ্গদা'র চতুর্থ দৃশ্যের পরিসমাপ্তি এইখানেই।

অতঃপর অতিশয় হ্রস্বায়তন পঞ্চম দৃশ্যটিতে মদন এবং বসন্তের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে শোনা যায়—'হর্ষ-অচেতন বর্ষ শেষ হয়ে এল।' ষষ্ঠ দৃশ্যটিও পরিমাণে খুবই ছোটো। বর্ষাগমে অরণ্যবাসী অর্জুন মৃগয়াভিলাষী হলেন। তখন চিত্রাঙ্গদা তাঁকে বললেন—

হে শিকারী,
যে মৃগয়া আরম্ভ করেছ, আগে তাই
হোক শেষ। তবে কি জেনেছ স্থির
এই স্বর্ণমায়ামৃগ তোমারে দিয়েছে
ধরা। নহে, তাহা নহে। এ বন্য হরিণী
আপনি রাখিতে নারে আপনারে ধরি।

সপ্তম দৃশ্যে মদন-চিত্রাঙ্গদার সংলাপ। আগেকার রূপকটি মনে রেখে চিত্রাঙ্গদা মদনকে বলেন—

ধনুর্ধর ঘনশ্যাম
ব্যাধেরে আমার, করিয়াছি পরিশ্রান্ত
আশাহত প্রায়; ফিরাতেছি পথে পথে
বনে বনে তারে।

সেই উক্তির উত্তরে অনঙ্গদেবের নির্দেশ—

থাক্ ভাঙিয়ো না খেলা।
এ খেলা আমার। ছুটুক ফুটুক প্রাণ
টুটুক হৃদয়।

এবং এই সংক্ষিপ্ত আয়োজনের মধ্যেই এ-দৃশ্যের শেষ চরণে মদনের আর-একটি স্মরণীয় মন্তব্য শোনা যায়—'শিকারে দয়ার বিধি নাই।'

পরের দৃশ্যটি অপেক্ষাকৃত বড়ো হলেও তারও বিস্তার অল্পই। অর্জুন চিত্রাঙ্গদা,—এই দুটিমাত্র চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে আর-একবার। চিত্রাঙ্গদার গৃহ, প্রিয়-পরিজন, অতীত ইত্যাদি বিস্তৃত ভূমিকা জানবার কৌতূহল জেগেছে

অর্জুনের মনে। রবীন্দ্রনাথের এ কাব্যে উপমা এবং রূপকের অজস্রতার কথা আগেই বলা হয়েছে। সেই উপমা-স্বভাবের ঝোঁকে কবির কবিতায় এই অংশের পংক্তিগুলি অভাবিতপূর্ব সাদৃশ্য-উপলব্ধির বিস্ময়ে চিরচিহ্নিত! নায়িকা বলেছেন :

তুমি যারে ভালোবাসিয়াছ, সে এমনি
শিশিরের কণা, নামধামহীন।

কিন্তু নাম, রূপ, কুল-পরিচয়—সব মিলিয়ে নায়িকার স্বরূপ জানা চাই! নাম না হলে অর্জুনের-ই বা তৃপ্তি হবে কী উপায়ে? তিনি বলেন—

নাম নাই?
তবে কোন্ প্রেমমন্ত্রে জপিব তোমারে
হৃদয়মন্দির-মাঝে? গোত্র নাই? তবে
কী মৃণালে এ কমল ধরিয়া রাখিব।

তখন নায়িকা বলেন :

সে কেবল
মেঘের স্বর্ণছটা, গন্ধ কুসুমের,
তরঙ্গের গতি।

নায়ক অবিলম্বে জবাব দেন :

তাহারে যে ভালোবাসে
অভাগা সে। প্রিয়ে, দিওনা প্রেমের হাতে
আকাশ-কুসুম।

অতঃপর পরের দৃশ্যে বনচরদের মুখে অর্জুন শুনেছেন যে, উত্তরের পাহাড় থেকে দস্যুদল এগিয়ে আসছে। বনবাসী প্রজারা সেই আশঙ্কায়, নিরন্তর তাদের রানীর কথা ভাবছে। রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা নাকি তীর্থভ্রমণে গেছেন। ইতিমধ্যে চিত্রাঙ্গদার আরো পরিচয় শোনা যায়—

এক দেহে
তিনি পিতামাতা অনুরক্ত প্রজাদের
স্নেহে তিনি রাজমাতা, বীর্যে যুবরাজ।

এইটুকু বলেই বনচর নিষ্ক্রান্ত হয়। চিত্রাঙ্গদা প্রবেশ করেন। অর্জুন

তখন শ্রুতকীর্তি সেই চিত্রাঙ্গদার কথাই ভাবছিলেন। মায়ালাবণ্যময়ী চিত্রাঙ্গদা তাঁকে বলেন—

কুৎসিত, কুরূপ। এমন বঙ্কিম ভুরু
নাই তার, এমন নিবিড় কৃষ্ণতারা।'

তবু, অর্জুনের মনে ব্যাকুলতা! ঈষৎ কটাক্ষ ক'রে ছদ্মবেশী চিত্রাঙ্গদা বলেছেন—'নারীতে খুঁজিতে চাও পৌরুষের স্বাদ'! তৎসত্ত্বেও অর্জুন কৃতসংকল্প। ক্ষত্রিয়ের বাহু আর আলস্যে লীন থাকবে না। তাঁর মনে জিজ্ঞাসা দেখা দেয়—

ভাবিতেছি, বীরাঙ্গনা কিসের লাগিয়া
ধরেছে দুষ্কর ব্রত। কী অভাব তার।

পরিশেষে, আসল চিত্রাঙ্গদার 'রুধ্যমান রমণী-হৃদয়ে'র বেদনা ব্যক্ত হয়েছে। অর্জুন সেই বীরাঙ্গনাকে কল্পনায় দেখেছেন।

দেখিতে পেতেছি তারে—
বাম করে অশ্বরশ্মি ধরি, অবহেলে,
দক্ষিণেতে ধনুঃশর, হৃষ্ট নগরের
বিজয়লক্ষ্মীর মতো আর্ত প্রজাগণে
করিছেন বরাভয়দান।

চিত্রাঙ্গদার সেই—'বীর্যসিংহ-পরে চড়ি জগদ্ধাত্রী দয়া'-মূর্তির কথা ভেবে, অর্জুন নারীর লালিত্যের প্রতীক কঙ্কণকিঙ্কিণিধ্বনি-কে ধিকার দিয়েছেন! তাঁর প্রাণ জেগে উঠেছে—

এ পরাণ মোর উঠিছে অশান্ত হয়ে
দীর্ঘশীতসুপ্তোত্থিত ভুজঙ্গের মতো।

'চিত্রাঙ্গদা'-কাব্যের এই উপান্ত দৃশ্যের সংশয়, উত্তেজনা, আনন্দ, উদ্দীপনার বহু প্রতিধ্বনি ফিরে এসেছিল কবির পরবর্তী রচনাধারায়,—তাঁর 'মহুয়া'-র 'সবলা' প্রভৃতি কবিতার ছত্রে ছত্রে। চিত্রাঙ্গদার 'ভূষণবিহীন' সত্যস্বরূপটি প্রেমের 'সাধক' অর্জুনের উপলব্ধিতে ধরা প'ড়েছিল। অর্জুন বলতে পেরেছিলেন—'শ্রান্তিহীন সে মিলন চিরদিবসের।'

এইখানেই কাহিনী শেষ হলে ক্ষতি ছিলনা। এই নবম দৃশ্যের পরে তবু আরো দুটি দৃশ্য দেওয়া হয়েছে। দশম অংশে মদন, বসন্ত এবং চিত্রাঙ্গদার

সমাবেশ ঘটেছে। বর্ষকালের বর শেষ হবার আগে,—শেষ লগ্নে দেবতারা আর-একবার অন্তিম দীপ্তিতে তাঁর রূপোচ্ছ্বাস পূর্ণদীপ্যমান করবেন,—এ দৃশ্যে তারই প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। তারপর, শেষ দৃশ্যে সূর্যোদয়ের লগ্নে গুণ্ঠনমুক্তা রাজেন্দ্রনন্দিনী চিত্রাঙ্গদার আত্মপ্রকাশ! তিনি নারী, কিন্তু নর্মসহচরী নন; অর্জুনের কঠিন ব্রতের সহায় তিনি। অর্জুনের সন্তানের তিনি জননী!

'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্যে রবীন্দ্রনাথ নায়িকাকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। পৌরাণিক হর-পার্বতীর প্রণয়সাধনার কাহিনীতে শিব ছিলেন তপস্বী; রূপের স্থূল আকর্ষণের ঊর্ধ্বলোকে তাঁর বিচরণ; মদনের কৌশলে তিনি ক্রুদ্ধ! শিবের স্বরূপ উপলব্ধি করে পার্বতী তাই নিজের দেহলাবণ্যের প্রতি বিমুখ হন। 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্যে নায়িকা রূপমায়ার ক্ষণস্থায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ। তবু অর্জুনের প্রতি তাঁর অনুরাগের তীব্রতায় তিনি হয়েছেন রূপসাধিকা! 'কড়ি ও কোমল'-এ একদা নর-নারীর প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে সত্যবোধ উচ্চারিত হয়েছিল,—'এ মোহ ক'দিন থাকে, এ মায়া মিলায়,'—'চিত্রাঙ্গদা', 'বিদায় অভিশাপ' প্রভৃতি নাট্যকাব্যে সেই একই কথা পুনরায় বলা হয়েছে। তাছাড়া, এ-রচনার বাক্‌রীতি ও অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে বহুপরিমাণে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব দেখা যায়।[১]

১। অন্যান্য আলোচকদের তুলনায় ডক্টর শ্রীক্ষুদিরাম দাশ সে-বিষয়ে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের নাটক-নাটিকা

'চিত্রাঙ্গদা' ভাব-সংঘাতের কাব্য। রবীন্দ্রনাথের নাটক-নাটিকার একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এসব ক্ষেত্রে তিনি-বাইরের দর্শনযোগ্য ঐশ্বর্যের চেয়ে অন্তর্লোকের সংঘাত-সংঘর্ষ, আবেগ-অনুভূতির দিকেই বেশি মনোযোগী। চিত্রাঙ্গদাতেও তাই হয়েছে, অন্যত্রও তাই দেখা যায়।

বদ্ধ ঘরে নির্জন-বাসের প্রহর গেছে প্রথমে,—তারপর শুরু হয়েছে মানুষের স্পর্শ! রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা দিয়ে তাঁর আপন জীবনের প্রথম দুটি পর্বের কথা খুবই সংক্ষেপে বলতে হ'লে, তা এইভাবেই বলা যেতে পারে। প্রথম অবস্থাটিকে তিনি বলেছিলেন—'গুহাচরের' অবস্থা, দ্বিতীয় অবস্থাকে—'লোকালয়ের বাস'! নিজেরই মনের বিচিত্র ভাব-ভাবনা অবলম্বন করে তাঁর প্রথম যে আত্মময় আদান-প্রদানের ঋতু উদ্‌যাপিত হয়েছে,—তাকে তিনি 'আবেগের বাষ্পপুঞ্জ' বলে চিহ্নিত করেছেন। আবার, 'ছবি ও গান' লেখবার সময়ে তাঁর মনে নতুন যে প্রবৃত্তির কাজ শুরু হয়েছিল, তাকেই তিনি বলে গেছেন 'বহির্মুখী প্রবৃত্তি'। 'ছবি ও গান' লেখবার সময়ে তাঁর বয়ঃসন্ধি চলছিল। তবে, প্রথম কৈশোরের 'অনুদ্দিষ্ট বেদনা-বোধ' তখন অতিক্রান্ত। সেই 'ছবি ও গান' রচনার সমকালীন মনোভাবের কথা বলতে গিয়ে তিনি লেখেন—'ছবি এঁকে তখন প্রত্যক্ষতার স্বাদ পাবার ইচ্ছা জেগেছে মনে কিন্তু ছবি আঁকবার হাত তৈরি হয়নি তো'। এ মন্তব্য 'রচনাবলী' সংস্করণে ছাপা হয়েছে। 'ছবি ও গান' সম্বন্ধে এই ছিল তাঁর আপন কথা।

তারপর, তিনি একথাও বলেছেন যে, সন্ধ্যা-সংগীত প্রভাত-সংগীতের অবরুদ্ধ আলোকের প্রহর কাটিয়ে, বহির্মুখী প্রবৃত্তির তাড়নায় তিনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন অন্য এক পথে। সেই পথটির প্রকৃতিই ছিল নাট্যধর্মী বা নাট্যীয়।[১]

১। তাঁর নিজের কথায়—'বেদনার ভিতর দিয়ে ভাব প্রকাশের প্রয়াসে সে শ্রান্ত, কল্পনার পথ সৃষ্টি করবার দিকে পড়েছে তার ঝোঁক। এই পথে তার দ্বার প্রথম খুলেছিল বাল্মীকি-প্রতিভায়। যদিও তার উপকরণ গান নিয়ে কিন্তু তার প্রকৃতিই নাট্যীয়। তাকে গীতিকাব্য বলা চলে না।'

'নাট্যীয়' কথাটির অভিপ্রেত অর্থ সম্বন্ধে 'রচনাবলী' সংস্করণে তাঁর সেই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর ভূমিকায় তিনি নিজেই লিখেছিলেন—'অর্থাৎ সে আত্মগত নয়, সে কল্পনায় রূপায়িত।' 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর দ্বিতীয় দৃশ্যে 'হেদে গো নন্দরাণী, আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও' গানটির সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য দেখা গেছে—সে গান 'একটি ছবি, যার রস নাট্যরস'। এবং 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' সম্বন্ধে তাঁকে পুনরপি বলতে শোনা গেছে—'এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে এবং নাট্যে মিলিত।'

রবীন্দ্রনাথের নাটক-নাটিকার কথা আলোচনা করতে গেলে তাই প্রথমেই তাঁর এই কাব্য, গদ্য, এবং তাঁর গান—এই ত্রি-পথ-সমাবেশের কথা মনে পড়ে; এবং সেই কারণেই তাঁর রচনা-ধারার একটি কালানুক্রমিক তালিকা দরকার হয়। তাঁর নাটক-নাটিকার সংখ্যা কম নয়। তাদের শ্রেণীও এক নয়। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' বা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ',—'গোড়ায় গলদ' আর 'চিরকুমারসভা'—আবার, 'শারদোৎসব', 'ডাকঘর', 'ফাল্গুনী', 'রাজা', 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা', 'অচলায়তন',—আবার, তাঁর 'বৈকুণ্ঠের খাতা', কিংবা 'মুকুট'—এইসব প্রসিদ্ধ লেখার শ্রণী-বৈচিত্র্যের কথা মনে রেখে, সাধারণভাবে তাঁর নাটকের প্রকৃতির কথা ভাবতে গেলে, তাঁর অন্যতম প্রিয় প্রসঙ্গ মুক্তিতত্ত্বের কথা মনে আসে। গানে, কবিতায়, গদ্য-রচনায়, নাট্য-সাহিত্যে—সর্বত্রই তিনি মানব-জীবনের অনিবার্য মুক্তি-সাধনার কথা বলেছেন। নাটক রচনার কাজে জীবনের প্রাত্যহিক, সাধারণ দৃশ্যক্ষেত্র তিনি যে উপেক্ষা করেছেন, তা নয়। তবে, নাটকের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব পথ কী, সে-প্রশ্নের জবাব দিতে হলে একথা বলতেই হয় যে,—তিনি রূপকভাষী,—সংকেত-ব্যবহারে দক্ষ,—গানে সিদ্ধহস্ত,—এবং অন্তর্মুখিতার সাধক!

সে সব লক্ষণ কেবল যে তাঁর নাটকেই দেখা গেছে, তা নয়। অন্যান্য সাহিত্য-শাখার মধ্যেও তাঁর এইসব স্বাভাবিক প্রবণতার প্রকাশ ঘটেছে। তিনি গানেও ইশারা করেছেন,—আবার নাটকেও তাই। 'বনফুল' থেকে 'চিত্রা' অবধি তাঁর কাব্য-রচনাবলীর মধ্যেই কি কম ইশারা আছে? সৌন্দর্য, মুক্তি, কল্যাণ ইত্যাদি, ভাবনাই তাঁর নিজস্ব প্রধান প্রধান ভাবনা। তাঁর 'শারদোৎসব', 'তপতী', 'অচলায়তন', 'রক্তকরবী', 'রাজা' প্রভৃতি নাট্য-রচনায় এইসব ভাবনাই তো ব্যক্ত হয়েছে।

তাঁর আমলের আগে, বাংলা সাহিত্যে এসব ভাবনাকে ঠিক নাটকের ভাবনা বলে ভাবা হোতোনা। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে 'নীলদর্পণ' বা 'একেই কি বলে সভ্যতা',—অথবা 'প্রফুল্ল' বা 'বিবাহ-বিভ্রাট' বা 'চন্দ্রগুপ্ত' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ নাটকের প্রকৃতি আলাদা। রামনারায়ণের পরে,—মধুসূদন আর গিরিশচন্দ্রের হাতেই সত্যিকার আধুনিক বাংলা নাটকের জন্ম হয়। সেটা উনিশ শতকের শেষার্ধের ঘটনা। গিরিশচন্দ্রের মধ্যে শেক্‌স্‌পীয়র আর রামকৃষ্ণ, এই দু'জনেরই প্রভাব বর্তেছিল। বাংলার প্রাচীন যাত্রা,—আর সংস্কৃতের নাটক-নাটিকার ধারা,—এই দুইয়ের সঙ্গে ইউরোপের নাট্যাদর্শ অনুসরণের চেষ্টা, এবং তারই ফলে, নবযুগের নতুন বাংলা নাটকের উদ্ভব বা সূচনার সংকেত— এই ছিল সে-আমলের নাট্য-সাহিত্যের ঐতিহাসিক লক্ষণ!

মধুসূদন তাঁর 'পদ্মাবতী' নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করে-ছিলেন,—অথবা রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে পরিহাসের তীব্রতা ছিল,—এ-ধরনের তথ্য বা মন্তব্য সম্বন্ধে কোনো-রকম আপত্তি ওঠবার হেতু নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটক সত্যিই নাটক, না-কি কবিতা ?— তাতে ঘটনা এবং সংঘাতই প্রধান ব্যাপার, না-কি তা কেবল গানের রেশের মতন ?— এ-ধরনের কথা উঠলে সংক্ষেপে কী-ই বা বলা যায় ?

নাটক-নাটিকার প্রকৃতি-সম্বন্ধে অভ্যস্ত ধারণা বলতে যা বোঝায়, তাঁর নাটক-নাটিকার একটি বড় অংশে সে-ধারণার ব্যতিক্রমই সুপরিচিত। তাঁর 'রাজা' [প্রথম প্রকাশ ১৩১৭] নাটকের প্রথই দৃশ্যটিই অন্ধকার। সেই অন্ধকার ঘরে রানী সুদর্শনা আর তাঁর দাসী সুরঙ্গমাকে দেখা যায়। প্রথমে রানী-ই কথা আরম্ভ করেন—'আলো, আলো কই ? এ-ঘরে কি একদিনও আলো জ্বলবে না।' তার জবাবে দাসী সুরঙ্গমা বলে—'রানীমা, তোমার ঘরে ঘরেই তো আলো জ্বলছে—তার থেকে সরে আসবার জন্যে কি একটা ঘরেও অন্ধকার রাখবে না?' এ নাটকের শেষ দৃশ্যে রাজার সঙ্গে রানী-সুদর্শনার মিলন হয়েছে। প্রথম দৃশ্য বা সূচনার সংখ্যা—এক; শেষ দৃশ্য বা সমাপ্তির সংখ্যা, কুড়ি। সুদর্শনার কামনা ছিল যে, রাজা আপনি এসে আদর করে তাঁকে গ্রহণ করবেন। কিন্তু রাজা আসেন নি। দশম দৃশ্যে নিজের অনাদর উপলব্ধি করে সুদর্শনা তাই বড়োই ব্যথিত হয়েছেন। তার আগে, রাজবেশী এক প্রতারকের গলায় মালা দিয়েছেন তিনি। তারপর অষ্টম দৃশ্যে যখন আগুন

লেগেছে রানীর প্রাসাদে,—রানী নিজের ভুল বুঝতে পেরে যখন লজ্জায় ভেঙে পড়েন, সেই সময়ে আবার সেই 'অন্ধকার কক্ষে' রাজা এসে দেখা দিয়েছেন। সুদর্শনা সেদিন রাজাকে দেখেছেন বটে, কিন্তু—দেখে কেবল এই কথাই বলতে পেরেছেন যে—'ভয়ানক, সে···কালো, কালো, তুমি কালো !'

এই অন্তরালবর্তী, অদৃশ্য 'রাজা' এক রূপক ; রানী সুদর্শনা আর-এক রূপক ; দাসী সুরঙ্গমা এখনকার তৃতীয় এক রূপক। সুরঙ্গমাও রাজাকে কামনা করে। কিন্তু রাজা অনাগত ! তবু সুরঙ্গমার নৈরাশ্য নেই। তাঁকে বলতে শোনা যায়—'সে যেন এইরকম পর্বতের মতোই চিরদিন কঠিন হয়ে থাকে—আমার কান্নায় আমার ভাবনায় সে যেন টলমল না করে। আমার দুঃখ আমারই থাক্, সেই কঠিনেরই জয় হোক্।' দশম দৃশ্যের এই উক্তির পরে, শেষের একটি গানে সুরঙ্গমা বলেছেন—'আমি কেবল তোমার দাসী···বিনা-মূল্যের কেনা আমি শ্রীচরণ-প্রয়াসী।' রাজা যে আমাদেরই গভীরে আমাদের নিত্য-জাগর প্রেম, সৌন্দর্য, কল্যাণের মূর্তি,—তিনি শুধু প্রেয় নন, রম্য নন,—তিনি যে শ্রেয়,—কঠিন তিনি, প্রেমিক তিনি,—তিনি যে সুন্দর—এবং 'সুন্দর' হলেই শোভন হতে হবে, সত্যিই এ-রকম কোনো বাধ্যবাধকতা যে নেই,—এখানে সেই কথাই ব্যক্ত হয়েছে ! রাজা 'সুন্দর' নন—রাজা 'অনুপম' ! কুড়ির অন্তিম দৃশ্যে সুদর্শনাকে রাজা বলেছেন : 'তোমারই মধ্যে আমার উপমা আছে।' সে-কথার জবাবে সুদর্শনা বলেছেন : 'আমার মধ্যে তোমার প্রেম আছে, সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে, সেইখানেই তুমি আপনার রূপ আপনি দেখতে পাও—সে আমার কিছুই নয়, সে তোমার।' 'রাজা'র ধ্যানের মধ্যেই আনন্দের ধ্যান মিশেছে। তিনি অ-রম্য হলেও তিনি যে আনন্দস্বরূপ, সে-কথা মানতে বাধা কিসের ? সেই বিশ্বাসে পৌঁছলেই হৃদয়ে এই গান উঠতে পারে—

হোলো তব যাত্রা সারা,
মোছো মোছো অশ্রুধারা
লজ্জা ভয় গেল ঝরি ঘুচিল রে অভিমান।

প্রেম, সৌন্দর্য, কল্যাণ, আনন্দ ইত্যাদি ধারণার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে, অনেক রকম উপমার সাহায্যে, রবীন্দ্রনাথ এই 'রাজা' নাটকে যে-সব কথা বলেছেন, সৌন্দর্য সম্পর্কে লেখা তাঁর একটি প্রবন্ধের মধ্যেও অনুরূপ কোনো কোনো কথা শোনা গেছে। যেমন, তাঁর 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধটি।

'রাজা' নাটকে বাইরের রূপতৃষ্ণার তাড়নাতেই সুদর্শনার সামঞ্জস্য-চেতনা বিচলিত হয়েছে। তার আত্মাভিমান এতো বড়ো হয়ে উঠেছে যে, তাতে প্রেমের নিবেদনের সত্য সে যেন হারিয়ে ফেলেছে। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ সেই কথাই বলেছেন। এ রূপক বটে,—কিন্তু 'রূপক' মানে 'অলীক' নয় মোটেই।

'রূপক' মানে 'অলীক' বা 'অস্তিত্বহীন' কোনো ব্যাপারের ইশারা নয়। না, কোনোরকম ঝাপসা-ভাব বা দুর্বোধ্য অস্পষ্টতাও নয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে এ-সব চিন্তা অতিশয় সত্য—অর্থাৎ বাস্তব বলেই বোধ হোতো। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের পনেরোই নভেম্বরের এক চিঠিতে দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজকে তিনি সে-কথা জানিয়েছিলেন। 'রক্তকরবী' [প্রথম প্রকাশ ১৩৩১]-এর ভূমিকায় তিনি লেখেন—'এই নাটকটি সত্যমূলক। এর ঘটনাটি কোথাও ঘটেছে কি না ঐতিহাসিকের পরে তার প্রমাণ সংগ্রহের ভার দিলে পাঠকদের বঞ্চিত হতে হবে। এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে কবির জ্ঞানবিশ্বাসমতে এটি সম্পূর্ণ সত্য।'

তাঁর এই ভূমিকার ভঙ্গি কিছুটা কৌতুক-মিশ্রিত বটে, —তবে এ-কথা তিনি খুবই সোজাসুজি ভাবে বলেছেন যে,—'এ নাটকটি একেবারেই পৌরাণিক কালের নয়, একে রূপকও বলা যায় না।' যক্ষপুরীর রাজার ডাকনাম 'মকররাজ।' রাজমহলের বাইরের দেয়ালে এক জালের জানলা। সেই জালের আড়াল থেকে রাজা তাঁর ইচ্ছেমতন মানুষের সঙ্গে দেখা-শোনা করেন। এখানে প্রধানতঃ দুই পক্ষ ; এক পক্ষে আছেন রাজা,—রাজার সর্দার-দল, মোড়ল, কেনারাম গোঁসাই ইত্যাদি,—অন্যপক্ষে নন্দিনী, বিশু, রঞ্জন।

২। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'Critics and detectives are naturally suspicious. They scent allegories and bombs where there are no such abominations. It is difficult to convince them of our innocence.

With regard to the criticism of my play, The King of the Dark Chamber that you mention in your letter, the human soul has its inner drama, which is just the same as anything else that concerns Man, and Sudarsana is no more an abstraction than Lady Macbeth, who might be described as an allegory representing the criminal ambition in man's nature.'

১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে 'রক্তকরবী' যখন প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, তার প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে, বাংলা ১৩৩০ সালের গ্রীষ্মকালে শিলঙ্-বাসের সময়ে সে-বইখানি প্রথম লেখা হয়। তখন এ-নাটকের নাম ছিল 'যক্ষপুরী'। তারপর সে নাম কেটে নতুন নাম রাখা হয় 'নন্দিনী'। পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই এই রদবদল ঘটেছিল, অতঃপর ১৩৩১ এর আশ্বিন মাসে 'প্রবাসীতে' রক্তকরবী নামেই সংশোধিত লেখাটির প্রথম প্রকাশ ঘটে, এবং সে ঘটনার আরো দু'বছর পরে ১৩৩১ সালে তা প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

প্রথম সংস্করণের প্রস্তাবনাটি ছিল ১৩৩১ সালে লেখা এক 'অভিভাষণ'। ১৩৩২ এর বৈশাখ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে সেটি ছাপা হয়।

'রক্তকরবী' সম্বন্ধে 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের নিজের যে মন্তব্য ছাপা হয়, পরে—১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যার ইংরেজি বিশ্বভারতী-ত্রৈমাসিকে সেটি পুনর্মুদ্রিত হয়। তাতে তিনি যা বলেছিলেন, ১৩৩২ সালের বৈশাখের 'প্রবাসী'তে 'রক্তকরবী'র রূপকত্ব সম্বন্ধে প্রায় সেই একই কথা জানানো হয়:

> 'হঠাৎ মনে হ'তে পারে, রামায়ণটা রূপক কথা। বিশেষত যখন দেখি রাম রাবণ দুই নামের দুই বিপরীত অর্থ। রাম হ'ল আরাম, শান্তি; রাবণ হ'ল চীৎকার অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য, পল্লবের মর্মর; আর একটিতে সান-বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গধ্বনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রামায়ণ রূপক নয়। আমার রক্তকরবীর পালাটিও রূপকনাট্য নয়।'

তিনি বিশেষভাবে বলেছেন—'এইটি মনে রাখুন' রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি।' আবার, 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে তিনি তাঁর 'রাজা' নাটক সম্বন্ধে বলে গেছেন:

> "রাজা" নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা—তারপর সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে পাপের মধ্যে দিয়ে যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে তা অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে তাতেই তো

তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির পথ। তাই উপনিষদে আছে তিনি তাপের দ্বারা তপ্ত হয়ে এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন। আমাদের আত্মা যা-কিছু সৃষ্টি করেছে তাতে পদে পদে ব্যথা। কিন্তু তাকে যদি ব্যথাই বলি তবে শেষ কথা বলা হল না, সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য, তাতেই আনন্দ।'

আবার 'অরূপরতন'-এর ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন :

'সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল, যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধনজনখ্যাতি, সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয়ই স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না; নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্ম-সমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা-রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল—সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে-প্রভু কোনো বিশেষ রূপে বিশেষ স্থানে বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে-প্রভু সকল দেশে সকল কালে; আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।'

অতঃপর তাঁর আর একখানি নাটকের কথা স্মরণযোগ্য। 'তাসের দেশ [প্রথম সংস্করণ ভাদ্র ১৩৪০] নাটিকার শুরুতেই একটি গানের

'ভূমিকা' চোখে পড়ে। রাজপুত্র আর সদাগর পুত্র—এই দুটি মাত্র চরিত্র সেখানে। গানটিও প্রসিদ্ধ—

হারে রে রে রে রে
আমায় ছেড়ে দে রে দে রে,
যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দে রে॥
ঘন শ্রাবণ ধারা
যেমন বাঁধন হারা,
বাদল বাতাস যেমন ডাকাত, আকাশ লুটে ফেরে॥
হারে রে রে রে রে
আমায় রাখবে ধরে কে রে,
দাবানলের নাচন যেমন
সকল কানন ঘেরে
বজ্র যেমন বেগে
গর্জে ঝড়ের মেঘে
অট্টহাস্যে সকল বিঘ্ন বাধার বক্ষ চেরে॥

তাঁর 'ডাকঘর' [প্রথম প্রকাশ ১৩১৮] নাটকেও এই ছুটির পিপাসাই সর্বাধিক স্মরণীয় কথা। সৌন্দর্য, সুখ, মুক্তি, কল্যাণ, আনন্দ—এইসব কথাই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কথা! তাঁর 'নিজস্ব' নাট্যশ্রেণী বললে যেসব নাটকের কথা মনে পড়ে, সে-সব রচনায় তিনি এইসব কথাই বলেছেন। অবিশ্যি 'চিরকুমার সভা' বা 'শেষরক্ষা'র মতন নাট্য-রচনাও মনে পড়ে—সেও তাঁরই নিজের সৃষ্টি। কিন্তু সে আলাদা কথা।

নাট্য-রচনার ক্ষেত্রেও কাছাকাছি বা একই সময়ে, তাঁর কলমে কতো যে বিপরীতধর্মী রচনা দেখা দিয়েছে, তার তুলনা হয় না! তাঁর মনের গহনে একই সময়ে, বিভিন্ন বিপরীত ঢেউয়ের ওঠা-পড়া রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই লক্ষ্য করেছেন। সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য সৃষ্টিকর্তা নিজেই কি পুরোপুরি জানেন? ১২৯৮ সালের ভাদ্র মাসে 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্য লেখা হয়। তার ঠিক এক বছর পরে, তাঁর 'গোড়ায় গলদ' প্রহসনের রচনাকাল—১২৯৯ সালের ভাদ্র মাসে। 'ছিন্নপত্রে' বোলপুর থেকে লেখা ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের,—

অর্থাৎ ১২৯৯-এর ১৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন'—'ছোটো ছোটো কবিতাগুলো আপ্‌না আপ্‌নি এসে প'ড়বে ব'লে আর নাটকে হাত দিতে পারছিনে। নইলে দুটো তিনটে ভাবী নাটকের উমেদার মাঝে মাঝে দরজা ঠেলাঠেলি ক'রচে। শীতকাল ছাড়া বোধ হয় সেগুলোতে হাত দেওয়া হয়ে উঠবে না। চিত্রাঙ্গদা ছাড়া আমার আর সব নাটকই শীতকালে লেখা। সে সময়ে গীতিকাব্যের আবেগ অনেকটা ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে—অনেকটা ধীরে সুস্থে নাটক লেখা যায়।' ১২৯১ থেকে ১২৯৭ এর মধ্যে তাঁর 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন' লেখা হয়ে গেছে। ঠিক তারই পরবর্তী এই 'ভাবী নাটকের উমেদার মানে 'শারদোৎসব', 'রাজা', 'ডাকঘর,' 'প্রায়শ্চিত্ত,' 'অচলায়তন' ইত্যাদি নয়। 'বিদায়-অভিশাপ', 'মালিনী', 'কাহিনী' ইত্যাদির রচনাকাল তাঁর ঐ চিঠির বরং আরো নিকটবর্তী।

সেই চিঠিতে তিনি শিল্পের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার আনন্দের কথা তুলেছিলেন। 'তাসের দেশ', 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী' ইত্যাদি রচনায় যে মুক্তি-পিপাসার কথা আছে,—কবিতার কথা বলতে বলতে 'আর্ট'-এর অত্যাবশ্যক শর্ত হিসেবে সেই মুক্তির আবশ্যিকতা সম্বন্ধে তিনি বলেন,—'আর্টের একটা প্রধান আনন্দ হচ্ছে স্বাধীনতার আনন্দাবেশে আপনাকে অনেক দূরে নিয়ে যাওয়া যায় তারপরে আবার এই ভবকারাগারের মধ্যে ফিরে এসেও অনেকক্ষণ কানের মধ্যে একটা ঝঙ্কার, মনের মধ্যে একটা ফ‍ূর্তি লেগে থাকে।'

তাঁর নাটকে তাই কবিতার আমেজ অপরিহার্যভাবেই মিশে থাকতে দেখা যায়। তিনি যে প্রধানতঃ কবি-ই, সে-পরিচয় এ ক্ষেত্রেও সমর্থিত। এবং এই সূত্রেই তাঁর নাটক-নাটিকার কথায় তাঁর সংগীত-সম্পর্কিত নানা মন্তব্যের প্রসঙ্গও বিবেচ্য।

তাঁর নাটকে অনুভূতির তীব্রতা, আদর্শের সংঘাত, উপমা প্রভৃতি অর্থালঙ্কারের প্রাচুর্য ইত্যাদি লক্ষণের কথা বলা হোলো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর অনুভূতি, চিন্তা ইত্যাদির সঙ্গে হয়তো-বা বিশেষ স্বপ্নও এসে যোগ দিয়েছে। যেমন, তাঁর 'মালিনী'তে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের

'Sanskrit Buddhist Literature'-এর 'মহাবস্তুবদান' থেকে কাহিনী নেওয়া হয়েছে এখানে—এবং তাঁর একটি বিশেষ স্বপ্ন-কথা এতে যুক্ত হয়েছে। 'সাধনা' পর্বে,—১৮৯০ থেকে শুরু ক'রে,—পরবর্তী শতকের প্রায় প্রথম ছ-সাত বছর পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৮৯০ থেকে ১৯০৭ অবধি নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর এক বিশেষ আদর্শ-সন্ধানের পর্ব উদ্‌যাপিত হয়। 'বিদায়-অভিশাপ,' 'মালিনী' এবং 'কাহিনী'র লেখাগুলি সেই সময়কার।

'মালিনী'র প্রথম দৃশ্যেই রাজার অন্তঃপুরে কাশ্যপ-প্রবর্তিত নবধর্মে দীক্ষিতা মালিনীর দেখা পাওয়া যায়। রাজকন্যার মনে সংসার-ত্যাগের দৃঢ় সংকল্প জেগেছে। রাজ্যের প্রজারা রাজকন্যার স্বীকৃত সেই 'নবধর্ম' সম্বন্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। প্রথম দৃশ্যের শেষ দিকে সেনাপতির মুখে প্রজাদের দাবি শোনা যায়,—তারা চায় রাজকন্যার নির্বাসন :

মহারাজ ; বিদ্রোহী হয়েছে প্রজাগণ
ব্রাহ্মণ বচনে। তারা চায় নির্বাসন
রাজকুমারীর।

কিন্তু রানী নিজে তাঁর কন্যার এই নির্বাসন-ব্যবস্থা কোনো মতেই মেনে নিতে পারছেন না। মহারাজের কাছে তিনি রাজকন্যার অসাধারণ সত্তার অলৌকিক মহিমার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন :

এ কন্যা মানবী নহে, এ কোন্ দেবতা
এসেছে তোমার ঘরে।

কিন্তু মায়ের কোনো অনুরোধই রাজকন্যা-মালিনীকে সংকল্পচ্যুত ক'রতে পারেনি। সংকল্প-সাধনের আনন্দেই রাজকন্যা প্রজাদের আকাঙ্ক্ষিত এই নির্বাসন কামনা করেন! 'মালিনী' নাটিকার প্রথম দৃশ্যে মালিনীর জননী রাজ-মহিষী তাঁর কন্যার ধর্মপ্রেরণার উল্লেখ ক'রে, তাঁর নিজের সংশয়ের কথাও জানিয়েছেন :

কিন্তু মাগো, এযে তব
সৃষ্টিছাড়া বেদছাড়া ধর্ম অভিনব
আজিকার গড়া।

তিনি জানেন—

রমণীর
ধর্ম থাকে বক্ষে কোলে চিরদিন স্থির
পতিপুত্ররূপে।

রাজা এসে বলেন :

কন্যা, ক্ষান্ত হও এবে
কিছুদিন-তরে, উপরে আসিছে নেমে
ঝটিকার মেঘ।

কিন্তু মালিনী তাঁর সংকল্পে অটুট! সকলের স্নেহপাশ মোচন ক'রে তিনি তাঁর অন্তর্যামীর ইঙ্গিত অনুসরণ ক'রেই চ'লতে চান। তার এই ত্যাগের সংকল্প শুনে মহিষী কাতর হন এবং মহিষী আর মালিনী চলে যাবার ঠিক পর-মুহূর্তে সেনাপতি এসে প্রবেশ করেন। তাঁরই কাছে খবর পাওয়া যায় যে, প্রজারা রাজকুমারীর নির্বাসন চায়!

এই প্রথম দৃশ্যেই সংঘর্ষের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আবার এই দৃশ্যে মালিনীর প্রথম উক্তিতেই মালিনীকে যখন বলতে শোনা যায়—

'ভগবন্ রুদ্ধ আমি, নাহি হেরি চোখে;
সন্ধ্যায় মুদ্রিত দল পদ্মের কোরকে
আবদ্ধ ভ্রমরী—স্বর্ণরেণুরাশি মাঝে মৃত জড় প্রায়।'

—তখন একদিকে, উপমা, রূপক ইত্যাদি উদ্ভাবনায় কবি-মানসের সামর্থ্য অনুভব করা যায়, অন্যদিকে তাঁর এইসব উক্তির স্বতঃস্ফূর্ততাতেও বিস্মিত হতে হয়।

তারপর দ্বিতীয় দৃশ্য। মন্দির-প্রাঙ্গণে ব্রাহ্মণদল উপস্থিত। একমাত্র সুপ্রিয় ছাড়া সমস্ত ব্রাহ্মণই রাজকন্যার নির্বাসনে একমত। কিন্তু যুক্তিবাদী সুপ্রিয়ের মতে—

ধর্ম? মহাশয়,
মূঢ়ে উপদেশ দেহ ধর্ম কারে কয়।
ধর্ম নির্দোষীর নির্বাসন?

আর—

শুধু দল বেঁধে সবে
সত্যের মীমাংসা হবে, শুধু উচ্চরবে ?
যুক্তি কিছু নহে ?

সুপ্রিয়ের এই বিদ্রোহী মতবাদের জবাবে ব্রাহ্মণরা বলেছেন—'দূর করে দাও সুপ্রিয়েরে'। এবং সুপ্রিয় তাতে সম্মতি জানিয়ে বলেন :

যে শাস্ত্রের অনুগামী
এ ব্রাহ্মণ, সে শাস্ত্র কোথাও লেখে নাই
শক্তি যার ধর্ম তার।

মালিনীর সমর্থনে তিনি বলেন :

ভেবে দেখো মনে
মিথ্যারে সে সত্য বলি করেনি প্রচার—
সেও বলে সত্য ধর্ম, দয়া ধর্ম তার,
সবজীবে প্রেম—সর্বধর্মে সেই সার।

এ-আবেদনের উত্তরে ক্ষেমংকরের যুক্তিজাল কিন্তু সত্যকে শুধু আচ্ছন্ন-ই করে! সেই জালে ধরা দেন সুপ্রিয়। ক্ষেমংকর বলেন—মূল ধর্ম এক বটে, কিন্তু তার বিভিন্ন আধার! সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্যেই ধর্মের লোকাচারের দিকটি মেনে চলা দরকার। সুপ্রিয় এ-যুক্তি মেনে নেন। তাই তিনি বলেন—'তব পথগামী চিরদিন এ অধীন।' ঠিক এই সময়ে, উগ্রসেনের মুখে রাজসৈন্যদের বিদ্রোহের খবর এসে পৌছোয় :

হয়েছে চঞ্চল
ব্রাহ্মণের বাক্য শুনে রাজসৈন্যদল
আজি বাঁধ ভাঙে-ভাঙে।

ব্রাহ্মণদল এ-সংবাদে চঞ্চল হন। সোমাচার্যের মাধ্যমে, স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁরা প্রলয়শক্তি সিদ্ধিদাত্রী জগদ্ধাত্রীকে আহ্বান জানান :

সংহারের বেশে সাজি
এখনি দাঁড়াও সর্বসম্মুখেতে আসি
মুক্তকেশে খড়্গহস্তে অট্টহাস হাসি
পাষণ্ডদলনী।

এ নাটিকায় একেবারে প্রথম দৃশ্য থেকেই এই রকম বিভিন্ন চরিত্রের বিবিধ উদাহরণ দেখা যায়। মালিনী, সুপ্রিয়, রাজা, ক্ষেমংকর—সকলেই

বাগ দক্ষ! তবে, দ্বিতীয় দৃশ্যের এই শেষ উক্তিটিতে—ক্ষেমংকরের হাত থেকে এখানকার নেতৃত্ব যেন সোমাচার্যের হাতে চলে গেছে! আর, সেই মুহূর্তেই মালিনীর আবির্ভাব ঘটে। নর-দুহিতার সাজে সজ্জিতা এই অপরূপ দেবীর আবির্ভাবে ব্রাহ্মণরা অভিভূত হয়ে পড়েন। নিজের পরিচয় দিয়ে মালিনী বলেন :

আসিয়াছি নির্বাসনে,
তোমরা ডেকেছ বলে ওগো বিপ্রগণ।

রাজকন্যার এই অভাবনীয় কার্যকলাপে সকলে বিহ্বল বোধ করেন। প্রতিপক্ষ তাঁদের বহু-আকাঙ্ক্ষিত কামনা ভুলে গিয়ে, আবার রাজকন্যাকে রাজদ্বারে ফেরাতে উদ্যত হন। দেবদত্ত বলেন :

চলো সবে
বিপ্রগণ, জননীরে জয়জয়রবে
রেখে আসি রাজগৃহে।

'ম্লানবস্ত্রে', 'নরকন্যা'-রূপে রাজকন্যার এই প্রবেশ কিঞ্চিৎ অতিনাটকীয় বটে,—সোমাচার্যের অভিভূত ভাবটাও একটু বেশি মাত্রায় নাটকীয়! সকলেই হঠাৎ মালিনীর ভক্ত হয়ে ওঠেন। রাজকুমারীর এই অসাধারণ ব্যবহারে মোহাচ্ছন্ন হননি একমাত্র ক্ষেমংকর। তিনি তাঁর নিজের সংকল্পে অটুট। তাই সুপ্রিয়ের আচ্ছন্ন চেতনাকে জাগ্রত করবার অভিপ্রায়ে ক্ষেমংকর বলেন :

দূর হোক, মোহ দূর হোক, কোথা যাও
হে সুপ্রিয়!

দ্বিতীয় দৃশ্যে মালিনীর সম্বন্ধে সোমাচার্য, চারুদত্ত, দেবদত্ত ইত্যাদি সকলে যখন প্রায় একবাক্যে বলেছেন—'এসো, এসো মা জননী,—শত-চিত্ত-শতদলে দাঁড়াও অমনি করুণা-মাখানো মুখে'—তখন মালিনা নিজে যে স্বগতোক্তিটি শুনিয়েছেন, তার সঙ্গে 'প্রভাত-সংগীত'-এর 'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি'-র মিল আছে। নাট্য-সংঘাতের এলাকা থেকে সে-যেন হঠাৎ কবিতার প্রগাঢ় আস্বাদনের দিকে এগিয়ে যাওয়া! সেখানে মালিনী বলেন—

আজি মোর মনে হয়
অমৃতের পাত্র যেন আমার হৃদয়—

যেন সে মিটাতে পারে এ বিশ্বের ক্ষুধা
যেন সে ঢালিতে পারে সান্ত্বনার সুধা
যত দুঃখ যেথা আছে সকলের পরে
অনন্ত প্রবাহে।

এবং এই উচ্ছ্বাসের ঝোঁকেই তিনি আরো বলেন :

'কী বৃহৎ লোকালয়, কী শান্ত আকাশ—
এক জ্যোৎস্না বিস্তারিয়া সমস্ত জগৎ
কে নিল কুড়ায়ে বক্ষে—ওই রাজপথ,
ওই গৃহশ্রেণী, ওই উদার মন্দির—
স্তব্ধচ্ছায়া তরুরাজি—দূরে নদীতীর,
বাজিছে পূজার ঘণ্টা—আশ্চর্য পুলকে
পুরিছে আমার অঙ্গ, জল আসে চোখে।
কোথা হতে এনু আমি আজি জ্যোৎস্নালোকে
তোমাদের এ বিস্তীর্ণ সর্বজনলোকে।'

মালিনীর এই ভাবময়ী মূর্তি দেখে,—'বিস্তীর্ণ সর্বজনলোকে' তাঁর প্রবেশের আত্মকথা শুনে,—সোমাচার্য, দেবদত্ত প্রভৃতি অনেকেই নিজেদের পূর্ব-ব্যবহারে অনুতপ্ত হয়েছেন। রাজকন্যা যখন বলেন—'শুনিয়াছি দুঃখময় বসুন্ধরা, সে দুঃখের নব পরিচয় তোমাদের সাথে',— তখন সকলে একবাক্যে বলেন—'আমরা সকলে পাষণ্ড পামর'! 'জননী,' 'লক্ষ্মী,' 'করুণাময়ী' ইত্যাদি অনুরাগ-বচনে মালিনী তখন সুপ্রতিষ্ঠিতা। কেবল ক্ষেমংকরই অবিচলিত ছিলেন! সে কথা আগেই বলা হয়েছে। মালিনীকে নিয়ে সকলে চলে যাবার পরে, সুপ্রিয় আর ক্ষেমংকরই কেবল পরস্পরের মনোভাবের কথা পরস্পরকে জানিয়েছেন। ক্ষেমংকর প্রশ্ন করেছেন যে, আর্যধর্মের মহাদুর্গ সেই তীর্থনগরী কাশীতেই যখন ধর্ম-বিভ্রান্তির দুর্যোগ দেখা দিয়েছে, তখন ক্ষেমংকরকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ফেলে রেখে সুপ্রিয় কি সত্যিই চলে যাবেন ? শেষ-পর্যন্ত ক্ষেমংকরের অসাধারণ যুক্তি-তর্কের কাছে সুপ্রিয়কে নিজের বিশ্বাসের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে হয়—

কভু নহে, কভু নহে। নিদ্রাহীন চোখে
দাঁড়াইব পার্শ্বে তব।

—এই আনুকূল্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় সুপ্রিয়ের কাছ থেকে!

সুপ্রিয়ের এই আত্মসমর্পণে ক্ষেমংকর অপরিসীম উৎসাহিত হন। বিদেশী সৈন্যের সাহায্যে রাজকন্যার এই নব-প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বিনাশ ঘটাবেন তিনি, —এই তাঁর কামনা। তাই তিনি সুপ্রিয়ের কাছে দেশান্তরে যাবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু যাবার ঠিক আগে,—সুপ্রিয়কে যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রতে কুণ্ঠা হয়। আশঙ্কাতুর হৃদয়ে তিনি বলেন :

দেখো সখে,
তুমিও ভুলোনা শেষে নূতন কুহকে,
ছেড়ো না আমায়। মনে রেখো
প্রবাসী বন্ধুরে।

সুপ্রিয় বলেন :

সখে, কুহক নূতন,
আমি তো নূতন নহি। তুমি পুরাতন,
আর আমি পুরাতন।'

তারপর তৃতীয় দৃশ্য। কন্যার বিরহে অন্তঃপুরে রাজা আর রানী, উভয়েই তখন অত্যন্ত শোকাতুর। রাজাকে যুবরাজ বলেন—স্নেহ-মোহ পরিহার ক'রে মালিনীকে নির্বাসন-দণ্ড দেওয়াই শ্রেয়! যে রাজা এতক্ষণ বলেছেন—

দিব তারে নির্বাসন, পূরাব প্রার্থনা—
সাধিব কর্তব্য মোর। মনে করিওনা
বৃদ্ধ আমি মোহমুগ্ধ, অন্তর দুর্বল,
রাজধর্ম তুচ্ছ করি ফেলি অশ্রুজল।

—মালিনী ঘরে নেই শুনে, অপত্যস্নেহে সেই রাজাকেই আবার বলতে শোনা যায় :

প্রতিজ্ঞা করিনু আমি ফিরাইব কোলে
কোলের কন্যারে মোর। রাজ্যে ধিক থাক্।
ধিক্ ধর্মহীন রাজনীতি। ডাক্ ডাক্
সৈন্যদল।

ঠিক এই মুহূর্তেই প্রজাপুঞ্জের 'জয়জয়' রবের সঙ্গে আবির্ভূত হন

মালিনী ! প্রজার আনন্দে রাজা, আর, মালিনীও অকৃত্রিম আনন্দে উচ্ছ্বসিত ! প্রজাদের সঙ্গে রাজাও তখন একাত্মতা অনুভব করেন—

সেই মতো উচ্ছ্বসিত জনপারাবার,
মাঝে তুমি লোকলক্ষ্মী মাতা !

আর, সেই মুহূর্তে মালিনীও অনুভব করেন—

দেহ নাই মোর, বাধা নাই,
আমি যেন এ বিশ্বের প্রাণ।

রানী নিজেও তাঁর কন্যার সে-মত সমর্থন ক'রেছেন। কিন্তু এক অজানা আশঙ্কায় তাঁর হৃদয় চঞ্চল হয়ে ওঠে। প্রজাদের তরফ থেকে মালিনীর সংবর্ধনা এই তৃতীয় দৃশ্যের শেষে যেন এক চূড়ান্ত অবস্থায় এসে পৌঁছোয়। সকলে একবাক্যে বলে—'মোরা আজি ধন্য সবে—ধন্য আজি কাশী'। তবু তৃতীয় দৃশ্যের এই উক্তিতেই মহিষী তাঁর মাতৃমনের আশঙ্কার কথা ব'লতে বাধ্য হন। কন্যার অকল্যাণ-সম্ভাবনা আশঙ্কা ক'রে—'নবধর্ম' সম্বন্ধে অবহিত থেকে, মনকে শান্ত রাখবার অনুরোধ জানান তিনি। তাঁর একমাত্র ইচ্ছা—

মনোমত বর দেখে
খেলা ভেঙে যোগ্য কণ্ঠে দিক বরমালা—
দূর হবে নবধর্ম জুড়াইবে জ্বালা।

এই আশা ব্যক্ত হবার পরেই চতুর্থ দৃশ্যের সূচনা। চতুর্থ দৃশ্যের প্রথমাংশেই দেখা যায়—মালিনীর নব-প্রতিষ্ঠিত ধর্মে সুপ্রিয় একান্ত ভাবে নিজেকে সমর্পণ ক'রেছেন। তাই তাঁকে ব'লতে শোনা যায়—

যে পথে লইয়া যাবে, জীবন আমার
সাথে যাবে সব তর্ক করি পরিহার
নীরব ছায়ার মতো দীপবর্তিকার।

সুপ্রিয়ের এই আত্মসমর্পণে রাজকন্যাও কিছুটা আশ্বস্ত হন। তাই নিজের অক্ষমতা প্রকাশ ক'রে সুপ্রিয়ের সাহায্য চেয়ে তিনি বলেন :

'মহাধর্মতরণীর বালিকা কাণ্ডারী
নাহি জানি কোথা যেতে হবে। মনে হয়

বড়ো একাকিনী আমি, সহস্র সংশয়,
বৃহৎ সংসার, অসংখ্য জটিল পথ...
তুমি মহাজ্ঞানী
হবে কি সহায় মোর ?'

এই ব্যাকুল প্রশ্নের জবাবে পূর্ণ সম্মতি উচ্চারিত হয় সুপ্রিয়ের এই উক্তিতে—

প্রস্তুত রাখিব নিত্য
এ ক্ষুদ্র জীবন।

এইভাবে উভয়ে উভয়কে গ্রহণ করেন। পরস্পরের কাছে তাঁদের এই আত্মসমর্পণের ফলে, অলক্ষ্যে উভয়ের মধ্যে নিবিড় এক ভালবাসার বন্ধন সত্য হ'য়ে ওঠে! এই পূর্ণ সমর্পণের আবেগেই সুপ্রিয় মালিনীর কাছে নিজের আত্মকাহিনী ব্যক্ত করেন। ক্ষেমংকরের অকৃত্রিম স্নেহে কীভাবে তিনি দিনে-দিনে পরিণতির দিকে এগিয়েছেন, কীভাবে শত বাধা-বিঘ্ন, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে অচল অটল ক্ষেমংকর তাঁরই বিশ্বস্ত অনুচর থেকেছেন, সে-সব প্রসঙ্গ সুপ্রিয়ের আলোচনায় ব্যক্ত হয়েছে। আর ব্যক্ত হয়েছে—কী ভাবে রাজার কাছে ক্ষেমংকরের গোপন চক্রান্ত জানিয়ে, কবে তিনি নিজে এই বন্ধুত্বের নির্মম প্রতিদান বা পরিচয় দিয়েছেন! নিজের এই আচরণে সুপ্রিয়ের মনে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঝড় বয়ে গেছে।

সুপ্রিয়ের এই চরম উত্তেজনার মুহূর্তেই রাজার প্রবেশ ঘটে! ক্ষেমংকরের চক্রান্ত ব্যর্থ ক'রে তাকে বন্দী ক'রতে পারায় রাজা বার-বার সুপ্রিয়কে পুরস্কৃত করবার প্রস্তাব জানান। তাতে সুপ্রিয়ের মানসিক সংঘাত আরো প্রবল হয়ে ওঠে। রাজা তাঁকে বলেন—'এস আলিঙ্গনে মম বান্ধব, আত্মীয় তুমি।' তার উত্তরে সুপ্রিয়কে ব'লতে হ'য়েছে—'ক্ষম মোরে ক্ষম মহারাজ।'

তিনি তো পুরস্কার-প্রত্যাশী হয়ে ক্ষেমংকরের বিরোধিতা করেননি! মালিনী যখন জিগেস ক'রেছিলেন—'ক্ষেমংকর বান্ধব তোমার ?'—তখন সুপ্রিয় বলেন—'বন্ধু, ভাই, প্রভু'! ক্ষেমংকরের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রীতির শেষ নেই। কিন্তু রাজকন্যা মালিনীই সুপ্রিয়ের 'শুষ্কচিত্তে' সুধা-বর্ষণ ক'রেছেন! মালিনীর দেওয়া সর্বজীবে দয়ার মন্ত্র—ভাবের ক্ষেত্রে সুপ্রিয়ের সঙ্গে ক্ষেমংকরের যোগে বাধা সৃষ্টি ক'রেছে! তাই মালিনীর নবধর্ম দলনের জন্যে রত্নবতী নগরীর

রাজগৃহ থেকে ক্ষেমংকর সৈন্য নিয়ে আসছেন,—এই চিঠি পেয়েই সুপ্রিয় রাজাকে সে-খবর জানাতে বাধ্য হন। একদিকে মালিনীর 'নবধর্মের' প্রতি ঐকান্তিক আকর্ষণ, অন্যদিকে বন্ধু ক্ষেমংকরের চক্রান্ত ব্যর্থ ক'রে দেবার পর অনুশোচনা,—এই দুই প্রবল বোধের সংঘর্ষ জাগে সুপ্রিয়ের মনে। তাই পুরস্কারে তাঁর অভিরুচি নেই। সুপ্রিয় বলেন :

> 'কিছু নহে, কিছু নহে, খাব ভিক্ষা করে
> দ্বারে দ্বারে।'

তাঁর এই অবস্থা উপলব্ধি ক'রতে পেরেই মালিনী পিতাকে বলেন—'কী করেছ বলো পিতা বন্দীর বিচার ?'

মালিনীর সে-প্রশ্নের উত্তর—'প্রাণদণ্ড হবে তার।'

রাজার এই উত্তরে সুপ্রিয় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ক্ষুব্ধ সুপ্রিয়কে তুষ্ট করবার অভিপ্রায়ে রাজকন্যা রাজার কাছে ক্ষেমংকরের জীবন প্রার্থনা করেন। সুপ্রিয়েরও সেই প্রস্তাব। রাজা সে প্রস্তাবে সম্মতও হন। অধিকন্তু সুপ্রিয়কে তিনি আরো মূল্যবান কিছু উপহার দেবার জন্যেই ব্যগ্র! কিন্তু রাজা তখনো সুপ্রিয় আর মালিনীর সেই গোপন, অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বুঝতে পারেন নি। তবে মালিনী যে বালিকা-বয়সের সীমা অতিক্রম ক'রে যৌবনে পদার্পণ ক'রেছেন, সে-কথা রাজার অজানা নয়—

> বুঝিলাম মনে
> আমাদের কন্যাটুকু বুঝি এতদিনে
> বিকশি উঠিল।

এ তাঁর স্বগতোক্তি! ক্ষেমংকরের বীরত্ব পরীক্ষা ক'রতে চেয়েছেন তিনি। অতঃপর আবার ঘটনা দেখা দেয়। এই সময় প্রতিহারী এসে বন্দী ক্ষেমংকরের আগমন-বার্তা জানায়। রাজার আদেশে বন্দীকে রাজ-সমীপে উপস্থিত করা হ'লে রাজা তাঁকে পরীক্ষা করবার অভিপ্রায়েই তাঁর প্রাণদণ্ড রহিত ক'রতে চেয়েছেন। কিন্তু নির্ভীক স্বাধীনচেতা ক্ষেমংকর বলেন—

> পুনর্বার
> তুলিয়া লইতে হবে কর্তব্যের ভার—
> যে পথে চলিতেছিনু আবার সে পথে
> যেতে হবে।

রাজা তখন ক্ষেমংকরকে প্রাণের মমতা ত্যাগ ক'রে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হ'তে বলেন,—আর শেষবারের মতন তাকে কিছু প্রার্থনা জানাতেও আদেশ দেন :

এই বেলা লহ তবে মাগি
প্রার্থনা যা-কিছু থাকে।

এই প্রস্তাবে ক্ষেমংকর শেষবারের মতন বন্ধু সুপ্রিয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ কামনা ক'রলে রাজা তাতে সম্মত হন। কিন্তু আবার এক অজানা আশঙ্কায় মালিনীর প্রাণ কেঁপে ওঠে। তাই তিনি পিতাকে বলেন :

হৃদয় কাঁপিছে বুকে
কী যেন পরমাশক্তি আছে ওই মুখে
বজ্রসম ভয়ংকর। রক্ষা করো পিতঃ
আনিও না সুপ্রিয়েরে।

কন্যাকে নির্ভাবনার আশ্বাস দিয়ে, রাজা সুপ্রিয়কে আনবার আদেশ দেন। সুপ্রিয় আসেন। ক্ষেমংকর সুপ্রিয়কে—বন্ধুত্বের সকল বন্ধন ভুলে, সোজাসুজি তাঁর এই কাজের কৈফিৎ দিতে বলায় সুপ্রিয় বলেন :

সব ছেড়ে রাখিয়াছি তাহারি বিশ্বাস,
প্রাণমনে ধর্ম সে আমার।

কিন্তু সুপ্রিয়ের এই 'ধর্ম'-নিষ্ঠা যে রাজকন্যার প্রতি আকর্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নয়, ক্ষেমংকর তা স্পষ্টই জানিয়ে দেন! তাঁর কথা :

'ধর্ম ওই তব।
ওই প্রিয়মুখে তুমি রচিয়াছ নব ধর্মশাস্ত্র আজি।'

সুপ্রিয় বলেন :

সত্য বুঝিয়াছি মনে।
মোর ধর্ম অবতীর্ণ দীন মর্তলোকে
ওই নারীমূর্তি ধরি।

কিন্তু ক্ষেমংকরের নিরন্তর ব্যঙ্গের আঘাতে সুপ্রিয়ের সব যুক্তিই যেন বিপর্যস্ত হয়। সুপ্রিয়ের মতন পরধর্মসহিষ্ণুতা নেই ক্ষেমংকরের। তাই তাঁকে ব'লতে হয়েছে—'হে সুপ্রিয়, প্রেম এত সর্বপ্রেমী নয়'।

'নবধর্মে'র সর্বব্যাপী উদারতার গুণেই ক্ষেমংকরের সব অপমান সুপ্রিয় সহ্য ক'রেছেন। এমন কি, বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে এখন

হাসিমুখে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ ক'রতেও তিনি স্বীকৃত। তাঁর এ-প্রস্তাব ক্ষেমংকরের মনঃপুত হয়েছে। মৃত্যুর পারাবারে বন্ধুত্বের এই মিলন কামনা ক'রেই ক্ষেমংকর সুপ্রিয়কে আহ্বান করেন—

যেথায় অনন্তকাল বিচ্ছেদ না হবে।
লহ তবে বন্ধুহস্তে করুণ বিচার—
এই লহো।

এই উক্তির পরেই দু-হাতের শিকল দিয়ে বন্ধুর মাথায় সজোরে আঘাত ক'রে তাকে ধরাশায়ী করেন ক্ষেমংকর! সেই সঙ্গে রাজাকে অবিলম্বে তাঁর প্রাণদণ্ড দান ক'রতে অনুরোধ করেন।

মৃত্যুর আগে সুপ্রিয়ের শেষকথা—'দেবী,তব জয়।' ক্ষেমংকরকে বধ করবার জন্যে রাজা ঘাতককে আহ্বান করেন। মূর্ছিত হবার আগের মুহূর্তে—মালিনী নিজে এই নাটিকার শেষ কথাটি বলেন—'মহারাজ ক্ষম ক্ষেমংকরে।'

'মালিনী'র কাহিনী এইটুকুই। 'চিত্রাঙ্গদা' আর 'গোড়ায় গলদ'-এর ঈষৎ পরে হলেও 'মালিনী' সেই একই সময়ের রচনা। রবীন্দ্রনাথের সেই 'সাধনা' পর্বের লেখাতে কবিতা আর নাটকের অন্যোন্য-সংস্পর্শ কী রকম ছিল, এখানে তারই নমুনা দেখা গেল।

সৌন্দর্য, প্রেম, কল্যাণ, মুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে জীবনে নানা পর্বে তিনি নানাভাবে ভেবে গেছেন। সেইসব ভাবনা তাঁর কবিতায় যেমন,—নাটকেও তেমনি প্রতিফলিত হয়েছে। 'মালিনী'তে গ্রীক-প্রভাব কতোদূর খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, সেটা অনুসন্ধানের বিষয় বটে,—কিন্তু তার গুরুত্ব বেশি নয়! এ নাটক গ্রীক নাটকের ভবিতব্যের কথা মনে করিয়ে দেয়,—আর, এর দ্রুত গতিবেগ এবং সংহতিও স্বীকার্য। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় একই কথা বলেছেন।[৩] সেখানে

৩। 'কপালকুণ্ডলার আর একটি গুণ সমালোচকের বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তাহা উপন্যাসটির অনবদ্য গঠনকৌশল। উপন্যাসখানি ঠিক একটি গ্রীক ট্রাজেডির মত সরল রেখায়, অবিসর্পিত গতিকে সর্বপ্রকার বাহুল্য-বর্জিত হইয়া অবশ্যম্ভাবী বিষাদময় পরিণতির দিকে অনিবার্য বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।'—'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' [১৩৬৯]: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৭৩।

গ্রীক ট্র্যাজেডির বাহুল্য-বর্জিত দেহসৌষ্ঠব,—সরল, তীব্র, গতিবেগ আর বিষাদময় পরিণতি দেখা গেছে। কিন্তু তিনি নিজে ঐ যে তাঁর ভূমিকায় বলে গেছেন—'মনের একটা সত্যকার বিস্ময়ের আলোড়ন ওর মধ্যে দেখা দিয়েছে,'—সে বিস্ময় ভবিতব্যের অপ্রত্যাশিত সংঘটন-সমাবেশের বিস্ময়! প্রেম আর প্রতাপের সংঘর্ষ-জনিত বিস্ময়! আঘাতের মধ্য দিয়ে মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা-লোভের বিস্ময়! রবীন্দ্র-মানসে মঙ্গলের বোধ বলতে যা বোঝায়, 'মালিনী'তে তাই-ই উচ্চারিত। যা মঙ্গল, তাই সুন্দর! যা সুন্দর, তাই-ই মঙ্গল! তাঁর মঙ্গলবোধের সঙ্গেই তাঁর স্বাধীনতাবোধ আর সামঞ্জস্যবোধ জড়িত।

তাঁর অন্য নাটকের কথা তোলবার আগে, এখানে রবীন্দ্রনাথের এই সৌন্দর্য ধারণার কথা ভেবে দেখা দরকার। তাঁর অনেকগুলি নাটক-নাটিকায় এই কল্যাণ, সৌন্দর্য, সামঞ্জস্যের কথা আছে। 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধে প্রসঙ্গতঃ ব্রহ্মচর্য পালনের কথা বলেছেন তিনি। জীবনকে সুন্দর ক'রে তুলতে হলে নিয়মের সংযম মেনে চলা দরকার। সেক্ষেত্রে রসের জন্যেই নীরসতা স্বীকার ক'রে নিতে হয়। কিন্তু লক্ষ্যের দিকে মন না রেখে, নিয়মকেই যাঁরা চরম লক্ষ্য বলে মনে করেন, তাঁদের সেই নিয়মলোলুপতাকে তিনি বলেছেন জড়ত্বের লক্ষণ! নিবৃত্তি-সাধনারও বাড়াবাড়ি ভাল নয়। সেরকম বাড়াবাড়ি প্রচণ্ড এক প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়! পূর্ণতা লাভের দিকে লক্ষ্য রেখে, সংযম-চর্চাকে তাই তিনি সংযত ক'রতে ব'লেছেন।

জীবনে জৈব বৃত্তির যে অনিবার্য প্রয়োজনবোধ স্বীকৃত, সৌন্দর্য সে-রকম প্রয়োজনের জিনিস নয়। তিনি বলেছেন—প্রয়োজনের সম্বন্ধে আমাদের দৈন্য, আমাদের দাসত্ব। আনন্দের সম্বন্ধেই আমাদের যথার্থ মুক্তি! এই প্রয়োজন-প্রয়োজনাতীত বিভেদের কথাসূত্রে তিনি সুদৃশ্য, সৌরভময়, সুপক্ক ফলের সাদৃশ্য দেখান! সে-রকম 'ফলে' আমাদের ক্ষুধারও নিবৃত্তি ঘটে, তাতে আমাদের মনও আনন্দিত হয়। ক্ষুধার রূঢ়তাকে সৌন্দর্য এইভাবে আবৃত ক'রে রাখে,—শোভন ক'রে দেয়। মানুষের মনে জৈব ক্ষুধাকে এইভাবে সংযত ক'রেই মানব-জীবনে সৌন্দর্য-চেতনা নিজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এই ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস।

সৌন্দর্যের মর্মস্থানে প্রবেশ ক'রতে হলে স্তব্ধভাবে নিবিষ্ট হওয়া দরকার। আর একটি সাদৃশ্য ব্যবহার ক'রে তিনি বলেন যে, এক-পরায়ণা সতী স্ত্রীর পক্ষেই যথার্থ প্রেমের উপলব্ধি সম্ভব। লোলুপ ভোগীর পক্ষে সে আস্বাদন সম্ভব নয়। উতঙ্কের কাহিনীতে এই ব্যাপারেরই সমর্থন পাওয়া যায়। এসব রবীন্দ্রনাথেরই কথা। এইসব আলোচনায় তিনি বার বার সতীত্বের সাদৃশ্য উল্লেখ ক'রে গেছেন। উপনিষদ স্মরণ ক'রে তিনি বলেছেন—'সুখার্থী সংযতো ভবেৎ'।

কিন্তু যাঁরা কলাকুশল, গুণী,—তাঁদের জীবনেও অসংযমের বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। অথচ তাঁরাও সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন। জীবনের সে-সত্য মেনে নিয়ে তিনি বলেছেন—'কলাবান গুণীরা যেখানে বস্তুতঃ গুণী সেখানে তাঁহারা তপস্বী।' সংসারে অপরিণত শক্তির সঙ্গে অসংযত চরিত্রের একত্র সমাবেশ অসম্ভব নয়। কিন্তু যথার্থ পরিণত সৌন্দর্যবোধ আর প্রবৃত্তির বিক্ষোভ কখনই একসঙ্গে থাকতে পারে না। প্রেম আর প্রতাপের এই দ্বন্দ্বই তাঁর অনেক নাটক-নাটিকার আসল বিষয়।

বিশ্বামিত্রের জগৎ যেমন বিধাতার বিরুদ্ধে অহংকারী তপস্বীর দম্ভের সৃষ্টি,—নদীর ঘূর্ণি যেমন স্রোতের প্রতিকূল আঘাতজনিত বিক্ষোভ,—মাতালের বৈঠক যেমন জগৎ-সংসারে অসংগতের সমাবেশ,—মানুষের মনে প্রবৃত্তির বাড়াবাড়িও সেইরকম উন্মত্ততা,—সামঞ্জস্যহীনতা,—অসংগতি! এ সবই তাঁর নিজের উপমা।

বর্বর মানুষ আড়ম্বর-প্রিয়! আড়ম্বরের মোহ উত্তীর্ণ হবার জন্যে মনের যে উত্তরণ-শক্তির প্রয়োজন,—শিক্ষা এবং সংস্কৃতির উচ্চতর স্তরেই সে-শক্তির বিকাশ সম্ভব। সমুচিত সাদৃশ্যের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এ-মন্তব্যও ব্যাখ্যা ক'রেছেন। তিনি বলেছেন, রাজার মহিমা কেবল বসন-ভূষণের ঐশ্বর্যেই আশ্রিত নয়, সে মহিমা মন দিয়ে অনুভব ক'রতে হয়! তাই শিল্পে যথার্থ গুণের পরিচয়—সামঞ্জস্য রক্ষাতেই নিহিত। যে-দর্শন আমাদের মনের বড়ো অংশ অধিকার করে, সেইরকম দেখাতেই আমরা বেশি তৃপ্তি পাই। যাকে আমরা মঙ্গল বলি, তাতে আমাদের প্রয়োজন ত মেটেই, তাছাড়া এক অনির্বচনীয় সামঞ্জস্যবোধে তা আমাদের মুগ্ধ করে।

সেই সামঞ্জস্যের কথা তাঁর গানে, কবিতায়, নাটকে,—তাঁর বিবিধ গদ্য-

নিবন্ধে নানাভাবে বলা হয়েছে। তাঁর নাটকেও প্রধানতঃ সেই সামঞ্জস্য-চেতনারই অভিব্যক্তি দেখা যায়। সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা না হোক্, সংক্ষেপে সে বিশেষত্ব স্মরণ করবার জন্যে ১৮৮০-র 'বনফুল' থেকে শুরু ক'রে ১৯০০ পর্যন্ত, অর্থাৎ—এই বিশ বছরের মধ্যে লেখা তাঁর রচনাবলী লক্ষ্য করা,—এবং তারই মধ্যে তাঁর নাট্য-রচনাবলীর তালিকা দেখা দরকার। সেই আংশিক তালিকাটি এখানে দেওয়া হোলো :

বনফুল

তের-চোদ্দ বছর বয়সে লেখা তাঁর প্রথম কাব্য-পুস্তক; ১২৮৬ সালে গুপ্ত-প্রেস থেকে ছাপা হয়। আট সর্গে সমাপ্ত এই আখ্যায়িকামূলক কাব্য 'জ্ঞানাঙ্কুর' মাসিক পত্রে ১২৮২ সালে প্রথমে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এ-রচনা লেখা হয় আরো আগে।

কবিকাহিনী

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। বাংলা ১২৮৪ সালের প্রথম বর্ষের 'ভারতী' পত্রিকায় পৌষ-সংখ্যা থেকে এই খণ্ডকাব্য প্রকাশিত হ'তে আরম্ভ ক'রে চৈত্র সংখ্যায় সমাপ্ত হয়। এইটিই তাঁর প্রথম ছাপা বই।

বিলেত যাত্রার আগে রবীন্দ্রনাথ এই যে গাথা ও কাব্যোপন্যাস লেখেন, বিলেতে বাস করবার সময়েও সে ধারা চলছিল। টার্কি শহরে [Torquay, Devonshire] বাস করবার সময়ে তিনি 'ভগ্নতরী' নামে এক গাথা রচনা করেন; সে সম্বন্ধে তাঁর 'জীবনস্মৃতিতে' বেশ বিস্তৃতভাবেই বলেছেন।

রুদ্রচণ্ড

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে, বাংলা ১২৮৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'রুদ্রচণ্ড' নাটিকা প্রকাশিত হয়। 'রুদ্রচণ্ড'ই তাঁর প্রথম নাটক ব'লে ধরা হয়। কিন্তু এটিকে বরং একখানি কাব্য বলাই সংগত,—চোদ্দ সর্গে, আটশ' লাইনে এ-গ্রন্থ সম্পূর্ণ। কবির প্রথম বিলেত যাত্রার পূর্বে—অর্থাৎ ১৮৮১র অনেক আগে এই নাটিকা রচিত হয়।

ভগ্নহৃদয়

এই কাব্য-নাটিকা লেখা আরম্ভ হয় বিলেতে। ১২৮৭ সালে 'ভারতী' পত্রিকার কার্তিক থেকে মাঘ সংখ্যায় প্রথম ছয় সর্গ ছাপা হয়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে—বাংলা ১২৮৮ সালে এ-কাব্য আলাদা বই হিসেবে

প্রকাশিত হয়। এই নাট্যকাব্য রচনার সময়ে তাঁর বয়স ছিল মাত্র উনিশ বছর। এটি সর্বসমেত চৌত্রিশ সর্গে বিভক্ত।

বাল্মীকি-প্রতিভা

গীতিনাট্য। বিলেত থেকে দেশে ফেরবার পরে, ১২৮৭ সালে লেখা হয়। এ-বইয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে কবি তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন যে, তাঁদের বাড়িতে কবি মুরের লেখা সচিত্র একখানি Irish Melodies বই ছিল। তাতে একটি বীণা আঁকা ছিল। সেই ছবি দেখে তাঁর ইচ্ছা হয় যে, তিনি আইরিশ সুর শিখে নিয়ে দেশকে সেই সুর শোনাবেন!

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে,—১২৮৭ সালের ফাল্গুনে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বিদ্বজ্জনসমাগমের অধিবেশন উপলক্ষে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রচিত এবং অভিনীত হয়। কবি নিজে 'বাল্মীকি'—এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা দেবী 'সরস্বতী' সেজেছিলেন। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'তে অক্ষয়কুমার চৌধুরীর কয়েকটি গান আছে, এবং এর দুটি গানে বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল' কাব্যের ভাষাও অল্প পরিমাণে এসে পড়েছে।

'জীবনস্মৃতি'তে কবি লিখেছেন—'বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে-উৎসাহে আর কিছু রচনা করি নাই।'

কালমৃগয়া

দশরথকর্তৃক অন্ধ মুনির পুত্রবধ বিষয়ে নাটিকা। বোধ হয়, 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র পরে লেখা হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'জীবন-স্মৃতি'তে এটিকে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র পূর্ববর্তী লেখা বলেছেন। ২৩এ ডিসেম্বর, ১৮৮২ বিদ্বজ্জন-সমাগম উপলক্ষে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অভিনীত হয়। ১৮৮২তে প্রকাশিত। তাঁর এই বইখানির সঙ্গে তাঁরই 'মায়ার খেলা'র তুলনা দ্রষ্টব্য।

সন্ধ্যাসঙ্গীত ও প্রভাতসঙ্গীত

কবিতা-সংগ্রহ। 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর প্রথম প্রকাশ: ১৮৮২ সালের ৫ই জুলাই,—১২৮৯ সালের আষাঢ়। 'প্রভাতসংগীত' তার পরের বছর ছাপা হয় [১২৯০ সাল,—১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ]।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

১২৯০ সালে কারোয়ারে লেখা। প্রথম প্রকাশ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ এপ্রিল,—১২৯১ সাল। এটি নাট্যকাব্য।

এই বছরেই তাঁর কবিতা-সংগ্রহ 'ছবি ও গান' [ফাল্গুন, ১২৯০'] 'শৈশব সঙ্গীত' [১২৯১] এবং ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' বেরোয়। এই শেষোক্ত সংগ্রহে একুশটি পদ আছে। ১২৮৪ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় এগুলি ছাপা আরম্ভ হয়। ১২৮৪ থেকে ১২৮৮ সালের মধ্যে—এবং ১২৯০ সালেও 'ভারতী'তে 'ভানুসিংহের পদাবলী' ছাপা হয়। বইয়ের আকারে এইসব রচনা প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। বলা বাহুল্য, এর সঙ্গে নাট্যরূপের কোনো সাদৃশ্য নেই।

অতঃপর ১৮৮৬ তে 'কড়ি ও কোমল' কবিতা-সংগ্রহ [১২৯৩] বেরোয়।

নলিনী

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর পরে ১৮৮৪তেই ১০ই মে তারিখে এই নাট্যরচনা প্রকাশিত হয়।

মুকুট

১২৯২ সালে 'বালক' পত্রে প্রকাশিত ক্ষুদ্রায়তন উপন্যাস। পরে, ৩১এ ডিসেম্বর, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে 'বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকদের দ্বারা অভিনীত' হবার জন্যে এটিকে নাট্যরূপে রূপান্তরিত করা হয়।

মায়ার খেলা

প্রথম প্রকাশ—১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ। গীতিনাট্য। শ্রীযুক্ত পি কে রায়ের সহধর্মিণী সরলা রায়ের অনুরোধে এ-নাটিকাটি লেখা হয়। ১২৯৫ সালের ১৩ই, ১৪ই, ১৫ই পৌষ সখি-সমিতির মহিলা-শিল্প-মেলায় বা মহিলা-শিক্ষা-মেলায় অভিনয় উপলক্ষে এই বই ছাপা হয়—এবং যাঁর অনুরোধে এ বই লেখা হয়, তাঁকেই উৎসর্গ করা হয়। এটিকে 'গীতমুখ্যনাটক' বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়—এটি তাঁর 'অকিঞ্চিৎকর গদ্য নাটিকা' 'নলিনী'র 'সংশোধন স্বরূপ' গ্রাহ্য। আবার—'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, 'মায়ার খেলা' তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা।'—'জীবনস্মৃতি'।

রাজা ও রানী

১২৯৬ সালে [১৮৮৯] প্রথম প্রকাশ। এটি নাট্যকাব্য। ১৩৩৬ সালে 'রাজা ও রানী'র গল্পাংশ 'তপতী' নাটকে নতুন ক'রে পরিবেষিত হয়।

বিসর্জন

এ নাটকখানি রবীন্দ্রনাথের উনত্রিশ-ত্রিশ বছর বয়সে, ১২৯৭ সালে [১৮৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দে] 'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্রথমাংশ থেকে নাট্যাকারে রচিত ও প্রকাশিত হয়। ১৩০৩, ১৩০৬ এবং ১৩৩৩ সালে বিভিন্ন সংস্করণে নতুন নতুন পরিবর্তন সাধিত হয়।

এই ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দেই কবিতা-সংগ্রহ 'মানসী' ছাপা হয়। ১২৯৪-১২৯৭ সালের মধ্যে লেখা এই কবিতা-সংগ্রহের প্রথম প্রকাশের তারিখ ১২৯৭, পৌষ।

চিত্রাঙ্গদা

এ রচনা ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের কোনো-এক তারিখ থেকে অক্টোবর মাসের কোনো-এক তারিখের মধ্যে লেখা। এই 'চিত্রাঙ্গদা' নাটক তাঁর উড়িষ্যা ভ্রমণের সময়ে লেখা হয়। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে [২৮এ ভাদ্র, ১২৯৩] গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। অনেকদিন পরে, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কবি এটিকে নৃত্যনাট্যের রূপ দেন।

গোড়ায় গলদ

প্রহসন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে [৩১এ ভাদ্র, ১২৯৯] প্রকাশিত।

সোনার তরী, ছোট গল্প ইত্যাদি,

১২৯৮ সালের ফাল্গুন থেকে ১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে যে সব কবিতা লেখা হয়, সেগুলি 'সোনার তরী'তে সন্নিবেশিত হয় এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে [১৩০০ সাল] এ-সংগ্রহ প্রকাশিত।

এই ১৮৯৪ তেই তাঁর প্রথম গল্প-সংগ্রহ' 'ছোট গল্প' [১৫ ফাল্গুন, ১৩০০],—১২৯৮-১৩০১এ 'সাধনা'য় প্রকাশিত গল্পগুলি যথাক্রমে 'বিচিত্র গল্প' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে এবং 'কথা-চতুষ্টয়'-এ [১৩০১] প্রকাশিত হয়।

বিদায়-অভিশাপ

এও তাঁর কাব্য-নাটিকা। রচনার সময় ১২৯৯ সাল অথবা ১৩০০

রালের ২৬এ শ্রাবণ। ১৩০০ সালের মাঘ মাসের 'সাধনা' পত্রিকায় এ-লেখা প্রথম প্রকাশিত হয়। ১০ই মে, ১৯১২ তারিখে পৃথক গ্রন্থাকারে 'বিদায় অভিশাপ' নাট্যকাব্য প্রকাশিত হয়।

চিত্রা

কবিতা-সংগ্রহ। ১৩০০ সালের মাঘ মাস থেকে ১৩০২ সালের ২০এ ফাল্গুনের মধ্যে এ-কবিতাগুলি লেখা। ১৮৯৬এ [ফাল্গুন, ১৩০২] গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। এই বছরেই 'নদী' নামে অতি ছোট আয়তনের এক কাব্য প্রকাশিত হয়। ২২-এ মাঘ, ১৩০২ সালে কবির ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিণয়-দিনে তাঁকে 'নদী' উপহার দেওয়া হয়।

মালিনী

সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থাবলীতে [১৫ই আশ্বিন ১৩০৩] 'মালিনী' প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে এ-নাটিকা পৃথক পুস্তকাকারে দেখা দেয়।

বৈকুণ্ঠের খাতা

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে—অর্থাৎ ১৩০৩ সালের চৈত্র মাসে এই প্রহসন প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রসিদ্ধ প্রবন্ধমালা 'পঞ্চভূত' এই বছরেই বই হয়ে বেরোয়।

কাহিনী

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে, ২৪-এ ফাল্গুন, ১৩০৬, এই নাট্যকাব্য ও কবিতার সংগ্রহ ছাপা হয়। এর আগের বছর, অর্থাৎ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে—কিন্তু, মাত্র মাস-তিনেক আগেই, তাঁর 'কণিকা' ছাপা হয়। 'কাহিনী'র মাস-দুয়েক পরে বেরিয়েছিল কবিতা-সংগ্রহ 'কল্পনা' এবং আরো কয়েক মাস পরে 'ক্ষণিকা'।

১৮৮১ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লেখা তাঁর রচনাবলীর এই তালিকায় তাঁর 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'রুদ্রচণ্ড', 'কালমৃগয়া' 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'নলিনী',

'মায়ার খেলা', 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন', 'চিত্রাঙ্গদা' [কাব্য ও নৃত্যনাট্য], 'গোড়ায় গলদ', 'বিদায় অভিশাপ', 'মালিনী', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' এবং 'কাহিনী—নাট্যলক্ষণে চিহ্নিত এই ক'খানি বইয়ের নাম দেখা যাচ্ছে। 'গোড়ায় গলদ' বা 'বৈকুণ্ঠের খাতা' যে-জাতের নাটক, এই তালিকার অন্যগুলি সে-জাতের নয়। এগুলিকে কাব্যনাট্য, নাট্যকাব্য,—কখনো বা গীতিনাট্য বলা হয়েছে। তবে, নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি যে কেবল দু'চারখানি মাত্র প্রহসন লিখেছিলেন,—আর বাকি সবই যে কাব্যনাট্য, তাও নয়। 'বালক' পত্রিকায় এবং 'ভারতী'তে ১২৯২ থেকে ১২৯৪ সালের মধ্যে তাঁর অনেকগুলি [১২৯২ সালে ন'টি,—১২৯৩ সালে তিনটি, এবং ১২৯৪ সালে একটি,—মোট এই তেরটি] কৌতুক-নাটিকা ছাপা হয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে—ডিসেম্বর মাসে,—তাঁর 'ব্যঙ্গকৌতুক' প্রকাশিত হয়। তাতেও কিছু নাট্যধর্মী রচনা সংকলিত হয়। তাঁর 'চিরকুমার সভা' [১৩০৭-৮ সালে 'ভারতী'তে প্রকাশিত], 'শারদোৎসব,'—এবং বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকদের অভিনয়ের জন্যে লেখা তাঁর 'মুকুট' [১২৯২ সাল]—তিনখানি বইয়েরই প্রথম প্রকাশকাল ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এর নাট্যরূপ 'প্রায়শ্চিত্ত' বেরিয়েছিল। তারপর ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বেরিয়েছে 'রাজা',—১৯১২তে 'ডাকঘর' এবং 'অচলায়তন',—১৯১৬তে 'ফাল্গুনী',—১৯১৮তে 'অচলায়তনে'র অভিনয়যোগ্য সংস্করণ 'গুরু',—১৯২০তে 'রাজা'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'অরূপরতন',—১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে 'শারদোৎসবে'র অভিনয়যোগ্য সংস্করণ 'ঋণশোধ',—১৯২২-এ 'মুক্তধারা'—১৯২৩-এ তাঁর গীতিনাট্য 'বসন্ত'—এবং ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে 'গৃহপ্রবেশ' নাটিকা। তাঁর নাট্যরচনাবলীর প্রবাহে ১৯২৬ সাল একটি স্মরণীয় বছর! আগের বছরে যেমন তাঁর একটি গল্পের নাট্যরূপ 'গৃহপ্রবেশ' বেরিয়েছিল,—১৯২৬এ তেমনি—'কর্মফল' গল্পের নাট্যরূপ 'শোধবোধ' বের হয়। 'কর্মফল' অবিশ্যি অনেক আগেকার লেখা [২২এ ডিসেম্বর ১৯০৩]। 'গৃহ-প্রবেশ'-এর মূল গল্প 'শেষের রাত্রি'ও আগেকার রচনা [১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ]। সে যাই হোক্, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁর 'নটীর পূজা', 'ঋতু-উৎসব' [নাট্য-সংগ্রহ] এবং 'রক্তকরবী'—সবই বই হয়ে বেরোয়। এইভাবে,—তাঁর কলমে বিচিত্র নাট্য-রচনার যেন আর অন্ত ছিলনা! নাটকের পথ ধরে তিনি জীবনের হাসির দিকটাও দেখিয়েছেন, কান্নার দিকটাও দেখিয়েছেন!

নিজের মনের কাব্যাবেগ-প্রবণতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ খুবই সজাগ ছিলেন। গদ্য, পদ্য, নাটক—সব ক্ষেত্রেই তিনি নিজের লেখা বার বার সংশোধন ক'রেছেন। শিল্পী হিসেবে সে তাঁর গভীর অতৃপ্তিবোধেরই নিদর্শন! তাঁর নাট্যপ্রবাহে তাঁরই নিজের কলমে 'অচলায়তন' কেটে 'গুরু' হয়েছে,—'রাজা ও রানী' কেটে 'তপতী' [১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে] হয়েছে—'প্রায়শ্চিত্ত' থেকে 'পরিত্রাণ' দেখা দিয়েছে! শেষ দিকে, নৃত্যনাট্যের মধ্য দিয়ে তিনি অন্যতর কোনো পথ খুঁজছিলেন। ১৯৩৪এ 'শ্রাবণগাথা' গীতিনাট্যের পরে ১৯৩৮এ নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা, আর ১৯৩৯এ 'শ্যামা' বেরোয়। শেষ দিকের গীতি-নাট্য-নৃত্যনাট্যই হোক্, আর, প্রথম দিকের কাব্যনাট্যই হোক্,—অথবা তাঁর প্রতীক-নাটকগুলির কথাই ধরা যাক্,—সব ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের নাটক যেন প্রধানতঃ কাব্য, গৌণতঃ নাটক! তাঁর প্রতীক-নাটকগুলিতে সংঘাত যতোটা—সংঘাতের কাব্যাবেগই ততোধিক কথা! 'বিসর্জন', বা 'মালিনী' প্রতীক-নাটক নয় বটে, কিন্তু সে-সব ক্ষেত্রেও গভীর আবেগ চোখে পড়ে। বাইরের সংঘাত আছে কি নেই, সেটাই যে একমাত্র প্রশ্ন, তা নয়। বিস্ময় এই যে,—তাঁর নাটকে ঘাত-প্রতিঘাত সবই যেন বাঁশি হয়ে বেজে ওঠে,—আর, আমরা ভাবতে বাধ্য হই—সে বাজনা 'বনমাঝে কি মনমাঝে'? বাইরে না ভেতরে?

'কাব্যনাট্য' কথাটাই একরকম অন্বয়ের ইশারা! যেখানে কবিতাও আছে, নাটকেরও ঘাত-প্রতিঘাত ঘটেছে—সেই রকম রচনাকেই বলা হয় 'কাব্যনাট্য'। আবার, নাটকের প্রাধান্য মেনে নিয়ে যেখানে কবিতার মিশ্রণ স্বীকৃত, তারই নাম 'নাট্যকাব্য'।

এ-ধরনের লেখার প্রকৃতি নাটক-ঘেঁষা হলেও লেখকরা কবিতা-রীতির ওপর নির্ভর করেন ব'লে এই শ্রেণী-নামের সঙ্গে 'কাব্য'-অংশটুকু জড়িত থেকেই যায়। এবং কবিত্বের কথা উহ্য রাখলে, নাটকের প্রধান প্রধান লক্ষণ বলতে যা বোঝায়,—নাট্যকাব্যে সেই সব লক্ষণই সুস্পষ্ট।

সাহিত্যের আসরে গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদির তুলনায় কবিতার আয়ুই যে সর্বাধিক, সে-কথা মানতেই হয়। আমাদের আদি ও অকৃত্রিম, ইন্দ্রিয়-

বেদনাময়, সনাতন শরীরী সত্তা যেটি,—তার সুখ-দুঃখের সুদীর্ঘস্থায়ী ঢেউ থেকে যায় প্রত্যেক যুগের কবিতায়! নাট্যকাব্যে ঘাত-প্রতিঘাত বা সংঘাত-সংঘর্ষের কাহিনী কিছু পরিমাণে থাকে বটে,—তবে তার আবেদন নির্ভর করে সেইসব ঢেউয়ের অকৃত্রিমতার ওপরে,—অর্থাৎ কবির হৃদয়াবেগের সততাতে আর তীব্রতাতে! অর্থাৎ কবিতাকে সহায়ক বাহন হিসেবে পেয়ে, এ-ক্ষেত্রে নাটক যেন সুদূরগামী হয়ে ওঠে!

প্রত্যেক যুগেই সাহিত্যের পুরোনো রীতি, পুরোনো কায়দা-কানুন, পুরোনো রুচি ইত্যাদি বদ্‌লে যাচ্ছে। জীবের আজকের কথা কাল থাকে না, কালকের রঙ পরশু ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু তবু সবই কি শেষ হয়ে যায়? কিছুই কি থাকে না? আমাদের পরিচয়ের যে অংশটা সাময়িক, সেটাই পুরোনো হতে পারে,—সময়ের সেইটাই প্রত্যক্ষ সীমানা! কিন্তু দু'চার পুরুষের সাময়িকতাকেও যা ছাড়িয়ে যায়,—দেশে-কালে ব্যক্ত হলেও যা দেশ-কালের অধীনস্থ নয় বলেই বিশ্বাস হয়, তাকেই আমরা চিরন্তন সত্য বলে জানি। কবিতায় মানব-সমাজের অস্তিত্বের সেই সময়াতীত পরিচয় থেকে যায়। নাটকও পুরোনো হয়ে যায়,—গল্প-উপন্যাসও পড়া হলেই একরকম 'জানা হোলো' বলা যায়। কিন্তু সত্যিকার ভালো কবিতা যেন চিরকালের ঢেউ! কাব্যনাট্যে বা নাট্যকাব্যে—সেই ঢেউ ধরে অনুভূতি-সংঘাতকে বাঁচিয়ে রাখবার নাটকীয় আয়োজন! একালের বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের কলমেই সে-আয়োজন প্রথম সার্থক হয়ে ওঠে।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে 'রুদ্রচণ্ড', 'ভগ্নহৃদয়', 'কালমৃগয়া' এবং 'বাল্মীকি-প্রতিভা' —নাটক আর কবিতার মিশ্রণে রবীন্দ্রনাথের এই চারটি রচনা প্রকাশিত হয়। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' এবং 'কালমৃগয়া' যথাক্রমে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিদ্বজ্জনসমাগম-সভার অধিবেশনের জন্যেই লেখা হয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নতুন ক'রে লিখে, প্রথমে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে,—তারপর স্টার-থিয়েটারে যথারীতি প্রবেশ-মূল্যের ব্যবস্থা ক'রে অভিনয় করানো হয়। প্রভাতবাবু বলেছেন যে, বোধ হয় 'পাবলিক রঙ্গমঞ্চে কবির অভিনয়ও এই প্রথম এবং টিকিট বেচিয়া

অর্থসংগ্রহও এই প্রথম।' তার তিন বছর পরে, সখী-সমিতির মেলায় অভিনয়ের জন্যে রবীন্দ্রনাথ 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য লিখে দেন। সেটা ১৮৯৫-এর পৌষ মাসের কথা। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' এবং 'কালমৃগয়া'র পরে একে-একে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'মায়ার খেলা', 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন' ইত্যাদি রচনার ধারা এগিয়ে গেছে। সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন', 'চিত্রাঙ্গদা'—এবং আরো কোনো কোনো নাট্য-রচনায় তিনি এই একটি কথাই বলতে চেয়েছিলেন যে, প্রেম যখন আত্মকেন্দ্রিক এবং ভোগপ্রধান, তখন তা অকল্যাণকর। যাতে আমাদের কল্যাণ, সে কেবলমাত্র ভোগাত্মক ব্যাপার নয়! এ তাঁর অন্যতম প্রধান কথা।

এই ধরনের গভীর, ব্যাপক, সম্প্রদায় অতিশায়ী জীবন-সত্যের উদ্ঘাটনেই নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ চোখে পড়ে। যেমন তাঁর অন্তর্মুখিতা, তেমনি তাঁর এই ব্যাপ্তি-চেতনা! তাঁর নাটকে তাঁর শিল্পিমনের এই দুটি বিশেষত্বই পাশাপাশি বিদ্যমান। 'অচলায়তন', 'রাজা', ডাকঘর', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি নাটক তাঁর সেই গভীর, ব্যাপক জীবন-সত্যবোধের দর্পণ। তাঁর যে সত্যবোধ সম্বন্ধে এখানে বার বার 'ব্যাপক' বিশেষণটি ব্যবহার করা হোলো, সে-সত্যের আর একটি উদাহরণ দিতে হলে তাঁর শেষ পর্বের 'কালের যাত্রা'র কথা বলা যেতে পারে। শরৎচন্দ্রের সপ্তপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব উপলক্ষে ১৩৩৯ [১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ] সালের ভাদ্র মাসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কালের যাত্রা' নাটিকাটি তাঁরই নামে উৎসর্গ করেন। সে-নাটিকার মূল বিষয়টি তিনি নিজেই সংক্ষেপে তাঁর এক চিঠিতে জানিয়ে গেছেন। ১৩৩৯ সালের কার্তিক সংখ্যার 'বিচিত্রা' থেকে তাঁর সেই চিঠির অংশ রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বাবিংশ খণ্ডের 'গ্রন্থ-পরিচয়' অংশে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ এইভাবে বর্ণনা করেন—'রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে মহাকালের রথ অচল। মানবসমাজের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি, কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধবন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই

আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে; তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।' এও তাঁর অন্যতম বিশ্বাস!

অবশ্য এ অনেক পরের কথা। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের সেই আদি পর্বের অনুশীলন থেকে ধ'রলে ১৮৯৬ এর 'মালিনী' পর্যন্ত সুদীর্ঘ পনেরো বছরের যে বিস্তার, —তাঁর 'রুদ্রচণ্ড' সেই আদি-পর্বের প্রাচীনতম রচনাগুলির মধ্যে গণ্য। তাতে পথ-সন্ধানের নানা চেষ্টা এবং বিভিন্ন ত্রুটির চিহ্ন আছে। কিন্তু ব্যাপ্তি এবং গভীরতার পরিচয় তাঁর সেই আদি রচনাতেও বিদ্যমান! এখানে এ লেখাটিরও বিশ্লেষণ দরকার।

প্রতিহিংসা-সর্বস্ব রুদ্রচণ্ড চেয়েছিলেন পৃথ্বীরাজের হত্যা! 'রুদ্রচণ্ড' নাটিকায় এই উগ্র, তীব্র, ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসার ছবিতে—'পাণ্ডুবর্ণ আঁখি-মুদা ছিন্ন মুণ্ড তার'—লাইনটি অনবদ্য! 'কালমৃগয়া'র চতুর্থ দৃশ্যে বনদেবীদের গানে আছে—

'রাখ্ রে কথা রাখ্, বারি আনা থাক্
যা ঘরে যা ছুটে!'

রবীন্দ্রনাথের এসব রচনা রচনাবলীর অচলিত-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। তিনি নিজে তাঁর প্রবীণ বয়সেও তাঁর সেই আদি-পর্বের রচনা সম্বন্ধে খুবই কুণ্ঠিত ছিলেন। সংগ্রহের 'ভূমিকা'য়—জীবনের শেষ পর্বে, তিনি ব'লে গেছেন—'সব কিছুকে নির্বিচারে রাশীকৃত করলে সমগ্রকে চেনা যায় না। সাহিত্য রচয়িতারূপে আমার চিত্তের যে একটি চেহারা আছে সেইটিকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করা যেতে পারলেই আমার সার্থকতা। অরণ্যকে চেনাতে গেলেই জঙ্গলকে সাফ করা চাই, কুঠারের দরকার।'

তাঁর পরমাশ্চর্য পরিণত কবিচেতনা দিয়ে—প্রথম বয়সের এই লেখাগুলি দেখতে গিয়ে তাঁকে যে কুঠারের কথা ভাবতে হয়েছিল,—সে তাঁর এই কথাতেই সূচিত! পূর্বোক্ত উদ্ধৃতির 'আঁখি-মুদা' বা 'বারি' শব্দগুলি আর যাই হোক, কাব্যের ভাষাগত সংগতির উদাহরণ নয়! তাঁর পরিণত বয়সের রচনায় শব্দ বা নামের এরকম দুর্বলতা নেই। 'পাঁচমুড়া' পাহাড়,—'শোণপাংশুদল', —বা তাঁর 'নন্দিনী',—'রঞ্জন',—'অঞ্জনা, 'রঞ্জনা' ইত্যাদি নাম, কিংবা তাঁর উপন্যাসে ব্যবহৃত উপমাসমৃদ্ধ পুরো একটি গদ্য-বাক্য—'ফেলে দেওয়া খবরের

কাগজের পাতাগুলো ফর ফর করে এধারে ওধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, মজা লাগছিল দেখতে, মনে হচ্ছিল, মূর্তিমতী জনশ্রুতির এলোমেলো নৃত্য',—অথবা তাঁর প্রবন্ধের লাইন—'অহংকার না হলে বিচ্ছেদ হয় না, বিচ্ছেদ না হলে মিলন হয় না, মিলন না হলে প্রেম হয় না'—এসব ক্ষেত্রে তাঁর ঐ প্রথম বয়সের 'আঁখি-মুদা', বা 'বারি'র মতন শব্দগত অসামঞ্জস্যের চিহ্নও নেই ! 'শেষরক্ষা'য় প্রথম দৃশ্যের শেষদিকে ইন্দু বলেছিলেন—'নামের দাম কম নয় দিদি। ভেবে দেখো তো, দৈবদুর্যোগে 'গদাই' যদি কাননকুসুমিকার কবি হোতো, তাহলে কবির নাম জপ করবার সময়ে দিদি কি মুস্কিলেই পড়তো ! ভক্তি হোতো না, সুতরাং মুক্তিও পেতো না।' শুধু তাই নয়, ইন্দু সরাসরি বলেই দিয়েছিলেন—'আমার স্বয়ম্বর-সভার নিমন্ত্রণের ফর্দ থেকে 'গদাই' নামটা কাটা পড়লো।' হাস্যপরিহাসময় এইসব উক্তিতেও তাঁর শব্দগত সামঞ্জস্যচিন্তা একই ভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

'আঁখি-মুদা' বা 'বারি' বা ঐ ধরনের পূর্বাপরসংগতিহীন অন্যান্য শব্দ তিনি যখন ব্যবহার করেছেন, তাঁর শব্দবোধ তখনো প্রত্যাশিত তীক্ষ্ণতায় পৌঁছোয়নি। কবি-জনোচিত অনুভূতিই তাঁর প্রধান সম্বল ছিল বটে, কিন্তু সেই অনুভূতির যোগ্য শাসন বা সমুচিত নিয়ন্ত্রণ ঘটেনি তখনো। সে তাঁর ছেলেবেলার অপরিণত সৃষ্টি-পর্ব !

সেই ছেলেবেলার প্রথম কাব্যচর্চার কথা তিনি নিজেই লিখে গেছেন। গুণেন্দ্রনাথের বড়ো বোন ছিলেন কাদম্বিনী দেবী। জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় [১৮৫৫-১৯১৯] তাঁরই সন্তান। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ তাঁকেই তাঁর কাব্যচর্চার প্রথম উৎসাহদাতাদের অন্যতম বলে গেছেন। তাঁর বয়স যখন মাত্র সাত-আট বছর, সেই সময়ে একদিন দুপুরে জ্যোতিঃপ্রকাশ তাঁকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে, পয়ারছন্দের রীতি-পদ্ধতি বুঝিয়ে দিয়ে, পদ্য লেখবার ফরমাশ দেন। তারপর ঠাকুরবাড়ির কোনো-এক কর্মচারীর কৃপায় নীল কাগজের একখানি খাতা এসেছিল। নর্মাল স্কুলের ছাত্রাবস্থায় সেখানকার প্রধান শিক্ষক সাতকড়ি দত্তের কাছে তিনি পদ্যচর্চায় উৎসাহিত হন। তারপর জীবনে আরো অনেকের কাছে তিনি প্রেরণা পেয়েছেন, আরো অনেকের পরামর্শ শুনেছেন। ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের বাংলা-চর্চা ভালোই হয়েছিল! হিমালয়ে পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছে সংস্কৃত

ঋজুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে তাঁর সংস্কৃতচর্চা শুরু হয়। মহর্ষি নিজে তাঁর এই ছেলেটিকে—একেবারে শুরু থেকেই স্বাধীন রচনার কাজে নিযুক্ত করেন।

'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'অবোধবন্ধু পত্রিকা', 'বঙ্গদর্শন'—পর পর অন্ততঃ এই তিনখানি পত্রিকা থেকে বাল্যাবস্থায় ভাষা-সাহিত্য চর্চায় তিনি উৎসাহ পেয়েছেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'পৌল-বর্জিনী' অনুবাদ, আর, বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'নিসর্গসন্দর্শন', 'বঙ্গসুন্দরী', 'সুরবালা' তিনি 'অবোধবন্ধু'তেই প্রথম পড়েন। 'বঙ্গদর্শন'-এর মধ্য দিয়ে আরো বিস্তীর্ণ সমসাময়িক সাহিত্য-জগৎ তাঁর তরুণ মনের গোচর হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র এগারো বছর। ১৮৭২-এ 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। তার পরের বছর, ১৮৭৩-এর মার্চ মাসে বোলপুরে তিনি 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' নামে এক কাব্য লিখে ফেলেন। সে ঘটনার প্রায় আট বছর পরে—২৫এ জুন, ১৮৮১ 'রুদ্রচণ্ড' প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে, রুদ্রচণ্ড সম্ভবতঃ সেই 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়'-এরই 'নাটকীয় রূপান্তর'।[৪]

জ্যোতিদাদার নামে 'রুদ্রচণ্ড' বইখানি উপহার দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

ছেলেবেলা হতে, ভাই, ধরিয়া আমারি হাত
অনুক্ষণ তুমি মোরে রাখিয়াছ সাথে সাথ।

'রুদ্রচণ্ড' গীতিনাট্য' নয়,—অন্য বিশেষণহীন নাটিকা মাত্র। তবু এটিও গীতিকাব্যেরই আবেশময় রচনা। সুকুমার বাবু এটিকেও 'গাথাকাব্য'—এবং রবীন্দ্রনাথের শেষ গাথাকাব্য ব'লেছেন।

'রুদ্রচণ্ডে'র বিষয়বস্তু সাধারণ। হস্তিনাপুরের রাজা পৃথ্বীরাজের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে প্রতিশোধ-কামনায় রুদ্রমূর্তি ও চণ্ডস্বভাব হয়ে রুদ্রচণ্ড অরণ্যবাসী হন। এদিকে পৃথ্বীরাজের সভাসদ চাঁদকবি তাঁরই কন্যা অমিয়ার প্রতি স্নেহশীল। এ মমতা বোনের প্রতি ভাইয়ের আকর্ষণ। তাঁদের

৪। 'নাটকের ভাষা অত্যন্ত কাঁচা। আমাদের মনে হয় বিলাত যাইবার পূর্বে তাড়াতাড়িতে নূতন কিছু সৃষ্টি-প্রেরণার অভাবে পুরাতন রচনাটাকে নূতন কলেবরে সাজাইয়া 'জ্যোতিদাদা'কে উপহার দেন।'
—রবীন্দ্র-জীবনী [১৩৫৩] প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯০।

এই সাক্ষাতে-সান্নিধ্যে রুদ্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হন। একদিন চাঁদকবি অমিয়াকে গান শেখাচ্ছেন দেখে, রুদ্রচণ্ড তাঁকে আক্রমণ করেন! কিন্তু দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত হয়ে চাঁদকবির কাছেই তাঁকে প্রাণ ভিক্ষা ক'রতে হয়! অমিয়া তখন সংজ্ঞাহীন। অমিয়াকে সেই অবস্থায় ফেলে রেখে, অনিবার্য রাজকার্যে, চাঁদকবিকে রাজসভায় যেতে হয়। রুদ্রচণ্ডের রাগ-দ্বেষ ক্রমশঃ বেড়ে ওঠে। অমিয়া চাঁদকবির সন্ধানে হস্তিনাপুরের পথে বেরিয়ে পড়েন, কিন্তু দেখা হয় না। এদিকে দেশে তখন শত্রুর আক্রমণ শুরু হয়েছে। পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করবার জন্যে মহম্মদ ঘোরী রুদ্রচণ্ডের সাহায্য দাবি ক'রলে রুদ্রচণ্ড নিজের হাতে পৃথ্বীরাজকে হত্যা করবার ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। আবার, চাঁদকবি যখন সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে চলেছেন, অমিয়া তখন তাঁরই মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে চাঁদকবিরই শেখানো গান—'তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল'—গাইতে থাকেন। সে গান চাঁদকবির কানে পৌছলেও যুদ্ধের গুরুকর্তব্যে গায়িকাকে খুঁজে দেখবার সময় ছিলনা তাঁর। তাই হতাশ হয়ে নিজের পিতার আশ্রয়ে,—অরণ্যে ফিরে যেতে হয় অমিয়াকে। ইতিমধ্যে যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ নিহত হন।

রুদ্রচণ্ড এ-খবর পেয়ে বড়ই শূন্যতা বোধ করেন। এই ব্যর্থতার ফলেই তাঁর আত্মঘাত ঘটে! অরণ্যে ফিরে,—অমিয়া সে-দৃশ্য দেখে বিহ্বল হন বটে, কিন্তু মৃত্যুর আগে রুদ্রচণ্ডের মুখে 'মা' ডাক শুনে কন্যা বলেন—

'এসেছি পিতার কোলে বড় শ্রান্ত হোয়ে
সেথা তুমি যাবে পিতা যাব সাথে সাথে,
যা তুমি বলিবে মোরে সকলি শুনিব,
তোমারে তিলেক তরে ছাড়িব না আর।'

এ-উক্তি দ্বাদশ দৃশ্যের ঘটনা। অতঃপর আরো দুটি দৃশ্য আছে। ত্রয়োদশ দৃশ্যটি কেবলমাত্র চাঁদকবিরই উক্তি। এ-দৃশ্যে পৃথ্বীরাজের নিধন আর অমিয়ার নিরুদ্দেশ অবস্থার জন্যে চাঁদকবির বিলাপ-ব্যাকুলতাই একমাত্র বক্তব্য। তারপর, শেষ দৃশ্যে অমিয়া এবং চাঁদকবির সাক্ষাৎ—এবং মুমূর্ষু অমিয়ার মৃত্যু বর্ণনা করা হয়েছে।

জীবনের প্রথম পর্বে এইসব ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শব্দ-শিক্ষার কবিজনোচিত অসন্তোষ ভোগ করছিলেন বললে অন্যায় হবে না। তাঁর শেষ

জীবনের অচলিত-সংগ্রহের ভূমিকাটিই তার প্রমাণ। পরবর্তী রচনায় জীবনের নানা অভিজ্ঞতার প্রতিফলনে,—তাঁর কাব্যের বিষয়, রীতি, সবই পরমাশ্চর্য সার্থকতায় পৌঁছেছিল। এখানে সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রসাহিত্যের-পাঠকমাত্রেরই সে-সব জানা কথা। শেষ-পর্বের কবিতায় 'স্থকিত', 'দুর্ভর', 'কলোল্লোল', 'বিনষ্টি', 'রশ্মিপ্লাবী নিরস্ত নির্ঝর',—আবার 'বাল্যপনা', 'সভ্যনামিক পাতাল', 'রোষে গরোগরো', 'যমালয়ের ডাণ্ডাগুলি' ইত্যাদি নানান ধরনের শব্দ দেখা দিয়েছে খুবই সুসংগতভাবে। কিন্তু প্রথম পর্বের প্রকৃতি আলাদা।

তবে, প্রথম পর্বে তাঁর রচনার সব জায়গায় তাঁর অনুভূতির দুর্বলতাই যে কেবল চোখে পড়ে, তা নয়। 'কবি-কাহিনী'র কবি লিখেছিলেন :

পৃথিবীতে হেন ভাষা নাইক, মনের কথা
পারে যাহা পূর্ণভাবে করিতে প্রকাশ
ভাব যত গাঢ় হয়, প্রকাশ করিতে গিয়া,
কথা তত নাহি পায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া,...

তবু তাঁর 'বনফুল' কাব্যে 'কাপড় চোপড়'-এর মতন অন্ততঃ একটি অত্যন্ত অসংগত শব্দ-সমাবেশের উদাহরণ কে না লক্ষ্য করেছেন?[৫] সেখানে—মিলও সাধারণ, শব্দও দুর্বল। তারই কয়েক ছত্র পরে,—'মোহিনী কল্পনে! আবার আবার'—গানটি অতিরিক্ত দৈর্ঘ্যে সামঞ্জস্যের সমস্ত শাসন উপেক্ষা ক'রেছে। 'আইস', 'আইল' ইত্যাদি ক্রিয়াপদেরও অন্ত নেই। কানে ছন্দের ত্রুটিও ধরা পড়ে, যেমন—

পৃথিবী ছাড়া এ আঁখি, স্বর্গের আড়ালে থাকি
পৃথ্বীরে জিজ্ঞাসে 'কে তুমি? কে তুমি?
মধুর মোহের ভুল, এ মুখের নাই তুল
স্বর্গের বাতাস বহে এ মুখটি চুমি।

'বিহ্বল'-এর সঙ্গে মিল দিতে গিয়ে গলা-কে 'গল' করা হয়েছে; 'আকাশ পাতাল'-এর সঙ্গে 'ঘোর গোলমাল' মেলানো হয়েছে! কিন্তু এতৎসত্ত্বেও

৫। এই বইয়ের ৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সেই সুদূর আদি-পর্বে 'ভগ্নহৃদয়'-এর কবি তাঁর অনুভূতির ঐশ্বর্যের চিহ্নও রেখে গেছেন, যেমন—

প্রাণের সমুদ্র এক আছে যেন এ দেহ মাঝারে
মহা উচ্ছ্বাসের সিন্ধু রুদ্ধ এই ক্ষুদ্র কারাগারে
মনের এ রুদ্ধস্রোতে দেহখানা করি বিদারিত
সমস্ত জগৎ যেন চাহে সখি করিতে প্লাবিত !

এই অনুভূতির আদি-গরিমা বজায় রেখে,—উত্তরোত্তর প্রকাশের কলাকৌশলকে তিনি সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। সেই বিচিত্র বিজয়যাত্রাই কবির তপস্যা! নাটক-নাটিকার অনুশীলনেও শব্দ-প্রয়োগ ও ভাবাভিব্যক্তির ক্ষেত্রে তিনি সেই তপস্যার পরিচয় রেখে গেছেন !

রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের 'অবতরণিকা'র মধ্যে একটি কথা আছে,—যেটি এই আলোচনার পক্ষে স্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন: 'ফুল ফুটেছে এইটেই ফুলের চরম কথা। যার ভালো লাগলো সেই জিতলো, ফুলের জিত তার আপন আবির্ভাবেই। সুন্দরের অন্তরে আছে একটি রসময় রহস্যময় আয়ত্তের অতীত সত্য, আমাদের অন্তরেরই সঙ্গে তার অনির্বচনীয় সম্বন্ধ।'

এরই পরের অংশে তিনি আরো বলেন: 'সেই কবিকেই মানুষ বড়ো বলে, যে এমন সকল বিষয়ে মানুষের চিত্তকে আশ্লিষ্ট করেছে যার মধ্যে নিত্যতা আছে, মহিমা আছে, মুক্তি আছে, যা ব্যাপক এবং গভীর।'

তাঁর নাটক-নাটিকাতে তাঁর এই নিত্যের মহিমা সন্ধানের চিহ্ন চোখে পড়ে। সাধারণতঃ যে-সব জাগতিক ঘটনার আকর্ষণে এবং মানব-চিত্তের যে-সব সংঘাত-সংঘর্ষের প্রতি উন্মুখতায় নাটক-নাটিকা—সাহিত্যের প্রধান এক শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত,—রবীন্দ্রনাথের নাটক ঠিক সে-রকম নয়।

'বিহারীলাল' নামে তিনি যে প্রবন্ধটি লেখেন,—তাতে 'সারদামঙ্গল' থেকেই তিনি যে তাঁর 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র ভাবটি পেয়েছিলেন,—সে-কথা বলা হয়। বাল্মীকির ব্যক্তিগত অন্তর্দ্বন্দ্বই সে-নাটকের প্রধান বিষয়। তেমনি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সন্ন্যাসী বিশেষ জীবনবোধের কথাই জানিয়ে গেছেন। জীবনের শত বন্ধনের মধ্যে প্রকৃতিরই ষড়যন্ত্র উপলব্ধি করে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন—'একদিন—একদিন নেব প্রতিশোধ।' স্নেহ, প্রেম, দয়া ইত্যাদি

চিত্তসংস্কার দূর ক'রে—নিজের অন্তরে তিনি যে বিজয়গৌরব অর্জন করেন,—তার ফলে তিনি জ্ঞানী হন বটে, কিন্তু শান্তি পাননি! জগতের অন্তহীন নর-নারীর স্রোত চলে যায় তাঁরই চোখের সামনে দিয়ে, অথচ তিনি যেন বড়োই দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন। ক্রমশঃ তাঁর মনে এই বোধ দেখা দেয়:

এ দীর্ঘ পরাণ মোর সংকুচিত করে
পারি কি এদের সাথে মিশিতে আবার!
কি ঘোর স্বাধীন আমি। কি মহা আলয়!
জগতের বাধা নাই—শূন্যে করি বাস।

'বাল্মীকি-প্রতিভায় অথবা 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' মানব-চিত্তের যে-সব ভাবসংঘাত আত্মপ্রকাশ ক'রেছে, 'ভগ্নহৃদয়' [১৮৮১] কাব্যেও কতকটা সেই ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তবু 'ভূমিকা'য় তিনি জানিয়েছেন—'এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন। নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, এমন কি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই। বর্তমান কাব্যটি ফুলের মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে।'

এ থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর আদিপর্বের এইসব রচনাপ্রসঙ্গে 'কাব্য এবং 'নাটক' কথা-দুটির অর্থভেদ সম্বন্ধে তিনি খুবই সজাগ ছিলেন।

বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপ এবং অন্যান্য আচরণের মধ্য দিয়ে নাটকে প্রধানতঃ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত দেখানো হয়। সংঘাত-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে জীবনের কোনো একটা সত্যবোধে পৌঁছে দেওয়াই তার কাজ। 'ভগ্নহৃদয়'-এর—কবি, অনিল,—কবির বাল্যসহচরী এবং অনিলের বোন মুরলা,—অনিলের প্রণয়িনী ললিতা,—নলিনী নামে চপল স্বভাবের এক কুমারী,—মুরলার সখী চপলা,—নলিনীর সখী লীলা, সুরুচি, মাধবী প্রভৃতি এবং—নলিনীরই প্রণয়াকাঙ্ক্ষী সুরেশ, বিজয়, বিনোদ প্রভৃতিকে দেখা যায়। পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা এখানে মোটেই কম নয়। এদের সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনীর ধারা এগিয়েছে। সে কাহিনী সংক্ষেপে এই: কবির বাল্যসখী মুরলা কবিকে খুবই ভালোবাসেন, কিন্তু গোপনে! এদিকে কবি নিজের ভাবেই আবিষ্ট! মুরলা

যখন মনে মনে ভাবছেন—'জানি, কবি, ভাল তুমি বাসনাক মোরে',—তখন কবি তাঁকে সেই ব্যাপ্তি এবং গভীরতার কথা শুনিয়েছেন।[৬] মনের কথা মনে লুকিয়ে রেখে, মুরলা প্রকাশ্যে বলেন :

কবি গো, ও সব কথা ভেবোনাকো আর,
শ্রান্ত মাথা রাখ এই কোলেতে আমার।

কবি বলেন :

কে আছে, কে আছে সখি, এ শ্রান্ত মস্তক মম
বুকেতে রাখিবে ঢাকি যতনে জননী সম !

এই সম্পর্ক উদ্ঘাটনের সঙ্গে-সঙ্গেই 'ভগ্নহৃদয়'-এর প্রথম সর্গ শেষ হয়। দ্বিতীয় সর্গে নলিনী নামে এক রূপসী—বিনোদ, প্রমোদ, অশোক, বিজয়, সুরেশ প্রভৃতি যুবকের হৃদয় অধিকার ক'রে আছেন ব'লে শোনা যায়। মুরলার ভাই অনিলের ফুলশয্যার উৎসবে যাবার আয়োজন চ'লেছে। সখীরা নলিনী-সুন্দরীকে সাজিয়ে দিচ্ছেন। আগের সর্গে কবিকে যেমন নিজের ভাবে আবিষ্ট থাকতে দেখা গেছে, দ্বিতীয় সর্গে নলিনীও তেমনি নিজের রূপমোহে বড়োই স্বাধিকারপ্রমত্তা! তৃতীয় সর্গে মুরলা এবং অনিল, দুটি ভাই-বোনের কথা। তবে, নাটকের পক্ষে সে কথোপকথন বড়োই অসংগত,—উচ্ছ্বাসময় এবং দীর্ঘ! কিন্তু 'ভগ্নহৃদয়'-কে নাটক না ব'লে 'কাব্য' ব'ললে সে দোষ কতকটা কেটে যায়। অনিলের কথা দিয়েই সর্গ শুরু হয়েছে এবং রচনাবলী-সংস্করণের একটানা পঁয়তাল্লিশ লাইন ছাপা হরপের স্রোত বইয়ে দিয়ে,—অনিল তাঁর বোনকে শুধু এই কথাই বলেছেন যে, তাঁর হাসিটি বড়ো করুণ, তাঁর মনটি বড়ো বেদনাতুর,—সমস্ত জীবন তিনি যদি এই বিষাদ-স্বভাবের মধ্যেই নিজেকে অন্তরীণ রাখেন, তাহলে

আপনার পানে তবে চাহিয়া দেখিবি যবে
দেখিবি জীবন দিন সন্ধ্যা হয় হয় !
যে মেঘ মাঝারে থাকি উদিলি প্রভাতে
সেই মেঘ মাঝে থাকি অস্তে গেলি রাতে।

৬। ২৮৫ পৃষ্ঠায় কাব্যাংশের উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

মুরলা স্বীকার করেন যে,

সুখ দুঃখ দিনরাত মিলিয়া উভয়ে
রেখেছে সায়াহ্ন করি এ শান্ত হৃদয়ে।

এবং মনের এই সায়াহ্ন-দশার কারণটিও তিনি তাঁর ভাইকে জানিয়েছেন! এসব ক্ষেত্রে বাস্তব সমাজের রীতিনীতি মেনে চলার দিকে 'ভগ্নহৃদয়'-এর রবীন্দ্রনাথ মোটেই ব্যস্ত ছিলেন না! কারণ, এসব রচনাতে তাঁর উপস্থাপনীয় বিষয়টি সত্যিকার কোনো স্থূল সামাজিক সত্য নয়; যা তিনি প্রকাশ ক'রতে চেয়েছিলেন, সে একটা তত্ত্ব,—শুধু প্রণয়াকাঙ্ক্ষার সূক্ষ্ম,ব্যক্তি-মানসিক তত্ত্ব!

কাব্যে-ই হোক্ আর নাটকেই হোক্,—এই স্তরের বিভিন্ন লেখার মধ্যে সেই একই অভিনিবেশ নানাভাবে নিজের স্বাক্ষর রেখে গেছে। কাজে-কাজেই অনিল-মুরলার এই আলাপের মধ্যে বাঙালী সমাজের ভাই-বোনের বিশ্বাসযোগ্য বাস্তব সমীহবোধের চিহ্ন নেই! পদাবলীর নায়িকার মতন মুরলা যেন বড়োই ব্যাকুল হয়ে বলেছেন :

মনে মনে মন যেন কাঁদিয়া ডু-করে
কবির চরণ দুটি জড়াইয়া ধরে;
আঁখি মুদি "কবি-কবি" বলে শতবার
শতবার কেঁদে বলে "আমার—আমার"

নিজের প্রণয়-ব্যাকুলতা সম্বন্ধে ভাইয়ের কাছে বোন যদি কেবল এইটুকুই বলতেন, তাহলেও এ হয়তো কতকটা বাস্তব বিশ্বাসযোগ্যতার সীমাভুক্ত ব'লে মেনে নেওয়া যেতো,—কিন্তু মুরলা নিজের মুগ্ধ ভাব আরো বিশদ ক'রেছেন :

আমার আমার যেন বলিতে বলিতে
চাহে মন একেবারে জীবন ত্যজিতে;
সুখেতে কি দুখে যেন ফেটে যায় বুক,
সুখ বলে দুখ আমি, দুখ বলে সুখ।

অনিলের উত্তরই এই ভাবসর্বস্ব তুঙ্গস্থান থেকে পাঠককে রক্ত-মাংসের বাস্তব জগতে নামবার সুযোগ দেয়! মুরলার প্রণয়াস্পদের নির্মমতা সম্বন্ধে খুবই অসন্তোষ প্রকাশ ক'রে অনিল বলেন :

দেখেও দেখেনি তবু, পশু সে নির্দয়!
ভাঙিয়া দেখিতে চাহে রমণীহৃদয়।

চতুর্থ সর্গে 'কবি'কে নলিনীর রূপমোহে মুগ্ধ হতে দেখা যায়। পর-পর আটটি গানের মধ্য দিয়ে 'কবি'র এই আবেশ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ সর্গে, একমাত্র 'কবি'ই আছেন, আর কোনো চরিত্র নেই। পঞ্চম গানে তাঁর

সত্য কি তাহারে ভালবাসি।
ভুলিনু কি শুধু তার দেখে রূপরাশি ?
স্বপনে জানি না তার হৃদয় কেমন,
সহসা আপনা ভুলে—শুধু কি রূপসী বোলে
জীবন্ত পুত্তলী পদে বিসর্জিনু মন ?

পঞ্চম সর্গের আয়োজন বিচিত্র। এখানে দৃশ্যের সংকেত কেবলমাত্র—'কানন : রাত্রি।' সেই কাননেরই এক পাশে, অনিল তাঁর সলজ্জা নববধূ ললিতাকে একটি গান শুনিয়ে তাঁকে প্রণয়ালাপে উৎসাহিত করেন! আর, কাননের অন্য দিকে নলিনী একে-একে বিজয়, অশোক, নীরদ প্রভৃতি যুবজনের হৃদয় দলনে নিযুক্ত! এ-কাব্যের অন্তর্নিহিত—'ভগ্নহৃদয়' নাট্যাভিপ্রায়টি এই ভাবে ব্যক্ত হ'য়েছে। দৃশ্য, চরিত্র, সংলাপ, ঘাত-প্রতিঘাত সবই আছে, —কেবল তাঁর আদি-পর্বের উচ্ছ্বাস-বহুলতা এখানে একটু বেশি পরিমাণে জায়গা জুড়েছে। দীর্ঘ চৌত্রিশটি সর্গের বিস্তার এ-কাব্যে! অনিল ললিতাকে ভালোবেসে বিয়ে করেন। সেই অনিলও নলিনীর রূপে আকৃষ্ট হন। একাদশ সর্গে ললিতা-অনিল সম্পর্কের মধ্য দিয়ে প্রেমের তত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব উপলব্ধিই ব্যক্ত হয়েছে। অনিল বলেছেন :

জানি গো ললিতা মোরে ভালবাসে মনে,
যাতে আমি ভাল থাকি করে প্রাণপণে ;
কিন্তু তাহে কিছুতেই তৃপ্ত নহে প্রাণ,
দুজনার মাঝে কেন এত ব্যবধান ?
যেমন নিজের কাছে লাজ নাহি থাকে
তেমনিই মনে কেন করে না আমাকে ?

দ্বাদশ সর্গে, ললিতার অতিলজ্জায় অনিলের ক্ষুব্ধ মনে নলিনীর প্রবেশ! অনিল ললিতাকে অকস্মাৎ বিসর্জন দিতে নারাজ। খুবই স্বাভাবিক অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এতে সেকালের বাংলা কবিতার বিশেষ ভঙ্গিগত দুর্বলতার চিহ্ন

থাকলেও অনিলের এই কথাগুলিতে রক্ত-মাংসের মানুষেরই স্বাভাবিকতা ফুটেছে। অনিল বলেছেন :

না হয় দেখিতে ভাল নলিনীর মুখখানি
তবু ললিতারে মোর ভাল আমি বাসি ত রে!

ত্রয়োদশ সর্গে অনিল-ললিতার নিবিড় অন্তরঙ্গতা এবং ষোড়শ সর্গে অনিলের ভাবান্তর সম্বন্ধে ললিতার ক্ষোভ ও আত্মধিক্কৃতি দেখা দেয়। উনিশের সর্গে ললিতার গানের—'বুঝেছি, বুঝেছি, বুঝেছি সখা ভেঙেছে প্রণয়!'—এবং ঠিক তার পরের সর্গেই নলিনীর গানে অনিলের চিত্তজয়ের ইশারা অনুমান করবার চূড়ান্ত দুর্যোগ দেখা দেয়। একুশের সর্গে অনিল বলেন :

কেমন? এখন তোর ঘুচেছে ত ভ্রম?
ভেঙ্গে দিলি হাল তুই, তুলে দিলি পাল তুই,
করিলি প্রবৃত্তি-স্রোতে আত্ম বিসর্জন......।

অনিল-ললিতার প্রণয়ভঙ্গ একদিকে,—অন্যদিকে নলিনীর প্রতি 'কবি'র ব্যর্থ আসক্তি,—ভগ্নহৃদয় মুরলার নিরুদ্দেশযাত্রা,—এবং শেষ দুটি সর্গে যথাক্রমে পর্ণশয্যায় শয়ান মুমূর্ষু মুরলার সঙ্গে 'কবির' মিলন, এবং বিষাদ-ক্ষুব্ধ ললিতার আত্মাবসান-সংগীতের শ্রোতা অনিলের উপস্থিতি দেখানো হয়েছে।

১২৮৭ সালের কার্তিক থেকে শুরু ক'রে ফাল্গুন পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে 'ভগ্নহৃদয়'-এর প্রথম ছয় সর্গ 'ভারতী'তে ছাপা হয়। আঠারো বছর বয়সে বিলাত-প্রবাস-কালেই তিনি এ-কাব্য লিখতে আরম্ভ করেন। পুরো চৌত্রিশ সর্গে সমাপ্ত একখানি বইয়ের আকারে এ-রচনা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে।

তার আগেই তাঁর 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রথম সংস্করণ বেরিয়ে গেছে। 'রুদ্রচণ্ড' ছাপা হয় সেই ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে,—প্রকাশকাল 'ভগ্নহৃদয়'-এর দুদিন পরে—২৫এ জুন তারিখে। 'ভগ্নহৃদয়'কে নাটক বা নাট্যধর্মী রচনা ব'লতে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল বলেই তাঁর নাট্যরচনাবলীর মধ্যে

এটিকে ধরা হয় না বটে, কিন্তু ডক্টর সুকুমার সেন যেমন আদি-পর্বের অনেকগুলি সমধর্মী রচনাকে কৈশোরক 'গাথা' বলেছেন, সমালোচক-কল্পিত সেইরকম কোনো নামের সাহায্যে এটির নাট্যশ্রেণীভুক্তি হয়তো কারো-কারো অনুমোদন পাবে; একে 'নাট্যধর্মী কাব্য' বলতেই বা আপত্তি হবে কেন?

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন বটে,—এতে মূল, কাণ্ড, শাখা ইত্যাদি বাদ দিয়ে নাটক-পুষ্পবৃক্ষের কেবল ফুলটুকুই ফোটানো হয়েছে। কিন্তু তাঁর এ রূপকের অর্থ অস্পষ্ট। কবিতা আর গানের বহুলতা তাঁর নাটক-নাটিকার বিশেষত্ব। উচ্ছ্বাসের অমিত প্রাচুর্য বাংলা নাটকের অনেক দিনের স্বভাব। 'বাল্মীকি-প্রতিভা', রুদ্রচণ্ড,' 'কালমৃগয়া', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ইত্যাদি সে-কালের বিভিন্ন নাট্যধর্মী রচনার সামান্য-লক্ষণগুলি 'ভগ্নহৃদয়'-এর মধ্যেও বিদ্যমান। সুতরাং একমাত্র 'সর্গ'-বিভাগটুকুর পরিবর্তে 'দৃশ্য'-বিভাগ শব্দটি ধ'রে নিলে একে আর নাট্যধর্মী ব'লতে আপত্তি হওয়া উচিত নয়। রবীন্দ্রনাথের সে-পর্বের নাট্যধর্মী লেখাগুলির সঙ্গে এই সাদৃশ্য অনুভব করবার জন্যেই 'ভগ্নহৃদয়' সম্বন্ধে এই বিস্তৃত আলোচনা করা গেল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন দ্বিজেন্দ্রনাথকে সম্পাদক করে 'ভারতী' প্রকাশের আয়োজন করেন, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ঠিক ষোল বছর। সতেরো বছর বয়সে তিনি প্রথম বিলাত-যাত্রা করেন। 'ভারতী'র প্রথম বছরেই তাঁর 'কবিকাহিনী' বেরোয়। বিশেষভাবে 'কবিকাহিনী' সম্বন্ধে এবং ব্যাপকভাবে তাঁর সে পর্বের যাবতীয় রচনা সম্বন্ধে 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি লিখে গেছেন: 'কাঁচা বয়সে অল্প সম্বলে অদ্ভুত কীর্তি করিতে না পারিলে মন স্থির হয় না, কাজেই ভঙ্গিমার আতিশয্য এবং প্রতিপদেই নিজের স্বাভাবিক শক্তিকে ও সেইসঙ্গে সত্যকে সৌন্দর্যকে বহুদূরে লঙ্ঘন করিয়া যাইবার প্রয়াস রচনার মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই অবস্থা হইতে প্রকৃতিস্থ হওয়া, নিজের যতটুকু ক্ষমতা ততটুকুর প্রতি আস্থালাভ করা কালক্রমেই ঘটিয়া থাকে।'

ভাবোচ্ছ্বাসটা বয়োধর্মের ব্যাপার বটে। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের ঝোঁক কিন্তু পারিপার্শ্বিক অন্যান্য কারণে আশ্রিত। জ্যোতিদাদার সহপাঠী বন্ধু কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী কতো যে উদ্ভট বাংলা গান জানতেন!—'সে গান সুরেবেসুরে যেমন করিয়া পারেন একেবারে মরিয়া হইয়া গাহিয়া যাইতেন।' এই অক্ষয় চৌধুরী সম্বন্ধেই তিনি আরো বলেছিলেন: 'সাহিত্যভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের চেয়ে অনেক বেশি দুর্লভ। অক্ষয়বাবুর সেই অপর্যাপ্ত উৎসাহ আমাদের সাহিত্যবোধশক্তিকে সচেতন করিয়া তুলিত।'

'জীবনস্মৃতি'র পাঠকমাত্রেই অক্ষয় চৌধুরীর এই 'অপর্যাপ্ত উৎসাহ' প্রসঙ্গের পাশাপাশি জ্যোতিদাদার উৎসাহগুণের কথা স্মরণ ক'রতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন যে, জ্যোতিদাদার কাছে তিনি 'খুব বড়ো রকমের স্বাধীনতা'র স্বাদ পেয়েছিলেন!—'প্রখর গ্রীষ্মের পরে বর্ষার যেমন প্রয়োজন, আমার পক্ষে আশৈশব বাধানিষেধের পরে এই স্বাধীনতা তেমনি অত্যাবশ্যক ছিল। সে সময়ে এই বন্ধনমুক্তি না ঘটিলে চিরজীবন একটা পঙ্গুতা থাকিয়া যাইত!' ঐ একই জায়গায় উপমার সাহায্য-ব্যতিরেকেই সে-অবস্থাটি আরো স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে গিয়ে তিনি লেখেন: 'তাঁহার সংস্রবে আমার ভিতরকার সংকোচ ঘুচিয়া গিয়াছিল।'

তাঁর নাটকের কথাসূত্রে,—বিশেষতঃ তাঁর 'গীতিনাট্য' সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতে গিয়ে অক্ষয় চৌধুরী এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করবার আরো একটি হেতু আছে। 'জীবনস্মৃতির' সে-কথাগুলি এখানে মনে পড়ে: 'এক সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলি-নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিসি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।'

ছেলেবেলা থেকেই সংগীত-চর্চার মধ্যে বেড়ে ওঠবার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর পারিবারিক সীমার মধ্যে অন্যান্য প্রিয়-সম্পর্কের কথাও এই সূত্রে স্বীকার্য। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর কণ্ঠে গানের সরস্বতী বাস করতেন না বটে, কিন্তু গানের মেজাজ ছিল তাঁর। 'জীবনস্মৃতি'তেই বলা হয়েছে—

'গলায় যে তাঁহার খুব বেশি সুর ছিল তাহা নহে, একেবারে বেসুরাও তিনি ছিলেন না—যে সুরটা গাহিতেছেন তাহার একটা আন্দাজ পাওয়া যাইত। গম্ভীর গদ্‌গদ কণ্ঠে চোখ বুজিয়া গান গাহিতেন, সুরে যাহা পৌঁছিত না, ভাবে তাহা ভরিয়া তুলিতেন। তাঁহার কণ্ঠের সেই গানগুলি এখনো মনে পড়ে— 'বালা খেলা করে চাঁদের কিরণে,' 'কে রে বালা কিরণময়ী ব্রহ্মরন্ধ্রে বিহরে।' তাঁহার গানে সুর বসাইয়া আমিও তাঁহাকে কখনো কখনো শুনাইতে যাইতাম।' কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের প্রথম শ্লোকে দীর্ঘ আ-স্বরের রহস্যটি বিহারীলালই তাঁকে প্রথম বুঝিয়ে দেন। কখনো আবৃত্তির সুরে, কখনো বা গানের সুরে ভাবের সংকোচহীন অভিব্যক্তি উপলব্ধির বিস্ময়-ব্যাকুল সেই আদিপর্বেই অক্ষয়চন্দ্র সরকার এবং সারদাচরণ মিত্রের সংকলিত প্রাচীন-কাব্যসংগ্রহ বইখানি তাঁর হাতে এসেছিল। মৈথিলী-মিশ্রিত ভাষায় লেখা বিদ্যাপতির পদাবলীতে মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি। তারপর কোনো এক মেঘলা-দুপুরে 'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে' কথা-ক'টি লিখে ফেলে, ভানুসিংহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার ছেলেমানুষী খেয়াল জেগেছিল তাঁর মনে! তাঁর খুড়তুতো ভাই গণেন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত এবং দেশানুরাগের গানগুলির কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। তাঁরই ছোট গুণেন্দ্রনাথের কথাও স্মরণীয়। গুণ-দাদার বৈঠকখানা-ঘরে অট্টহাস্য, অদ্ভুত গান, আর অক্ষয় মজুমদারের উদ্দাম নৃত্যের স্মৃতি রবীন্দ্র-জীবনীতে অক্ষয় হয়ে আছে!

তাঁর প্রথম প্রবন্ধের বই 'বিবিধ প্রবন্ধ' ছাপা হয় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর। সে-বইয়ের একটি প্রবন্ধের নাম 'আত্মীয়ের বেড়া'। ১২৮৮ সালের মাঘ সংখ্যার 'ভারতী'তে সে-লেখাটি প্রথম ছাপা হয়। তাতে নিজের ব্যক্তি-মনের সঙ্গে আত্মীয়-সাধারণের সম্বন্ধের কথা ব'লতে গিয়ে তিনি লেখেন: 'আমাদের কেহই যদি আত্মীয় না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের পরই বা কে থাকিত? তাহা হইলে সকলেরই সঙ্গে আমার সমান সম্পর্ক থাকিত। রেখাব নামক একটি সুর যতক্ষণ স্বতন্ত্র থাকে ততক্ষণ সে বেহাগেরও যেমন সম্পত্তি, কানেড়ারও তেমনি সম্পত্তি, ও অমন শত সহস্র

রাগিণীর সঙ্গে তাহার সমান যোগ। কিন্তু যেই তার চতুষ্পার্শ্বে আর কতকগুলি স্বর আসিয়া একত্র হয়, তখনি সে বিশেষ রাগিণী হইয়া দাঁড়ায় ও অবশিষ্ট সমুদয় রাগিণীকে পর বলিয়া গণ্য করে। তেমনি আমরা যে সকলে রেখাব গান্ধার প্রভৃতি একেকটি স্বর না হইয়া বেহাগ ভৈরবী প্রভৃতি একেকটি রাগিণী হইয়াছি, তাহা কেবল আমাদের আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের প্রসাদে।'

তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি বছর। মনের মধ্যে গানের প্রসঙ্গ তখন নানা সূত্রে নিত্যই দেখা দিয়ে যায়। সেই মাঘ-সংখ্যাতেই তিনি 'সংগীত ও কবিতা' প্রবন্ধটি লেখেন—এবং ঐ বছরেই [১২৮৮] ফাল্গুনের 'ভারতী'তে তাঁর 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধটি বেরোয়। মাস-ছয়েক পরে, ১২৮৯ সালের শ্রাবণে ছাপা হয় 'বসন্ত রায়'। ১২৯০-এর বৈশাখ সংখ্যার 'ভারতী'তে তিনি 'বাউলের গান' নামে দীর্ঘ এক পুস্তক-পরিচয় লেখেন। 'সংগীত ও কবিতা' লেখাটির সূচনাতেই তিনি বলেন: 'বলা বাহুল্য, আমরা যখন একটি কবিতা পড়ি, তখন তাহাকে শুদ্ধমাত্র কথার সমষ্টিরূপে দেখি না—কথার সহিত ভাবের সম্বন্ধ বিচার করি। ভাবই মুখ্য লক্ষ্য। কথা ভাবের আশ্রয় স্বরূপ। আমরা সংগীতকেও সেইরূপ দেখিতে চাই। সংগীত স্বরের রাগ রাগিণী নহে, সংগীত ভাবের রাগিণী।'

গান বিশেষভাবে ভাবেরই ভাষা! কবিতার সঙ্গে গানের পার্থক্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান: 'কবিতা ভাব প্রকাশ সম্বন্ধে যতখানি উন্নতি লাভ করিয়াছে, সংগীত ততখানি করে নাই।' তার কারণ, গানের চর্চাতে ভাবশূন্য স্বরের কেবল তন্মাত্রিক একটা আকর্ষণই বোধ করা যায়,—এবং সেই ভাবহীন স্বর-মাধুর্যে মেতে ওঠার দৃষ্টান্ত কম নয়। এই সূত্রে তিনি ম্যাথু আর্নল্ডের Epilogue to Lessing's Laocoon' লেখাটির উল্লেখ করেন।[৭] কবিতা আর গান,—এই দু'য়ের সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন: 'উভয়ে যমজ ভ্রাতা, এক মায়ের সন্তান, কেবল উভয়ের শিক্ষার বৈলক্ষণ্য হইয়াছে মাত্র।' এই প্রবন্ধটির উপসংহারে গানের স্বাধীনতার কথা ছিল। সে-কথাগুলি তাঁরই বিশেষ আত্মকথা। তাঁর নানাবিধ গীতিধর্মী নাটক-নাটিকার প্রসঙ্গে এখানে সে-কথাগুলি অবশ্যই স্মরণীয়: 'আমরা যেমন

৭। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি আমার 'কবিতার বিচিত্র কথা'তে।

আজকাল, নব রসের মধ্যেই মারামারি করিয়া কবিতাকে বদ্ধ করিয়া রাখি না, অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত আড়ম্বরপূর্ণ নামের প্রতি দৃষ্টি করি না—তেমনি সংগীতে কতকগুলা নাম ও নিয়মের মধ্যেই যেন বদ্ধ হইয়া না থাকি। কবিতারও যে স্বাধীনতা আছে, সংগীতেরও সেই স্বাধীনতা হউক, কারণ সংগীত কবিতার ভাই।'

তাঁর নাটক-নাটিকার সংগীত-রসায়ন ব্যাপারটি অংশতঃ এই দিক থেকেও বিবেচ্য।

'সন্ধ্যা-সংগীত'প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুলাই তারিখে—অর্থাৎ তাঁর এই 'সংগীত ও কবিতা' প্রভৃতি প্রবন্ধের খুবই কাছাকাছি সময়ে। সেই কবিতাবলীর মধ্যে 'গান' বা গান-এরই প্রতিশব্দ-জড়িত অনেকগুলি শিরোনাম চোখে পড়ে, যেমন,—'গান আরম্ভ', 'হৃদয়ের গীতিধ্বনি', 'শান্তি-গীত', 'পরাজয়-সংগীত', 'সংগ্রাম-সংগীত' এবং 'গান সমাপন'। রচনাবলী সংস্করণে তিনি লিখে গেছেন—'সন্ধ্যা-সংগীতে'ই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়। সে উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু আমারই বটে। সে-সময়কার অন্য সমস্ত কবিতা থেকে আপন ছন্দের বিশেষ সাজ পরে এসেছিল। সে সাজ বাজারে চলিত ছিল না।'

'সন্ধ্যাসংগীত'-এর নামের বিশেষত্বও স্মরণীয়। সন্ধ্যাসংগীতে দুঃখ আর নৈরাশ্যের ভাবনাই প্রধান ভাবনা। তবে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কথাটা এই যে, সে-ভাবনা তাঁর নিজের হৃদয় থেকেই উৎসারিত ভাবনা। সে গান বৈচিত্র্যহীন বটে, কিন্তু আন্তরিক! 'হৃদয়ের গীতিধ্বনি'-তে সেই কথাটাই বলা হয়েছিল :

ও কী সুরে গান গাস হৃদয় আমার?
শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বসন্ত শরৎ নাই
দিন নাই, রাত্রি নাই—
অবিরাম অনিবার
ও কী সুরে গান গাস হৃদয় আমার?

আবার, তাঁর 'গান সমাপন'-এর সূচনাতেই বলা হয়েছিল :

নমিয়া এ সংসারে কিছুই শিখিনি আর
শুধু গাই গান।

'সংগীত-সংগ্রহ' সম্বন্ধে আলোচনায় নেমে 'বাউলের গান' প্রবন্ধে ব্যক্তি ও জাতির বিশেষ বিশেষ স্বত্ব, স্বকীয়তা বা মর্মস্থানের কথা-প্রসঙ্গে তিনি সেই সময়ে লেখেন : 'যে ব্যক্তি নিজের ভাষা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, যে ব্যক্তি নিজের ভাষায় নিজের কথা কহিতে শিখিয়াছে, তাহার আনন্দের সীমা নাই।'...'ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে যাহা ঘটে, জাতি সম্বন্ধেও তাহাই খাটে !'

এই চিন্তাধারা অনুসরণ ক'রে প্রবন্ধের আরো কিছুদূর এগিয়ে দেখা যায় যে, সংস্কৃত-প্রভাবিত বাংলাকে তিনি কৃত্রিম বলেছেন,—ইংরেজি-প্রভাবিত বাংলাকেও স্বাভাবিক বাংলা ব'লে মানেন নি। এবং ব্যক্তি অথবা জাতির প্রকাশস্পৃহা-ঘটিত আত্মানুসন্ধানের নজীর দিতে গিয়ে, তিনি অতঃপর এই গানটি স্মরণ ক'রেছেন :

আমি কে তাই আমি জানলেম না,
আমি আমি ক'রি কিন্তু, আমি আমার ঠিক হইল না।
কড়ায় কড়ায় কড়ি গণি
চার কড়ায় এক গণ্ডা গণি
কোথা হইতে এলাম আমি, তারে কই গণি !

'বাউল গান' সম্বন্ধে এই লেখাটির বছর-তিনেক পরে, ১২৯১ সালের কার্তিক সংখ্যার 'নবজীবন' পত্রিকায় 'বৈষ্ণব কবির গান' নামে একটি মন্তব্যে বলা হয় : 'শঙ্খকে সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিলেও সে সমুদ্রের গান ভুলিতে পারে না।'

৬।

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একই সঙ্গে এই সংগীত-ভাবুক, আর, ভাবনিষ্ঠ কবিসত্তা দেখা দিয়েছিলেন ! তাঁর নাট্যরচনা তাই প্রধানতঃ কবিতাধর্মী।

প্রথম বিলাত-যাত্রার আগে তিনি যখন মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে আমেদাবাদের শাহিবাগে ক্ষীণস্বচ্ছস্রোতা সাবরমতী নদীতীরে বাদশাহী আমলের বিরাট এক প্রাসাদে বাস ক'রছিলেন, তখনকার বর্ণনা আছে 'জীবনস্মৃতি'র 'আমেদাবাদ' পর্বে : 'শুক্লপক্ষের গভীর রাত্রে সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাদটাতে একলা ঘুরিয়া বেড়ানো আমার আর একটা উপসর্গ ছিল। এই ছাদের উপর নিশাচর্য করিবার সময়ই আমার নিজের সুর দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে 'বলি ও আমার গোলাপবালা' গানটি এখনো আমার কাব্যের মধ্যে আসন রাখিয়াছে।'

ব্রাইটনের সংগীতশালায় 'মাডাম নীলসন অথবা মাডাম আলবানী' নামে কোনো বিখ্যাত গায়িকার গান শুনে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হন। ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে তুলনাসূত্রে তিনি জানিয়েছিলেন : 'য়ুরোপে গলা সাধাটাই মুখ্য, সেই গলার স্বরে তাহারা অসাধ্য সাধন করে। আমাদের দেশে যাহারা প্রকৃত শ্রোতা তাহারা গানটাকে শুনিলেই সন্তুষ্ট থাকে, য়ুরোপের শ্রোতারা গান-গাওয়াটাকে শোনে। সেদিন ব্রাইটনে তাই দেখিলাম—সেই গায়িকাটির গান গাওয়া অদ্ভুত আশ্চর্য। আমার মনে হইল যেন কণ্ঠস্বরে সার্কাসের ঘোড়া হাঁকাইতেছে।'

য়ুরোপীয় সংগীত সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, সে যেন মানুষের জীবনের সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িত। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রচনার প্রাক্-চিন্তা হিসেবে তাঁর সেই মন্তব্যটি মনে রাখা দরকার : 'তাই দেখিতে পাই, সকল রকমেরই ঘটনা ও বর্ণনা আশ্রয় করিয়া য়ুরোপে গানের সুর খাটানো চলে,—আমাদের দিশি সুরে যদি সেরূপ করিতে যাই তবে অদ্ভুত হইয়া পড়ে, তাহাতে রস থাকে না। আমাদের গান যেন জীবনের প্রতিদিনের বেষ্টন অতিক্রম করিয়া যায়। এইজন্য তাহার মধ্যে এত করুণা এবং বৈরাগ্য,—সে যেন বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবহৃদয়ের একটি অন্তরতর ও অনির্বচনীয় রহস্যের রূপটিকে দেখাইয়া দিবার জন্য নিযুক্ত; সেই রহস্যলোক বড়ো নিভৃত নির্জন গভীর—সেখানে ভোগীর আরামকুঞ্জ ও ভক্তের তপোবন রচিত আছে—কিন্তু সেখানে কর্মনিরত সংসারীর কোনো প্রকার সুব্যবস্থা নাই।'

দেশী বিলাতী এই বিচিত্র সুর-চর্চার সমসাময়িক আর একটি ঘটনা স্মরণীয়। অক্ষয় চৌধুরীর মুখে কবি মূরের 'আইরিশ মেলডীজ'-এর আবৃত্তি শোনেন তিনি। 'জীবনস্মৃতি'তে সেই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন : 'এই আইরিশ মেলডীজ আমি সুরে শুনিব, শিখিব এবং শিখিয়া আসিয়া অক্ষয়বাবুকে শুনাইব ইহাই আমার বড়ো ইচ্ছা ছিল।······আইরিশ মেলডীজ বিলাতে গিয়া কতকগুলি শুনিলাম ও শিখিলাম কিন্তু আগাগোড়া সব গানগুলি সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা আর রহিল না। অনেকগুলি সুর মিষ্ট এবং করুণ এবং সরল, কিন্তু তবু তাহাতে আয়র্লণ্ডের প্রাচীন কবিসভার নীরব বীণা তেমন করিয়া যোগ দিল না।'

'জীবনস্মৃতি'র এই পর্বেই তিনি তাঁর 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্য রচনার

ইতিহাস লিখে গেছেন। বিলাত-প্রবাসের অভিজ্ঞতা থেকে গান আর নাটকের চর্চা সম্বন্ধে তাঁর অনুরাগ বেড়েছিল। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিজেদের পারিবারিক পরিমণ্ডল এ-বিষয়ে আগে থেকেই অনুকূল ছিল। ১২৮৭ সালের ১৬ই ফাল্গুন বিদ্বজ্জনসমাগম উপলক্ষে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' অভিনীত হয়। ১২৯২ সালের ফাল্গুনে [২০এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬] পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছিল। সেই দ্বিতীয় সংস্করণে 'কালমৃগয়া'র কিছু কিছু তাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়। সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখেছেন: 'ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্যক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে; উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে।... সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই। বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব।'

তাঁরনাটক-নাটিকায়—প্রেম আর প্রতাপ,—স্বাধীনতা আর বন্ধন,—ধর্মবোধে প্রথা অনুসরণের দিক, আর যথার্থ উপলব্ধির মুক্তি ইত্যাদি প্রধান বক্তব্যগুলির আভাস দিতে গিয়ে সৌন্দর্য, সামঞ্জস্য, কল্যাণ ইত্যাদির কথা উঠলো। তাঁর অনেকগুলি নাটক গানের আবেদনবাহী। সেই সূত্রে, জীবনের প্রথম পর্বে গানের চর্চাসূত্রে যেসব ধারণা তাঁর মনে দেখা দেয়, সে সব ধারণার কথাও কিছু কিছু উল্লেখ করা গেল। এইবার তাঁর আর একখানি সুপরিচিত নাটকের কথা আলোচ্য। সে তাঁর 'রাজা ও রানী'।

তাঁর বড়ো দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে 'রাজা ও রানী' উৎসর্গ করা হয়। নাটকের সংহতির আদর্শ মনে রেখে এ-রচনায় লিরিকের বাড়াবাড়ির সঙ্গে ঘটনা বা action-এর আদর্শগত বিরোধ-বৈষম্যের কথাসূত্রে তিনি যা লিখেছিলেন, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। 'রাজা ও রানী'র যথার্থ নাট্যস্ফুরণ সম্বন্ধে তর্জনী-সংকেত ক'রে নিয়ে অতঃপর তিনি জানান: 'এই নাটকে যথার্থ নাট্য-পরিণতি দেখা দিয়েছে যেখানে বিক্রমের দুর্দান্ত হিংস্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী।'

'রাজা ও রানী'র বছর পাঁচেক আগে বেরিয়েছিল 'প্রকৃতির প্রতিশোধ।' আলোচ্য মন্তব্যের মধ্যেই এই দুটি রচনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ তুলনার কথা আছে: 'প্রকৃতির প্রতিশোধের সঙ্গে রাজা ও রানীর এক জায়গায় মিল আছে। অসীমের সন্ধানে সন্ন্যাসী বাস্তব হতে ভ্রষ্ট হয়ে সত্য হতে ভ্রষ্ট হয়েছে। বিক্রম তেমনি প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে। এই তত্ত্বকেই যে সজ্ঞানে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছে তা নয়, এর মধ্যে এই কথাটাই স্বত উদ্ভত হয়েছে যে সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি জোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।'

রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস তাঁর অনেক রচনাতেই বার বার দেখা দিয়েছে। 'বাস্তবের সীমা' এবং 'সংসারের জমি' উক্তি-দুটির মধ্যে মানুষের সামাজিক-পারিবারিক নানা দায়িত্বের স্বীকৃতি সম্বন্ধে তাঁর ইশারা দেখে 'চোখের বালি'র কথা মনে পড়ে। 'চোখের বালি'তে অপ্রত্যাশিতভাবে বিনোদিনী এসে পৌঁছেছিলেন বিহারীর বাড়িতে! ভালোবাসার একান্ত আবেগে মহেন্দ্র সংসার ছেড়ে বিনোদিনীকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হবার প্রস্তাব জানিয়েছে,—এই কথাটাই বিনোদিনী বলতে আসেন। বিহারীকে এই খবর দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'যাহার শ্রদ্ধা আমি পাইয়াছিলাম এবং যাহার ভালোবাসা পাইলে আমার জীবন সার্থক হইত, তাহার কাছে এই রাত্রে ভয়-লজ্জা সমস্ত বিসর্জন দিয়া ছুটিয়া আসিলাম, সে যে কত বড়ো বেদনায় তাহা মনে করিয়া একটু ধৈর্য ধরো। আমি সত্যই বলিতেছি তুমি যদি আমাকে ভালো না বাসিতে, তবে আমার দ্বারা আশার আজ এমন সর্বনাশ হইত না।' বিহারী সব শুনে গর্জন ক'রে ওঠে! 'চোখের বালির' সেই এক অবিস্মরণীয় রাত্রির আশ্চর্য নাটকটুকু মনে পড়ে।[৮]

৮। "বিহারীর মুখের ভাব ক্রমশ অত্যন্ত কঠিন হইয়া আসিল—কহিল, "তুমি অনেক স্পষ্ট কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছ, এবার আমিও একটা স্পষ্ট কথা বলি। তুমি আজ যে কাণ্ডটা করিলে এবং যে কথাগুলা বলিতেছ, ইহার অধিকাংশই, তুমি যে-সাহিত্য পড়িয়াছ তাহা হইতে চুরি ইহার বারো আনাই নাটক এবং নভেল।"

বিনোদিনী—নাটক! নভেল!

বিহারী—হাঁ, নাটক, নভেল। তাও খুব উঁচুদরের নয়। তুমি মনে করিতেছ, এ সমস্ত তোমার নিজের—তাহা নহে। এ সবই ছাপাখানার প্রতিধ্বনি। যদি তুমি নিতান্ত নির্বোধ মূর্খ সরলা বালিকা হইতে, তাহা হইলেও সংসারে ভালোবাসা হইতে বঞ্চিত হইতে না—কিন্তু নাটকে নায়িকা স্টেজের উপরেই শোভা পায়, ঘরে তাহাকে লইয়া চলে না।"

এর পর সংসারের সীমা-নিরপেক্ষ প্রণয়াবেগের সঙ্গে সংসারের কল্যাণ-কর্তব্যবোধের ঘাত-প্রতিঘাত আরো ঘনীভূত হয়। 'রাজা ও রানী'র অন্তর্নিহিত এবং কবির অভিপ্রেত এই বিশেষ তত্ত্বটির সাদৃশ্যসূত্রেই 'চোখের বালি'র কথা এখানে স্মরণ করা গেল।

হয়তো গম্ভীর তর্ক-বিতর্কময় কোনো-এক প্রবন্ধের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ এ-কথাটা বোঝাতে পারতেন। কিন্তু 'রাজা ও রানী'তে তিনি তাঁর সারা জীবনের এই বিবেক-সত্যবোধকেই নাটক-রূপের বাহন দিয়েছেন। 'রাজা ও রানী'র রাজৈশ্বর্যের সমারোহ 'চোখের বালির' বাস্তব সাধারণ্যের সঙ্গে কোনো-রকম বাহ্য সাদৃশ্যের সূত্রে জড়িত বা সন্নিহিত নয়। কিন্তু ভেতরকার আসল কথাটা একই।

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে জালন্ধরের রাজা বিক্রম আর, তাঁর, বাল্যবন্ধু ব্রাহ্মণ দেবদত্তের সংলাপের মধ্যে দেবদত্ত জিগেস করেন: 'আমাকে বরিবে না কি পুরোহিত পদে?' বিক্রমের কথা শুনে দেবদত্ত পুনর্বার বলেন: 'শাস্ত্রহীন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন যদি,—আছেন ত্রিবেদী।' বিক্রম কিন্তু ত্রিবেদীকে পুরোহিতের কাজ দিতে রাজী নন। কারণ, তিনি রাজাকে যেমন ক্রিয়া-কর্মের বাড়াবাড়ি দিয়ে পীড়ন করেন, ব্যাকরণকে তেমনি বিধি-লঙ্ঘনের দ্বারা! এই আলাপ-আলোচনার মধ্যেই বিক্রম জিগেস করেন যে, স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করা কি সংগত? দেবদত্ত উত্তর দেন:

যত চিন্তা কর শাস্ত্র-চিন্তা আরো বাড়ে
যত পূজা কর ভূপে, ভয় নাহি ছাড়ে
কোলে থাকিলেও নারী রেখো সাবধানে
শাস্ত্র, নৃপ, নারী কভু বশ নাহি মানে।

বিক্রম বলেন: 'বশ করিবার নহে নৃপতি, রমণী।' ইতিমধ্যে মন্ত্রীকে রাজকার্যের বোঝা নিয়ে আসতে দেখে, রাজা পালিয়ে যেতে উদ্যত! বিদ্রূপ ক'রে দেবদত্ত বলেন:

রানীর রাজত্বে তুমি লও গে আশ্রয়!
ধাও অন্তঃপুরে! অসম্পূর্ণ রাজকার্য
দুয়ার বাহিরে পড়ে থাক; স্ফীত হোক
যত যায় দিন! তোমার দুয়ার ছাড়ি
ক্রমে উঠিবে সে ঊর্ধ্বদিকে,—দেবতার
বিচার-আসন পানে!

তারপর মন্ত্রী এসে রাজাকে অনুপস্থিত দেখে দুঃখ প্রকাশ করেন :

রাজশ্রী দুয়রে বসি অনাথার বেশে
কাঁদে হা হা রবে।

দেবদত্তের উদ্দেশে তিনি বলেন :

রানীর কুটুম্ব যত বিদেশী কাশ্মীরী
দেশ জুড়ে বসিয়াছে। রাজার প্রতাপ
ভাগ করে লইয়াছে খণ্ড খণ্ড করি
বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন মৃত সতীদেহ সম।
বিদেশীর অত্যাচারে জর্জর কাতর
কাঁদে প্রজা।

দেবদত্ত তাঁর সাধ্যানুসারে মন্ত্রীকে উচিত পরামর্শই দেন—রানীর কাছেই মন্ত্রী সত্যিকার বিচার প্রার্থনা করুন।

এইখানে প্রথম দৃশ্যের শেষ। অতঃপর দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় লোকারণ্যময় এক রাজপথ। রাজ্যে তখন অরাজকতা ছড়িয়ে পড়েছে। কিনু নাপিত, কুঞ্জরলাল কামার, মনসুখ চাষা, হরিদীন কুমোর ইত্যাদি নানা মানুষের অশান্তি এবং অস্থিরতার খবর পাওয়া যায় এই দৃশ্যে। 'শাস্তর' ছেড়ে তারা যখন 'অস্তর' ধরবার সংকল্প নিতে উদ্যত, সেই সময়ে দেবদত্ত এসে কৌশলে তাদের নিরস্ত করেন।

তৃতীয় দৃশ্যে, সন্ধ্যায় অন্তঃপুরে প্রমোদ-কাননে বিক্রমদেব এবং সুমিত্রাকে দেখা যায়। রাজা সুমিত্রাকে ডাকেন :

এস, নেমে এস, কনক-চরণ দিয়ে
এ অগাধ হৃদয়ের নিশীথ-সাগরে

সে-আহ্বানের উত্তরে রানী বলেন :

নিতান্ত তোমারি আমি
সদা মনে রেখো এ বিশ্বাস। থাকি যবে
গৃহকাজে—জেনো নাথ, তোমারি সে গৃহ,
তোমারি সে কাজ।

বিক্রম বলেন :

থাক্ গৃহ, গৃহকাজ।
সংসারের কেহ নহ অন্তরের তুমি ;
অন্তরে তোমার গৃহ—আর গৃহ নাই—
বাহিরে কাঁদুক পড়ে বাহিরের কাজ।

কিন্তু সুমিত্রা বলেন : 'অন্তরে প্রেয়সী তব বাহিরে মহিষী।' তাঁর সেই কথার পরে বিক্রম খুবই স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন :

নহি আমি রাজা। শূন্য সিংহাসন কাঁদে
জীর্ণ রাজকার্যরাশি চূর্ণ হয়ে যায়
তোমার চরণতলে ধূলির মাঝারে।

এই কথোপকথনের মধ্যে কঞ্চুকী এসে খবর দিয়ে যায় যে, গুরুতর রাজকার্যের প্রয়োজনে মন্ত্রী রাজার দর্শনপ্রার্থী। বিক্রম বলেন: 'রাজ্য রসাতলে যাক্ মন্ত্রী লয়ে সাথে।'

কিন্তু 'রাজা ও রাণী'র কাহিনী বিবৃত করা এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বিক্রমদেব আর সুমিত্রার ভাব-সংঘাতই এ-নাটকের আসল কথা!

'মালিনী'তে রাজশক্তি আর ব্রাহ্মণ্যশক্তির বিরোধ দেখা গিয়েছিল! 'বিসর্জন' এ সে-বিরোধ প্রবল এক আদর্শ-সংঘাত অবলম্বন ক'রেই আরো নাটকীয় চরিতার্থতা লাভ করে। সেখানে রঘুপতি আর গোবিন্দমাণিক্য সমুচিত প্রতিদ্বন্দ্বী। 'রাজা ও রানী'তে কুমার আর সুমিত্রার আত্মবিনাশে গভীর বেদনার স্ফুরণ ঘটে! শুধু তাই নয়, তাঁর এই ধরনের নাটকের মধ্যে 'রাজা ও রানী'কে অনেকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন।

তাঁর নাটক-নাটিকার মধ্যে এখানে কয়েকটি মাত্র রচনা ধরে,—কবিতা, গদ্য, গান,—রূপক ও সংকেত,—ভাবানুভূতি ও আদর্শ-সংঘাত,—একদিকে সৌন্দর্য, প্রেম, কল্যাণ, সামঞ্জস্য,—অন্যদিকে প্রতাপ ও প্রভুত্বের দ্বন্দ্ব,—অর্থাৎ তাঁর নিজস্ব নাট্যপ্রকৃতির মূল কথাটার ইশারা দেওয়া গেল। সংগীত সম্বন্ধে তাঁর প্রথম জীবনের সাধনা ও প্রবণতার আলোচনা এখানে কিঞ্চিৎ তথ্যভারাক্রান্ত। নাট্যরসের পুষ্টিতে তিনি নৃত্য ও গীত উপাদানের উপযোগিতা কীভাবে দেখিয়ে গেছেন, সে-আলোচনা এই দুই বিদ্যায় যথার্থ অধিকারীর পক্ষেই স্বীকার্য। অতএব এখানে সে-প্রসঙ্গে আর কথা বাড়ানো নিষ্প্রয়োজন। অতঃপর দ্বিতীয় খণ্ডে পৃথকভাবে কয়েকখানি নাটকের আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাবে। তাঁর 'ঠাকুরদা' চরিত্রের নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, আনন্দ স্বভাবের বিস্তৃত আলোচনা সেই আয়োজনেই সংগত! তাঁর এই 'ঠাকুরদা' চরিত্রটি সমস্ত দ্বন্দ্বের মধ্যে নির্দ্বন্দ্ব! সে-চরিত্রে নাটকের পাত্র-পাত্রীর বিরোধের চিহ্ন নেই, অথচ 'ঠাকুরদা' তাঁর নাটকের নানা চরিত্রেরই একটি চরিত্র! মনে হয়, তিনিই যেন অদ্বয়-বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ!

‘পঞ্চভূতে’র রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের ‘পঞ্চভূত’ গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় ১৮৯৭-এর ১২ই মে [১৩০৪]। তার অল্পকাল আগে ‘সাধনা’ পত্রিকার যুগ গেছে। ১২৯৮-এর অগ্রহায়ণ থেকে ১৩০২-এর কার্তিক পর্যন্ত মোট চার বছর ‘সাধনা’ প্রকাশিত হয়। ১৩০২-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার আগে সম্পাদক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আড়াই মাস প্রবাস ভ্রমণ করে ১২৯৭ এর ১৯এ কার্তিক কলকাতায় পৌঁছে, পৌষ-মাঘ মাসে তিনি রাজসাহী জেলার পতিসর অভিমুখে জমিদারি পরিদর্শনের কাজে যাত্রা করেন। উত্তর-বঙ্গে বৈষয়িক কাজে আত্মনিয়োগ ক’রে তিনি পদ্মাভ্রমণের সুযোগ পান। পতিসর, কালিগ্রাম, শিলাইদহ, সাহজাদপুর প্রভৃতি স্থানে বাংলাদেশের অন্তরঙ্গ রূপমাধুরী পান ক’রে, ফাল্গুন মাসে তিনি কলকাতায় ফেরেন।

সে-সময়ে ব্রাহ্মসমাজের নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্রের সম্পাদনায় একদিকে ‘সঞ্জীবনী’ পত্রিকার—অন্যদিকে, গোঁড়া হিন্দু-সমাজের মুখপত্র ‘বঙ্গবাসী’র প্রতাপ—এই দুই সাপ্তাহিকের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে বাস ক’রে,—বাঙালী লেখকদল ও পাঠকসমাজ একখানি ‘আদর্শ সাহিত্যক সাপ্তাহিক পত্রের’ প্রয়োজন অনুভব করছিলেন। ১২৯৮-এর সূচনায় বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের [১৮৪০-১৯৩২] সম্পাদনায়,—এই আদর্শ শিরোধার্য ক’রে, সাপ্তাহিক ‘হিতবাদী’ আত্মপ্রকাশ করে। পদ্মাভ্রমণের অবকাশে রবীন্দ্রনাথ যে-সব গল্পের প্রেরণা পান, তার মধ্যে অনেকগুলি ‘হিতবাদী’তে ছাপা হয়। ১২৯৮-এর আষাঢ় মাসে তিনি আবার উত্তর-বঙ্গে জলপথে ভ্রমণ ক’রে,—ভাদ্রমাস অবধি জমিদারি পরিদর্শন ক’রে—আশ্বিনে শিয়াইদহে পৌঁছোন। তঁ ‘ছিন্নপত্রে’ এইসব ভ্রমণের রেখাচিত্র ফুটেছে।

১৮৯০-এ বি. এ. পাশ ক'রে ১৮৯২-এ [১২৯৮] সুধীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকার সম্পাদনা আরম্ভ করেন। 'সাধনা'র প্রথম সংখ্যা থেকেই রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। তা'ছাড়া 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পটি দিয়ে,—প্রথম সংখ্যা থেকেই 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথের গল্পমালা শুরু হয়।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় নব্যহিন্দু-সমাজের অন্যতম নেতা চন্দ্রনাথ বসু সে-সময়ে আহারতত্ত্ব সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন। ১২৯৮-এর পৌষ সংখ্যার 'সাধনায়' সেই প্রবন্ধের তীব্র এক প্রতিবাদ লেখেন রবীন্দ্রনাথ। পরবর্তী আর একটি প্রবন্ধে ['কর্মের উমেদার'] তাঁর এই চিন্তাধারাই অনুসৃত হয়। একদিকে গল্পের ধারা,—অন্যদিকে রাজনৈতিক, সামাজিক চিন্তা-প্রভাবিত প্রবন্ধের ধারা,—তৃতীয়তঃ চিঠিপত্রের ['ছিন্নপত্র'] প্রবাহ,—চতুর্থতঃ কবিতার ধারা,—যুগপৎ এই চার স্রোতের চতুরঙ্গ শোভাযাত্রায় 'সাধনা'র যুগটি কবি-জীবনের বিশিষ্ট সৃজনী ঐশ্বর্যের স্মারক রূপে বন্দনীয়! 'সাধনা-আবির্ভাবের প্রায় এক বছর আগে ১২৯৭-এর কার্তিকে তাঁর 'মানসীর' শেষ কবিতা প্রকাশিত হয়। তারপর, ১২৯৮-এর ফাল্গুনে দেখা দেয় 'সোনার তরী' কবিতাটি! অতঃপর গ্রন্থাকারে 'সোনার তরী' ছাপা হয় ১৩০০ সালে [২ জানুয়ারি, ১৮৯৪]।

তাঁর 'পঞ্চভূত' আলোচনার ভূমিকায় 'সাধনা'-যুগের কবিমানসের বৈশিষ্ট্য-যে অবশ্যস্মরণীয় উপাদানগুলির অন্যতম, তাতে সন্দেহ নেই। এই পর্বে তাঁর কল্পনার সমৃদ্ধি তাঁর আত্মপ্রকাশের সমস্ত অত্যন্ত খাত যেন ছাপিয়ে দিয়ে গেছে। তাঁর গল্পের মধ্যে দেখা দিয়েছে অশরীরী ত্রাস-বিস্ময়-প্রেম-কারুণ্যের ছায়ামোহ। কঙ্কাল, ক্ষুধিত পাষাণ, নিশীথে প্রভৃতি গল্প এই সময়ের অন্যান্য বহু গল্পের মধ্যে বিশিষ্ট। 'বিম্ববতী', 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে', 'নিদ্রিতা,' 'সুপ্তোত্থিতা', প্রভৃতি কবিতায় তখনকার এই কল্পনা-প্রাধান্যের লক্ষণ ফুটেছে। 'রবীন্দ্র-জীবনী'র লেখক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়' 'ছিন্নপত্র' থেকে এই সময়কার দুটি প্রাসঙ্গিক উক্তি স্মরণ করেছেন। 'ছিন্নপত্রে'

১২৯৮এর ২৬এ এবং ২৭এ চৈত্র [৭ই ও ৮ই এপ্রিল, ১৮৯২] পর পর দুই তারিখের দু'খানি চিঠিতে যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

'জল এবং মেয়ে উভয়েই সহজে ছল্ ছল্ জল্ জল্ করতে থাকে, একটা বেশ সহজ গতি ছন্দ তরঙ্গ, দুঃখতাপে অল্পে অল্পে শুকিয়ে যেতে পারে কিন্তু আঘাতে একেবারে জন্মের মতো দুখানা হয়ে ভেঙে যায় না।...মেয়েকে পুরুষের সঙ্গে তুলনা করে টেনিসন্ বলেছেন, water unto wine—আমার . মনে হচ্চে জল unto স্থল।'

আবার—

'বাংলার যদি কতকগুলি ভালো ভালো মেয়েলি রূপকথা জানতুম এবং সরল ছন্দে সুন্দর করে ছেলেবেলাকার ঘোরো স্মৃতি দিয়ে সরল করে লিখতে পারতুম তাহলে ঠিক এখানকার উপযুক্ত হত।'

এই দুটি চিঠিই শিলাইদহ থেকে লেখা হয়। বোলপুর থেকে লেখা 'ছিন্নপত্রে'র আর একখানি চিঠিতে [২রা মে, ১৮৯২] তিনি লিখেছিলেন :

'অসীমতা এবং একটি মানুষ উভয়ে পরস্পরের সমকক্ষ—আপন আপন সিংহাসনে পরস্পর মুখোমুখি বসে থাকবার যোগ্য।'

প্রকৃতির প্রশান্ত বিস্তারে তাঁর এই আনন্দানুভূতি এই সময়ের যাবতীয় রচনায় ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু তাঁর অন্তরতম মনোভাব চিঠিপত্রের বাহনে যতোটা প্রকাশিত হয়েছে, হয়তো অন্য কোনো বাহনে তা সম্ভব ছিল না। এই সময়ের একাধিক চিঠিতে তিনি বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে তাঁর গভীর আগ্রহ স্বীকার করেন। বোলপুর থেকে লেখা এই সময়ের আর-একখানি চিঠিতে [১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৯২] গদ্য, পদ্য, আর নাটক—সাহিত্যের এই তিন বাহন সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনাসূত্রে তিনি লেখেন :

'রোজ রোজ যদি একটি করে কবিতা লিখে শেষ করতে পারি তাহলে জীবনটা বেশ একরকম আনন্দে কেটে যায়—কিন্তু এতদিন ধরে সাধনা ক'রে আসচি ও জিনিসটা এখনো তেমন পোষ মানেনি—প্রতিদিন লাগাম পরাতে দেবে তেমন পক্ষীরাজ ঘোড়াটি নয়।

...এই ছোটো ছোটো কবিতাগুলো আপনা আপনি এসে পড়চে বলে আর নাটকে হাত দিতে পারচি নে। নইলে দুটো তিনটে ভাবী নাটকের উমেদার মাঝে মাঝে দরজা ঠেলাঠেলি করচে।'

অনেক বছর পরে, 'পুনশ্চ'-র 'কোপাই', 'নাটক' প্রভৃতি কবিতায় অনুরূপ বিষয়-বিশ্লেষণে তাঁর মনোযোগ দেখা দেয়।

সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে এই সময়ে লোকেন্দ্র পালিতের সঙ্গে তাঁর যে আলোচনা হয়, 'সাধনা'র একাধিক সংখ্যায় সেগুলি ছাপা হয়েছে। চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে হিন্দুধর্মের আচার ও আদর্শ সম্পর্কে তিনি বিতর্কমূলক আলোচনায় নেমেছিলেন। প্রভাতকুমার লিখেছেন:

,এই সময়ের নব্য আন্দোলনের ভিতরে গুরুবাদ, শাস্ত্রের অভ্রান্ততা, বেদের অভ্রান্তবাদ প্রভৃতি এমন কতকগুলি মত প্রচারিত হইতেছিল যেগুলি কোনো সুবুদ্ধিমান স্বাধীনচিন্তাপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করা কঠিন। চন্দ্রনাথবাবু প্রমুখ শিক্ষিত সাহিত্যিকগণ ও 'বঙ্গবাসী'র লেখকগণ বাংলাদেশে স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের প্রবর্তক না হইয়া তাহার বিরোধী হইয়া উঠিতেছিলেন, এই ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত তীব্র ভাবেই বিঁধিতেছিল। দেশের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, চন্দ্রনাথবাবু উপলক্ষ্যমাত্র।'

গল্প, কবিতা, চিঠি,—এবং সাহিত্যতত্ত্ব, সমাজ আর ধর্ম বিষয়ে তিনি যেমন বিবিধ আলোচনায় নেমেছিলেন, তেমনি আবার ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কেও এ-সময়ে অনেক প্রবন্ধ লেখেন। দীনেন্দ্রকুমার রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতির প্রশ্নোত্তরসূত্রে ব্যাকরণ ও শব্দতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর অনেক লেখা আত্মপ্রকাশ করে। ১২৯৯-এর পৌষ সংখ্যার 'সাধনায়' যে-প্রবন্ধটি ছাপা হয়,—বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি তার প্রশংসা করেন। ১৮৯০ থেকে ১৯০০-র মধ্যে প্রকাশিত তাঁর নাটক, কবিতা ও প্রবন্ধের মধ্যে 'বিসর্জন' এবং 'মানসী' প্রকাশিত হয় ১৮৯০এ; 'চিত্রাঙ্গদা' ১৮৯২এ; 'সোনার তরী' ১৮৯৪এ; 'চিত্রা' ১৮৯৬এ; 'পঞ্চভূত' ১৮৯৭এ। ১৯০০তে 'কল্পনা' এবং 'কণিকা' ছাপা হয়। তাঁর কবি-জীবনের এ-পর্বটি ছিল নানা-ফসলের বিচিত্রতায় সমৃদ্ধ।

যে বছর 'পঞ্চভূত' বই হয়ে বেরোয়, তার পরের বছর—১৮৯৮এর ২৯এ
ানুয়ারি প্রমথ চৌধুরীকে লেখা এক চিঠিতে তিনি লেখেন :

'আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করছে—সেইজন্যে একদিকে বেদনা, আর একদিকে বৈরাগ্য। একদিকে কবিতা, আর একদিকে ফিলজফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালোবাসা, আর একদিকে দেশ-হিতৈষার প্রতি উপহাস। একদিকে কর্মের প্রতি আসক্তি আর একদিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ।'

'পঞ্চভূত' তাঁর এই দুই বিপরীত ভাবগ্রামের সন্ধি-সমন্বয়ের স্বীকৃতিবাহী চনা। ১৩৪২ সালে এই বইয়ের যে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়, তাতে র্বসমেত ষোলটি প্রবন্ধ জায়গা পায়। প্রথম প্রবন্ধের শিরোনাম 'পরিচয়'। ই প্রবন্ধে তিনি লেখেন :

'রচনার সুবিধার জন্য আমার পাঁচটি পারিপার্শ্বিককে পঞ্চভূত নাম দেওয়া যাক। ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।'

পাঁচ ভূতের সঙ্গে পাঁচটি মানুষের ঠিক ঠিক মিল খুঁজে পাওয়া যে অসম্ভব, এই-প্রবন্ধে তিনি নিজেই সে-কথা স্বীকার করেন :

'আমি ঠিক মিলাইতেও চাহি না। আমি তো আদালতে উপস্থিত হইতেছি না। কেবল পাঠকের এজলাসে লেখকের একটা এই ধর্ম-শপথ আছে, যে সত্য বলিব। কিন্তু সে সত্য বানাইয়া বলিব।'

মুখবন্ধে এইভাবে সত্য-ভাষণের চিত্তাকর্ষক ঘোষণা দিয়ে, পঞ্চভূতের প্রত্যেকের প্রকৃতি সম্পর্কে পরে পৃথক ভাবে বলা হয়েছে। প্রথমেই ক্ষিতির কথা-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

ক্ষিতি' হলেন পুরুষ,—'আমাদের সকলের মধ্যে গুরুভার। তাঁহার অধিকাংশ বিষয়েই অচল অটল ধারণা। তিনি যাহাকে প্রত্যক্ষভাবে একটা দৃঢ় আকারের মধ্যে পান এবং আবশ্যক হইলে কাজে লাগাইতে পারেন, তাহাকেই সত্য বলিয়া জানেন।' ব্যবহারিক জগতে উন্নতি লাভের উচ্চাশাই তাঁর মুখ্য আশা। উন্নতির অর্থই এই, ক্রমশঃ সঞ্চয় এবং অনাবশ্যকের পরিহার'।

শ্রীমতী অপ্ [স্রোতস্বিনী] ক্ষিতির এই বিশেষ 'হিতবাদ' [Utilitari nism] স্বীকার করেন না। তিনি জানেন, অনাবশ্যক আমাদের স্নেহ ভালোবাসা, করুণা বা স্বার্থ বিসর্জনের স্পৃহা উদ্রেক করে। অতএব প্রয়োজনের সাক্ষাৎ পরিতৃপ্তি না ঘটলেও—সংসারে এই তথাকথি 'অনাবশ্যক'ও আবশ্যক!

শ্রীমতী তেজ [দীপ্তি] স্রোতস্বিনীর মতো 'মধুর কাকলি ও সুন্দর ভঙ্গি সমৃদ্ধা নন। তিনি একেবারে—'নিষ্কাশিত অশি-লতার মতো ঝিকমিক করি ওঠেন এবং শাণিত সুন্দর স্বরে' ক্ষিতিকে বলেন:

> 'যদি সত্যই সভ্যতার তাড়ায় অত্যাবশ্যক জ্ঞানবিজ্ঞান ছাড়া আর সমস্ত দূর হইয়া যায়, তবে, একবার দেখিবার ইচ্ছা আছে অনাথ শিং সন্তানের এবং পুরুষের মতো এত বড়ো অসহায় এবং নির্বোধ জাতি কী দশাটা হয়।'

চতুর্থ এবং পঞ্চম ভূতও পুরুষ। শ্রীযুক্ত বায়ু [সমীর] ক্ষিতির শিং নন—প্রতিপক্ষ! তিনি জানেন, 'মানুষের সহিত জড়ের সম্বন্ধ লইয়াই সংসা নহে, মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধটাই আসল সংসারের সম্বন্ধ।' অতএ বস্তুসর্বস্বতা পরিহার্য।

শ্রীযুক্ত ব্যোম্ ধ্যানগম্ভীর অধ্যাত্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি বলেন—'ঠিক মানুষে কথা যদি বলো, যাহা অনাবশ্যক, তাহাই তাহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা আবশ্যক

ব্যোমের কথা ভালো বোঝা যায় না—শুধু এই কারণেই, দীপ্তি তাঁ সম্পর্কে 'একটা আন্তরিক বিদ্বেষ' পোষণ করেন; স্রোতস্বিনী তাঁর ক শোনবার ভাণ করেন, কিন্তু অন্তরে জানেন যে, 'বেচারা পাগল' মাত্র পঞ্চভূতের ভূতনাথ রবীন্দ্রনাথ ব্যোমের কথা উপেক্ষা করেন না বটে, কি তাঁকে বুঝিয়ে দেন যে, ভারতের প্রাচীন ঋষিরা ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি স্থূ প্রয়োজন অস্বীকার ক'রে মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন, করতে চেয়েছিলেন! একালে সর্বসাধারণের জন্যে বিজ্ঞান সেই কর্তব্যই পাল করতে চায়। জড়ের অধীনতা কাটিয়ে ওঠবার জন্যেই—আধ্যাত্মি সভ্যতায় পৌঁছোবার আগে,—'একটা দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক' সাধনার' স্তর অতিক্র করা দরকার।

ক্ষিতি তাঁর নিজের বিশ্বাসের কোনো প্রতিবাদ সহ্য করতে পারেন না।

তাঁর নিজের কথার খণ্ডনে কান দেন না। অতএব, ভূতনাথের এই দস্তর, বিজ্ঞানস্তর, অধ্যাত্মস্তর সম্পর্কিত পর্যায়-ঘোষণাতে কোনো পক্ষেরই বদলায় না।

পাঞ্চভৌতিক ধ্যান-ধারণার এই বৈচিত্র্যের ইঙ্গিত দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ ঞ্চভূতের ডায়ারি'র উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম, ডায়ারির স্তাব তুলেছিলেন দীপ্তি। ভূতনাথ সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। সমীর বিষয়ে উৎসাহ দেন। ডায়ারি লেখার দোষ-গুণ সম্বন্ধে স্রোতস্বিনী নোথের অভিমত জানতে চাইলে ভূতনাথ বলেন :

'ডায়ারি একটা কৃত্রিম জীবন।...একটা মানুষের মধ্যেই সহস্র ভাগ আছে, সব-কটাকে সামলাইয়া সংসারে চালানো এক বিষম আপদ, আবার বাহির হইতে স্বহস্তে তাহার একটি কৃত্রিম জুড়ি বানাইয়া দেওয়া আপদ বৃদ্ধি করা মাত্র।

...'আমি নিজেকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙিতে চাহি না। ভিতরে একটা লোক প্রতিদিন সংসারের উপর নানা চিন্তা, নানা কাজ গাঁথিয়া গাঁথিয়া এক অনাবিষ্কৃত নিয়মে একটি জীবন গড়িয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ডায়ারি লিখিয়া গেলে তাহা ভাঙিয়া আর একটি লোক গড়িয়া আর একটি দ্বিতীয় জীবন খাড়া করা হয়।

...'জীবনের গতি স্বভাবতই রহস্যময়, তাহার মধ্যে অনেক আত্মখণ্ডন, অনেক স্বতোবিরোধ, অনেক পূর্বাপরের অসামঞ্জস্য থাকে! কিন্তু লেখনী স্বভাবতই একটা সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিতে চাহে।'

স্রোতস্বিনী অতঃপর সংক্ষেপে এই কথাগুলিই বুঝিয়ে দেন :

'স্বভাবতঃ আমাদের মহাপ্রাণী তাঁহার অতি গোপন নির্মাণশালায় বসিয়া এক অপূর্ব নিয়মে আমাদের জীবন গড়েন, কিন্তু ডায়ারি লিখিতে গেলে দুই ব্যক্তির উপর জীবন গড়িবার ভার দেওয়া হয়। কতকটা জীবন অনুসারে ডায়ারি হয়, কতকটা ডায়ারি অনুসারে জীবন হয়!'

ভূতনাথ তাঁর পাঞ্চভৌতিক সম্প্রদায়ের অবগতির জন্যে বলেন যে, সাহিত্য-ব্যবসায়ী সৃজনের আনন্দবেগেই নিজের অন্তর্লোক থেকে নানা ভাব, নানা চরিত্র ফুটিয়ে থাকেন। সেই কারণেই, তাঁর নিজের জীবনে ঐক্য থাকে না!

এই সব বাধা-বিপত্তি আলোচনার পরে – অবশেষে স্থির হয় যে, ভূতনাথ ডায়ারি লিখবেন এবং সে-ডায়ারিতে ব্যক্তি-বিশেষের কথা থাকবে না—'এমন কথা লিখিব, যাহা আমাদের সকলের।'

অতঃপর ডায়ারি শুরু হয়।

প্রকাশিত বইয়ের সূচীতে 'পঞ্চভূতের পরিচয়' সম্পর্কিত আলোচনাটির পরে যে পনেরোটি প্রবন্ধের নাম পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্যে দ্বিতীয় রচনার নাম—'নরনারী'। 'পঞ্চভূতের' দীপ্তি এবং স্রোতস্বিনী নারী,—অবশিষ্ট তিনটি [ক্ষিতি, সমীর এবং ব্যোম্] পুরুষ। পাঞ্চভৌতিক গোষ্ঠীর সদস্য-বৃন্দের মধ্যে নর-নারীর অন্যোন্য সমাবেশ ঘটেছে,—এবং তাঁদের মধ্যে এইরকম প্রকৃতিভেদ বা মনোগত পার্থক্যও অবাস্তর নয়। একদিকে দীপ্তি এবং স্রোতস্বিনী,– অন্যপক্ষে ক্ষিতি, সমীর, ব্যোম এবং স্বয়ং ভূতনাথ,– এই দুই সম্প্রদায়ের দৃষ্টিকোণের বিভেদ-বৈষম্য এবং মনোগঠনের বিভিন্নতা সম্পর্কে আলোচনা আছে 'নরনারী' প্রবন্ধে। আসরের এক পক্ষে ডেস্‌ডিমোনা ক্লিয়োপাট্রা, কুন্দনন্দিনী, সূর্যমুখী, বিন্দা, মালিনী,—'দুর্গেশনন্দিনী'র বিমল প্রভৃতি সাহিত্যের স্মরণীয় নারীবাহিনী দাঁড়িয়েছেন,—আর, বিপরীত পক্ষে উপস্থিত হয়েছেন ওথেলো, অ্যাণ্টনি, নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল ইত্যাদি সাহিত্যের প্রখ্যাত কয়েকজন পুরুষ! এই আসরের মাঝখানে পঞ্চভূতের সভা বসেছে। এই সভায় সমীর বলেন যে, ইংরেজি সাহিত্যে নায়ক এবং নায়িকা উভয়েরই মাহাত্ম্য স্বীকার করা হয়েছে,—কিন্তু বাংলা সাহিত্যে নায়িকারই প্রাধান্য! ক্ষিতি ব্যাখ্যা শুরু করেন। তিনি বুঝিয়ে দেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যে কতক রচনা 'মানসপ্রধান', কতক আবার কার্যপ্রধান'! তারপর:

'মানসজগতে স্ত্রীলোকের প্রভাব অধিক, কার্যজগতে পুরুষের প্রভুত্ব যেখানে কেবলমাত্র হৃদয়বৃত্তির কথা সেখানে পুরুষ স্ত্রীলোকের সহি

পাষিয়া উঠিবে কেন? কার্যক্ষেত্রেই তাহার চরিত্রের যথার্থ বিকাশ হয়।'

এই মন্তব্যের প্রতিবাদসূত্রে দীপ্তি একে একে 'দেবীচৌধুরাণী'র কর্ত্রীত্ব, 'আনন্দমঠের' শান্তির কার্যকারিতা ইত্যাদি গুণের উল্লেখ করেন। সমীর বলেন ঃ

'ভাই ক্ষিতি, তর্কশাস্ত্রের সরল রেখার দ্বারা সমস্ত জিনিষকে পরিপাটিরূপে শ্রেণী বিভক্ত করা যায় না।...জীবন-শিখা যখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তখন টগ্‌বগ্‌ করিয়া সমস্ত মানবচরিত্র ফুটিতে থাকে, তখন নব নব বিস্ময়জনক বৈচিত্র্যের আর সীমা থাকে না। সাহিত্য সেই পরিবর্তমান মানবজগতের চঞ্চল প্রতিবিম্ব! ওথেলো তো মানস-প্রধান নাটক, কিন্তু তাহাতে নায়কের হৃদয়াবেগের প্রবলতা কী প্রচণ্ড! কিংলিয়রে হৃদয়ের ঝটিকা কী ভয়ংকর!'

নারী এবং পুরুষের প্রকৃতিগত, লক্ষ্যগত এবং আচরণগত পার্থক্যের মূল কারণ সম্পর্কে এই রচনাটির ছত্রে ছত্রে সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা এবং গভীর রসবোধের উদ্দীপনা অনুভব করা যায়। আমাদের দেশের নারী-প্রকৃতির স্তুতিতে এবং পুরুষ-স্বভাবের দোষ বর্ণনায় 'পঞ্চভূতে'র সভাপতি স্বয়ং ভূতনাথও যখন বিশেষ উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন, তখন দীপ্তি আর স্রোতস্বিনী বিশেষ খুশি হলেও, ক্ষিতি মনে মনে খুবই অস্বস্তিপীড়িত হন। পাঞ্চভৌতিক সভার নারী-সদস্যেরা এই স্তবে তুষ্টি লাভ ক'রে সভা ত্যাগ করবার পরে, অন্যান্য বক্তাদের তিরস্কার ক'রে ক্ষিতি বলেন :

'আদর্শ নারীর উপকরণ আয়োজন অনেকখানিই জোগাইয়াছে প্রকৃতি। প্রকৃতির আদুরে সন্তান নয় পুরুষ, বিশ্বের শক্তিভাণ্ডার তাহাকে লুঠ করিয়া লইতে হয়। এইজন্য পৃথিবীতে অনেক পুরুষ অকৃতার্থ। কিন্তু যাহারা সার্থক হইতে পারে, তাহাদের তুলনা তোমার মেয়ে-মহলে মিলিবে কোথায়?'

এই মন্তব্যের কোনোরকম প্রতিবাদ উত্থাপনের অবকাশ না দিয়েই ক্ষিতি সভা ত্যাগ করে সেদিনের মতো বিদায় নেন।

নর-নারীর স্বভাব-বৈষম্যের আলোচনা কোনো ধ্রুব, অকাট্য সিদ্ধান্তে

পৌঁছতে পারে না। আলোচনার প্রথম দিকে ক্ষিতির একটি মন্তব্যের জবাবে সমীর যে কথাটি বলেছিলেন, সেটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সে উক্তিটি এখানে পুনরায় স্মরণ করা যাক:

'জীবন-শিখা যখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তখন টগ্‌বগ্‌ করিয়া সমস্ত মানব-চরিত্র ফুটিতে থাকে, তখন নব নব বিস্ময়জনক বৈচিত্র্যের আর সীমা থাকে না।'

পঞ্চভূতের সদস্যদের প্রকৃতি-পর্যালোচনার পক্ষে সমীরের এই মন্তব্যটি খুবই সহায়ক। ঠিক সমগ্রভাবে না হলেও,—অংশতঃ এঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই জীবন-শিখা সুপ্রদীপ্ত! বুদ্ধির দীপ্তিতে এবং রসদক্ষতায় এঁরা সকলেই স্মরণীয়। সাহিত্য এবং জীবন সম্পর্কে এঁরা আগ্রহসম্পন্ন। কয়েকটি সজাগ লোক যেন এক জায়গায় এসে মিলেছেন! এই সম্মেলনের ফলে ক্ষিতির জড়তা, ব্যোমের গাম্ভীর্য, সমীরের কল্পনাবিলাস,—এমন কি স্বয়ং ভূতনাথের তথাকথিত পক্ষপাতমুক্ত স্বাতন্ত্র্যও যেন মাঝে মাঝে বিচলিত হয়। সমীর বলেন:

'সতরঞ্চ ফলকেই ঠিক লাল কালো রঙের সমান ছক কাটিয়া ঘর আঁকিয়া দেওয়া যায়, কারণ তাহা নির্জীব কাষ্ঠমূর্তির রঙ্গভূমি মাত্র; কিন্তু মনুষ্যচরিত্র বড়ো সিধা জিনিষ নহে; তুমি যুক্তিবলে ভাবপ্রধান, কর্মপ্রধান প্রভৃতি তাহার যেমনই অকাট্য সীমা নির্ণয় করিয়া দেও না কেন, বিপুল সংসারের বিচিত্র কার্যক্ষেত্রে সমস্তই উলট্-পালট্ হইয়া যায়'।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধ্যয়ন এবং অভিজ্ঞতার মিলিত উদ্ভাসনে মানব-প্রকৃতির মর্মস্থল যেমন দেখেছেন, তেমনি লিখেছেন। তা ছাড়া 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' রচনার অব্যবহিত প্রাক্-কারণ হিসেবে আরো একটি কথা স্মরণীয়। ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর লেখায় সে কারণটি উল্লেখ করে গেছেন।[১]

১। 'The 'Diary of the Five Elements' was inspired by the conversation of a few intellectuals who had gathered round Tagore to discuss life and letters. The Five Elements were the Five points of view of the philosophy of life. This little volume should be one of the world's classics. Even Tagore could not excel its brilliance.'

অবশ্য, 'পঞ্চভূতে'র সব ক'টি রচনা ঠিক এই পাঞ্চভৌতিক-সভারই স্মারক নয়। 'পল্লিগ্রামে' এবং 'মন'—এই দুটি রচনাই রবীন্দ্রনাথের অন্যনিরপেক্ষ ব্যক্তিগত আত্মোদ্‌ঘাটনের দৃষ্টান্ত। পাঠকদের সতর্ক করবার জন্যে তিনি যদিও লিখেছিলেন—'পাঠকেরা যদি 'ডায়ারি' শুনিয়া মনে করেন লেখকের অনেক আত্মকথা আছে, তবে তাঁহারা ভুল বুঝিবেন'—তবু, এই দুটি রচনা সম্পর্কে তাঁর সে-ঘোষণা গ্রাহ্য নয়। 'মন' প্রবন্ধে মনুষ্য-নিরপেক্ষ প্রকৃতির সান্নিধ্যে মনের ঐকান্তিক পুষ্টি, পরিণতি, বিশ্রাম ইত্যাদির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। ভাবুকের মন প্রকৃতির সংস্পর্শ-সুখের মধ্যে চিন্তালেশহীন, আদরপূর্ণ জীবনের অভিব্যক্তি আস্বাদন করে। এই প্রাকৃতিকতাকে তিনি বলেছেন—'ক্ষেপা হৃদয়ের উদার উল্লাস'! অন্য পক্ষে, প্রীতিহীন যুক্তিসর্বস্বতাকে নিশ্চল পাষাণের সঙ্গে তুলনা ক'রে মানুষের তর্কপ্রবণতাকে তিনি বলেন—'কঠিন কীর্তি'! শুধু তাই নয়, অভিযোগ জানিয়ে তিনি লেখেন :

> 'সভ্যতার খাতিরে মানুষ মন নামক আপনার এক অংশকে অপরিমিত প্রশ্রয় দিয়া বাড়াইয়া তুলিয়াছে।'

'পল্লিগ্রামে' নামক অন্য রচনাটিতেও তিনি অনুরূপভাবে আত্মকথার উল্লেখ করেন। ভাদ্র মাসের জলমগ্ন পল্লী-অঞ্চলে গ্রামীণ বাঙালীর—'স্নিগ্ধ হৃদয়াশ্রমে'—তিনি যখন সুখে দিন যাপন করছিলেন, তখন 'পঞ্চভূত-সভার কোনো একটি 'সভ্য'-মারফৎ কতকগুলি খবরের কাগজের টুকরো পেয়ে,—তিনি 'বৃহত্তর বিশ্বের মানুষের তুলনায় গ্রামবাসী নির্বোধ, সরল মানুষগুলি'কে অধিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার যোগ্য ব'লে মনে করেন :

> 'দেখিলাম ইহাদের মধ্যে একটি সরল বিশ্বাসের ভাব আছে তাহা অত্যন্ত বহুমূল্য। এমন কি তাহাই মনুষ্যত্বের চিরসাধনার ধন।…সরলতাই মনুষ্য-প্রকৃতির স্বাস্থ্য।'

জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে এখানে কয়েকটি গভীর প্রশ্ন তোলা হয়েছে। যেমন,—প্রশ্ন উঠেছে—সরলতা কাকে বলে? ভূতনাথের কথাতেই এই প্রশ্নের সরল জবাব পাওয়া যায় :

'সমস্ত জ্ঞান ও বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ পরিপাক করিয়া স্বভাবের সহিত একীভূত

করিয়া লওয়ার অবস্থাকেই বলে সরলতা, তাহাই মানসিক স্বাস্থ্য। বিবিধ জ্ঞান ও বিচিত্র মতামতকে মনের স্বাস্থ্য বলে না।'

'নরনারী' প্রবন্ধে স্রোতস্বিনীর মুখে এই কথাটি দেখা গেছে :

'পুরুষদেবতাগণ বৃষ মহিষ প্রভৃতি বলবান পশুবাহন আশ্রয় করিয়া ভ্রমণ করেন, স্ত্রীদেবীগণ হৃদয়-শতদলবাসিনী, তাঁহারা একটি বিকশিত ধ্রুব সৌন্দর্যের মাঝখানে পরিপূর্ণ মহিমায় সমাসীন।'

'পল্লিগ্রামে' প্রবন্ধে, 'চাষাদের' মুখে 'রমণীর সৌন্দর্যের মতো' লাবণ্য লক্ষ্য করেন রবীন্দ্রনাথ! আর, এই পঞ্চভূতের সভায় নানা জ্ঞান, বিশ্বাস,—এবং বিভিন্ন মানুষের বিচিত্র কার্যকলাপের আলোচনা - রবীন্দ্র-মানসের অন্তর্নিহিত ঐক্যানুসন্ধিৎসাই প্রধানতঃ ফুটিয়ে তুলেছে। কেবল গ্রামীণ মনুষ্য-প্রকৃতির বন্দনা হিসেবেই যে 'পল্লিগ্রাম' প্রবন্ধটি উপাদেয় তা নয়, রবীন্দ্র-মানসের স্থায়ী ভাবাভিব্যক্তির দৃষ্টান্ত হিসেবেও এই লেখাটি সমাদরণীয়। তাঁর এই রচনাভুক্ত একটি মন্তব্য দিয়েই 'পঞ্চভূত' সম্পর্কে নিশ্চিততর সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়। পল্লী-জীবনের সরলতার ব্যাখ্যানসূত্রে তিনি লেখেন :

'যাহার প্রকৃতি কোনো একটি বিশেষ স্থায়ী ভাবকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহার মুখে সেই ভাব ক্রমশঃ একট স্থায়ী লাবণ্য অঙ্কিত করিয়া দেয়।'

কেবল, বুদ্ধির তীব্রতা আর সন্ধানপরতার পটুত্বের জন্যেই যে 'পঞ্চভূত' স্মরণীয়, তাও নয়;—বরং রবীন্দ্র-মানসের পরিপাক-সামর্থ্যের অপূর্বত্বই এই বইখানির প্রধান আকর্ষণ। গ্রীক 'কোরাসে'র ভূমিকায় দাঁড়িয়ে, রবীন্দ্রনাথ এখানে শুধু পাত্র-পাত্রীর সংলাপের ব্যাখ্যা বা সমালোচনা মাত্র করেন নি,—আত্মবিরোধের সমস্ত ধারা-উপধারা সামনে রেখে,—তিনি সর্ববিরোধাতিশায়ী, পূর্ণ আত্মোপলব্ধির আনন্দ পেয়েছেন! অন্যত্র, নিজের স্বভাবের কথা বলতে গিয়ে তিনি লেখেন :

'আমার জীবনের নিরন্তর ভিতরে ভিতরে একটি সাধনা ধরে রাখতে হয়েছে। সে সাধনা হচ্ছে, আবরণ মোচনের সাধনা, নিজেকে দূরে রাখবার সাধনা। আমাকে 'আমি' থেকে ছাড়িয়ে নেবার সাধনা।'

'চতুরঙ্গে'র শচীশ ছিল এই সাধনারই প্রতীক। 'পঞ্চভূতে' আত্মচিন্তাপর্যায়ের টুকরো টুকরো লেখার মধ্য দিয়ে তাঁর এই মননই ধ্বনিত হয়।

অতএব, গ্রীক কোরাস,[২]—ল্যাণ্ডরের Imaginary Conversations,—Oliver Wendell Holmes-এর The Autocrat of the Breakfast Table ইত্যাদি প্রসঙ্গের ভার বাড়িয়ে, রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত'-এর রসগ্রহণের পথ বাধাসংকুল করে লাভ নেই। তবে, এই সব রচনার সঙ্গে পঞ্চভূতের আকৃতি-প্রকৃতিগত অল্পবিস্তর সাদৃশ্য যে আছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'পঞ্চভূতে'র অন্তর্নিহিত ঐক্যময়তার লক্ষণটি মনে রেখে, Imaginary Conversations সম্পর্কে ইংরেজি-সাহিত্যের ঐতিহাসিকের অভিমত লক্ষ্য করা দরকার।[৩]

ল্যাণ্ডরের 'ইম্যাজিনারি কনভার্সেশন্স্' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮২৪ থেকে ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। প্রায় একই সময়ে,—১৮৩১ সালের নভেম্বর মাসে Oliver Wendell Holmes তাঁর The Autocrat of the Breakfast Table লিখতে আরম্ভ করেন। দুটি প্রবন্ধ লিখে [দ্বিতীয়টির প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি, ১৮৩২], হোম্স্ অনেকদিন তাঁর এই প্রয়াস স্থগিত রাখেন। পঁচিশ বছর পরে, 'The Atlantic Monthly পত্রিকার তাগিদে এই পর্যায়ের আরো লেখা জমে ওঠে,—এবং ১৮৫৮ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর এই বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয়। 'পঞ্চভূতে' রবীন্দ্রনাথ নিজেই যেমন ভূতনাথ,—প্রাতরাশের টেবিলে—স্বয়ং হোমস্ তেমনি হয়েছেন Autocrat, Poet এবং Professor। তিনি অভিনব আলাপচারী। ইংরেজি সাহিত্যে এই পর্যায়ের লেখায় চার্লস্ ল্যাম্ব হলেন তাঁর উল্লেখযোগ্য জুড়ি! ল্যাম্বের রচনা সম্বন্ধে এক সাহিত্যরসিক বিচারক যা লিখেছেন, সে-সব কথার কিঞ্চিৎ নমুনা দেওয়া গেল পাদটীকায়।[৪]

২। 'The poet himself plays the part of a Gk. chorus, a sort of ideal mediator between the elements.'—Lesny.

৩। 'Their strongest interest lies in the revelation and contrasting of souls ; and these psycological dialogues are fundamentally inspired by the same sprit of moral curiosity, of philosophic emotion and of intelligent allowance for the diversity of things, which will produce the monologues of Browning.'—Legouis and Cazamian.

৪। 'The chatter of 'Elia' is the chatter of the artistic temperament ; the chatter of our Breakfast Table Philosopher that of the scientific temperament.'

'পঞ্চভূতে'র ভূতনাথও আলাপচারী, কিন্তু তাঁর প্রধান প্রবণতা মনস্তত্ত্ব-সন্ধানও নয়, বিজ্ঞান-সম্মত বিশ্লেষণ-অভিমুখিতাও নয়। অবশ্য, বিশ্লেষণের দিকে একটু বেশি ঝোঁক দেওয়া এই দুই প্রবণতারই সাধারণ স্বভাব। অপর পক্ষে, রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্যই হোলো মহান সর্বান্বয় উপলব্ধির দিকে। মন দিয়েই কি মনকে বোঝা যায়? 'ক্ষণিকা'র কবি লিখেছিলেন :

মন নিয়ে কেউ বাঁচেনাকো,
মন বলে যা পায়রে
কোন জন্মে মন সেটা নয়
জানে না কেউ হায়রে!
ওটা কেবল কথার কথা,
মন কি কেহ চিনিস?
আছে কারো আপন হাতে
মন বলে এক জিনিষ?
চলেন তিনি গোপন চালে
স্বাধীন তাঁহার ইচ্ছে।
কেই বা তাঁরে দিচ্চে এবং
কেই বা তাঁরে নিচ্চে।

সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে 'পঞ্চভূত'এ সেই একই কথা অন্য পাত্রে পরিবেষণ করা হয়েছে। ভালো সাহিত্যের আকৃতি-প্রকৃতির বিশেষত্ব যাই হোক্ না কেন, তার অন্তর্নিহিত গূঢ় ভাবটি যে প্রাঞ্জল,—'প্রাঞ্জলতা' প্রবন্ধে সেই সত্যই উদ্ভাসিত হতে দেখা যায়। মনের যুক্তি-তর্ক-বিশ্লেষণের সামান্য মাপকাঠি দিয়ে অন্তরের সত্যিকার বড়ো উপলব্ধির বিচার চলে না। অর্থাৎ, মন দিয়ে মিতি, সর্বত্র সম্ভব নয়। 'প্রাঞ্জলতা' প্রবন্ধে এ-বিষয়ে ভূতনাথের মন্তব্য :

'উচ্চশ্রেণীর সরল সাহিত্য বুঝা অনেক সময় এইজন্য কঠিন, যে, মন তাহাকে বুঝিয়া লয় কিন্তু সে আপনাকে বুঝাইতে থাকে না।'

'অখণ্ডতা' প্রবন্ধে সমীর বলেন :

'মনটা যে আছে এইটুকু যে ভুলাইতে পারে তাহাকেই বলি মনোহর। মনের বোঝাটা যে অবস্থায় অনুভব করি না সেই অবস্থাটাকে বলি আনন্দ। ...বুদ্ধিটা হইল মনের, তাহাকে পদক্ষেপ গণনা করিয়া চলিতে হয়, আর

প্রতিভা মনের নিয়মাবলী রক্ষা না করিয়া হাওয়ার মতো আসে, কাহারো আহ্বান মানে না, নিষেধও অগ্রাহ্য করে। '

'সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ' প্রবন্ধে ক্ষিতি মন্তব্য প্রকাশ করেন :

'বহির্জগৎটাকে উত্তরোত্তর বিলুপ্ত করিয়া দিয়া মনোজগৎকেই সর্বপ্রাধান্য দিতে গেলে যে ডালে বসিয়া আছি সেই ডালকেই কুঠারাঘাত করা হয়।'...

বৈজ্ঞানিক নিয়মতান্ত্রিকতার সংকীর্ণতা উপলব্ধি ক'রে ব্যোম বলতে পেরেছেন :

'আমাদের নিজেদের মধ্যে এক জায়গায় আমরা নিয়মের বিচ্ছেদ দেখিতে পাই। আমাদের ইচ্ছাশক্তি সকল নিয়মের বাহিরে—সে স্বাধীন; অন্ততঃ আমরা সেইরূপ অনুভব করি।'... ['বৈজ্ঞানিক কৌতূহল']

কেবল পাঞ্চভৌতিক সভার দুই মহিলা-সদস্যই মনের পরিসীমা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেন নি। তবে, তাঁরাও এ আলাপে যোগ দিয়েছেন। মনের জরীপে তাঁরা যে কেন হস্তক্ষেপ করেন নি, তার ইঙ্গিত আছে সমীরের উক্তিতে। 'অখণ্ডতা' প্রবন্ধে সে-উক্তিটি এই :

'রমণীও প্রকৃতির মতো। মন আসিয়া তাহাকে মাঝখান হইতে দুই ভাগ করিয়া দেয় নাই। সে পুষ্পের মতো আগাগোড়া একখানি। এইজন্য তাহার গতিবিধি আচার-ব্যবহার এমন সহজসম্পূর্ণ। এইজন্য দ্বিধান্দোলিত পুরুষের পক্ষে রমণী 'মরণং ধ্রুবং'।

'প্রকৃতির ন্যায় রমণীরও কেবল ইচ্ছাশক্তি—তাহার মধ্যে যুক্তিতর্ক বিচার আলোচনা কেন-কী বৃত্তান্ত নাই। কখনো সে চারিহস্তে অন্ন বিতরণ করে, কখনো সে প্রলয়মূর্তিতে সংহার করিতে উদ্যত হয়।'...

বলা বাহুল্য, এ অভিমত সর্বগ্রাহ্য নয়। কিন্তু, বাদ-প্রতিবাদ শুরু করবার পক্ষে নারীচিত্তের প্রকৃতি-নির্ধারণ-সম্পর্কিত এই মন্তব্যটি বিশেষ কার্যক্ষম! কিন্তু এ-তত্ত্বকথার সমর্থনে কিংবা প্রতিবাদে কালক্ষেপ ক'রে লাভ কি? রবীন্দ্র-সাহিত্যের স্মরণীয়া নারী-প্রকৃতির রহস্য আলোকিত হয়ে ওঠে এই উক্তির দ্যুতিতে! দামিনী-বিমলা-বিনোদিনীর মহামায়া-মূর্তি চকিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পাঠকের মানসপটে!

দীপ্তি অথবা স্রোতস্বিনী, দুজনের কেউই সমীরের এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন নি। কিন্তু, তাঁদের প্রতিবাদ বিচার-তাড়িত, বুদ্ধি-সমর্থিত, অহমিকা-লালিত এবং অজ্ঞান-প্রসূত! মানব সত্তার এই প্রদেশের অন্তর্বর্তী আর-এক পৃথক প্রদেশ আছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ নারী-প্রকৃতির সেই গূঢ় অন্তর্লোকের কথাই বলেছেন।

১৮৯৭ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের দূরত্ব যৎসামান্য। 'পঞ্চভূতে'র প্রকাশকাল থেকে 'ক্ষণিকা'র প্রকাশকালের ব্যবধান মাত্র এই তিন বছর! পঞ্চভূতের 'মন', 'অখণ্ডতা', 'নরনারী', 'মনুষ্য' প্রভৃতি রচনায় মানুষের মনের নিগূঢ়তা সম্পর্কে যে-সব ইঙ্গিত, আলোচনা, ব্যাখ্যান চোখে পড়ে,—'ক্ষণিকা'র অনেক কবিতায় লঘু ক্ষিপ্র ছন্দোবন্ধে তারই অনুচিন্তা বা সম্প্রসারণ ঘটেছে। 'ক্ষণিকা'র—'অনবসর', 'অতিবাদ', 'বোঝাপড়া', অচেনা', 'উৎসৃষ্ট', 'অসাবধান' প্রভৃতি কবিতায় রবীন্দ্র-মানসের এই বিশেষ অভিমুখিতা দর্শনীয়। সেই অভিমুখিতার আদি-দৃষ্টান্ত খুঁজে দেখতে হলে পিছিয়ে আসতে হয় 'ক্ষণিকা' থেকে 'পঞ্চভূতে,—১৯০০ থেকে ১৮৯৭খ্রীষ্টাব্দে,—অর্থাৎ তার আগে-পরে, 'মানসী' প্রকাশের পুরো দশকটিতে,—১৮৯০-১৯০০র বিস্তারে। পাঞ্চভৌতিক সভার অনুকূল বেষ্টনীর মধ্যেই কবির মনে এই পরিক্রমার প্রেরণা জেগেছিল। 'ক্ষণিকা'র 'সম্বরণ' কবিতায় অশোক-টগর-চাঁপা-চামেলী-কৃষ্ণচূড়ার বাগানে প্রসন্ন অনুভূতি নিয়ে, রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

আজকে আমার বেড়া দেওয়া বাগানে
বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে।

আর, 'পঞ্চভূত'-এর 'কৌতুক হাস্যের মাত্রা' প্রবন্ধে তিনি লেখেন :

'গড়ের মাঠে এক ছটাক শস্য জন্মে না, তবু অতটা জমি অনাবশ্যক নহে। আমাদের পাঞ্চভৌতিক সভাও আমাদের পাঁচজনের গড়ের মাঠ এখানে সত্যের শস্যলাভ করিতে আসি না, সত্যের আনন্দলাভ করিতে মিলি।

'সেইজন্য এ সভায় কোনো কথার পূরা মীমাংসা না হইলেও ক্ষতি নাই সত্যের কিয়দংশ পাইলেও আমাদের চলে। এমন কি, সত্যক্ষেত্র

গভীররূপে কর্ষণ না করিয়া তাহার উপর দিয়া লঘু পদে চলিয়া যাওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।'

ঐ একই রচনায় অন্যত্র তিনি লেখেন :

'কথোপকথন সভার একটি প্রধান নিয়ম—সহজে এবং দ্রুতবেগে অগ্রসর হওয়া। অর্থাৎ মানসিক পায়চারি করা।'

'ক্ষণিকা'র বোঝাপড়া' কবিতায় এই মানসিক পায়চারির মেজাজটি অক্ষুণ্ণ রেখেই সত্য-স্বরূপের প্রসঙ্গ তোলা হয় :

মনেরে আজ কহ, যে,
ভাল মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

এইভাবে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পঞ্চভূত' আলোচনামালায় সহজ সত্যের প্রসঙ্গ থেকে এক দুর্নিরীক্ষ্য সত্যের দিকে এগিয়ে গেছেন! ভালোবাসা, সৌন্দর্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি সর্ববিদিত সহজ কথা থেকে—জটিল কথার জালে তিনি পাঠকদের এগিয়ে নিয়ে গেছেন! তবু, সুকৌশলে নিজের দায়িত্বের পরিসীমা সম্বন্ধে একটি কৈফিয়ৎ জুড়ে দিতেও তিনি ভোলেন নি! সিদ্ধান্তকাম পাঠক এ-বই থেকে ভালোবাসা, সৌন্দর্য, কৌতুক, কাব্য ইত্যাদি প্রসঙ্গের গূঢ় সিদ্ধান্ত উদ্ধারের চেষ্টা করতে পারেন! কিন্তু সত্যকাম পাঠকের মনে স্পন্দিত হবে 'পঞ্চভূতে'র ভূতনাথের বহু কথার একটি কথা,—কৌতুককথা নয়,—সত্যকথা :

'এমন সকল বিষয় আছে যাহাতে প্রতিপদে গভীরতার দিকে তলাইয়া যাইতে হয়; কথোপকথন কালে সেই সকল অনিশ্চিত, সন্দেহতরল বিষয়ে পদার্পণ না করাই ভালো।'

মানুষের সারা জীবনের গভীর অনুভূতিবেদ্য সত্য,—আর, মানুষের তর্ক-বিতর্কের সিদ্ধান্ত ঠিক এক বা অভিন্ন নয়। 'ক্ষণিকা'য় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'ওগো সত্য বেঁটেখাটো'!

শেষ পর্বের কবিতা—প্রৌঢ় ঋতুর যৌবন

একথা বললে অন্যায় হয়না যে, 'পূরবী' থেকে 'শেষলেখা' পর্যন্ত,—অর্থাৎ ১৯২৫ থেকে ১৯৪১এর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের গোধূলি-পর্ব উদ্‌যাপিত হয়েছে। কিন্তু গোধূলি কি শুধুই আয়ুষ্কালের বিচারে? তিনি নিজে বলে গেছেন যে, 'সন্ধ্যাসংগীতে'ই [১২৮৮ সালে প্রকাশিত] তাঁর কাব্যের প্রথম সুস্পষ্ট, স্বতন্ত্র পরিচয়।—'সে উৎকৃষ্ট নয় কিন্তু আমারই বটে...।' 'শৈশব-সংগীত' তারও আগেকার রচনা। সে সময়ে 'কল্পনাদেবী'র সঙ্গে কথা বলতে-বলতে তিনি কবিতার আসরে প্রবেশ করেন! শৈশব-সংগীতের 'ফুলবালা' তারই নিদর্শন। ১২৯১ সালে আদিব্রাহ্মসমাজ থেকে 'শৈশবসংগীত' ছাপা হয়। এই বইখানির ভূমিকায় তিনি লেখেন: 'এই গ্রন্থে আমার তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি প্রকাশ করিলাম, সুতরাং ইহাকে ঠিক শৈশব-সংগীত বলা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু নামের জন্য বেশি কিছু আসে যায় না। কবিতাগুলির স্থানে স্থানে অনেকটা পরিত্যাগ করিয়াছি, সাধারণের পাঠ্য হইবে না বিবেচনায় ছাপাই নাই।...'

এই 'শৈশব-সংগীত যাঁকে উপহার দেওয়া হয়, তাঁর উদ্দেশে তিনি লেখেন:

'এ কবিতাগুলি তোমাকে দিলাম। বহুকাল ছিল, তোমার কাছে বসিয়াই লিখিতাম, তোমাকেই শুনাইতাম। সেই সমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। তাই, মনে হইতেছে তুমি যেখানেই থাক না কেন, এ লেখাগুলি তোমার চোখে পড়িবেই।'

১২৮৪র অগ্রহায়ণ থেকে ১২৮৭ সালের পৌষ সংখ্যার মধ্যে 'ভারতী'তে এর অনেকগুলি প্রকাশিত হয়। শব্দপ্রয়োগে, মিল-বিন্যাসে,—সমগ্রভাবে এই লেখাগুলির দেহসৌষ্ঠবে এবং অনুভূতিতে দুর্বলতার অনেক চিহ্নই বিদ্যমান। নিচের উদ্ধৃতিগুলিই তার প্রমাণ:

ক। ঝোপে ঝোপে ঝোপে লুকায়ে আঁধার
হেথা হোথা চাঁদ মারিছে উঁকি
সুধীরে আঁধার ঘোমটা হইতে
কুসুমের খোলো হাসে মুচুকি

খ। এস কল্পনে। এ মধুর রেতে
দুজনে বীণায় পুরিব তান
সকল ভুলিয়া হৃদয় খুলিয়া
আকাশে তুলিয়া করিব গান।

গ। এ কি কল্পনা, এ কি লো ঘরুণী
দুরন্ত কুসুম-শিশু,
ফুলের মাঝারে লুকায়ে লুকায়ে
হানিছে ফুলের ইষু।
এইরূপ কত কি যে হৃদয়ের ঢেউ খেলা
দেখিতাম বসিয়া বসিয়া
মরমের ঘুমঘোরে কত দেখিতাম স্বপ্ন
যেত দিন হাসিয়া খুসিয়া।'

কল্পনাবালা কবিকে ফুলবালাদের প্রেমের কাহিনী শুনিয়েছেন! কল্পনার বীণাধ্বনি শুনে ফুলে ফুলে সুখাবেশ জেগেছে!

হাতে-হাতে রঙের তুলি নিয়ে ফুলশিশুরা ফুলে ফুলে রঙ মাখিয়ে দেয়। সমস্ত কানন তখন নীরব ছবি! সেখানে কল্পনাদেবী ফুলবালাদের প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করেন! 'শিশু'র সঙ্গে 'ইষুর' মিল সেই অন্য কালের, অন্য পরিবেশের সৃষ্টি! সে কি শুধু অপরিণতির চিহ্ন? সে অন্য মায়া, অন্য দৃষ্টি!

এই রচনার অনেক পরে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কল্পনা'র 'প্রকাশ' কবিতাটি লেখেন। তারও অনেকদিন পরে বেরিয়েছে 'মালঞ্চ'। 'মালঞ্চে'র শিল্পায়োজন এবং বিষয়বস্তু দুইই অন্যরকম। তবু, একথা বললে অন্যায় হবে না যে 'শৈশব-সংগীত'-এর সেই অস্ফুটভাষী কবিমানসই কখনো গদ্যে, কখনো পদ্যে, তাঁর আরো পরের রচনাধারায় পরিণততর প্রকাশ-ক্ষমতার চিহ্ন রেখে গেছে। 'শৈশব-সংগীত'-এর এই প্রেমের বর্ণনায় মালতীর উদ্দেশে অশোককে নিজের মর্মকাহিনী ব্যক্ত করতে শোনা গিয়েছিল। এবং—

'ভ্রূকুটি করিয়া নিদয়া মালতী
যেতেছে সুদূরে চলি
মৃদু উপহাসে সরল প্রেমের
কোমল হৃদয় দলি।'

আর,

'হাসিতে হাসিতে কহিল মালতী
বকুলের সাথে কথা
মলিন অশোক রহিল বসিয়া
হৃদয়ে বহিয়া ব্যথা।'

তাঁর কাব্যপ্রবাহে আদি-পর্বের সঙ্গে মধ্য-পর্বের,—মধ্যের সঙ্গে শেষের সংযোগ যে অবিচ্ছেদ, তা' মানতেই হয়। আদিতে বা মধ্যেও যেমন,—অন্তেও তেমনি, তিনি ছিলেন প্রকৃতি-অনুরাগী, মানব-সমাজনিষ্ঠ, বিশ্ব-অভিমুখী, নিত্যসজাগ কবি। ১৩৪৩এর ২১এ শ্রাবণ 'শ্যামলী'র উদ্দেশে তিনি লিখেছিলেন—'আমি পাকা করে গাঁথিনি ভিত,—'বাসা বেঁধেছি আলগা মাটিতে!' জীবনের শেষপর্বে তিনি আর-একবার প্রায় সারা সভ্য দুনিয়া ঘুরে এসেছেন,—নিজের প্রবীণতা সম্বন্ধে, এবং দেশে, নিজের উত্তরবর্তী কবিক্রিয়ার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন থেকে, কবিতায় তিনি যথার্থ নতুনত্বের সত্য সন্ধান করেছেন; মানুষের রাষ্ট্রগত-সমাজগত নানা সংঘর্ষের ছায়া পড়েছে তাঁর এই পর্বের লেখাতেও,—এবং সমকালীন নানা ঘটনার ঢেউয়ে দুলতে দুলতে তাঁর কবিমন ক্ষণে-ক্ষণে স্মৃতিচারী হয়ে উঠেছে। 'পলাতকা' [১৯১৭] থেকে কবিতায় নানা গল্প বা কাহিনী বয়নের যে ঝোঁক দেখা দেয়, শেষ-পর্বে 'পুনশ্চ', 'শেষ-সপ্তক', 'শ্যামলী' প্রভৃতি বইয়ে তাঁর সে-ধারাও অব্যাহতগতি। এই প্রৌঢ় বয়সে সত্যিই তাঁর নবযৌবন ফিরে এসেছিল!

শেষ-পর্বের প্রধান প্রধান মোট বাশইটি কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকাল যথাক্রমে—পূরবী ১৯২৫; মহুয়া ১৯২৯; বনবাণী ১৯৩১; পরিশেষ ১৯৩২; পুনশ্চ ১৯৩২; বিচিত্রিতা ১৯৩৩; বীথিকা ১৯৩৫; শেষ-সপ্তক ১৯৩৫ [২৫এ বৈশাখ, ১৩৪২]; শ্যামলী, আর পত্রপুট ১৯৩৬; খাপছাড়া ১৯৩৭; প্রান্তিক ১৯৩৮; সেঁজুতি ১৯৩৮; প্রহাসিনী ১৯৩৯; আকাশপ্রদীপ ১৯৩৯; সানাই, নবজাতক এবং রোগশয্যায় ১৯৪০; আরোগ্য, ছড়া, জন্মদিনে এবং শেষলেখা ১৯৪১। এই বাইশখানি বইয়ের অসংখ্য কবিতার মধ্যে বিষয়বস্তু এবং রীতির দিক থেকে অনেক পুনরাবৃত্তি আছে,—দেশ-কালের নানা কথা আছে।

ভাবসত্য বা বিষয়বস্তুর দিক থেকে এগুলিতে ঠিক একটির পরে একটি পর্যায়-অতিক্রান্তিই যে ঘটেছে, তা নয়; মোট ষোল-সতেরো বছরের চিন্তা-প্রকৃতির রূপই এইসব রচনায় ধরা পড়েছে। একযোগে সেই সবটাই বিবেচ্য। তাঁর কবি-মনের শেষ প্রহরের বিস্তারবৈচিত্র্যের চিহ্ন আছে এই সব ক'খানি বইয়ের বিভিন্ন রচনায়!

তিনি তাঁর দীর্ঘ আয়ুষ্কালের মধ্যে দেশের ইতিহাসে অনেক পরিবর্তন দেখেছেন। তাঁর শেষ বয়সের নবীন পাঠকগোষ্ঠী হয়তো সে-ইতিহাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন না। মনে পড়ে, 'স্বগত'তে সুধীন্দ্রনাথ লেখেন,—'প্রত্যেক সৎকবির রচনাই তাঁর দেশ ও কালের মুকুর এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে দেশ ও কালের প্রতিবিম্ব পড়ে, তার সঙ্গে আজকালকার পরিচয় এত অল্প যে তাকে পরীর দেশ বললেও বিস্ময় প্রকাশ অনুচিত।' কিন্তু সমস্ত পরিবর্তন সত্ত্বেও জীবনের স্থায়ী কোন এক মূল্যবোধের দিকটিও স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ সেই চিরন্তনের দিকে চিরকাল উন্মুখ ছিলেন। বিশ্বচিত্তলোকের বীণকার যে দেবতা অনন্ত, তিনি ছিলেন সেই পরম দেবতার প্রত্যাশী। শেষ বয়সে 'আকাশ প্রদীপ'-এর নাম-কবিতায় তিনি সেই কথাই নতুন করে বলে গেছেন—'এবার তবে ঘরের প্রদীপ বাইরে নিয়ে চলো।' কিন্তু সেটিই তাঁর শেষপর্বের একমাত্র কথা নয়। তিনি নিজে বলেছেন: 'বাইরের হাটের দর কেবলই ওঠা-নামা করছে—সেখানে নানা মুনির নানা মত, নানা লোকের নানা ফরমাস, নানা কালের নানা ফ্যাশান। বাস্তবের সেই হট্টগোলের মধ্যে পড়লে কবির কাব্য হাটের কাব্য হবে।' আবার, তিনিই বলেছেন, জনসাধারণের সুবিধার জন্যে তানসেন 'মেঠো' সুর তৈরি করতেন না!

বাংলার শিক্ষিত-সমাজে 'আধুনিকদের' মধ্যে সে-পর্বে মার্কসীয় দর্শনের দিকে ব্যাপক আকর্ষণ দেখা গেছে। সেই ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন—'মার্কসিজমের ছোঁয়াচ যদি কারো কবিতায় লাগে, অর্থাৎ কাব্যের জাত বাঁচিয়ে থাকে, তাহলে আপত্তির কথা নেই, কিন্তু যদি নাই লাগে, তাহলে কি জাত তুলে গাল দেওয়া শোভা পায়। কেমেস্ট্রি ল্যাবরেটারি যদি ভালোয় ভালোয় জুড়তে পারো রান্নাঘরে, তবে সায়ান্সের

জয়জয়কার করব, কিন্তু নাই যদি পারো, তাহলে হারজিতের তর্ক তুলব না, ভোজনটার ব্যাঘাত না হলেই হোলো।'[১]

তিনি তাঁর এই শেষ-পর্বের বই 'আকাশ প্রদীপ' উৎসর্গ করেন কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নামে। সেই উৎসর্গ-পত্রে লেখা হয়:

> 'বয়সে তোমাকে অনেক দূরে পেরিয়ে এসেছি, তবু তোমাদের কালের সঙ্গে আমার যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে, এমনতরো অস্বীকৃতির সংশয়বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনিনি। তাই আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে আশা করে এই বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম। তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র থেকে একে গ্রহণ করো।'

'পুনশ্চ'তে টি. এস্. এলিয়টের 'The Journey of the Magi' কবিতার অনুবাদ—'তীর্থযাত্রী' সংকলিত হয়েছে। 'শেষ সপ্তক'-এর তেইশের সেই কবিতায় প্রবীণ রবীন্দ্রনাথই লিখেছেন:

> 'কল্পনা করছি—
> অনাগত যুগ থেকে
> তীর্থযাত্রী আমি
> ভেসে এসেছি মন্ত্রবলে।'

গাছ তাঁর প্রিয় রূপক। 'বনবাণী'তে,—'পত্রপুট'-এ,—তার আগে 'লিপিকা'তেও অনুরূপ রূপক-সহযোগে প্রাণৈশ্বর্যের কথা দেখা গেছে। 'নবজাতক'-এর 'প্রবীণ' কবিতায় তিনি আবার সেই গাছের রূপক দিয়েই লেখেন:

> 'আশি বছর বয়স হবে ওই যে পিপুল গাছ
> এ আশ্বিনের রোদ্দুরে ওর দেখলে বিপুল নাচ?

আবার, 'পত্রপুট'-এর তেরো নম্বর কবিতায় নিজের কবিসত্তাকে তিনি 'বনস্পতি' বলে চিনেছেন! তাঁর ব্যক্তিত্বের মূলে নিজস্ব যে প্রেরণা ছিল,—তাঁরই ভাষা ব্যবহার ক'রে, তাকে বলা যায়—'স্বাভাবিকী বলক্রিয়া'! তিনি বলে গেছেন—অসংখ্য উদ্ভিদরূপের মধ্যে বিশেষ গাছকে বটগাছ করেই গড়ে

১। ডঃ অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র: প্রবাসী, ১৩৪৬ দ্রষ্টব্য।

তুলেছে যে প্রবর্তনা,—'সে তার স্বাভাবিকী বলক্রিয়া'।[২] এবং সে-শক্তি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য হোলো—'নিজের ভিতরকার এই প্রাণময় রহস্যের কথা আমরা সহজে চিন্তা করিনে কিন্তু আমি তাকে বারবার অনুভব করেছি। বিশেষ ভাবে আজ যখন আয়ুর প্রান্তসীমায় এসে পৌছেছি তখন তার উপলব্ধি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।'

'আত্মপরিচয়'-এর ষষ্ঠ রচনায় তিনি লিখেছেন—'আমি সাধু নই, সাধক নই, বিশ্বরচনার অমৃতস্বাদের আমি যাচনদার, বার বার বলতে এসেছি ভালো লাগলো আমার।' বলেছেন,—এই কথাই তাঁর 'নটীর পূজা'র কথা। সংসারের প্রত্যেক পরিবর্তনের মধ্যে দেবতার কাব্য দেখেছেন তিনি! বলেছেন :

> 'সংসারের নিয়মকে জেনেছি, তাকে মানতেও হয়েছে, মূঢ়ের মতো তাকে উচ্ছৃঙ্খল কল্পনায় বিকৃত করে দেখিনি, কিন্তু এই সমস্ত ব্যবহারের মাঝখান দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমার মন যুক্ত হয়ে চলে গেছে সেইখানে যেখানে সৃষ্টি গেছে সৃষ্টির অতীতে।'

'ঋগ্বেদ' স্মরণ করে বলেছেন—'দেখো এই দেখো এই দেবতার কাব্য—পশ্য দেবস্য কাব্যম্'।

'আত্মপরিচয়ে'র চতুর্থ প্রবন্ধে জানিয়েছেন :

> 'একদিন আমি বলেছিলাম, 'আমি চাইনে হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক।' সে-কথা সত্য বলেছিলাম। ..বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে বাইরে লীলায়িত করা—এই আমার কাজ।'[৩]

ঐ বইয়েরই তৃতীয় প্রবন্ধে তিনি বলেন,—শারদোৎসব থেকে ফাল্গুনী পর্যন্ত সব কখানি নাটকেই মূল কথাটা এক। 'জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার পরিচয় চাই।'[৪]

আদি-পর্বের রচনা 'শৈশব-সংগীতে'ও সুখ-দুঃখের 'ঢেউ-খেলা' দেখবার

২। আত্মপরিচয় ॥ ষষ্ঠ রচনা ॥ ১, বৈশাখ ১৩৪৭ [১৯৪০] দ্রষ্টব্য।

৩। ২৫এ বৈশাখ ১৩৩৮ [১৯৩১] তারিখের উক্তি।

৪। ১৩২৪ [১৯১৭]-এর উক্তি।

কথা ছিল। সে-কাব্যেও প্রকৃতির বর্ণ-সমারোহ দেখেছিলেন তিনি! নিজের অশেষ বৈচিত্র্যময় কবি-জীবনে সে-রকম সমারোহের পরিচিতি তিনি বার-বার দিয়ে গেছেন। শেষ-পর্বের 'মহুয়া'ও সেই রকম সংবেদন-ঐশ্বর্যের স্মারক! এদিক থেকে তাঁর কবি-জীবনের শেষ-পর্ব যেন তাঁর আদিপর্বেরই পরিণততর, উজ্জ্বলতর অভিব্যক্তি। জীবন এবং মৃত্যু,—দুইয়েরই সমান রসিক তিনি! 'প্রহাসিনী'তে হাসতে হাসতে লিখে গেছেন :

'পাঁজিতে যে আঁক টানে গ্রহ-নক্ষত্তর
আমি তো তদনুসারে পেরিয়েছি-সত্তর।'

কিন্তু সত্তরেও তিনি যে রিক্ত হননি, সে-কথা হাসতে-হাসতেও বলতে ভোলেন নি। তবে, মাঝে মাঝে এও উল্লেখ করেছেন যে,—'জীর্ণ জীবনে আজ রঙ নাই, মধু নাই'! এবং ভবিষ্যৎ কালের লোকপ্রিয় কবির আমলেও তাঁর নিজের কবিতার কিছু-যে আবেদন থাকবেই, এ আশা তিনি আগের পর্বেও যেমন, অন্ত্য পর্বেও তেমনি বেশ জোরের সঙ্গেই প্রকাশ করে গেছেন :

'তাহলে হঠাৎ বুক উঠিবে যে কাঁপিয়া
বৈতরণীতে যবে যাব খেয়া চাপিয়া।'

'প্রহাসিনী' প্রসঙ্গে আর-একটি কথা বলা দরকার। কবিতার শিল্পকৌশল এবং রসসিদ্ধি সম্পর্কে নানা প্রবন্ধের মধ্যে তিনি নানা কথা বলে গেছেন। তাঁর সে-সব রচনার বাইরেও, অন্যত্র তৎপ্রসঙ্গের অল্প-বিস্তর বিচার-বিশ্লেষণ আছে। চিঠিপত্রে তো বটেই, তা ছাড়া তাঁর অনেক কবিতাতেও কাব্যসত্য সম্বন্ধে তাঁর গভীর চিন্তা, আর তাঁর কবিকর্মের আঙ্গিক-ভাবনা, দুইই ধরা পড়েছে। শেষ ক'বছরের বহু কবিতার ছত্রে-ছত্রে তাঁর নিজের স্বাস্থ্যভঙ্গ, জগতের সার্বিক পট-পরিবর্তন, গভীর বিশ্বসৌন্দর্যের উপলব্ধি ইত্যাদি প্রসঙ্গের পাশাপাশি কবিতার সত্য সম্পর্কে,—বা এই রকম কাব্যতত্ত্বচিন্তারই নানা উদাহরণ দেখা যায়। 'প্রহাসিনী' তারও উদাহরণ।

'প্রহাসিনী', 'নবজাতক', সানাই', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে', 'ছড়া', এবং শেষ লেখা',—১৯৩৯ থেকে ১৯৪১-এর মধ্যে এই আটখানি কবিতার বই বেরোয়। 'সেঁজুতি' বেরিয়েছিল ১৯৩৮-এ,—বাংলা ১৩৪৫ সালের ভাদ্রমাসে। তাতে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কাছে লেখা 'পত্রোত্তর'

কবিতায় 'চিরপ্রশ্নের বেদীসম্মুখে চিরনির্বাক'—'বিরাট নিরুত্তর' সম্বন্ধে তিনি জানান :

'খনে খনে তারি বহিরঙ্গণ-দ্বারে
পুলকে দাঁড়ায়, কত কী যে হয় বলা ;
শুধু মনে জানি, বাজিলনা বীণাতারে
পরমের সুরে চরমের গীতিকলা।'

বলা বাহুল্য, পরমের সুরে চরমের গীতিকলা' তাঁর উপলব্ধিতে ধরা দিয়েছিল। নিজের রচনায় সেই আদর্শেরই সন্ধান করে গেছেন তিনি। শিল্পীর চিরন্তন অসন্তোষের রঙেই তিনি তাঁর সেই সন্ধানের বেদনা চিহ্নিত করে গেছেন। 'সেঁজুতির' শেষ দিকের 'মায়া' কবিতাতেও সেই মনোবেদনারই চিহ্ন আছে।

'প্রহাসিনীর আয়োজনটা হালকা ধরনের। সেখানে সব কথাই ঠাট্টার সুরে বেজেছে। নিজের অতীত সামার্থ্যের সঙ্গে বার্ধক্যের তুলনা ক'রে 'গরঠিকানি' লেখাটিতে তিনি লেখেন :

'লেখনীটা ছিল
শক্ত জাতেরই ঘোড়া ;
বয়সের দোষে
কিছু তা হয়েছে খোঁড়া।'

তবু

'তোমার কলম
চলে যে হালকা চালে,
আমারো কলম
চালাব সে ঝাঁপতালে'

এবং

'সত্য কথাটা
উচিত কবুল করা—

রব যে উঠেছে
　　রবিরে ধরেছে জরা,
তারই প্রতিবাদ
　　করি এই তাল ঠুকে ;
তাই বকে যাই
　　যত কথা আসে মুখে।'

এ-ঘটনার অনেক আগেই তাঁর এরকম প্রতিবাদ কিন্তু আরো কয়েকবার উচ্চারিত হয়। ১৩৩৪এর ২০এ ফাল্গুন গিরিজাকুমার বসুর কাছে লেখা একখানি চিঠিতে তিনি লেখেন :

'তরুণের দল আমাকে সাহিত্যের আসর থেকে বরখাস্ত করেচেন এমনি একটা রব উঠেচে। এ আসরে যখন প্রবেশ করেছিলেম তখন তাঁরা আমাকে নিযুক্ত করেননি—সেই কারণেই তাঁরা জবাব দিলেই যে আমাকে মাথায় হাত দিয়ে পড়তে হবে এমন আশঙ্কা কোরোনা।'

বাংলাদেশে সাহিত্যক্ষেত্রে তখন 'কল্লোল'-এর নবীন লেখকরা দেখা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তখন কিঞ্চিৎ চড়া সুরেই তাঁর আত্মবিশ্বাস ঘোষণা করেন। কিন্তু তাঁর এই শেষ কয়েক বছরের কবিতায় তিনি কাব্যতত্ত্ব বা সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে যেখানে যেখানে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেছেন, সে-সব ক্ষেত্রে সুর মোটেই চড়া হয়নি। শান্ত মর্জিতে, কতকটা কৌতুকের সুরে, কোথাও বা উদাস অনাসক্তির খেয়ালে, তিনি আপন মনের সহজ বিশ্বাসের কথা বলে গেছেন।

শীতের রৌদ্রস্নাত মাঠের দিকে চেয়ে-চেয়ে তখন তাঁর দিন কেটে যায় ফিকে নীল রঙের আকাশে ভেসে বেড়ায় কবির ভাবের বাষ্প! সেই ভাববাষ্প যেন সুগ্রথিত নয়,—সংহত নয়,—দৃঢ়সংবদ্ধ নয়। তাঁর এসব আত্মবিশ্লেষণ মোটেই খেদোক্তি নয়। পরম শান্তির মনোভাব নিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর এ-পর্বের এই আত্মচিন্তা প্রকাশ করে গেছেন। এ-সময়ে তাঁর কখনো মনে হয়েছে, যেন অনেক দিন কলম ধরাই হয় না! ভাব আপনি দেখা দিয়ে আপনিই যেন মিলিয়ে যায়। সেই অবস্থায় তিনি কল্পনা করেছেন যে,

তাঁর কলম তাঁকে হয়তো এই ধরনের চিঠি লিখতে পারতো :

'বিনয়সহ এই নিবেদন অঙ্গুলিচম্পাসু,
নালিশ জানাই কবির কাছে, জবাবটা চাই আশু।
যে লেখনী তোমার হাতের স্পর্শে জীবন লভে
অচলকূটের নির্বাসন সে কেমন করে সবে।'

কবি-চৈতন্যের দীর্ঘ সান্নিধ্যের ফলে, অচেতন কলমের পক্ষে এইভাবে সচেতন হয়ে ওঠা মোটেই অসম্ভব নয়! সেটা সম্ভব হলে এ-রকম চিঠিই বা অবিশ্বাস্য মনে হবে কেন? 'প্রহাসিনী'র 'অনাদৃতা লেখনী'তে রবীন্দ্রনাথের শেষ-পর্বের এই আত্মচিন্তাই নিহিত আছে।

শতাব্দীর সূচনা থেকেই বাংলা কবিতার রাজ্যে তাঁর অনুকরণ ক্রমশঃ ব্যাপক হয়ে ওঠে। কিন্তু তাঁর মতন মনের কিংবা তাঁর মতন ভাষার অধিকারী আর কে-ই বা ছিলেন? অনুকরণনিষ্ঠ প্রতিবেশীদের অত্যাচারে তিনি জীবনে অনেকবার বড়োই জর্জর বোধ করেছেন। শেষ পর্বেও সে অত্যাচার কমেনি। 'প্রহাসিনী'-র 'পলাতকা' কবিতাটির শেষ দিকে, অন্য কথার মধ্যে, তাই বোধ হয়, সেই অনুকরণ-প্রসঙ্গই দেখা দিয়েছিল। নাতনিকে চিঠি লিখে তাই তিনি জানান :

'অনুকরণের শরাহত
আছি আমি ভীষ্মের মতো,
তাহে তুমি বাড়িয়োনা স্বর…'

'মাল্যতত্ত্ব' নামে আর-একটি কবিতায় নাতনির সঙ্গে আর-একরকম আলাপের কথা আছে। লাইব্রেরি-ঘরে বসে, গলায় কুন্দফুলের মালা পরে, দাদামশাই 'প্রুফ' সংশোধনে ব্যস্ত ছিলেন। নাতনি ভাবলেন, তাঁরই কোনো সহপাঠিনীর দেওয়া মালা গলায় নিয়ে কবি বুঝি নবগৌরবে বিভোর হয়ে আছেন! কিন্তু দাদামশাই বলেন :

'নাম যদি তার শুনবে নিতান্তই
আমাদের ঐ জগা মালি, মৃদুস্বরে কই।'

তরুণীদের করুণা জলাঞ্জলি দিয়ে কেন যে জগামালীর কঠিন কালো রূপ

তাঁর মনঃপুত হোলো, সে-কথার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঐ কবিতাতেই লিখে গেছেন :

'সে-সব কথা বলতে মানি ভয়
তোমার মতো নব্যজনের পাছে মনে হয়—
এ বাণী বস্তুত
কেবল মাত্র উচ্চ দরের উপদেশের ছুতো
ডাইডাকটিক্ আখ্যা দিয়ে যারে
নিন্দা করে নূতন অলংকারে।
গা ছুঁয়ে তোর কই,
কবিই আমি উপদেষ্টা নই।'

তবু জগামালীর খাঁটি মালার খাঁটিত্ব সম্বন্ধে নাত্‌নির মনের সংশয় দূর হয়নি। নাত্‌নি বলেছেন :

'কাব্যকথার ছলে
পকেট থেকে বেরোয় তোমার ভালো কথার থলি
ওটাই আমি অভ্যাসদোষ বলি।'

অতঃপর নাতনির অনুরোধে সেইদিনের সেই অভিজ্ঞতাকে কবিতায় রূপান্তরিত করবার সদিচ্ছা প্রকাশ করে, প্রথাসিদ্ধ অতিরঞ্জনের দায়িত্ব মেনে নিয়ে, তিনি লিখে ফেলেন :

'শুক্ল একাদশীর রাতে
কলিকাতার ছাতে
জ্যোৎস্না যেন পারিজাতের পাপড়ি দিয়ে ছোঁয়া,
গলায় আমার কুন্দমালা গোলাপ জলে ধোওয়া'—

এবং

'এইটুকু যেই লিখেছি সেই হঠাৎ মনে প'ল
এটা নেহাত অসাময়িক হল।
হাল ফ্যাশানের বাণীর সঙ্গে নতুন হল রফা,
একাদশীর চন্দ্র দেবেন কর্মেতে ইস্তফা।'

কারণ, 'আধুনিকরা বলেন—'মধুর করে বানিয়ে বলা নয় কিছুতেই ন্যায্য।' অতএব তথাকথিত 'আধুনিক' তিক্ত রীতিতেই বিষয়টা অন্য ভাষায়, অন্য ভঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে :

'বদল করে হল শেষে নিম্নরকম ভাষা—
'আকাশ সেদিন ধুলোয় ধোঁয়ায় নিরেট করে ঠাসা,
রাতটা যেন কুলি মাগি কয়লাখনি থেকে
এল কালো রঙের উপর কালির প্রলেপ মেখে।'

নাতনি বলেন :

'বিশ্বপ্রেমিক, তাই তোমার এই তত্ত্ব—
ফুলের গন্ধ আলংকারিক, এ গন্ধটাই সত্য।'

কবি আরো মাত্রা চড়িয়ে বলেন :

'মালাটাই যে ঘোর সেকেলে, সরস্বতীর গলে
আর কি ওটা চলে।
রিয়ালিস্টিক প্রসাধন যা নব্য শাস্ত্রে পড়ি—
সেটা গলায় দড়ি।'

বছরের শেষ দিনে ১৯৩৮-এর ৩১এ ডিসেম্বর,—শান্তিনিকেতনে বসে তিনি এই কবিতা লেখেন। কালের এবং রুচির পরিবর্তন সম্বন্ধে নিরন্তর তাঁর চিন্তা চলছিল। 'পুনশ্চ' এবং 'পরিশেষএর 'নূতন কাল' কবিতা-দুটির পাশাপাশি এই লেখাগুলিও সেই কারণেই একযোগে ধর্তব্য। 'রিয়ালিস্টিক আধুনিকে'র কথা তিনি আবার বলেছিলেন 'প্রহাসিনীর' 'ধ্যানভঙ্গ' কবিতায়। আর, বইয়ের শেষ দিকে 'মাছিতত্ত্ব' নামে আর-একটি লেখার মধ্যে [রচনাকাল : ২২এ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০] অভিপ্রেত বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও, মনে হয়, সে-কালের সাহিত্য-মানসিকতার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতা-নীতিরই কঠোর সমালোচনা করা হয়েছিল। ঠাট্টা করে তিনি বলেছিলেন :

'মাছি বংশেতে এল অদ্ভুত জ্ঞানী সে,
আজন্ম ধ্যানী সে।'

সেই মাছির বিষয়ে তিনি পুনরপি বলেন—'অঘোরপন্থ সে যে শবাসন সাধনায়'; এব

'মন তার বিজ্ঞাননিষ্ঠ;
মানুষের বক্ষ বা পৃষ্ঠ
কিংবা তাহার নাসিকান্ত
তাই নিয়ে গবেষণা চলে অক্লান্ত—'

তাছাড়া

'এদের ভাষায় নেই 'ছি ছি'
শৌখীন রুচি নিয়ে খুঁত খুঁত নেই মিছামিছি।'

কবিতার শেষ কয়েক ছত্রে এই মাছি সম্বন্ধে বড়োই কঠোর এক মন্তব্য ছিল। 'প্রহাসিনীর' হাল্‌কা হাসিতে হঠাৎ যেন খুবই কড়া তিরস্কারের সুর লেগেছিল:

'নিত্য কানের কাছে ভন্‌ভন্‌ ভন্‌ভন্‌
লুব্ধের অপ্রতিহত অবলম্বন।'

তারপর ১৯৩০এর ৪ঠা আগষ্ট শান্তিনিকেতনে বসেই তিনি পুনরায় লেখেন:

'শুঁটকি মাছের যারা রাঁধুনিক
হয়তো সে দলে তুমি আধুনিক
তব নাসিকার গুণ কী যে তা,
বাসি দুর্গন্ধের বিজেতা।
সেটা প্রোলিটেরিটের লক্ষণ,
বুর্জোয়া-গর্বের মোক্ষণ।'

এবং 'প্রহাসিনী'র সংযোজিত কবিতাগুলির মধ্যে এই শেষ কবিতার একেবারে শেষ কয়েক ছত্রে বলা হয়:

'আজকাল বিড়িটানা শহরে
যে চাল ধরেছে আটপহরে,

মাসিকেতে একদিন কে জানে
অধুনাতনের মন-ভেজানে
মানে-হীন কোনো এক কাব্য
নাম করি দিবে অশ্রাব্য।'

১৩৪৭এর আশ্বিন-সংখ্যার 'নিরুক্ত' পত্রিকায় সেকালের এই 'আধুনিকতা'-দমনী কবিতাটি ছাপা হয়। রবীন্দ্রনাথের শেষ কয়েক বছরের কবিতা খুঁজে দেখলে,—১৯৩০-এর কাছাকাছি সময় থেকে শুরু করে তাঁর মহাপ্রয়াণের প্রহর অবধি বাংলা কবিতার দশ-পনেরো বছরের প্রবাহের মধ্যে যে নবরুচির আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, সে-বিষয়ে তাঁর এই রকম কটু-কষায় সমালোচনা চোখে পড়ে। এখানে 'প্রহাসিনী'র সেই সুদীর্ঘ সমালোচনার একটি মাত্র অংশই দেখা গেল। অতঃপর আরো কিছু অতীতে পিছিয়ে, 'পূরবী'র কথায় ফেরা যাক্। 'পূরবী'র 'আহ্বান' কবিতায় তিনি লিখে গেছেন :

'আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া
সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া।'

'লিপি'তে তিনি প্রশ্ন করেন :

'হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড় ফিরে ফিরে।'

এবং—'প্রথম সে দর্শনের অসীম বিস্ময় এখনো যে কাঁপে বক্ষোময়'! সৃষ্টির আদিপর্বে কোনো-এক শুভক্ষণে বাষ্পের গুণ্ঠন খুলে গিয়েছিল! দেখা দিয়েছিল অমর জ্যোতির মূর্তি! বনে-বনান্তরে রব উঠেছিল—'জাগো রে, জাগো রে'! ধরণী আর সূর্যের মাঝখানে যে অনন্ত আকাশের ব্যবধান, সেই বিরহের তাড়নাতেই ধরণীর পত্ররচনা চলেছে—'যুগে যুগে বারম্বার লিখে লিখে বারম্বার মুছে'! পৃথিবীর সেই নিত্য নতুন প্রকাশের আগ্রহকেই কবি তাঁর কাব্যরচনার প্রেরণা ব'লে অনুভব করেন।

১৯২৪এর ৪ঠা অক্টোবর হারুনা-মারু জাহাজে বসে এ-কবিতা লেখা

হয়। এতে মানব-মনের তৃপ্তি-অতৃপ্তির বেদনা আর বিস্ময়ের প্রসঙ্গই প্রধান। আমাদের দৃষ্টিতে কী যে এক 'ছায়ার বাধা' বিদ্যমান! সুন্দর জগতের দিকে চোখ রেখে তিনি অনুভব করেন—'না-বোঝার প্রদোষ-আলোকে, স্বপ্নের চঞ্চল মূর্তি জাগায় আমার দীপ্ত চোখে সংশয়মোহের নেশা'! ৬ই অক্টোবর ঐ একই জাহাজে তাঁর এই শেষোক্ত আত্মকথা লেখা হয়। সেটি পূরবীর 'ক্ষণিকা'। তাঁর সে-কবিতায় এই নিত্য-চঞ্চলের অন্তর্লীন শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ-রূপের আদি-উৎসটি তিনি উপলব্ধি করে গেছেন। সেই বছরেই, ১৯এ অক্টোবর আণ্ডেস জাহাজে বসে 'পূরবী'র বিখ্যাত 'আশা কবিতায় তিনি লেখেন :

'বহুদিন মনে ছিল আশা—
অন্তরের ধ্যানখানি
লভিবে সম্পূর্ণ বাণী
ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা
করেছিনু আশা।'

এই তাঁর সন্ধানের সার কথা। কবি-জীবনের পর্বে-পর্বে, বার-বার নিজের অভিব্যক্তির যোগ্যতম ভাষা খুঁজেছিলেন তিনি! তিনি সৃষ্টির আনন্দও পেয়েছেন, ধ্বংসের বিসর্জনও দেখেছেন। 'পূরবীর' 'পদধ্বনি'তে সে-কথা বলা হয়েছে। তিনি নির্ভয় হয়েছেন। সেই 'নিত্য-শিশু'কে তিনি অন্তরে অনুভব করেছেন, যে—

'কিছু নাহি চাহে—
নিজের খেলেনাচূর্ণ
ভাসাইছে অসম্পূর্ণ
খেলার প্রবাহে…'

সেই নিত্যশিশুই তাঁর বন্ধু, তাঁর সঙ্গী! কবির 'বিরহী' সেই শিশু! তারই পদধ্বনি শুনেছেন তিনি। ২৪এ অক্টোবর তিনি এ-কবিতা লেখেন। আণ্ডেস জাহাজে যেতে যেতে লেখা ২৮এ অক্টোবরের 'দোসর' কবিতায় তাকেই তিনি আবার 'দোসর' বলে ডাকেন :

'দোসর আমার, দোসর ওগো, কোথা থেকে
কোন্ শিশুকাল হতে আমায় গেলে ডেকে।
তাই তো আমি চিরজনম একলা থাকি…'

তাকেই ডেকে বলেছেন :

'দোসর ওগো, দোসর আমার, দাও-না দেখা—
সময় হল, একার সাথে মিলুক একা।'

শেষ বয়সে তিনি যেন ছুটির মর্জিতে জীবনবিচিত্রার রূপকার হয়ে আত্মপ্রকাশ করে গেছেন। মনে পড়ে 'বীথিকা'র 'ছুটির লেখা' :

'এ লেখা মোর শূন্যদ্বীপের সৈকততীর
তাকিয়ে থাকে দৃষ্টি-অতীত পারের পানে
উদ্দেশহীন জোয়ার-ভাঁটায় অস্থির নীর
শামুক ঝিনুক যা খুশি তাই ভাসিয়ে আনে।'

১৯৩৫এর ৬ই জুন চন্দননগরে এ-কবিতা লেখা হয়। আবার, এরই বছর তিনেক পরের লেখা সেঁজুতির প্রসিদ্ধ 'জন্মদিন' কবিতায় [২৫, বৈশাখ, ১৩৪৫] গভীর বিশ্বাস, শান্তি এবং দুঃখানুভূতি বেজে উঠেছে :

'যবে শান্ত নিরাসক্ত গিয়েছি তোমার নিমন্ত্রণে
তোমার অমরাবতী সুপ্রসন্ন সেই শুভক্ষণে
মুক্তদ্বার ; বুভুক্ষুর লালসারে করে সে বঞ্চিত ;
তাহার মাটির পাত্রে যে-অমৃত রয়েছে সঞ্চিত
নহে তাহা দীন ভিক্ষু লালায়িত লোলুপের লাগি।
ইন্দ্রের ঐশ্বর্য নিয়ে, হে ধরিত্রী, আছ তুমি জাগি
ত্যাগীরে প্রত্যাশা করি, নির্লোভেরে সঁপিতে সম্মান,
দুর্গমের পথিকেরে আতিথ্য করিতে তব দান
বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে। ক্ষুব্ধ যারা লুব্ধ যারা,
মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা
শ্মশানের প্রান্তচর, আবর্জনাকুণ্ড তব ঘেরি
বীভৎস চীৎকারে তারা রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি,
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি।'

তাঁর কাব্যপ্রবাহের শেষ-পর্ব তাই তাঁর সারা জীবনের স্থায়ী আদর্শবোধ, জীবন-বিশ্বাস, প্রেমোপলব্ধি, মৃত্যু-বোধ, প্রকৃতি-প্রেম, সমাজ-নিষ্ঠা এবং

শিল্প-চিন্তারই পুনরাবৃত্তি। কিন্তু এ-পর্ব শুধু পুরোনো তথ্যের পুনরাবৃত্তি নয়। এখানে তাঁর ভ্রমণের চির-আনন্দই ব্যক্ত হয়েছে। জীবনের অন্তিম লগ্নে যে শান্তি-পারাবারে তিনি তরী ভাসাবার কথা বলে গেছেন, তার৬ বীজানুভূতি পাওয়া যায় 'পূরবী'র 'মৃত্যুর আহ্বান' কবিতায়। সেটি লেখা হয় ৩রা নভেম্বর। তাতে তিনি বলেন—মানুষের 'জন্ম' মানে 'গৃহ-মাঝে গৃহীর আহ্বান'; আর—'মৃত্যু সে যে পথিকের ডাক'! ২৯এ নভেম্বর সান-ইসিড্রোতে 'পথ' নামে একটি কবিতা লেখা হয়। তাতে বলেন—'আমি চলিবার পথ, সেই আমি ভুলিবার পথ'! শেষ-পর্বের সেই 'পথ' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের সেই নিত্য-পান্থ মন-ই দেখা দিয়েছিল:

'বামে মোর শস্যক্ষেত্র, দক্ষিণে আমার লোকালয়—
প্রাণ সেথা দুই হস্তে বর্তমান আঁকড়িয়া রয়।
আমি সর্ববন্ধহীন নিত্য চলি তারি মধ্যখানে
ভবিষ্যের পানে।'

১৯২৫ এর ১৬ই জানুয়ারি 'জুলিয়ো চেজারে' জাহাজে লেখা 'প্রাণ-গঙ্গা' কবিতায় নিজের রচনা সম্বন্ধে সেই সময়েই তিনি বলেন যে, তাঁর গান আর কিছুই নয়, সে শুধু প্রাণজাহ্নবীর উদ্দেশে সমর্পিত 'কুসুম-অঞ্জলি অর্ঘ্যদান'!

সুন্দরকে তিনি আনন্দে চিনেছিলেন; বলেছিলেন—'ওগো মোর না-পাওয়া গো!' সেও তাঁর চিরজীবনের ডাক! শুধু শেষ পর্বে নয়,—জীবনসত্য তাঁর চোখে চির রহস্যময়! অনেকদিন আগে 'ক্ষণিকা'য় সেই একই রবীন্দ্রনাথ এই একই কথা যেন অন্য ভঙ্গিতে লিখেছিলেন:

'কেউ যে কারে চিনিনাক সেটা মস্ত বাঁচন;
তা না হলে নাচিয়ে দিত বিষম তুর্কী নাচন।'

আবার, 'লিপিকা'র 'মেঘদূত' লেখাটিতে প্রত্যেক মানুষের অন্তর্লীন রহস্য সম্বন্ধেই অন্য সুরে, অন্য ভঙ্গিতে বলা হয়:

'দুই মানুষের মাঝে যে অসীম আকাশ সেখানে সব চুপ, সেখানে কথা চলে না। সেই মস্ত চুপকে বাঁশির সুর দিয়ে ভরিয়ে দিতে হয়। অনন্ত আকাশের ফাঁক না পেলে বাঁশি বাজে না।'

'সেই আমাদের মাঝের আকাশটি আঁধিতে ঢেকেছে, প্রতিদিনের কাজে কর্মে কথায় ভরে গিয়েছে, প্রতিদিনের ভয় ভাবনা কৃপণতায়।'

বলেছেন:

'সেই আকাশ-পৃথিবীর বিবাহমন্ত্রগুঞ্জন নিয়ে নববর্ষা নামুক আমাদের বিচ্ছেদের পরে। প্রিয়ার মধ্যে যা অনির্বচনীয় তাই হঠাৎ-বেজে-ওঠা বীণার তারের মতো চকিত হয়ে উঠুক। সে আপন সিঁথির পরে তুলে দিক দূর বনান্তের রঙটির মতো তার নীলাঞ্চল। তার কালো চোখের চাহনিতে মেঘমল্লারের সব মিড়গুলি আর্ত হয়ে উঠুক। সার্থক হোক্ বকুলমালা তার বেণীর বাঁকে বাঁকে জড়িয়ে উঠে।'

এই 'মেঘদূত' নিবন্ধের রচনাকাল কার্তিক, ১৩২৬। তাঁর কাব্যধারায় কালিদাসের উল্লেখ বা প্রতিধ্বনি নতুন নয়,—তা প্রায়ই ঘটে থাকে। আগেও তাই, শেষ পর্বেও তাই! 'পুনশ্চ'র 'বিচ্ছেদ' কবিতাটি এই সূত্রে স্মরণীয়,—তেমনি তাঁর শেষ পর্বের আরো কোনো কোনো লেখা।

তাঁর কবিচিত্তের সূক্ষ্ম সংবেদন-ভূমিতেই তাঁর কবিতার বিভিন্ন পাঠান্তরের সূত্র নিহিত। শেষ-পর্বেও এই নানা পাঠান্তরের প্রাচুর্য চোখে পড়ে। এক কথা একভাবে বলে তাঁর যেন তৃপ্তি হয় না। তখন অন্যভাবে বলবার চেষ্টা করেন। 'লিপিকা'র লেখাগুলি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২৪-২৯এর সবুজপত্র, প্রবাসী, ভারতী, মানসী ও মর্মবাণী, আগমনী, শান্তিনিকেতন, আঙুর, পার্বণী, মোসলেম-ভারত এবং বঙ্গবাণী পত্রিকায়। এই সব পত্রিকায় মূল রচনার যে পাঠ ছিল, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার সময়ে, অনেক ক্ষেত্রেই সে পাঠ বদলে যায়। ১৩২৬এর আশ্বিনের 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'মেঘলা দিনে' এবং ঐ বছরে ফাল্গুনের 'সবুজপত্রে' প্রকাশত 'প্রাণমন' 'লিপিকা'য় পরিবর্ধিত হয়। ১৩২৬এর পৌষের 'শান্তিনিকেতনে' প্রকাশিত 'মুক্তি' লেখাটি লিপিকায় 'পূর্ব-প্রকাশিত পাঠের তুলনায় সংস্কৃত ও সংক্ষিপ্ত'।

১২৯২-এর বৈশাখের 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'পুষ্পাঞ্জলি'র কোনো কোনো স্তবকের প্রভাব আছে 'লিপিকা'র প্রথম ভাগের কোনো কোনো লেখাতে। সপ্তদশ খণ্ড 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র গ্রন্থপরিচয় অংশ এই সূত্রে দেখে নিলে একথা স্পষ্টই বোঝা যায়।

'লিপিকা'র 'নতুন পুতুল' প্রথম বেরিয়েছিল ১৩২৮এর ভাদ্রের 'প্রবাসী'তে। তাতে পুরোনো শিল্পীর গৌরবলোপের কথা আছে। নতুন কালের শিল্পী কিষণলাল দেখা দিতেই পুরোনো কালের প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর দিনাবসান ঘটে! তারপর মেয়ের শাসনে,—জামাইয়ের ক্ষেতের কাক তাড়িয়ে, —নাত্‌নি সুভদ্রার আদরে তার দিন কেটে যায়। একদিন সুভদ্রার হাতে তার সেই মাতামহের তৈরী পুতুল দেখে, রাজবাড়ির শিল্পী কিষণলাল সেই পুতুলের সাজ বদলে দেয়। সামান্য এই সাজ-বদলের ফলেই পুরোনো গুণীর পুতুল নতুন-কালের ক্রেতার মনোরঞ্জন করে! সুভদ্রার অনুরাগী এই নতুন-কালের শিল্পী কিষণলাল পুরোনো কালের গুণীর কাছে এসে দাঁড়ায়। সুভদ্রার প্রতীক্ষায় সে পিয়ালগাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকে! তারপর, কাছে এসে পুরোনো কালের গুণীকে প্রণাম করে।

> 'বুড়ো তাকে বুকে চেপে ধরে বললে, 'ভাই একদিন তুমি কেড়ে নিয়েছিলে আমার হাতের পুতুলকে, আজ নিলে আমার প্রাণের পুতুলটাকে।
>
> নাত্‌নি বুড়োর গলা ধরে তার কানে কানে বললে, 'দাদা, তোমাকে শুদ্ধ'।

তাঁর এই লেখাটির সঙ্গে 'নামের খেলা'ও [ভাদ্র, ১৩২৮] বিবেচ্য। 'সুয়োরানীর সাধ' [আশ্বিন, ১৩২৭], 'রাজপুত্ত্র' [আশ্বিন, ১৩২৮], 'ভুল স্বর্গ' [কার্তিক, ১৩২৮], 'পরীর পরিচয়' [বৈশাখ, ১৩২৯],' বিদূষক' [বৈশাখ, ১৩২৯] ইত্যাদি লেখাগুলি এইরকম গভীর বাণীবাহী রচনা। তাঁর 'গলি [১৩২৬, অগ্রহায়ণ] লেখাটি অনেক পরের 'পুনশ্চ' বইয়ের 'কিনু গোয়ালার গলি'র সঙ্গে তুলনীয়। 'লিপিকা'র এই 'গলি'তে দেখা গেছে :

> 'এ দিকে বেলা বেড়ে যায়; ব্যস্ত গৃহিণীর আঁচলটার মতো বাড়িগুলোর কাঁধের উপর থেকে রোদ্দুরখানা গলির ধারে খসে পড়ে; ঘড়িতে-ন'টা বাজে; ঝি কোমরে ঝুড়ি ক'রে বাজার নিয়ে আসে; রান্নার গন্ধে

আর ধোঁওয়াতে গলি ভরে যায়; যারা আপিসে যায় তারা ব্যস্ত হতে থাকে।'

'কৃতঘ্ন শোক'এর [কার্তিক, ১৩২৬] শেষ অনুচ্ছেদে মৃত্যুহীনতার কথা ছিল—যা তাঁর 'শেষ লেখা' পর্যন্ত সমান বিশ্বাসে উচ্চারিত :

> 'জানালার বাইরে দেখি ঝাউগাছের আড়ালে তৃতীয়ার চাঁদ উঠছে, যে গেছে যেন তারই হাসির লুকোচুরি। তারা-ছিটিয়ে-দেওয়া অন্ধকারের ভিতর থেকে একটি ভর্ৎসনা এল, 'ধরা দিয়েছিলেম সেটাই কি ফাঁকি আর আড়াল পড়েছে এইটেকেই এত জোরে বিশ্বাস?'

'লিপিকা'য় এমন কয়েকটি রচনা আছে, যেগুলিকে বলা যায় শোকার্থক রচনা, যেমন,—'কৃতঘ্ন শোক', 'প্রথম শোক' [আষাঢ় ১৩২৬], 'প্রশ্ন' [আশ্বিন ১৩২৬], 'সতেরো বছর' [কার্তিক, ১৩২৬]। 'প্রথম শোক' থেকে একটু উপমার নমুনা দেখা যেতে পারে,—'তার চোখের কোণে একটু ছলছলে আভা দেখা দিলে, যেন দিঘির জলে চাঁদের রেখা।' এ উল্লেখ অবশ্য নিতান্তই আনুষঙ্গিক ব্যাপার। তাঁর উপমা-সমৃদ্ধি সর্বত্র সমুজ্জ্বল!

'লিপিকা'র 'তোতা-কাহিনী' [মাঘ, ১৩২৪] সাধু ভাষায় লেখা।

'মাটির প্রদীপখানি আছে' এই গান দিয়ে'স্বর্গ-মর্ত' লেখাটির সূচনা হয়। এতে ইন্দ্র, বৃহস্পতি, আর কার্তিকেয়,—এই ক'জনের কথোপকথনের মধ্যে মৃত্যুতত্ত্বের আভাস ধ্বনিত হয়েছে। মুক্তিতত্ত্বের বার্তা এটি! এই লেখাটিতে তিনি বলেছেন যে, কার্তিকেয় পৃথিবীতে নেই বলেই মানুষ স্বার্থের জন্যে নির্লজ্জ হয়ে যুদ্ধ করছে। বৃহস্পতি নেই বলেই কেবল ব্যবহারের জন্যে জ্ঞানের সাধনা চলেছে। এ-ধরনের কথা তিনি 'লিপিকা'র পরেও আবার বলেছেন। শেষ-পর্বের কথা-সূত্রে এদিকটি ভোলবার নয়।

১৯২৫এর মাঝামাঝি [শ্রাবণ, ১৩৩২] সময়ে 'পূরবী' ছাপা হয়। 'বলাকা' [১৯১৬], 'পলাতকা' [১৯১৭] এবং 'লিপিকা' [১৯২২] বেরিয়ে গেছে তার বেশ কিছুকাল আগে। ১৯২৩-২৫এর রচনা এই 'পূরবী'র অনেকগুলি লেখায় তাঁর পথিক-মনের স্বাক্ষর আছে। তাঁর শেষ জীবনের

এই বিশ্ব-ভ্রমণের দিকটি তার কাব্যপাঠের সুবিধার জন্যেই জানা দরকার। ১৯২৪ থেকে ১৯৩০এর মধ্যে তাঁর সেই ভ্রমণের বিবরণ এখানে খুবই সংক্ষেপে স্মরণীয়।

'পূরবী' প্রকাশের প্রায় বছর-খানেক আগে—পিকিং লেকচার-অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে ১৯২৪এর মার্চের শেষদিকে তিনি কলকাতা থেকে চীন ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। রেঙ্গুন, পিনাং, কুয়ালালামপুর, সিঙ্গাপুর, হংকং, সাংহাই, ন্যানকিং, পিকিং ইত্যাদি দেখে,—জাপান হ'য়ে—জুলাই মাসের শেষ দিকে তিনি কলকাতায় ফেরেন। ইতিমধ্যে ১৩৩০এর বৈশাখে—১৯২৩এ 'রক্তকরবী' রচনার সূত্রপাত,—এবং ১৯২৪এর সেপ্টেম্বরে সেটি প্রকাশিত হয়। ১৯এ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ-অ্যামেরিকার পথে বেরিয়ে,—কলম্বো ছুঁয়ে, —১৯২৫এর জানুয়ারিতে আর্জেনটাইন-রিপাবলিকের সভাপতির কাছে বিদায় নিয়ে,—২১এ জানুয়ারি তিনি ইটালির জেনোয়া বন্দরে পৌছোন। ইটালির মিলানে এবং ভেনিসে অল্পকাল কাটিয়ে, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি তিনি আবার দেশে ফেরেন। তার মাস-চারেক পরেই 'পূরবী' প্রকাশিত হয়। তাঁর ভ্রমণকাহিনী 'যাত্রী'তে এই সময়ের নানা চিন্তার ইশারা আছে। ইতিমধ্যে ১৯২৪এর ডিসেম্বরে গান্ধীজীর নেতৃত্ব দেশে বেলগাঁও কংগ্রেসে অসহযোগ স্থগিত রেখে চরকা ও খাদি ব্যবহারের আদর্শ গৃহীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তারই প্রতিবাদে তাঁর 'চরকা প্রবন্ধটি লেখেন।

প্রকাশকালের পর্যায়ক্রমে 'পূরবী'র পরে উল্লেখযোগ্য কবিতার বই তাঁর 'মহুয়া' [১৯২৯]। ইতিমধ্যে ১৯২৭এর জানুয়ারি মাসে শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের উদ্যোগে বার্লিনে রবীন্দ্রনাথের অটোগ্রাফ-সংগ্রহ 'লেখন' ছাপা হয়। ১৯২৬এর ১৮ই জানুয়ারি শান্তিনিকেতনে দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। অতঃপর অল্পকালের জন্যে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ,—তারপর ১২ই মে কলকাতা থেকে বেরিয়ে,—সমুদ্রপথে পুনরায় ইটালি পৌছে,—জুন মাসের প্রথমেই মুসোলিনির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্রনাথের নিজের অনুরোধে ক্রোচের সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়। ইটালি থেকে সুইজারল্যাণ্ডে পৌছে, ভিলেন্যুভে 'হোটেল বাইরোঁনে' ভিকটর হিউগো যে-ঘরে অনেকদিন কাটিয়েছেন, সেই ঘরে বারো দিন বাস করবার সময়ে রোম্যা রোলাঁর সঙ্গে তাঁর প্রায় প্রত্যহই দেখা হোতো। জুলাই মাসে তিনি ভিয়েনায় পৌছোন। সেখান

থেকে প্যারিস হ'য়ে,—লণ্ডনে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সঙ্গে দেখা ক'রে,—অক্সফোর্ডে রবার্ট ব্রিজেসের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে,—২১এ আগস্ট তিনি নরওয়ের পথে পাড়ি দেন।

নরওয়ের অসলোতে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক স্টেন-কোনো প্রভৃতির দেখা পেয়ে, খুশি হ'য়ে,—সুইডেনের স্টক্হলমে আবিষ্কারক ভেন হিডেনের [Sven Heden] উৎসাহে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা-সভায় যোগ দিয়ে,—ডেনমার্ক ঘুরে [সেপ্টেম্বর ১৯২৬] বার্লিনে যান। সেখান থেকে ড্রেসডেনে। অক্টোবর মাসে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাগ শহরে উইন্টারনিজ আর লেস্নি তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। সেখান থেকে বেরিয়ে, রবীন্দ্রনাথ যখন অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনায় আসেন, তখন ফ্রয়েড এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। এই ভিয়েনাতে বসেই 'বনবাণী'র প্রথম কবিতা লেখা হয়।

'মহুয়া'র পরে উল্লেখযোগ্য কবিতার বই এই 'বনবাণী' প্রথম ছাপা হয় ১৯৩১এ। হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, তুরস্ক, গ্রীস, মিশর, কলম্বো হ'য়ে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি তিনি কলকাতায় পৌঁছোন। 'পথে ও পথের প্রান্তে' তাঁর এই ভ্রমণের নানা চিন্তার সঞ্চয় !

এই ভ্রমণের পরে, আবার ১৯২৭এর ১২ই জুলাই তিনি মাদ্রাজ মেলে কলকাতা থেকে যাত্রা করেন। ১৪ই সকালে 'আঁবোয়াজ' নামে ফরাসী জাহাজে তিনি মাদ্রাজ ত্যাগ করেন। ২০এ জুলাই সিঙ্গাপুরে পৌঁছে, সেখানে সাতদিন ছিলেন। ডাঃ লিম-বুন-কে প্রভৃতি চীনা সাহিত্যিকের সান্নিধ্য লাভ করেন সেখানে। ২৬এ জুলাই অপরাহ্ণে 'লারুৎ' জাহাজে সিঙ্গাপুর ত্যাগ ক'রে, ২৭এ মালাক্কা পৌঁছোন। ৩০এ জুলাই মালাক্কা থেকে কুড়ি মাইল দূরে তামপিন্ শহরে এসে কুয়ালালামপুরের ট্রেন ধরেন। দোসরা আগষ্ট চীনাদের ডুরীলেন থিয়েটারে 'ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা' ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ৭ই আগষ্ট দুপুরে কুয়ালালামপুর ত্যাগ করে ইপোতে গিয়ে পৌঁছোন। ১২ই আগষ্ট ইপো ত্যাগ করে, তাইপিং-এর পথে কুয়াল-কাংসার শহরে উপস্থিত হন। সেখান থেকে পিনাং। ১৬ই আগষ্ট 'কুয়ালা' জাহাজে সুমাত্রা যাত্রা করেন। ২১এ আগষ্ট জাহাজ যবদ্বীপে বাতাবিয়ার বন্দরে পৌঁছোয়। সেখান থেকে ২৩এ তাঁর বলিদ্বীপ যাত্রা। ২৬এ বলির উপকূলে

বুলেলঙ বন্দরে পৌঁছোন। ৮ই সেপ্টেম্বর আবার তিনি যবদ্বীপের পথে যাত্রা করেন।

২১এ সেপ্টেম্বর যোগ্যকর্তর সুলতানের বাড়িতে 'অনিন্দ্য সম্পূর্ণ' নাচ দেখেন। ২২এ তিনি বরবুদুরের বিখ্যাত বৌদ্ধ-স্তূপ দেখে নিয়ে,—৩০এ সেপ্টেম্বর 'মাইম্বর' জাহাজে শ্যামদেশ অভিমুখে [থাইল্যাণ্ড] বেরিয়ে পড়েন। ৮ই অক্টোবর শ্যামের রাজধানী ব্যাংককে পৌঁছোন। সেখান থেকে ১৬ই অক্টোবর পুনরায় ভারত অভিমুখে যাত্রা,—এবং ২৭এ অক্টোবর তাঁর কলকাতায় প্রত্যাবর্তন।

১৯২৮এর মে-মাসে পণ্ডিচেরি শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমে এবং আডিয়রের শান্তি-কুঞ্জে অ্যানি বেসান্টের সঙ্গে দেখা ক'রে রবীন্দ্রনাথ সিংহলে যান।

আরো কিছুদিন পরে,—১৯২৯এর ১লা মার্চ বোম্বাই থেকে 'নালদেরা' জাহাজে তিনি ক্যানাডা যাত্রা করেন। ১৫ই হংকং-এ পৌঁছোন। সেখান থেকে ১৯এ সাংহাই—এবং সাংহাই থেকে তাঁর জাপান-যাত্রা শুরু হয়। ২৪এ তিনি জাপানের কোবে বন্দরে পৌঁছেছিলেন।

৬ই এপ্রিল ক্যানাডার ভিক্টোরিয়া নগরে উপস্থিত হয়ে, ৭ই ভ্যাঙ্কুবার যাত্রা করেন ; ভিক্টোরিয়াতে দীনবন্ধু অ্যান্‌ড্রুজ তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। ১১ই এপ্রিল, ১৯২৯ শিখ-গুরুদ্বারে তাঁর সংবর্ধনা [Viswabharati Quarterly, ১৯২৯, April ও July—এই দুটি সংখ্যা দ্রষ্টব্য] হয়। ১৮ই লস্‌এঞ্জেলসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সভায় তিনি এক বক্তৃতা দেন। সেখানে যাবার পথে ভ্যাঙ্কুবারে পাশপোর্ট আপিসে তাঁকে কিছু বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়, এবং তারই প্রতিবাদে ২০এ তিনি আমেরিকা ত্যাগ করেন।

১০ই মে জাপানে ইয়াকোহামায় পৌঁছান,—সেখান থেকে ১১ই যান টোকিওতে। অন্যান্য জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে, ৮ই মে ফরাসী জাহাজ 'অ্যানজার্স'এ তিনি ফরাসী-ইন্দোচীন যাত্রা করেন। ২১এ জুন তিনি সাইগনে পৌঁছোন। ২৪এ সাইগন ত্যাগ করে ২৬এ সিঙ্গাপুরে পৌঁছোন,—এবং ৫ই জুলাই, মাদ্রাজ হয়ে আবার কলকাতায় ফেরেন।

এর পরে, ২রা মার্চ ১৯৩০, হিবার্ট-বক্তৃতার জন্যে তাঁকে বিলেত যাত্রা করতে হয়। এইবার সঙ্গী হিসেবে অন্যান্যদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্তা হৈমন্তী দেবী ছিলেন। কলম্বো থেকে মার্সাই-এ যান। ১১ই মে লণ্ডনে

পৌছে, ১৯এ তিনি অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতা [Religion of Man] দেন, এবং সেখান থেকে ১১ই জুলাই বার্লিনে গিয়ে আইনষ্টাইনের সঙ্গে দেখা করেন। ১৬ই জুলাই 'গ্যালারী মুলার' নামে চিত্র-সংগ্রহালয়ে তাঁর এক চিত্র-প্রদর্শনী হয়। ব্যাভেরিয়া অঞ্চলের পর্বতপ্রান্তের নিভৃত গ্রাম Oberammuergau দেখতে গিয়েছিলেন তিনি। সেই ওবেরামের্গায়ে তিনি 'Passion Play' দেখেন। তারপর, ৭ই আগষ্ট ডেনমার্ক যাত্রা করেন। ৯ই কোপেনহাগেনে তাঁর চিত্র-প্রদর্শনী হয়।

অতঃপর ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০ তাঁর মস্কো যাত্রা। এই প্রসিদ্ধ ভ্রমণে অন্যান্য সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ তিনি The Central Peasants' House-এ উপস্থিত হন। তারপর ২৫এ সেপ্টেম্বর তাঁর মস্কো ত্যাগ,—তারপর বার্লিন,—৩০এ অক্টোবর তাঁর আমেরিকা যাত্রা। ২৫এ নভেম্বর তিনি নিউইয়র্ক পৌছোন। সে-ভ্রমণ শেষ করে তিনি আবার কলকাতায় ফেরেন। এইভাবেই তাঁর এই পর্বের যাত্রা শেষ হয়। ১১ই এপ্রিল ১৯৩২ তিনি আবার এক দূর ভ্রমণের পথে পাড়ি দেন। সেবার পারস্য যাত্রা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর আয়ুষ্কালের শেষ পর্বেও এইসব বিচিত্র ভ্রমণে অক্লান্ত উৎসাহী ছিলেন। তাঁর শেষ পনেরো বছরের কাব্য-কবিতায় চির-তৃষ্ণার্ত কবিদৃষ্টিতে বৃহৎ দুনিয়াকে একযোগে দেখবার সহজ আনন্দ আছে। সেই সঙ্গে আসন্ন এক ছুটির প্রতীক্ষা! 'সেঁজুতি'র শেষ কবিতায় তিনি লেখেন:

'আমার ছুটি আসছে কাছে সকল ছুটির শেষ,
ছবি একটি জাগছে মনে—ছুটির মহাদেশ!
আকাশ আছে স্তব্ধ সেথায়, একটি সুরের ধারা
অসীম নীরবতার কানে বাজাচ্ছে একতারা।'

এই ভ্রমণ-কথার পরে, আবার মনে পড়ে তাঁর 'পূরবী'র কথা। ৯ই জানুয়ারি ১৯২৫এ 'জুলিয়ো চেজার' জাহাজে লেখা পূরবীর 'মিলন' কবিতায় তিনি বলেন:

'জীবন মরণের স্রোতের ধারা
যেখানে এসে গেছে থামি

সেখানে মিলেছিনু সময়হারা
একদা তুমি আর আমি।'

'প্রাণের নিশ্বাস কী মহাবেগে ছুটেছে দশদিক্‌গামী'! পথিক পথ চলতে-চলতে এই সত্যও যেমন উপলব্ধি করে, তেমনি সময়হারা গভীর মিলন-মগ্নতার অন্য সত্যও তার হৃদয়ঙ্গম হয়। সে চলে এবং চলে না; সে চঞ্চল এবং চিরস্থির; নশ্বরতা এবং ধ্রুবত্ব দুইয়েরই সে অংশীদার! 'বনস্পতি'র রূপক দিয়ে 'লিপিকা'য়, 'পূরবী'তে, 'বনবাণী'তে, 'পত্রপুট'এ রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবি-জীবনের শেষ-পর্বে বার বার এ-কথা বলেছেন।

'ধ্রুবত্বের মূর্তি সে যে, দৃঢ়তা শাখায় প্রশাখায়,
বিপুল প্রাণের বহে ভার।
তবু তার শ্যামলতা কম্পমান ভীরু বেদনায়
আন্দোলিয়া উঠে বারম্বার।'

সান ইসিড্রো-তে ২৮এ ডিসেম্বর, ১৯২৪ এই 'বনস্পতি' কবিতাটি লেখা হয়। শান্তিনিকেতনে ১৩৩৪এর দোলপূর্ণিমায় তিনি যখন 'মহুয়া'র 'বোধন' লেখেন, তখন এই কথাই তিনি আর একভাবে বলেছিলেন:

'বাঁধন ছেঁড়ার সাধন তাহার
সৃষ্টি তাহার খেলা।
দস্যুর মতো ভেঙেচুরে দেয়
চিরাভ্যাসের মেলা।'

এই কবিতা থেকেই শব্দ ব্যবহার করে তাঁর এই অনুভূতির নাম দেওয়া যায়—'চিরন্তনের চঞ্চলতা'বোধ! 'মহুয়া'র বোধন, বসন্ত, বরযাত্রা, মাধবী, প্রত্যাশা ইত্যাদি কবিতায় কখনো তীব্রভাবে, কখনো বা ক্ষীণভাবে এই বোধই আত্মপ্রকাশ করেছে। তাছাড়া অন্য প্রসঙ্গও আছে। সবগুলিই গীতিকাব্য, কিন্তু এগুলির কোথাও প্রসাধনের প্রাধান্য, কোথাও বা তত্ত্বাবেগের! তিনি নিজে 'মহুয়া'র সূচনায় লিখে গেছেন:

'আমি নিজে' 'মহুয়া'র কবিতার মধ্যে দুটো দল দেখতে পাই। একটি হচ্ছে নিছক গীতিকাব্য, ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গিতেই তার লীলা; তাতে প্রণয়ের প্রসাধনকলা মুখ্য। আর একটিতে ভাবের আবেগ প্রধান স্থান নিয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধনবেগই প্রবল।'

'মহুয়ার 'মায়া' নামক কবিতায় প্রণয়ের এই দুই ধারার পরিচয় দেওয়া হয়েছে।'

সে যাই হোক্, প্রণয়তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর 'কড়ি ও কোমলে,'—'মানসী'তে তিনি যা বলেছিলেন, শেষপর্বে তাছাড়া কোনো নতুন কথা নেই। কিন্তু শেষপর্বের ভঙ্গিগত পার্থক্য এক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট।

প্রেমের প্রসাধন আর সাধনবেগের এই বিভাগ-চিন্তা যেমন,—তেমনি কবিতার প্রসাধন বা অনুভূতির অঙ্গ-সজ্জার দিক থেকেও পরমাশ্চর্য কারুকলা আছে 'মহুয়ার' চিত্রকল্পে, শব্দবিন্যাসে, মিল-উদ্ভাবনায়। মনে পড়ে, 'বরযাত্রা'তে তিনি লিখে গেছেন :

'পথপাশে মল্লিকা দাঁড়ালো আসি
বাতাসে সুগন্ধের বাজালো বাঁশি।'

মনে পড়ে, 'অর্ঘ্য'তে লেখেন :

'সূর্যমুখীর বর্ণে বসন
লই রাঙায়ে,
অরুণ আলোর ঝংকার মোর
লাগলো গায়ে।'

আবার, 'মনে পড়ে, মুক্তি'তে তিনি লিখেছিলেন :

'ঘাসের ছোঁওয়া তৃণশয়ন ছায়ে
মাটির যেন মর্মকথা বুলায়ে দিল গায়ে।'

'পূরবী'র 'আশা' কবিতায় নিজের ভাষা-সন্ধানের বেদনা প্রকাশ করে গেছেন তিনি,—পরে 'পরিশেষ'-এর 'লেখা'তে বলে গেছেন—নতুন কালে নতুন লেখা বার বার পুরোনো কালের পুরোনো লেখা মুছে দিয়ে দেখা দেয়; —তেমনি 'মহুয়া'র 'নির্ঝরিণী' [আষাঢ়, ১৩৩৫] কবিতায় জানিয়ে গেছেন :

'আমার ছায়াতে তোমার হাসিতে
মিলিত ছবি,
তাই নিয়ে আজি পরানে আমার
মেতেছে কবি।

পদে পদে তব আলোর ঝলকে
ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে,
মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজি,
নির্ঝরিণী
তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায়ে
নিজেরে চিনি।'

আবার, ১৯৪১এর পয়লা ফেব্রুয়ারি 'উদয়ন' বাসগৃহে বসে 'আরোগ্য' বইখানির তৃতীয় কবিতার শেষ কয়েক ছত্রে তিনি লেখেন :

'মনে মনে ভাবিয়াছি প্রাচীন যুগের
বৈদিক মন্ত্রের বাণী কণ্ঠে যদি থাকিত আমার
মিলিত আমার স্তব স্বচ্ছ এই আলোকে আলোকে।
ভাষা নাই ভাষা নাই ;
চেয়ে দূর দিগন্তের পানে
মৌন মোর মেলিয়াছি পাণ্ডু নীল মধ্যাহ্ন আকাশে।'

'আরোগ্যে'র পঞ্চম কবিতায়,—অর্থাৎ আগের কবিতাটির জন্মের আগের দিন, ২৮এ জানুয়ারি তারিখে,—দুপুরে, জনশূন্য ঘরে বসে, 'দিগন্তের নীলিম আলোর স্রোতে' মন ভাসিয়ে দিয়ে, তিনি আনন্দের সেই প্রগাঢ় ভাষা পেয়েছিলেন—যার নাম মৌন!

চঞ্চলের শোভাযাত্রায় যে-প্রেমের দৃষ্টিতে মানুষের মর্মগত প্রাণের সত্য 'বিধির স্বতন্ত্র সৃষ্টি' হিসেবে ব্যক্ত হয়, সেই প্রেমের বন্দনা তাঁর এই 'মহুয়া' কাব্য। 'আচ্ছাদন হতে—ডেকে লহো মোরে তব চক্ষুর আলোতে'—এই আহ্বানই মহুয়ার আহ্বান! 'মহুয়া'র প্রথম কবিতার নাম 'উজ্জীবন'। তাতে মদনকে বলা হয়েছে :

'যাহা স্থূল দগ্ধ হোক্ ; হও নিত্য নব।
মৃত্যু হতে জাগো পুষ্পধনু—
হে অতনু বীরের তনুতে লহ তনু।'

'অপরাজিত', 'নির্ভয়', 'পথের বাঁধন', 'দায় মোচন' প্রভৃতি কবিতায় সেই

উজ্জীবনের বিস্ময়-প্রত্যয়-আসক্তি-অনাসক্তির জয়ধ্বনি বেজেছে! কবি-প্রেরণার সেই শক্তি-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'সবলা'তে নারী বলেছেন :

'হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহীনা,
রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা।'

'মহুয়া'য় প্রেম যেন অলৌকিক পদ্ম! 'সৃষ্টিরহস্য' কবিতায় তিনি নিজেই সে উপমাটি দেখিয়ে গেছেন :

'তুমি আছ, তুমি এলে
এ বিস্ময় মোর পানে আপনারে নিত্য আছে মেলে
অলৌকিক পদ্মের মতন।'

শ্যামলী, কাজলী, হেঁয়ালী, খেয়ালী, কাকলী, পিয়ালী, দিয়ালী, নাগরী সাগরী, জয়তী, কামিনী ইত্যাদি 'নাম্নী' কবিতাবলীতে নারীর যে ভাব-বিচিত্রতা ধরা দিয়েছে, সেই ধারাতেই আরো পরে এসেছে 'আকাশ-প্রদীপ' এর 'নামকরণ',— শ্যামলী'র 'তেঁতুলের ফুল!' এসব ক্ষেত্রে কবির মন জগতের নানা ভাবকে নানা নামে বাঁধতে চায়। শ্যামলীর 'বাঁশিওয়ালা' মনে পড়ে। অধরাকে ধরবার খেলাই কবির খেলা! তাঁর সে খেলা কখনোই ফুরোয়নি। শেষ-পর্বে কবিসত্তার এই বহুবিচিত্র নব-উজ্জীবনই প্রধান কথা!

'পরিশেষ' এবং 'পুনশ্চ' দুটি বইই প্রকাশিত হয় ১৯৩২এ। 'পরিশেষ' বইখানি উৎসর্গ করা হয়—'শ্রীমান অতুলপ্রসাদ সেনের' করকমলে। খেলনার মুক্তি, পত্রলেখা, খ্যাতি, বাঁশ, উন্নতি, ভীরু,— এই ছ'টি কবিতাই প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত হয় [১৩৩৯, ভাদ্র, প্রথম সংস্করণ; ১৩৫০, বৈশাখ, দ্বিতীয়; ১৩৫৪, আশ্বিন পুনর্মুদ্রণ]। 'পুনশ্চ' কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণে পূর্বোক্ত ছ'টি কবিতা এবং সেই সঙ্গে নতুন লেখা—তীর্থযাত্রী, চিরজপের বাণী, শুচি, রঙরেজিনী, মুক্তি, প্রেমের সোনা, আর স্নানসমাপন—মোট এই তেরোটি সংযোজিত হয়।

'পরিশেষ' এর প্রথম কবিতা 'বিচিত্রা' [৭ই বৈশাখ ১৩৩৪, শান্তিনিকেতন]। বইয়ের দ্বিতীয় কবিতা 'প্রণাম'-এ [৬ই এপ্রিল ১৯৩১] কবি জানান :

'অর্থ কিছু বুঝি নাই, কুড়ায়ে পেয়েছি কবে জানি
নানা বর্ণে চিত্র করা বিচিত্রের নর্মবাঁশিখানি
যাত্রাপথে।...'

এই লেখাটিতে কাব্য-সাধনার 'গীতিপথপ্রান্তে' 'একের চরণে' কবি তাঁর প্রণাম জানিয়ে গেছেন। এই সমাসন্ন শেষপ্রান্ত সম্বন্ধে তাঁর ধারণার ইশারা ফুটেছিল 'জন্মদিন' কবিতাতেও [২৩এ বৈশাখ ১৩৩৮, শান্তিনিকেতন]। তাতে তিনি লেখেন :

'আমার রুদ্রের মালা রুদ্রাক্ষের অন্তিম গ্রন্থিতে এসে ঠেকে
রৌদ্রদগ্ধ দিনগুলি গেঁথে গেঁথে একে একে।'

'বিশ্বরসসরোবরে' তিনি শেষবার 'হৃদয় মন দেহ' ভরে চলে যেতে চান! তাই বলেছেন—'আমি যাই রেখে যাই মোর ভালোবাসা।'

আগেই দেখা গেছে যে, পথ তাঁর এক প্রিয় রূপক। 'মুক্তধারা' নাটকের প্রথম পরিকল্পিত নাম ছিল 'পথ'। তাঁর নানা বয়সের নানা কবিতায় গতির আবেগ এক প্রধান বিষয় হিসেবে বিদ্যমান। 'পরিশেষ'-এর 'পান্থ' [২৪ বৈশাখ, ১৩৩৮] কবিতায় তিনি লেখেন :

'তোমার মন্দির নাই, নাই স্বর্গধাম,
নাইকো চরম পরিণাম;
তীর্থ তব পদে পদে'।

এই কবিতার সঙ্গে 'বলাকা'র কোনো কোনো কবিতার অনুভূতিগত সাদৃশ্য মনে পড়ে। 'পূরবী'র কোনো কোনো কবিতার কথাও মনে পড়ে। ভ্রমণের পথে পথে তাঁর যাত্রী-মনের স্বাক্ষর থেকে গেছে। 'বালক' [২১, বৈশাখ ১৩৩৮], 'আমি' [১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩১] প্রভৃতি লেখাগুলির সহজ আনন্দের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। 'তুমি' [৭ নভেম্বর ১৯৩১] নিউইয়র্কে লেখা। 'মোহানা' [৭ই কার্তিক ১৩৩৪, কালীপূজা] কবিতাটি লেখা হয় সত্যিই এক মোহানায়,—ইরাবতীসংগম, বঙ্গসাগরে।

'বরণ তব ধূসর কর, বাঁধন নিয়ে খেল,
হেলায় হিয়া হারায়ে তুমি ফেল'।

দার্জিলিং-এ লেখা হয় 'বক্সা দুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি' [১৯, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮]। 'আবামারু' জাহাজ, বঙ্গসাগর থেকে লেখেন 'দুর্দিনে' [২৬ অক্টোবর, ১৯২৭]। এ-কবিতায় মিলের বাহাদুরি চোখে পড়ে :

'চৌদিক করে যুদ্ধ ঘোষণ,
দুর্গম হয় পন্থা
চিন্তায় করে রক্তশোষণ
প্রখর নখর দন্তা।

মিলের জন্যে একই কবিতায় কখনো সাধু ক্রিয়াপদ, কখনো চলিত ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করেছেন তিনি। আবার, 'আকাশ প্রদীপে'র 'প্রশ্ন' কবিতায় 'চলতেছিলেম', 'আনতেছিলে' ক্রিয়ারূপেরও প্রয়োগ দেখা গেছে। 'পরিশেষে'র 'চিরন্তন'এ তিনি লেখেন—'গাড়ি আমার চলতেছিল হেঁকে'।

গান্ধীজীর কারাবরণ উপলক্ষে লেখা হয় 'প্রশ্ন' [পৌষ, ১৩৩৮]। বাঙ্গালোরে লেখেন 'ভিক্ষু' [৩, জুন, ১৯২৮]। আবার, 'বীথিকা'র 'জয়ী',—'প্রান্তিকে'র প্রায় সব কবিতাই,—'নবজাতকে'র 'বুদ্ধভক্তি' প্রভৃতি এই ধারারই উদাহরণ। 'পুনশ্চ'র 'মানবপুত্র'ও এই ধারাতে ধর্তব্য।

মন সম্বন্ধে 'ক্ষণিকা'তে যেমন ভেবেছিলেন, তেমনি এই শেষ-পর্বেও তিনি অনেক ভেবেছেন। কবিতায় চেতন-অবচেতন বিভিন্ন স্তরের অভিজ্ঞতা ধরতে চেয়েছেন। 'আকাশপ্রদীপ'-এর 'জানা-অজানা,'--সেঁজুতি'র 'অমর্ত', 'পলায়নী',—নবজাতকের 'প্রজাপতি', এবং অন্যান্য বইয়ের অনুরূপ অন্যান্য কবিতায় নিজের কবিমনকেই তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে গেছেন। 'আবামারু' জাহাজে লেখেন 'অবুঝ মন' [২০, অক্টোবর ১৯২৭] :

'বিরাট অবুঝ এই যে আদিম মন,
মানব ইতিহাসের মাঝে আপনাকে তার অধীর অন্বেষণ
ঘর হতে ধায় আঙনপানে, আঙন হতে পথে,…'

এসব কবিতায় তাঁর বক্তব্য এই যে, মানুষের মন এসেছে প্রাণেরই সঙ্গে সঙ্গে। জগৎ-দৃশ্যপ্রবাহে বিচিত্রের শোভাযাত্রা দেখাই তার কাজ।

পিনাঙে লেখেন 'চিরন্তন' [১৮ই অক্টোবর ১৯২৭]। নেবুর ডালে

কোকিল ডেকে ওঠে,—আর তাই শুনে মনে পড়ে ছেলেবেলার গঙ্গাতীরের কথা। আবার 'আহ্বান' [৪, শ্রাবণ, ১৩৩৪] কবিতায় জানিয়েছেন :

'আমারে চাহি ডঙ্কা তব বেজেছে সেইখানে
বন্দী যেথা কাঁদিছে কারাগারে।'

'দুয়ার' [১৩৩৪] কবিতায় জীবন-মৃত্যুর কথা আছে :

'হে দুয়ার, বীজ হতে অঙ্কুরের দলে
খোল পথ ফুল হতে ফলে।'

'দীপিকা'তে [২৫, ফাল্গুন, ১৩৩৩] লিখে গেছেন :

'পথ ভুলে ভুলে পথ খুঁজে লও
সেই উৎসাহে পথদুখ বও,
দেববিদ্রোহে বাঁধা পড় মোহে
তবে হয় দেবারাধনা।'

কাব্যরচনার ধারা-পরিবর্তন এবং যুগাতিক্রমণের কথা আছে তাঁর 'লেখা'তে[১১ই চৈত্র১৩২৩]। ইতিপূর্বে সে-লেখাটি দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে।

'সব লেখা লুপ্ত হয় বারম্বার লিখিবার তরে
নূতন কালের বর্ণে।'

'আবামারু' জাহাজে বসেই এই শেষ পর্বে তিনি লেখেন 'নূতন শ্রোতা' [২১ অক্টোবর, ১৯২৯]। এই লেখাটির সঙ্গে আগের আমলের 'গানভঙ্গ', 'কবির বয়স,' '১৪০০ সাল' ইত্যাদির তুলনা চলতে পারে। পূরবীর 'ভাবীকাল',—বীথিকা'র 'অতীতের ছায়া',—'সেঁজুতি'র 'নতুনকাল'—অথবা 'লিপিকার' 'নতুন পুতুল' ইত্যাদি কবিতাগুলির বক্তব্যও এই সঙ্গে বিবেচ্য।

'নন্দগোপাল উৎসাহেতে বলল হঠাৎ ঝোঁকে
দাদামশায় শাবাশ
তোমার কালের মনের গতি, পেলেম তারি
ইতিহাসের আভাস।'

এই ধারাতেই মনে পড়ে, 'আকাশপ্রদীপ'-এর 'সময়হারা',—'পত্রপুট'-এর বারো নম্বর কবিতা। দৃষ্টান্ত দিয়ে,—নাম উল্লেখ ক'রে, এসব বেদনার কতোটুকুই বা পরিচয় দেওয়া যায়? চলে যাবার, ফুরিয়ে যাবার, শেষ

হবার বেদনা সর্বজনীন। 'পরিশেষ'-এর 'ধাবমান' কবিতায় তিনি লেখেন —'সংসার যাবারই বন্যা, তীব্রবেগে চলে, পরপারে।'

'পরিশেষ'এর আশীর্বাদ-প্রাসঙ্গিক লেখাগুলির মধ্যে: 'আশীর্বাদ' [দিলীপকুমার রায়কে—১৪, পৌষ, ১৩৩৫], 'আশীর্বাদী' [কল্যাণীয়া অমলিনার প্রথম বার্ষিক জন্মদিনে—৮ই কার্তিক ১৩৩৮, দার্জিলিং], 'পরিণয়' [সুরমা ও সুরেন্দ্রনাথ করের বিবাহ উপলক্ষে—২৫, বৈশাখ ১৩৩৮, শান্তিনিকেতন], 'আশ্রমবালিকা' [মমতা সেনের বিবাহ ১৩, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩, রোহিতসাগর] ইত্যাদি স্মরণীয়।

এইসব গুরু-লঘু বিচিত্র চিন্তার মধ্যেই মাঝে মাঝে সামান্য দৃশ্যরূপ দেখা দিয়ে যায়,—যেমন তাঁর 'কন্টিকারি' [৫ আষাঢ় ১৩৩৯]! 'শিলঙে এক গিরির খোপে পাথর আছে বসে'। সেইখানে অফলা পিচের শাখায় ফুল ফুটেছিল! কালো ডানায় হলদে আভাস অক্লান্ত এক পাখির গান,—উচ্ছ্বসিত গোলাপলতা, পাইনবনের বুজ—আর, পায়ের কাছে একটি কন্টিকারি! এই উপকরণ হয়ে ওঠে অনন্তের সংকেত।

স্বভাবোক্তির এই সব সহজসৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে তাঁর শেষ পর্বের নানা বইয়ের কতো যে কবিতায়! তাঁর 'আরেকদিন'ও এই ধরনের কবিতা। এই মসৃণ রূপ-বর্ণনার মধ্যেই ক্ষণে-ক্ষণে মননের রঙ লাগে! দেখা দেয় শব্দের চমক, চিত্রকল্পের কারুকার্য! এরই দৃষ্টান্ত আছে তাঁর এই বইয়ের 'অবাধ' [১৮ই অষাঢ়, ১৩৩৯] কবিতায়। চিত্র-কল্প এখানে মনন-চিহ্নিত।

'ওরা সব মেঘের মতন
প্রভাত কিরণ-পায়ী, সিন্ধুর তরঙ্গ অগণন।'

শব্দে, ছন্দে,—সাদৃশ্যবোধের তীক্ষ্ণ-কোমল নিদর্শনে,—তাঁর শেষ পর্ব যে বিশিষ্ট, তাতে সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য, অন্যান্য পর্বের মতন এই শেষ পর্বেরও প্রকাশকলা আর বক্তব্য দুই-ই একযোগে বিচার্য। তবু ছন্দ-প্রকৃতির নতুনত্বের দিকটি একটু বিশদভাবে আলাদা করে দেখা যেতে পারে। 'পুনশ্চ'র ভূমিকায় তাঁর গদ্য কবিতার ছন্দ ও অনুভূতিগত বিশেষত্বের কথা তিনি নিজেই জানিয়ে গেছেন:

'গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি অনুবাদ গদ্যে করেছিলেম। এই অনুবাদ

কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে, পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না। মনে আছে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেম, তিনি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু, চেষ্টা করেননি। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি, 'লিপিকা'র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয়নি, বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।'

'তার পরে আমার অনুরোধক্রমে একবার অবনীন্দ্রনাথ এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আমার মত এই যে, তাঁর লেখাগুলি কাব্যের সীমার মধ্যে এসেছিল, কেবল ভাষাবাহুল্যের জন্যে তাতে পরিমাণ রক্ষা হয়নি। আর একবার আমি সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছি।'

'এই উপলক্ষ্যে একটা কথা বলবার আছে। গদ্যকাব্যে অতি-নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশ-রীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব, এই আমার বিশ্বাস, এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি। এর মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে তাতে মিল নেই, পদ্যছন্দ আছে, কিন্তু পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করবার চেষ্টা করেছি। যেমন 'তরে' 'সনে', 'মোর' প্রভৃতি যে-সকল শব্দ গদ্যে ব্যবহার হয়না সেগুলিকে এই-সকল কবিতায় স্থান দিইনি।'

তাঁর এই ভূমিকার তারিখ ২রা আশ্বিন, ১৩৩৯। ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে 'পুনশ্চ' কাব্যের রচনা-রীতির আলোচনায় এক চিঠিতে ['পরিচয়,' বৈশাখ, ১৩৪০] তাঁর স্বভাবসুলভ, পরমাশ্চর্য সব সাদৃশ্য ব্যবহার করে, তিনি কাব্যের এই লক্ষণ নিরূপণ করেন: 'বচন-অনির্বচনের সদ্যোমিলনের পরিভূষিত

উৎসব।' বর-বধুর বিবাহ অনুষ্ঠানের উৎসব-সমারোহ প্রতিদিনের নয়। উৎসবের পরে দেখা দেয় প্রতিদিনের আটপৌরে সজ্জা,—তখন সংসার-যাত্রার স্থুল-সূক্ষ্ম নানা ভাবের সহজ প্রাত্যহিকতা। এইভাবে এগিয়ে তিনি লেখেন :

'যে সংসারটা প্রতিদিনের অথচ সেই প্রতিদিনকেই লক্ষ্মী-শ্রী চিরদিনের করে তুলেছে, যাকে চিরন্তনের পরিচয় দেবার জন্যে বিশেষ বৈঠকখানায় অলংকৃত আয়োজন করতে হয় না, তাকে কাব্য-শ্রেণীতেই গণ্য করি। অথচ চেহারায় সে গদ্যের মতো হতেও পারে। তার মধ্যে বেসুর আছে, প্রতিবাদ আছে, নানা প্রকার বিমিশ্রতা আছে, সেইজন্যেই চরিত্রশক্তি আছে।'

সেই চিঠিতেই তিনি আরো লেখেন :

'কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রীস্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি তাহলে সাহিত্যসংসারের আলংকারিক অংশটা হাল্কা হয়ে তার চরিত্রের দিক, অনেকটা খোলা জায়গা পায়; কাব্য জোরে পা ফেলে চলতে পারে।'

এই 'চলা'র কথা থেকেই 'নাচে'র কথা ওঠে। তিনি বলেছিলেন,—'গদ্যকাব্য নাচে না, সে চলে! সেই গতিভঙ্গি আবাঁধা।' এই চিঠির শেষ দিকে লেখা হয় :

'আরো-একটা পুনশ্চ-নাচের আসরে নাট্যাচার্য হয়ে বসব না এমন পণ করিনি। কেবলমাত্র কাব্যের অধিকারকে বাড়াব মনে করেই একটা দিকের বেড়ায় গেট বসিয়েছি। এবারকার মতো আমার কাজ ওই পর্যন্ত।' ১৩৩৯-এর দেওয়ালির দিনে খড়দহ থেকে লেখা তাঁর চিঠির শেষদিকে দেখা যায় : 'এর পরে মদ্‌রচিত আরো একখানা কাব্যগ্রন্থ বেরবে, তার নাম বিচিত্রিতা। সেটা দেখে ভদ্রলোকে এই মনে করে আশ্বস্ত হবে যে আমি পুনশ্চ প্রকৃতিস্থ হয়েছি।' ১৯৩৫-এর ৩রা জুনের চিঠিতে 'শেষ সপ্তক' সংগ্রহের কথা তুলে ধূর্জটিপ্রসাদকে তিনি প্রশ্ন করেন—'এর মধ্যে ছন্দোরাজকতার নিয়ন্ত্রিত শাসন না থাকলেও আত্মরাজকতার অনিয়ন্ত্রিত সংযম নেই কি?' ঐ বছরেই ২২-এ মে শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাছে এক চিঠিতে গদ্যকবিতার নমুনা দিয়ে লেখেন—'এ সমস্তই প্রতিদিনের চলতি কথার সহজ ছন্দ, গদ্যকাব্যের গতিবেগে আত্মরচিত।' আবার ১৩৩৯-এর ৭ই কার্তিকের চিঠিতে 'পুনশ্চ'র কবিতা-

গুলির কথা-প্রসঙ্গেই ধূর্জটিপ্রসাদকে তিনি জানান যে ওখানে—'গদ্যের পাখা উঠেছে!'—অর্থাৎ 'রূপরসাত্মক গদ্য, অর্থভারবহ গদ্য নয়!' ১৩৪১ এর 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত 'গদ্য-ছন্দ' প্রবন্ধেও এই 'নাচ' আর 'চলা'র কথা উঠেছিল। নানা কথায় কথায় আলোচনা এগিয়ে নিয়ে, তিনি কাব্যের ভাষা-বিন্যাসে 'আত্মিকতার বিধি' ব্যাখ্যা করেছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদকে লেখা চিঠিতে 'আত্মরাজকতা'র উল্লেখ সেই সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। প্রবন্ধের শেষদিকে হুইটম্যানের গদ্য-কবিতার অনুবাদ ক'রে গদ্য-কবিতার ছন্দ সম্বন্ধে তিনি বলেন—'ভাবের ছন্দ'।

'পুনশ্চ' বইখানি উৎসর্গ করা হয় 'নীতু'কে। দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুশোক অনুমান করা যায় 'পুনশ্চ'র 'বিশ্বশোক' কবিতায়। প্রথম কবিতা 'কোপাই'এর রচনাকাল ১লা ভাদ্র ১৩৩৯। তাতে তিনি বলেন :

'পুরাণে প্রসিদ্ধ এই নদীর নাম
মন্দাকিনীর প্রবাহ ওর নাড়ীতে।
ও স্বতন্ত্র। লোকালয়ের পাশ দিয়ে চলে যায়—
তাদের সহ্য করে, স্বীকার করে না।
বিশুদ্ধ তার আভিজাতিক ছন্দে
এক দিকে নির্জন পর্বতের স্মৃতি, আর-এক দিকে নিঃসঙ্গ সমুদ্রের আহ্বান।'

আবার, এই লেখাটিতেই আরো কয়েক লাইন পরে—

'ওর ভাষা গৃহস্থ পাড়ার ভাষা
তাকে সাধুভাষা বলে না।
জল স্থল বাঁধা পড়েছে ওর ছন্দে,
রেষারেষি নেই তরলে শ্যামলে।'

গদ্য-কবিতার ব্যাকরণ বা আঙ্গিকের দিকটি তিনি এই ভাবে নানা আলোচনায় অনুভূতির প্রাধান্য-চিহ্নিত বলে গেছেন। তাঁর কবি-জীবনের শেষ পর্বে সে-অনুভূতি বেশি দেখা দিয়েছে। দূরের জগৎ তাঁকে নিত্যই আকর্ষণ করেছে। তবু ভেতরে-ভেতরে গভীর যে মনোধর্মে তাঁর সবচেয়ে বেশি নিষ্ঠা ছিল, সেটিকে বলা যায় শান্তরসে নিষ্ঠা। ১৩০১-২ সালে,—অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দের হিসেবে গত শতাব্দীর শেষ দশকে তিনি যখন 'চিত্রা'র

'শীতে ও বসন্তে' 'নগর সংগীত'ইত্যাদি কবিতা লেখেন, তাঁরই 'ছিন্নপত্র' থেকে মন্তব্য তুলে তখনকার মনোভাবের পরিচয় দিতে হলে বলা যায় যে, মানুষের বিষয়-কর্মময় ব্যস্ততার মধ্যে প্রসন্নভাবে প্রতিদিনের কর্তব্য নির্বাহ করতে-করতে তিনি তখন প্রবলভাবে বিশ্বাস করতেন—'কাজের মধ্যেই পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা।' পরের আমলেও তিনি সে বিশ্বাস ত্যাগ করেন নি। কিন্তু 'চিত্রা'র যুগে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তাঁর যে শান্ত প্রসন্নতা ছিল, কালস্রোতে সমাজের গভীর সব অসংগতির চিন্তাতে সে-প্রসন্নতা নিঃসন্দেহে ক্রমশঃ কিছু পরিমাণে অদৃশ্য হয়। তাঁর মন কখনো গাম্ভীর্যে,—কখনো বা কৌতুকস্মিত কারুণ্যে আচ্ছন্ন হয়! তাঁর যৌবনের কর্মব্যস্ততার কথাসূত্রে,—সেই আগেকার আমলে 'শীতে ও বসন্তে' কবিতায় তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল :

আমি ভাবিলাম মনে,
এবার মাতিব রণে
বৃথা কাজে অকারণে
কেটে গেছে দিনরাত্র।'

সে-কালের এই রকম সংকল্পের মধ্যেও কিঞ্চিৎ কৌতুকের মর্জি ছিল। তিনি বলেন :

'লাগিব দেশের হিতে
গরমে বাদলে শীতে,
কবিতা নাটকে গীতে
করিব না অনাসৃষ্টি ;
লেখা হবে সারবান
অতিশয় ধার্-বান
খাড়া রবে দ্বারবান
দশদিকে রাখি' দৃষ্টি।'

পরিহাসের সুরে আত্মকথা বলতে-বলতে,—সারবান লেখার প্রসঙ্গ ধরেই তিনি জানান যে, ঘরের দরজা বন্ধ করে এইসব লেখা লিখে-লিখে, শুধু কলমের কালিতেই তাঁর

'আঙুলের ডগাগুলো
হয়ে গেল কালিকুষ্টি !'

ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, কাব্য, বিজ্ঞান,—এমন কি দেশের অর্থনৈতিক নানা খুঁটিনাটি বৃত্তান্তও তাঁর সে-সময়ের অধ্যয়নের বিষয় ছিল। তখন—

'আমি জানি, রুশিয়ান
কতদূরে আগুয়ান,
বাজেটের খতিয়ান,
কোথা তার আছে রন্ধ্র।
আমি জানি কোন্ দিন
পাশ হোলো কী আইন
কুইনের বেহাইন
বিধবা হইল কন্যা ;...'

তাঁর 'পূরবী'-পরবর্তী নতুন ভঙ্গির আলোচনাসূত্রে 'চিত্রা'-পর্বের এই বিশেষত্ব স্মরণীয়। সংসারের 'জটিল কুটিল' বিচিত্র কর্মে তিনি ব্যস্ত ছিলেন বটে, তবে সেকালেও নিজেকে বলেছিলেন 'নীড়হারা নিশার পক্ষী'! 'চিত্রা'র 'নগর-সংগীত'-এর মধ্যে এই কর্মস্বীকৃতির কথা ছিল :

'মানবজন্ম নহে তো নিত্য
ধন-জন-মান খ্যাতি ও বিত্ত
নহে তারা কারো অধীন ভৃত্য
কাল-নদী ধায় অধীরা।
তবে দাও ঢালি—কেবল মাত্র
দু'চারি দিবস, দু'চারি রাত্র,
পূর্ণ করিয়া জীবন-পাত্র
জন-সংঘাত মদিরা।'

যৌবনের জনসংঘাত-বোধের সেই 'মদিরা' বা নেশার ভাবটা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হয়েছে। তিনি জনসংসার ত্যাগ করেননি বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে শরীর জীর্ণ হয়েছে,—বস্তুজগৎ দেখে দেখে,—অভিজ্ঞতার সিঁড়ি পেরিয়ে পেরিয়ে, শেষ পর্বে পৌঁছে, তাঁর মন বলেছে :

'যে নেয়নি মেনে মর্ত শরীরে
বাঁধন পাঞ্চ ভৌতে;

তার সাথে মন করেছি বদল বদল
স্বপ্নমায়ার দৌত্যে।'

এ তাঁর সানাই'-এর 'মানসী' থেকে উদ্ধৃত। তখন তাঁর প্রৌঢ়ত্বের শেষ প্রহর। জগতের চেহারা বদলে গেছে তখন। বাংলাদেশের গ্রামপথের অপরাহ্ন-শোভা দেখতে দেখতে হঠাৎ কোনোদিন অপঘাত-সংবাদ আসে—'টেলিগ্রাম এল সেইক্ষণে—ফিনল্যাণ্ড চূর্ণ হল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে!' জনসংঘাত, রাষ্ট্রবিপ্লব, অপঘাত—সবই তাঁর চোখে পড়েছে, কিন্তু তাঁর মেজাজ বদলেছে ইতিমধ্যে। দেশকে দেখেছেন অন্নদাত্রী, স্নেহময়ী মাতৃমূর্তিতে,—জীবনের অমৃতস্বরূপের সত্যবোধ যেন আরো প্রশান্ত হয়েছে। ১৩২৮ সালের ২৩এ ফাল্গুন 'পূরবী'র 'মাটির ডাক' কবিতাটি লেখা হয়। যৌবনের নানামুখী কর্মকাণ্ডের কথা ভেবে, প্রৌঢ় বয়সের সেই কবিতায় তিনি জানান :

'আজকে খবর পেলাম খাঁটি
মা আমার এই শ্যামল মাটি,
অন্নে-ভরা শোভার নিকেতন ;
অভ্রভেদী মন্দিরে তার
বেদী আছে প্রাণ-দেবতার
ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন।'

যৌবনে একদা কর্মচাঞ্চল্যের তাড়নায় সেই শান্ত প্রকৃতির আরামাবাস ছেড়ে, তিনি যে দূরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, সে-কথা উল্লেখ করে অনুশোচনার সুরে তিনি বলেন :

'হেথা হতে গেলেম দূরে
কোথা যে ইটকাঠের পুরে
বেড়া-ঘেরা বিষম নির্বাসনে ;
তৃপ্তি যে নাই, কেবল নেশা,
ঠেলাঠেলি, নাই তো মেশা
আবর্জনা জমে উপার্জনে।'

শেষ পর্বের প্রশান্ততর অন্তর্মুখিতার দিনেও 'চিত্রা'র সেই সরস কৌতুক-ভঙ্গি অক্ষুন্ন ছিল। 'প্রহাসিনী'তে, 'ছড়া'তে তো বটেই, তাছাড়া 'পূরবী'তেও

সে-ভঙ্গির চিহ্ন আছে। তরুণ বয়সের রচনাশক্তিতে তখন বুঝি-বা ভাঁটা পড়েছে, এই রকম আশঙ্কা করে সকৌতুক আস্ফালনের ভঙ্গিতে জিৎভূমি—শিলঙ থেকে ১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'পূরবী'র 'শিলঙের চিঠি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

'যা হোক একটা খ্যাতি আছে অনেক দিনের তৈরী সে,
শক্তি এখন কম পড়েছে তাই হয়েছে বৈরী সে ;
সেই সেকালের নেশা তবু মনের মধ্যে ফিরছে তো,
নতুন যুগের লোকের কাছে বড়াই রাখার ইচ্ছে তো।
তাই বসেছি ডেস্কে আমার, ডাক দিয়েছি চাকরকে,—
কলম লে আও, কাগজ লে আও, কালি লে আও ধাঁ করকে।'

নিত্য নতুনভাবে নিজের রচনাশক্তির নৈপুণ্য প্রতিষ্ঠিত করবার আগ্রহে তিনি কখনোই নিরুৎসাহ ছিলেন না। পূরবীর' ঐ 'শিলঙের চিঠি'র মধ্যেই সে-সময়ের ক্লান্তিবোধের সঙ্গে আগের পর্বের উৎসাহ-উদ্দীপনার তুলনা করে কৌতুকময় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

'তরুণ বেলায় ছিল আমার পদ্য লেখার বদ অভ্যাস ;
মনে ছিল, হই বুঝি বা বাল্মীকি কি বেদব্যাস ;
কিছু না হোক, 'লঙ্‌ফেলো'দের হব আমি সমান তো—
এখন মাথা ঠাণ্ডা হয়ে হয়েছে সেই ভ্রমান্ত।
এখন শুধু গদ্য লিখি, তাও আবার কদাচিৎ,
আসল ভালো লাগে খাটে থাকতে পড়ে সদা চিৎ।'

তাঁর গদ্যে ইতিমধ্যে নতুন ভঙ্গি দেখা গেছে। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে—বাংলা ১৩৩৪ সালে 'বিচিত্রা'র আশ্বিন সংখ্যা থেকে তাঁর বৃহৎ উপন্যাস 'যোগাযোগ' বেরিয়েছে; ১৩৩৫ সালের ভাদ্র থেকে চৈত্র পর্যন্ত 'প্রবাসী'তে বেরিয়েছে 'শেষের কবিতা'; ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ বাংলা ১৩৩৮ সালের বৈশাখে গ্রন্থাকারে বেরিয়েছে 'রাশিয়ার চিঠি'। আর, সেই ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁর কবিতার বই 'বনবাণী' প্রথম দেখা দেয়।

সেই সময়ের রচনা 'পরিশেষ'-এর 'প্রণাম', 'পান্থ', 'জন্মদিন' ইত্যাদির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। 'পান্থ' কবিতায় তিনি বলেছিলেন :

শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা মুক্তি কারে কই,
আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই।
আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি,
এ পারের খেয়ার ঘাটায়।

বলেছিলেন :

রাখিতে চাহি না কিছু, আঁকড়িয়া চাহি না রহিতে।
ভাসিয়া চলিতে চাই সবার সহিতে
বিরহ মিলন গ্রন্থি খুলিয়া খুলিয়া।
তরণীর পালখানি পলাতকা বাতাসে তুলিয়া।

এ-সব রচনার পাঁচ বছর পরে লেখা হয় 'শ্যামলী'র 'চিরযাত্রী' [৪.৬।৩৬] যার শেষ কয়েক ছত্রে সীমানাভাঙ্গার দলের জয়যাত্রার কথা শোনা গেছে :

বহু যুগ থেকে
বেড়া ডিঙিয়ে, পাথর গুঁড়িয়ে,
পার হয়ে পর্বত ;
আকাশে বেজে উঠেছে নিত্যকালের দুন্দুভি
"পেরিয়ে চলো।
পেরিয়ে চলো।"

পূরবীর 'মৃত্যুর আহ্বান', 'পথ' প্রভৃতির সঙ্গে 'শ্যামলী'র এ-অনুভূতির যোগ সুস্পষ্ট। শুধু এই বিদায় বা চিরযাত্রার অনুভূতিই নয়, এরই সঙ্গে ছিল কাহিনী রচনার খেয়াল,—ছিল পরমাশ্চর্য রূপানুরাগ যেমন 'শ্যামলী'র 'হঠাৎ দেখা'তে, 'অমৃত'তে ;—ছিল নানা প্রসঙ্গে উন্মুখতা,—নানা সাদৃশ্য সৃষ্টির সৃজনী প্রতিভা, যেমন 'অপর পক্ষ' কবিতায় ট্রেনের ছবিতে—

দাঁড়িয়ে আছে একটা খালি ট্রেন—
যেন আদিকালের প্রকাণ্ড সরীসৃপটার কঙ্কাল,
যেন একঘেয়ে অর্থের গ্রন্থিতে বাঁধা
অমর কোষের একটা লম্বা শব্দাবলী।

'পূরবী' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত সুদীর্ঘ ষোলো বছরের মধ্যে ১৯২৯

খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একমাত্র 'মহুয়া' বইখানিই কতকটা ফরমাসী; এবং সেই কারণেই একটু অন্য ধরনের। তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রণয়-ধ্যানের প্রকাশ খুবই তীক্ষ্ণ, তীব্র এবং বিস্ময়কর সন্দেহ নেই,—কিন্তু প্রসঙ্গবৈচিত্র্যের দিক থেকে রবীন্দ্র-মানসের শেষ-পর্বের বিশেষ পরিচয় সেখানে ব্যক্ত হয়নি। তাতে বসন্ত-উদ্দীপনা অকৃত্রিম; কিন্তু ১৯২৯-এর কাছাকাছি সময় থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি যে নানা বিষয়ের সজাগ মননের মধ্য দিকে এগিয়েছেন, সে-প্রতিনিধিত্বের চিহ্ন নেই। 'মহুয়া'র পাঠ-পরিচয়ে শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ জানিয়েছিলেন:

> 'মহুয়া'র অধিকাংশ কবিতা ১৩৩৫ সালের শ্রাবণ হইতে পৌষ মাসের মধ্যে লেখা। এই সময়ে কথা হয় যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে প্রেমের কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া বিবাহ উপলক্ষে উপহার দেওয়া যায় এইরূপ একখানি বই বাহির করা হইবে, এবং কবি এই বইয়ের উপযোগী কয়েকটি নূতন কবিতা লিখিয়া দিবেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে কয়েকটির জায়গায় অনেকগুলি নূতন কবিতা লেখা হইয়া গেল; এই সব কবিতা এখন 'মহুয়া' নামে বাহির হইতেছে।'
>
> 'ইহার কিছু পূর্বে ১৩৩৫ সালের আষাঢ় মাসে, 'শেষের কবিতা' নামে উপন্যাসের জন্য কয়েকটি কবিতা লেখা হয়। ভাবের মিল হিসাবে সেই কবিতাগুলিও ছাপা হইল।'

'মহুয়া'র কথা আগেই বলা হয়েছে[৫]। অতএব আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ২৭এ শ্রাবণ ১৩৩৫ 'মহুয়া'র 'নিবেদন' কবিতাটি লেখা হয়। তাতে তিনি লেখেন:

> 'অজানা খনির নূতন মণির
> গেঁথেছি হার,
> ক্লান্তিবিহীনা নবীনা বীণায়
> বেঁধেছি তার।'

মূলতঃ এই ক্লান্তিবিহীনতাই এ-আমলের প্রধান কথা,—এবং এসব কথা

৫। ৩৪৪-৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পড়তে-পড়তে আবার মনে পড়ে যে. 'পূরবী', 'পরিশেষ', 'বনবাণী', 'মহুয়া'—সময়ের দিক দিয়ে এ-সবই পরস্পরের সন্নিহিত রচনা। তাঁর শেষ পর্বের কবিতায় বিষয়-বস্তুর শ্রেণী বিভাগ বা আঙ্গিকের বিভিন্নতা দেখিয়ে হয়তো একভাবে এ-পর্বের মূল কথাগুলি ধরা সম্ভব। কিন্তু কবির উপলব্ধি বা মনোধর্মের দিক থেকে আদিতে, মধ্যে, অন্তে, পর্বে-পর্বে ভেদ যে খুবই কম, সে-কথা মানতেই হয়।

'প্রভাত-সংগীত'-এর 'প্রভাত-উৎসব' প্রসিদ্ধ। সেই আদিপর্বেই তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল :

'আকাশ, 'এসো, এসো', ডাকিছ বুঝি ভাই—
গেছি তো তোরি বুকে আমি তো হেথা নাই।'

এই ব্যাপ্তিচেতনার প্রকাশ দেখা গেছে তাঁর সারা জীবনের রচনায়। শেষ পর্বের কবিতায় তাঁর অবসান-ভাবনা আর সেই পরিব্যাপ্তিবোধ একই সঙ্গে মিলেছিল। এ-পর্বের রচনায় তাই 'অবসান' গোধূলি' ইত্যাদি শব্দ ছড়িয়ে আছে। সেই সঙ্গে তাঁর 'পৃথিবী' [পত্রপুট] বা 'আফ্রিকা',—'বৃক্ষবন্দনা' [বনবাণী], 'প্রশ্ন' [পরিশেষ]—অথবা 'রাতের গাড়ি' [নবজাতক] ইত্যাদি অন্য বিষয়ের, অন্য ভাবনার কবিতাগুলিও দেখা গেল। স্থায়ী এক অবসান-ভাবনার ফলেই এ-পর্বে 'শেষ' কথাটি—বা এরই অন্য কোনো প্রতিশব্দ তাঁকে অনেকবার ব্যবহার করতে হয়েছে। 'পূরবী'তে 'শেষ বসন্ত',—'মহুয়া'তে 'শেষ মধু',—'পুনশ্চ'তে 'শেষ চিঠি'—'রোগশয্যায়' 'আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু'—'নবজাতক'এর 'শেষ বেলা',—এসব তো আছেই, তাছাড়া পুরো একখানি বইয়েরই নাম 'শেষ সপ্তক'। যেমন 'ক্ষণিকা'য়,—'বলাকা'য়,—তেমনি 'পরিশেষ'-এর 'ধাবমান' কবিতায় বলেছিলেন—'সংসার যাবারই বন্যা, তীব্রবেগে চলে পরপারে',—'মুক্তাকাশে দেখো চেয়ে প্রলয়ের আনন্দস্বরূপ!' মনে পড়ে, 'জন্মদিনে'র 'ঐকতান,'—আবার 'রোগ-শয্যায়'-এর 'ধূসর গোধূলি লগ্নে' লেখাটি! এই লেখাটিতে তিনি জানান :

'ধূসর গোধূলি লগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণ বাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত
রক্তসূত্রগাছি দেয় বাঁধা—
চিনিলাম তখন দোঁহারে।

দেখিলাম, নিতেছে যৌতুক
বরের চরম দান মরণের বধূ—
দক্ষিণ বাহুতে বহি চলিয়াছে যুগান্তের স্বর।

তাঁর রচনায় বর-বধূ রূপকের প্রয়োগ এই নতুন নয়। গোলাপ, রক্তপদ্ম ইত্যাদি পূর্বব্যবহৃত অন্যান্য রূপকও নানা কবিতায় ছড়িয়ে আছে। অতীতের 'গানভঙ্গ'-কবিতার মতন শেষ পর্বে দেখা গেছে 'নূতন শ্রোতা'! 'পরিশেষ' বইখানিতে পর্যায়বন্ধে পর পর দুটি কবিতা ছাপা হয়েছে—'নূতন শ্রোতা' নামেই। দুটিই ১৯২৭-এর রচনা—প্রথমটি লেখা হয় ১৯এ আগষ্ট এবং দ্বিতীয়টি ২৭এ অক্টোবর। এ লেখাগুলির কথা অগেই বলা হয়েছে। দ্বিতীয় কবিতাটিতে নতুন কালের 'আধুনিকতা'র তিনি এই বর্ণনা দিয়েছিলেন:

'নতুন কালের শান দেওয়া তার ললাটখানি খর খড়্গ-সম,
শীর্ণ যাহা, জীর্ণ যাহা তার প্রতি নির্মম
তীক্ষ্ণ সজাগ আঁখি,
কটাক্ষে তার ধরা পড়ে কোথা যে কার ফাঁকি।'

ইতিপূর্বে এ-আলোচনায় 'প্রহাসিনী'র কথা-প্রসঙ্গে সে-কালের 'আধুনিকতা'র বিরুদ্ধে তাঁর কিছু কিছু কটাক্ষ লক্ষ্য করা গেছে। তবু, রবীন্দ্রনাথকেও তাঁর নিজের লেখা 'আধুনিকতা'দুষ্ট বলে অভিযোগ শুনতে হয়! ১৩৪৩ এর কার্তিক-অগ্রহায়ণের পর পর দুটি প্রবন্ধে মোহিতলাল রবীন্দ্র-কাব্যের 'আধুনিকতা'র বিরুদ্ধে তীব্র কয়েকটি মন্তব্য করেন। শব্দ, চিত্রকল্প, ছন্দ—তিন দিক থেকেই শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ দুর্বলতা দেখিয়ে গেছেন,—মোহিতলালের সমালোচনায় সেই অনুযোগই স্পষ্ট হয়ে ওঠে! এইবার সমকালীন আর-এক সমালোচকের লেখা থেকে সে-কালের 'আধুনিকতা'-তত্ত্বের পর্যালোচনা স্মরণীয়।

১৩৩৮ সালে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা' পর্যায়ের প্রথম প্রবন্ধটি লেখেন। তার দশ বছর পরে 'প্রবাসী'তে তাঁর সে-পর্যায়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধ ছাপা হয়। ঈশ্বরগুপ্ত-দীনবন্ধুর আমল থেকে বঙ্কিম-মধুসূদনের যে ব্যবধান, সে কেবল সময়ের ব্যবধান নয়,—মতিগতি বা মনোধর্মের দিক থেকে তা বিবেচ্য; এই ছিল নলিনীকান্তের কথা। তিনি বলেন: 'আধুনিকতার

পাকা সড়কে বঙ্কিম-মধুই বাংলাকে তুলিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। তবুও, সে পথে উঠিয়াও প্রাচীন যুগের ধরন-ধারন—কেমন যেন মাঠ-ঘাটের গন্ধ, কাদামাটির স্পর্শ—আমরা একেবারে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে আমরা সেখানে গাড়ি-জুড়ী—গাড়ি-জুড়ী কেন, রেল-মোটর পর্যন্ত চালাইয়া দিয়াছি।'

তাঁর সেই প্রবন্ধে এই 'আধুনিকতা'র আরো নিখুঁত পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়: 'আধুনিক আধুনিক হইয়াছে বিশ্বজগতের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সংমিশ্রণের কল্যাণে। জাতিতে-জাতিতে দেশে-দেশে নিবিড়তর আদান-প্রদান প্রত্যেক জাতিকে দেশকে দিয়াছে একটা অভিনব রূপ, অভিনব ধর্ম—এইভাবে যে অভিনবত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই বোধ হয় আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যের প্রধান অঙ্গ।…মধুসূদন-বঙ্কিম যে আধুনিক, তাহার অর্থ এই—তাঁহারা বাঙালীর শিল্পচেতনায় ইউরোপীয় হাবভাব আনিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন। ইউরোপই হইল আধুনিক যুগের ধর্মক্ষেত্র, পীঠস্থান।'

তিনি দেখিয়েছিলেন যে, য়ুরোপের সংস্পর্শে জাপান আধুনিক হয়ে উঠেছে, আর সেই সংস্পর্শের অভাবে তখনো চীন সে- রকম 'আধুনিক' হতে পারে নি। ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত, দীনবন্ধু—এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন প্রাদেশিক-অর্থে বাঙালী, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিম-মধুসূদন এই প্রাদেশিকতার বেড়া ভেঙে দেশ-দেশান্তরের পরিচয় সঞ্চার করে দেন। রবীন্দ্রনাথও সেই কাজই করেছেন; কিন্তু তাঁর বিশেষত্ব এই যে, বহির্বিশ্বকে তিনি খুবই সহজে নিজের ভাষায় প্রতিফলিত হতে দিয়েছেন,—এবং তাকে তিনি সত্যিই আত্মসাৎ করে নিয়েছেন। নলিনীকান্ত এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের কবিতার কয়েকটি দিক বিশেষভাবে স্মরণ করেন। প্রথমতঃ তাঁর আন্তর্জাতিকতা:

'দেশে দেশে মোর দেশ আছে
আমি সেই দেশ লব বুঝিয়া।—'

—এ-চিন্তা বিশ্লেষণ করে তিনি লেখেন: 'দেশ হিসাবে, রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি এইরকম তির্যকৃভাবে প্রসারিত হইয়াছে, আলিঙ্গন করিয়াছে বিশ্বকে। কাল হিসাবেও তাহা আবার অন্যদিকে বর্তমান হইতে উঠিয়া গিয়াছে অতীতে, বৈষ্ণব সাধকের অনুভব, উপনিষদের অনুভবের রাজ্যে তিনি চলিয়া

গিয়াছেন।—এই দিককার অনুভবকে লইয়া নামিয়া আসিয়াছেন আবার সেই তির্যক্-প্রসারিত বিশ্ব-অনুভূতির মধ্যে।'

স্থান-কালের এই ব্যবধানহীন ব্যাপ্তি আর নিত্যতার উপলব্ধিতেই তাঁর 'আধুনিকতা'র বিশেষত্ব! নলিনীকান্তের একথা মেনে নিলে, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সৃষ্টিক্ষেত্রটিই সেই 'আধুনিক' দৃষ্টির দান বলে স্বীকার করতে হয়।

লোকধারণায় যাকে বলে 'আধুনিকতা', নলিনীকান্তের আলোচনায়—সেই আধুনিকতার সঙ্গে কালের নিত্যতা এবং স্থানের পরিব্যাপ্তি কতটা জায়গা পেয়েছে, সে-বিষয়ে আপাততঃ আলোচনা স্থগিত রেখে, রবীন্দ্র-নাথের সমস্ত কবিতার কালানুক্রমিক পর্ব-বিভাগ করতে হলে 'ক্ষণিকা' থেকেই তাঁর আধুনিকতার সূত্রপাত ধরা যাবে,—না-কি 'বলাকা' থেকে,—'পূরবী' থেকে,—না-কি 'মহুয়া'য়,—'শেষসপ্তকে', না-কি 'পুনশ্চ'তে, সে-বিষয়ে সংশয়াতীত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো সম্ভব নয়। তাঁর মৃত্যুর বছর-খানেক আগে,—৪ঠা এপ্রিল ১৯৪০ তারিখে 'নবজাতক'-এর সূচনায় তিনি জানিয়েছিলেন যে, তাঁর কাব্যের ঋতু পরিবর্তন বারে-বারেই ঘটে গেছে। 'প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে তখন মৌমাছির মধু-যোগান নতুন পথ নেয়।'

সেই 'সূচনাতে'ই তিনি লেখেন :

'কাব্যে এই যে হাওয়াবদল থেকে সৃষ্টিবদল এ তো স্বাভাবিক, এমনি স্বাভাবিক যে এর কাজ হতে থাকে অন্যমনে। কবির এ সম্বন্ধে খেয়াল থাকে না। বাইরে থেকে সমজদারের কাছে এর প্রবণতা ধরা পড়ে। সম্প্রতি সেই সমজদারের সাড়া পেয়েছিলুম। আমার একশ্রেণীর কবিতার এই বিশিষ্টতা আমার স্নেহভাজন বন্ধু অমিয়চন্দ্রের দৃষ্টিতে পড়েছিল। ঠিক কীভাবে তিনি এদের বিশ্লেষণ করে পৃথক করেছিলেন তা আমি বলতে পারিনে। হয়তো দেখেছিলেন, এরা বসন্তের ফুল নয়, এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকে মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে। তাই যদি না হবে তাহলে তো ব্যর্থ হবে পরিণত বয়সের প্রেরণা। কিন্তু এ আলোচনা আমার পক্ষে সংগত নয়। আমি তাই

'নবজাতক' গ্রন্থের কাব্য গ্রন্থনের ভার অমিয়চন্দ্রের উপরেই দিয়েছিলুম। নিশ্চিন্ত ছিলুম, কারণ দেশবিদেশের সাহিত্যে ব্যাপকক্ষেত্রে তাঁর সঞ্চরণ।'

জগতের ঘটনা-ক্ষেত্রে তাঁর এই দৃষ্টি-পরিব্যাপ্তির কথা 'নবজাতক'-এর এই সূচনায় তিনি নিজেই বলেছেন। নলিনীকান্তের সূত্র দিয়ে, রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টি বিচার করলে, তাকে 'আধুনিক' বলতেই হয়। কিন্তু আবার প্রশ্ন ওঠে—এ-অর্থে তিনি কী কোনো কালে অনাধুনিক ছিলেন? প্রথম জীবনে তিনি সেই-যে বলেছিলেন,—জগতের আলিঙ্গন গ্রহণের জন্যে তাঁর হৃদয় প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল, সেই 'প্রভাতসংগীতে'র আমল থেকে,—এমনকি তারও আগে থেকেই,— তিনি এই ব্যাপ্তির কথা বার বার বলে গেছেন। 'আবার, 'নবজাতকে'রই সমকালীন সংগ্রহ 'সানাই'-এর প্রথম কবিতা 'দূরের গান'-এ বলেছেন—'সুদূরের পানে চাওয়া উৎকণ্ঠিত আমি!' একদিন তিনি যেমন জীবনদেবতাকে স্মরণ করেছিলেন, 'সানাই'-এর 'কর্ণধার' কবিতায় তেমনি প্রশ্ন করেছেন—'ওগো আমার লীলার কর্ণধার, জীবন-তরী মৃত্যুভাঁটায় কোথায় কর পার।'

'নবজাতক' ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের সংগ্রহ। তখনকার যুদ্ধের হাওয়া লেগেছিল তাঁর কবি-চৈতন্যে। 'বুদ্ধভক্তি' [৭।১।৩৮] কবিতায় তাই দেখা যায়:

'তুরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।'

'কেন' [১২।১০।৩৮] কবিতায় দর্শনের কথা তুলেছিলেন তিনি। কেন সৃষ্টি? কেনই বা বিনাশ? শুধুই নবজাতকে নয়, তাঁর জীবনের শেষ পর্বে—সমকালের মানব-সংসারের নানা দুর্যোগ তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন রচনায় এইসব প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে। 'আহ্বান' [১।৪।৩৯] কবিতায় কানাডার উদ্দেশ্যে তাঁর উৎসাহ-বাণী উচ্চারিত হয়। মানুষ আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হোক্। কল্যাণ সর্বমানবিক হোক্,—এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। তাই, সেই অবস্থায় তিনি লেখেন—'তোলো অজেয় বিশ্বাসের কেতু।' আবার, 'রাতের গাড়ি'র [২৮।৩।৪০] চিত্রকল্পের অভিনবত্ব তুলনাহীন! সেই সঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে, 'মংপু পাহাড়' [১০।৬।৩৮] লেখাটিতে সমকালের নানা অনুভূতির মধ্যেই রোমান্টিক কবির গভীর আত্মকথা

পাওয়া যায়। কিন্তু তারও ভঙ্গি অন্য রকম, চাল সোজাসুজি। উচ্ছ্বাস কম, যুক্তি অটুট,—কতকটা কণিকা'র মতন পরিহাস-ব্যঞ্জনাময়—

'বিধাতা আপন ক্ষতি করে যদি ধার্য
নিজেরই তবিল ভাঙা হয় তার কার্য।'

'ক্যাণ্ডীয় নাচ' [জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪] কবিতায় ছন্দ, শব্দ, ভঙ্গি—সব দিক থেকেই আকর্ষণের অন্ত নেই।

তাঁর শেষ পর্বের এই বিভিন্নতা দেখতে-দেখতে আবার মনে পড়ে যে, বিষয়বস্তুর দিক থেকে কিংবা কবিমনের সক্রিয়তার দিক থেকে এ-পর্ব অন্যান্য পর্বের মতোই বহুধা সমৃদ্ধ। সবচেয়ে বেশি মনে হয়, বহুবিচিত্র এইসব উদাহরণের মধ্য দিয়ে তাঁর সক্রিয় শিল্পিমনের মুক্তিসাধনাই নানা-ভাবে ব্যক্ত। এ তত্ত্ব তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করে গেছেন। শ্রীযুক্ত দিলীপ-কুমার রায় তাঁর 'তীর্থঙ্কর' বইখানিতে 'রবীন্দ্রনাথের পত্রমর্মর' নামে যে অধ্যায় যোগ করেছেন, তাতে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে দেখা যায়:

'প্রাণের গতি নিঃশব্দ, নিগূঢ়। অঙ্কুর বীজকে বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসে। তার ধ্বনি যদি থাকে তবে সেটা ভিতরে, সেইটেই হচ্ছে নীরব ওঁ। গাছ প্রতি মুহূর্তে বাড়ে। তার ঘোষণা নেই। কিন্তু দিগ্বিজয়ী রাজা জয়স্তম্ভ যখন বানিয়ে তোলে তখন তার প্রত্যেক স্তরে স্তরে শব্দ, দূর থেকে মানুষ জানতে পারে একটা কাণ্ড হচ্ছে—কারণ তার এই সাধনার দ্বারা সে তার অহংকেই প্রচার করে। কিন্তু মুক্তির সাধনার লক্ষ্যই হচ্ছে এই অহংকে তার নিগূঢ় গুহাগহ্বর থেকে খেদিয়ে নিয়ে মারা, নইলে তপস্যার ফল সেই চুরি করে, আত্মা হয় বঞ্চিত।'[৬]

দিলীপকুমারের এই বইয়েরই ২৯১ পৃষ্ঠায় আর-একখানি চিঠিতে নিজের আয়ুর শেষ পর্বে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেরই কবি-পরিচিতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন আবার—

'বয়স সত্তর হোলো—আমার পরিচয়ের কোঠায় অনুমানের জায়গা প্রায় বাকি নেই।...একদিন কোনো পঁচিশে বৈশাখে ষোলো বৎসর

৬। ডিসেম্বর, ১৯২৮ ; পৃঃ ২৮৫।

বয়সের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছিলুম, অনেকগুলো পথের সামনে, অনেকগুলো আন্দাজের মুখে। তার মধ্যে সবগুলোকে বাদ দিয়ে আজকে অন্তত একটাতে এসে ঠেকেছে। এইটুকু নিঃসন্দেহে পাওয়া গেল যে, আমি কবি। কিন্তু শুধু কবি বললেও সংজ্ঞাটা অসম্পূর্ণ থাকে। কবির প্রেরণা কিসের এবং তার সাধনার শেষ ঠিকানাটা কোন্‌খানে এরও একটা পরিষ্কার জবাব চাই। সে-ও আমি জানি। আমার সব অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। বার বার ডেকেছি দেবতাকে, বার বার সাড়া দিয়েছেন মানুষ, রূপে এবং অরূপে, ভোগে এবং ত্যাগে। সেই মানুষ ব্যক্তিতে এবং সেই মানুষ অব্যক্তে।

বহুকাল আগে 'কড়ি ও কোমল'-এর একটি কবিতায় লিখেছিলুম 'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'[৭]

তাঁর শেষ পর্বের এই নবজাগ্রত অথচ চিরজীবনের মানবতাবোধের দিকটিও স্মরণীয়। এবং এইসব বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিল্প-সমৃদ্ধি বা আঙ্গিক-সৌকর্যের কথাও ধর্তব্য। ১৩৩৮ এর ৫ই বৈশাখ [১৯৩০] দিলীপ-কুমারের বইয়ের নাম দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

'নামকরণ রূপকরণের চেয়েও শক্ত। রূপের পরিচয় স্বয়ং রূপেই, নাম এসে বেড়া লাগিয়ে দেয়—সীমা নির্ণয়টা ঠিক মতো হয় না। তুমি নাম দাও না—'অনামী'। যার নাম খুঁজে পাই না তারি কথা বলি ছন্দে—ডিকশনারি দূরে পড়ে থাকে।'[৮]

এই ঘটনার এগারো-বারো বছর পরে, 'আরোগ্য' বইখানির ছাব্বিশের এবং সাতাশের কবিতার শেষ কয়েক ছত্রে তাঁর এই নাম-চিন্তা প্রতিফলিত হয় আর-একভাবে। সে-উক্তিতে আবার শিল্পাদর্শের গভীর সংকেত পাওয়া যায়। সাতাশ সংখ্যক কবিতায় তিনি শিল্পীর এই রূপায়ণ-সাধনা সম্পর্কিত আত্মকথা লেখেন : 'নামে বাঁধিবারে চাই, না মানে নামের পরিচয়।' ছাব্বিশের লেখাটিতে বলেন :

৭। ঐ, ১৯৩০ ; পৃঃ ২৯১-৯২।

৮। পৃষ্ঠা ২৯৪-২৫।

'শিল্পের নৈপুণ্য এই উদ্দামেরে শৃঙ্খলিত করা
অধরাকে ধরা।'

এই অধরাকে ধরবার আঙ্গিকস্পৃহাই 'সানাই'-এর 'সম্পূর্ণ', 'অত্যুক্তি' ইত্যাদি রচনায় আর একভাবে ব্যক্ত হয়েছিল। 'শ্যামলী'র 'তেঁতুলের ফুল' এই দিক থেকে স্মরণীয়।[১০] কিন্তু আঙ্গিকের কথা থেকে এইবার অন্য কথায় এগিয়ে যাওয়া যাক্।

১৩৪৫ সালের ভাদ্র মাসে 'সেঁজুতি' প্রকাশের আগেই তাঁকে একটি বড়োরকমের অসুস্থতা ভোগ করতে হয়। প্রায় আড়াই বছর পরে আবার অনুরূপ রোগভোগের পরে তাঁর 'আরোগ্য' বেরিয়েছিল ১৩৪৭-এর ফাল্গুনে। 'সেঁজুতি' উৎসর্গ করা হয় ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারের নামে। 'উৎসর্গ'-কবিতাটিতে সেই ১৩৪৫-এর ব্যাধি-যন্ত্রণার কথা পাওয়া যায়:

'অন্ধ তামসগহ্বর হতে
ফিরিনু সূর্যালোকে।
বিস্মিত হয়ে আপনার পানে
হেরিনু নূতন চোখে।'

১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮-এর মধ্যেই 'সেঁজুতি'র কবিতাগুলি লেখা হয়। ১৩৪৫ সালের পঁচিশে-বৈশাখ তাঁর জন্মদিন উদ্‌যাপিত হয় কালিম্পং-এর গৌরীপুর ভবনে। বিখ্যাত 'জন্মদিন' কবিতাটি তিনি সেখান থেকেই বেতারে প্রচারের জন্যে পাঠ করেন। 'সেঁজুতি'র সেই প্রথম কবিতা কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা গেছে।[৯] তাতে তিনি বলেন:

'আজ আসিয়াছে কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন, একাসনে দোঁহে বসিয়াছে,
দুই আলো মুখোমুখি মিলেছে জীবনপ্রান্তে মম
রজনীর চন্দ্র আর প্রত্যুষের শুকতারা সম,
এক মন্ত্রে দোঁহে অভ্যর্থনা।'

১০। ৩১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
৯। ৩৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

'পূরবী' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক কবিতাসংগ্রহের মধ্যেই জন্ম-মরণের এই রকম ওতপ্রোত সম্পর্কের কথা তিনি বেশ একটু জোর দিয়ে বার-বার বলেছেন। কাজেই, 'সেঁজুতি'র এই 'এক মন্ত্রে দোঁহে অভ্যর্থনার'-র আয়োজনটা আকস্মিক নয়,—বরং পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি! 'শেষ লেখা'র প্রথম কবিতার তারিখ ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৩৯। তাতে কবির প্রার্থনা—

'হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়,
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি' লয়,
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
মহা অজানার।'

'সেঁজুতির 'জন্মদিন'-এর মধ্যেও অনুরূপ প্রার্থনা ছিল:

'পিছু ফিরে আর্ত চক্ষে যেন নাহি দেখি চেয়ে চেয়ে
জীবনভোজের শেষ উচ্ছিষ্টের পানে।'

জরার আক্রমণে শরীর ভেঙে পড়েছে তখন। একে-একে চক্ষু-কর্ণ ক্রমশঃ অশক্ত হয়ে পড়ে! 'নিষ্প্রভ নেপথ্য-পানে' যেতে-যেতে তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন যে, অন্তিম লগ্ন তখন সমাসন্ন! তবু, বিদায়ের আগে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মনুষ্য-প্রকৃতির সংঘর্ষের কথা ভেবে তিনি লেখেন:

'কিন্তু জানি,
তোমার অবজ্ঞা মোরে পারে না ফেলিতে দূরে টানি।
তব প্রয়োজন হতে অতিরিক্ত যে-মানুষ তারে
দিতে হবে চরম সম্মান তব শেষ নমস্কারে।
যদি মোরে পঙ্গু কর, যদি মোরে কর অন্ধপ্রায়,
যদি বা প্রচ্ছন্ন কর নিঃশক্তির প্রদোষচ্ছায়ায়,
বাঁধ বার্ধক্যের জালে, তবু ভাঙা মন্দির-বেদীতে
প্রতিমা অক্ষুণ্ণ রবে সগৌরবে; তারে কেড়ে নিতে
শক্তি নাই তব।'

৭ই মে, ১৯৪০ 'শেষ লেখা'র দ্বিতীয় কবিতায় আরো সংহতভাবে এই কথাই দেখা দেয়:

'রাহুর মতন মৃত্যু
শুধু ফেলে ছায়া,
পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত
জড়ের কবলে
এ-কথা নিশ্চিত মনে জানি।'

'আরোগ্য' বইখানির প্রথম কবিতার কথা আগেই বলা হয়েছে। সেখানেও এই বাণীই ধ্বনিত হয়:

'দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে
সব ক্ষতি মিথ্যা করি' অনন্তের আনন্দ বিরাজে।'

তিনি এই লেখাটিতেই বলেছিলেন—'দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।' নিরাসক্ত মন দিয়ে সেই নিত্যকে দেখবার কথা রবীন্দ্র-সাহিত্যের বহু জায়গায় বলা হয়েছে। তাঁর শেষ পর্বের এই কবিতাটির শেষ-দিকে তিনি যা লেখেন, এ আলোচনার পূর্বাংশে [৩৩৫ পৃষ্ঠা] তা স্মরণ করা হয়েছে। এখানে এই কথাই বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, একদিকে যেমন এই সুতীক্ষ্ণ মূল্যবোধ, অন্যদিকে আবার শেষ পর্বের অন্য বোধও বিদ্যমান। 'শ্যামলী'র 'প্রাণের রস' [১।৬।৩৬] তারই উদাহরণ। সেখানে কবির প্রৌঢ় প্রশান্তির মৃদুভাষণ! শুধু স্বীকৃতি, শুধু সমর্পণ—চেতনার মধ্যে কেবল বিশ্ব-প্রাণের স্পর্শরসটুকুর অনুভূতি।

'সেঁজুতি'র 'জন্মদিন'-এর সঙ্গে 'পূরবী'র 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটির তুলনা মনে আসা স্বাভাবিক। ১৩২৯ সালের ২৫এ বৈশাখের এই কবিতায় তিনি লেখেন:

'উদয়-দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে।
মোর চিত্ত মাঝে
চির নূতনের দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।'

এই-আলোচনার মোট কথা এই যে শুধু শেষ পর্বেরই নয়,—এসব কথা কবি-রবীন্দ্রনাথের চিরবিশ্বাসের কথা! তাঁর শেষপর্ব অজ্ঞেয়বাদে মুখর, একথা কেবল আংশিক সত্য। তিনি 'সত্যহারা শূন্যতা' স্বীকার করতে চাননি। দেহের বেড়া পেরিয়ে, কালের সীমা পেরিয়ে আপনাকে দেখেছেন —'হিরণ্ময় পুরুষ'! 'শ্যামলী'র 'কালরাত্রে' [২০।৬।৩৬] মনে পড়ে।

'আরোগ্য' ১৯৪১এর সংগ্রহ; প্রথম কবিতার তারিখ ১৪ই ফেব্রুয়ারি। সে-লেখাটিতে বলা হয়—'সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে।' নিজের হৃদয়ে এই মন্ত্র নিয়েই ধরণীর ধূলায় তিনি প্রণতি জানান। 'মন্ত্র' শব্দটি এ-বইয়ে অনেকবার দেখা দিয়েছে।[১১] এই সূত্র থেকেই প্রকাশের আয়োজনে সংহতি-সন্ধানের সংকল্প অনুভব করা যায়। দ্বিতীয় কবিতা লেখা হয় ঐ বছর ১২ই মার্চে। তাতে তিনি অনুভব করেন:

'চির নূতনের অভিষেক
চির পুরাতন বেদীতলে।'

তৃতীয় কবিতার তারিখ সেই বছরের পয়লা ফেব্রুয়ারি। তাতে রূপে-সংগীতে কবিচেতনার আশ্চর্য এক সমাবেশবোধের ইশারা আছে!

'আলোতে ঝিকিয়া ওঠা ঘটকাঁখে পল্লীমেয়েদের
ঘোমটায় গুন্ঠিত আলাপে…'

শেষ পর্বের রূপানুরাগের কথা আগেই বলা হয়েছে। এ সেই রূপচেতনারই আর এক উদাহরণ।

তাঁর এ-পর্বে স্মৃতিরোমন্থন-মুখ্য অনেকগুলি রচনাই চোখে পড়ে। নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শ মানতে চেয়েছেন তিনি। আবার যোগ্য ভাষা-সন্ধানের ব্যাকুলতাও উচ্চারিত হয়েছে। এই লেখাটিতে তিনি পুনর্বার তাঁর চিরকালের প্রিয় সূর্যদেবতাকে স্মরণ করেছেন।

চতুর্থ কবিতায় [৩১।১।৪১] লিখে গেছেন:

'আতপ্ত মাঘের রৌদ্রে অকারণে ছবি এল চোখে
জীবন যাত্রার প্রান্তে ছিল যাহা অনতিগোচরে।'

পঞ্চম কবিতায় [২৮।১।৪১]:

'বলে, আমি আনন্দিত, ছন্দ যায় থামি,
বলে ধন্য আমি॥'

১১। ৩৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ কবিতায় [২৪।১।৪১] মাঘের প্রভাতের একটি দৃশ্য দেখা দিয়েছিল :

'এ কথা রাখিনু লিখে
উদাসীন চিত্রকর এই ছবি মুছিবার আগে।'

সপ্তমে [২৭।১।৪১] তাঁর নিজের দিনাবসান-চিন্তার বেদনার কথা স্পষ্ট :

'দুঃখবিজয়ীর মূর্তি দেখি আপনার
জীর্ণদেহ-দুর্গের শিখরে।'

জীবনের এই শেষ দিনগুলিতে তাঁর শরীর তখন গতবল,—মনে তখন 'কালিমার আক্রমণ'। দশম কবিতায় [১৩।২।৪১] 'অলস সময়ধারা বেয়ে' দিনযাপনের অভিজ্ঞতার মধ্যেই সমাজ-সেবক নানা জনগোষ্ঠীর কর্মবৈচিত্র্যের বন্দনা আছে। আঙ্গিকের দিক থেকে, এও স্মরণীয় যে, অনুভূতিধারার সঙ্গে সঙ্গে এই কবিতার শেষ দিকে খুবই সমুচিতভাবে হঠাৎ ছন্দ-পরিবর্তন ঘটেছে—'গুরু গুরু গর্জন গুন্ গুন্ স্বর'! ত্রয়োদশ কবিতায় [৩০।১।৪১] প্রেমের স্মৃতিচারণা আছে। তাতে আত্মজীবনীর স্মরণীয় ভঙ্গিতে পূর্বযুগের সঙ্গে তাঁর শেষ পর্বের প্রেমানুভূতির তুলনা করে গেছেন তিনি :

'ভালোবাসা এসেছিল একদিন তরুণ বয়সে
নির্ঝরের প্রলাপ কল্লোলে ...
আজ সেই ভালোবাসা স্নিগ্ধ সান্ত্বনায় স্তব্ধতায়
রয়েছে নিঃশব্দ হয়ে প্রচ্ছন্ন গম্ভীরে।'

মনে পড়ে, 'সানাই'-এর 'আসা-যাওয়া' [২৮।৩।৪০],—কিংবা 'অবশেষে' [৩।১২।৩৮]—যেখানে যৌবন-মধ্যাহ্নের অজস্রতার পালা শেষ করে বলেছিলেন—'পাই তারে না পাওয়ায় রূপে!' মনে পড়ে সেই 'সানাই' এরই আর একটি গান—'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী!' সে যাই হোক্, আরোগ্যের আঠারোর কবিতায় [১০।১।৪১] প্রেমানুভূতি নয়, তাঁর কবিজীবনের সে-পর্বের মন্থরতার কথাই প্রধান—

'আজকে আমার চাষ চলে না, নাই লাঙলের বালাই
পোড়ো মাঠের কুঁড়েমিতে মন্থর দিন চালাই।'

চব্বিশ-সংখ্যক লেখাটিতেও [২৩।১।৪১] সেই একই সুর :

'অলস শয্যার পাশে জীবনের মন্থরগতি চলে,
রচে শিল্প শৈবালের দল।
মর্যাদা নাইকো তার তবু তাহে রয়
জীবনের স্বল্পমূল্য কিছু পরিচয়।'

তারিখহীন বত্রিশের কবিতাটি 'পূরবী'র 'সবিতা'র সঙ্গে সাদৃশ্যের কথা মনে করিয়ে দেয়।

এসব রচনায় স্মৃতিচারণার উদাস কারুণ্যও অনুভব করা যায়, আবার উদাত্ত, গম্ভীর ভঙ্গিও যেন থেকে-থেকে পাঠকের বোধে ঢেউ তোলে। এই শেষ লক্ষণের উদাহরণ 'পত্রপুট'এর তিন-নম্বর কবিতা—'আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো পৃথিবী!' ষোলো নম্বর লেখাটি মনে পড়ে—'উদভ্রান্ত সেই আদিম যুগে'! মনে পড়ে পনেরো নম্বর, যাতে বলেছেন—

'আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য আলোকের প্রকাশ—
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য ভালোবাসার অমৃত।
আমি ব্রাত্য আমি মন্ত্রহীন,
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হোলো।
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।'

'নবজাতক'-এর পরে পয়লা বৈশাখ ১৩৪৮ সালে বেরিয়েছিল 'জন্মদিনে'। অর্থাৎ এও 'আরোগ্যে'র সমকালীন রচনা। 'জন্মদিনে'র প্রায় প্রতিটি কবিতাতেই তাঁর চেতনার অশেষস্পর্শিতার কথাই তাঁকে বলতে শোনা গেছে। যেমন তিনি প্রথম কবিতাতেই বলেন :

'আজি এই জন্মদিনে
দূরত্বের অনুভব অন্তরে নিবিড় হয়ে এল।

যেমন সুদূর ঐ নক্ষত্রের পথ
নীহারিকা-জ্যোতির্বাষ্প-মাঝে
রহস্যে আবৃত,
আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি দুর্গমে।
অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অজানা তাহার পরিণাম

দ্বিতীয় কবিতার প্রথম দুটি লাইনে বলা হয়:

'বহু জন্ম গাঁথা আমার জীবনে
দেখিলাম আপনারে বিচিত্র রূপের সমাবেশে।'

এবং সেই কবিতার শেষ তিন লাইনে নিজের সেই ব্যাপ্তিবোধের কথাই তাঁকে পুনর্বার বলতে শোনা গেছে:

'শুধু করি অনুভব,
চারিদিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন
বেষ্টন করিয়া আছে দিবস রাত্রিরে॥'

তাহলেও 'নবজাতক'-এর বেশির ভাগ কবিতাই অন্য জাতের, অন্য বিষয়ের। সেখানে তিনি 'শেষদৃষ্টি', 'বিদায়' ইত্যাদি কথা ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই মানতে হয় যে, তৎসত্ত্বেও 'ভূমিকম্প', 'রাজপুতানা', 'হিন্দুস্থান', 'বুদ্ধভক্তি' ইত্যাদি কবিতাগুলির নামেতেই নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি তাঁর মনোযোগের বিশেষ ঝোঁক পড়েছে। 'অস্পষ্ট', 'ইস্টেশান' ইত্যাদি কবিতায় সীমা-অসীমের মহাসম্মিলনের অনুভূতি আছে! 'কেন' কবিতায় তিনি মানবজীবনের যে অশেষ ব্যাপ্তি-চৈতন্য প্রকাশ করেছেন, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। এই বিপুল জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁর গূঢ় অর্থানুসন্ধানও বোধগম্য:

'নিরর্থক হরণে ভরণে
মানুষের চিত্ত নিয়ে সারা বেলা
মহাকাল করিতেছে দ্যূতখেলা
বাঁ হাতে দক্ষিণ হাতে যেন—
কিন্তু, কেন॥

১৯৪০-এর এইসব অনুভূতির সূত্রেই আবার 'পূরবী'-'পরিশেষ' পর্বের কথা মনে পড়ে। সে পর্বে একদিকে কবির বিষণ্ণতা এবং নিজের বোধ-বুদ্ধি-বিশ্বাসের তীব্র স্বীকৃতি বা সমর্থন ধ্বনিত। কৌতুকের ভঙ্গিতে লেখা মন্তব্য-গুলির মধ্যেও সেই একই বিশেষত্ব দেখা গেছে,—যেমন 'শিলঙের চিঠি'তে—'ভাবছি বসে, এই কলমের আর কি তেমন জোর আছে,'—এই উক্তির সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি জানিয়েছিলেন:

'ছড়া কিম্বা কাব্য কভু লিখবে পরের ফরমাশে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জেনো নয়কো তেমন শর্মা সে।'

আবার 'তপোভঙ্গ', 'লীলাসঙ্গিনী', 'সাবিত্রী', 'আহ্বান' প্রভৃতি 'পূরবী'র প্রসিদ্ধ কবিতা তাঁর ভূমাবোধের ব্যাকুলতা এবং তাঁর আত্মবোধের অভ্যস্ত পুনরাবৃত্তিরই উদাহরণ। 'কালের অধীশ্বর' কিংবা 'কালের রাখাল' কিংবা অন্য যে-কোনো নামেই অমৃতস্বরূপকে তিনি চিহ্নিত করে থাকুন না কেন, সেইসব আহ্বানের মধ্যে পূর্বসংযোগহীন কোনো অভূতপূর্ব নতুনত্বের বন্দনা নেই,—এবং তা তাঁর কবিচিন্তার ধারায় মোটেই যুগান্তসূচক নয়!

তবু, ১৯২৬-২৭এর পরেই তাঁর এক নতুন মনোভঙ্গির সূচনা ঘটেছিল বলা যেতে পারে। সে অবিশ্যি নতুনও বটে, নতুন নয়ও বটে। বিষাদ, বিস্ময়, ভাষা সন্ধান, প্রেম, স্মৃতিসুখ, অজ্ঞেয় অদৃষ্টবোধ, সমাজবীক্ষা, রূপানুভূতি, মানবতাবোধ ইত্যাদি প্রসঙ্গধারা আগেও ছিল, পরেও আছে। তাঁর জীবনে কবিচেতনার স্পন্দন হয়তো কখনো কখনো তীব্র হয়ে উঠেছে। যেমন, একবার ঘটেছিল 'ক্ষণিকা'তে,—তারপর 'বলাকা'তে- আবার 'মহুয়া'তে। এবং 'মহুয়া'র তীক্ষ্ণ, তীব্র, চমকময়তাইবোধ হয় তাঁর রোমান্টিক কবিমানসের শেষ জোয়ার! তারপর অন্য ঋতু, অন্য মনের নিরীক্ষা! সে-ভঙ্গিকে কোথাও কোথাও ক্লাসিকাল বলতে ইচ্ছে-হয়। আবার তৎক্ষণেই মনে পড়ে তাঁর 'সানাই-এর 'অনসূয়া' [২০।৩।৪০]—'এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্ম-রোমান্টিক!' কখনো ক্লাসিকাল কখনো রোমান্টিক! এ যেন কবিমানসের সর্বাস্তিবোধেরই আর এক দিক।

তাঁর 'মহুয়া' ফরমাসী বটে, তবু সংশয়াতীত উদ্দীপনার দিকটি ভেবে

দেখলে 'মহুয়া'তেই তাঁর শেষ বসন্ত-আস্বাদনের চিহ্ন ছিল। প্রাকৃতিক উচ্ছলতার স্বখে,—নৈসর্গিক উচ্ছ্বাসের প্রহরে,—তাঁর কবি-দৃষ্টিতে মানব-সংসারের স্থূল-সূক্ষ্ম নানাবিধ বাদপ্রতিবাদ তখন 'শুকনো পাতার মতো' অপসারিত ! সেই অবস্থাতে বড়োই বিস্ময়-ব্যাকুল মনে তিনি তাঁর 'হৃদয়-নিকুঞ্জ' মাঝে ঋতুরাজ বসন্ত-কে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ! কিন্তু 'মহুয়া'র বসন্ত-বন্দনা ললিত নয়,—উদ্দীপনায় অণুরণিত ! স্মৃতিচারণা, অবসান-ভাবনা, কাব্যতত্ত্বচিন্তা,—বিশ্বাস, শান্তি, প্রেম,—আন্তর্জাতিক-মানবসংসারের বোধ—এইসব অনুভূতিই অতঃপর প্রাধান্য পেয়েছে।

বিন্দু বিন্দু জল দিয়েই মহাসমুদ্র গড়ে ওঠে বটে, তবে অনেক জলবিন্দুর সমাহার ঘটিয়ে তোলাটাই সমুদ্রসৃষ্টির নমুনা নয় ! বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে রবীন্দ্র-কাব্যের কোনো পর্বই ছিঁড়ে-ছিঁড়ে, টুকরো-টুকরো করে দেখবার জিনিস নয়। তাঁর শেষ-পর্বের সঙ্গে তাঁর সারা জীবনের যোগ তাই অনস্বীকার্য। এই শেষ-পর্বে তিনি দেশের যুবশক্তিকে নাগিনীর বিষোদ্গারের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমে উৎসাহও দিয়েছেন, আবার প্রগাঢ় অনুভূতি এবং প্রত্যয়ের দিকে,—পরমের দিকে,—অনিবার্য 'একে'র দিকে তাঁর চিরকালের অভি-মুখিতার কথাও জানিয়ে গেছেন ! বিশ্বলীলার বিশ্বাসী দর্শক ছিলেন তিনি। 'নবজাতক'-এর 'মংপু পাহাড়' আবার মনে পড়ে। মনে পড়ে তাঁর বৃক্ষ-বন্দনার অনুরণন :

ঐ গাছ চিরদিন যেন শিশু মস্ত,
সূর্য উদয় দেখে দেখে তার অস্ত।

রবীন্দ্রকাব্যের শেষপর্বে তাঁর কবিমানসের চিরচর্চাই গভীর অনুভূতির সঙ্গে পুনর্ব্যক্ত হয়েছে। তাতে আঙ্গিকের বিচিত্রতার সঙ্গে শান্ত প্রত্যয়ের যোগ সুস্পষ্ট। তাতে মননের প্রাধান্য মানতেই হয়। তাতে তীক্ষ্ণতাও আছে, মগ্নতার উদাহরণও সুপ্রচুর। সে তাঁর মুক্তিসাধনারই আর-এক দিক ! তখনো গানের খেয়া চলেছে। তখনো অধরা মাধুরীকে ধরতে চেয়েছেন ! 'সানাই'-এর 'গানের খেয়া', 'অধরা' ইত্যাদি তুলনীয়। 'সানাই' কবিতায় তিনি আবার বসন্তের কথা তুলেছিলেন। 'বসন্তের যে দীর্ঘ নিশ্বাস—বিকচ বকুলে আনে বিদায়ের বিমর্ষ আভাস',—সেই দীর্ঘশ্বাসেই 'সাহানার রাগিনীতে বৈরাগিনী' ওঠে যেন জেগে !